

২১
১৯১৭.৭.২৫

P27200

আর্য্যাবর্ত্ত।

মাসিক পত্র

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সম্পাদিত।

দ্বিতীয় বর্ষ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(কার্তিক হইতে চৈত্র।)

১৩১৮

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।

১০৬২ প্রাণবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।



প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক

সূচী ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

অচলারতন	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬১৮
অজ্ঞাত (কবিতা)	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ	৬৭৫
অবুটচক (উপভাস)	সম্পাদক	৪৮২, ৬৬১, ৭৫২, ৮১৭
অলবেকুশীর ভারত ভ্রমণ	শ্রীগিরিজামোহন সাক্তাল	৬১২
অফ্রিকার ইসলাম বর্ষ	শ্রীমোহাম্মদ আমাদ আলী	৭৭২
আহ্মেদেদের ইতিহাস	শ্রীব্রজবরত রায়	৬২২, ৬৫৭
আলোক (কবিতা)	শ্রীবতীশচন্দ্র বসু	৭৩০
উম্মাদিনী (কবিতা)	শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ	
উর্শিলা (কবিতা)	শ্রীমতী সরোজবাসিনী স্ততা	৬৭১
ঐতিহাসিক ব্যক্তিকিৎ	শ্রীকামাধ্যাপন চট্টোপাধ্যায়	
ঐতিহাসিক ব্যক্তিকিৎ	শ্রীঅরুণেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	
কবি . (কবিতা)	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ	৬৫৪
কবি ও কাব্য (কবিতা)	শ্রীবতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৮১০
কাল (কবিতা)	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫২৭
কালীপোদ্ধার	শ্রীঅখিনীকুমার সেন	৮৪৭
গঙ্গ্যর প্রতি দিহালর (কবিতা)	সম্পাদক	৬৩৩
চন্দ্রবোপ	শ্রীহেমন্তকুমার বসু	৮০৭
চুড়াখনিবোপ (গল্প)	সম্পাদক	৫৬২
জাতি-ভেদে বিবাহের পদ্ধতিভেদ	শ্রীঅবোরনাথ বসু	

তীর্থ বাত্রা (গল্প)

দারিদ্র্য (কবিতা)

দিল্লী

দীনদাশ্যেবর (কবিতা)

নবীন-প্রসঙ্গ

নব ও নারী (কবিতা)

নিরবচ্ছিন্নতা (কবিতা)

পালনগরী রবাবতী

পাৰাণের কথা

পিক্‌ নিক্‌ (গল্প)

পুরস্কার (কবিতা)

পুরাণ কথা

পুরাতন প্রসঙ্গ

প্রতিভা (কবিতা)

প্রত্যাবর্তন (গল্প)

প্রিয় স্মৃতি (কবিতা)

প্রিয় ভাবতবর্ষ

তগিনী বিবেদিতা

ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য

মদনভট্টের কল

মালদহের পাল নগরাদি

মালদহের পল্লীকথা

মুরোপ-স্রবণ

রাঙ্গা ষটক রায়

রাধেশ্বর শেঠ

রাবারণ ও মহাভারত

রামানন্দ-সত্যতা

রামাবতী ও গৌড়

ত

সম্পাদক

দ

ঐশ্বর্যোন্নয়ন বহু কবিশেষণ

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগোপাধ্যায়

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

ন

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগোপাধ্যায়

২৮৮

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

২১৮

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগোপাধ্যায়

৬২১

প

ঐশ্বর্যোন্নয়ন পালিত

৪৮০

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগোপাধ্যায়

৪৮০, ৪৮১

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

৬৪১

সম্পাদক

১০৭

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগোপাধ্যায়

৪৮০

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

৪৩১

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগোপাধ্যায়

৬৬০

সম্পাদক

১২৪

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

৪৮২

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

৬৭৬

ভ

ভাষ্কার ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগোপাধ্যায়

অ

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

ক

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ ৫১২, ৬২২, ৭৩২, ৮৪২, ৯১০

ক

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

৫৭৫, ৭৫০, ৮২৬

সম্পাদক

৫৫১

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগোপাধ্যায়

৫০০, ৫৫৬

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

৮০০, ৯০০

ঐশ্বর্যোন্নয়ন যুগ

৭৭১

লক্ষ্যভূমি কবিতা)
লাল হুল (গল্প)

বক্তব্য
বর্ষচক্র (কবিতা)
বসন্তের উপহার (কবিতা)
বাল্যলাগি শিক্ষাবিশিষ্ট
বাস্তবগী
বাঁশি চোর (গল্প)
বিদায় (কবিতা)
বিদেশী গল্প
বিমোহনীয় জনক
বীণাপানির উষ্মাধন (কবিতা)
বীর ও গুপ্তী (কবিতা)
বুলবুলের প্রতি (কবিতা)
রূপা নহে (কবিতা)
বেলভেড়িয়ার
বার্ষ-বসন্ত (কবিতা)

শৈলস্বতি
শোক (কবিতা)

সনাতনী
সমালোচনা

..
সংগ্রহ

ঐ
ঐক্যভুলচক্র বোম
ঐমতী সুনীলানন্দরী দাসী

ঐনগেন্দ্রনাথ সোম
ঐরবীন্দ্রমোহন বোম
ঐমতী সুনীলানন্দরী দাসী
ভাস্কর ঐরাসবিহারী বোম
ঐদেবেন্দ্রপ্রসাদ বোম
ঐনগেন্দ্রনাথ বোম
সম্পাদক ...

ঐক্যভুলচক্র বোম
ঐনগেন্দ্রনাথ বোম
ঐকালিদাস রায়
ঐরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐনগেন্দ্রনাথ সোম
ঐক্যভুলচক্র বোম
ঐদেবেন্দ্রপ্রসাদ বোম
ঐরবীন্দ্রমোহন বোম

ঐক্যভুলচক্র বোম
ঐক্যভুলচক্র বোম

ঐক্যভুলচক্র বোম
ঐক্যভুলচক্র বোম
ঐক্যভুলচক্র বোম
ঐক্যভুলচক্র বোম

— — —
ঐক্যভুলচক্র বোম

৮৬০

৮৬১

৮৬২

৮৬৩

৮৬৪

৮৬৫

৮৬৬

৮৬৭

৮৬৮

৮৬৯

৮৭০

৮৭১

৮৭২

৮৭৩

৮৭৪

৮৭৫

..
সংগ্রহ (কবিতা) ঐক্যভুলচক্র বোম

শেখকগণের নামানুক্রমিক

সূচী ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

—*—

অ

ঐশ্বোর নাথ বহু কবিশেষের ভাতি ভেদে বিবাহের পদ্ধতি ভেদ ,

সংসম (কবিতা)

পারিতোষ (কবিতা)

ঐশ্বল চন্দ্র ঘোষ

লজ্জাভূরা (কবিতা)

বিদেশী গল্প

বৃষ্য নহে (কবিতা)

ঐশ্বর্যপেত্র প্রসাদ ঘোষ

ঐতিহাসিক ব্যংগিকিৎ

ঐশ্বরিনী কুমার সেন

কালীপোদ্ভাব

ঐশ্বর্য চন্দ্র সরকার

সমালোচনা

ক

ঐক্যাব্যাপন চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক ব্যংগিকিৎ

ঐক্যালিন্দাস রায়

মদন ভবের কল (কবিতা)

প্রিয়স্বতি (কবিতা)

বীণাপাণির উদ্বোধন (কবিতা)

ঐকেন্দার নাথ মজুমদার

রামায়ণী সত্যতা

খ

ঐকপেন্দ্রনাথ মিত্র

বানীচোর (গল্প)

৬৪৭

গ

ঐকিবিজ্ঞ নাথ মুখোপাধ্যায়

মহীন-প্রসঙ্গ

৬৪৮

ঐকিরিমা নাথ সত্যাল

অলবেকীর ভারতপ্রবণ

৬৪৯

X

অ

শ্রীজগৎ প্রসন্ন রায়	রাজা হট্টক রায়
শ্রীজ্ঞানকী নাথ শুধু	সমালোচনা
শ্রীজীবানন্দ মল্লিক	নর ও নারী (কবিতা)

ত

শ্রীভারতচন্দ্র রায়	সনাতনী
---------------------	--------

দ

শ্রীদেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	বারাণসী বেলভেড়িয়ার
--------------------------	-------------------------

ন

শ্রীনগেন্দ্র নাথ সোম	বুল বুলের প্রতি (কবিতা) বক্রেস্বর
শ্রীনরেন্দ্র কুমার বসু	ইউরোপ-ভ্রমণ

প

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র ঘোষ	অজ্ঞাত (কবিতা)
-----------------------	------------------

৬৭৫

ভ

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়	শৈলশ্রুতি
---------------------------	-----------

৮৬০

অ

শ্রীমোহাম্মদ আসাদ খানী	আফ্রিকার ইসলাম বর্ষ
------------------------	---------------------

অ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	নিরবজ্জিন্নতা (কবিতা) বীর ও স্ত্রী (কবিতা) কবি ও কাব্য (কবিতা)
-------------------------------	--

৬৯১

৬৯৪

৮৭০

শ্রীযতীন্দ্র মোহন শুধু

পিক্‌নিক (গল্প)

৮৪১

শ্রীযতীন্দ্র বসু

জ্যোতীক (কবিতা)

...

ক

শ্রীকবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	অচলারতন
------------------------	---------

শ্রীমঙ্গী যোহন যোষ কবি ও কবিতা (কবিতা)
 সমালোচনা
 দীন দ্ব্যোষর (কবিতা)
 ব্যর্থ বসন্ত (কবিতা)
 বর্ষচক্রে (কবিতা)

শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাবাণের কথা
 শ্রীরাধাপোবিন্দু কর ভগিনী শিবমিত্তা
 শ্রীহাসবিহারী যোষ বাল্যকাল শিক্ষাবিত্তার

ন

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচনা

ন

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কাল (কবিতা)
 ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য

শ্রীবিনোদ বিহারী বিভাবিনোদ পুরাণ কথা

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত পুরাতন প্রসঙ্গ

শ্রীবিভূতিকৃষ্ণ মজুমদার শোক (কবিতা)

প্রতিভা (কবিতা)

শ্রীব্রজবল্লভ রায় আত্মকর্মের ইতিহাস

স

শ্রীশশিকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দিল্লী
 রাবারণ ও মহাত্মার

স

শ্রীমতী সরোজবাসিনী গুপ্তা উর্দু (কবিতা) ৬৭১

বসন্তের উপহার (কবিতা) ৮০৬

সম্পাদক অষ্টম চক্রে (উপভাস) ১৮২, ৬৬১, ৭৫১ ৮১৭

তীর্থবাত্রা (গল্প) ৫২০

রাধেন্দ্র শেঠ ৫৫১

হৃদয়শিখর (গল্প) ৫৬২

গজার প্রতি দিমালয় (কবিতা) ৬৩৩

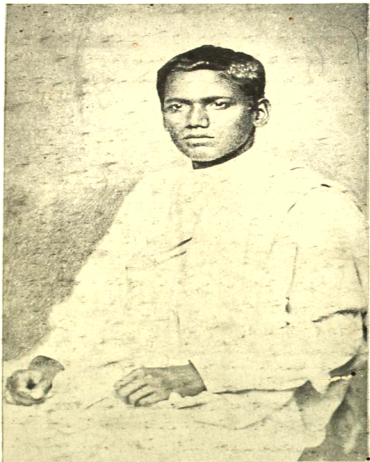
পুরকার (কবিতা) ৭০৭

সম্পাদক	বিদায় (কবিতা)
শ্রীমুদ্রেন নাথ মিত্র	প্রত্যাবর্তন (গল্প)
শ্রীমতি সুনীলাম্বুদেবী দাসী	বিদেহরাজ কনক লালকুল (গল্প)
শ্রীহরিন্দ্রনাথ পালিত	হ পালনগরী রমাবতী মাগদধে পাল নগরাদি রামাবতী ও গোড় মাগদধের পল্লীকথা শ্রীহেমচন্দ্র দাশ ও শ্রী হেমন্ত কুমার বসু শ্রীমতী হেমাদিনী ঘোষ
	শ্রীমির ভারতবর্ষ চন্দ্রখোপ উষাদিনী (কবিতা)

চিত্রসূচী ।

রাধেন্দ্র নেঠ ।
কুতুবখানার ।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সিটোর বিবেদিতা ।
শিশিরকুমার ঘোষ ।
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
নবীনচন্দ্র সেন ।
বারাগসী ।
ঐ
বেলভেড়িয়ার ।
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ।
কাকন জন্ম ।
হাইডলবার্গ ।
রাইনপ্রপাত ।

আর্য্যাবর্ত—



৬ রাধেশচন্দ্র গোট ।

ইংল্যান্ড জেস, কলিকাতা ।

মালদহে পালনগরী রামাবতী

—••—••—

রামাবতীপুরী প্রতিষ্ঠার কারণ-নির্ণয় ।

পুণ্ড্রনগরের সংস্থান-নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কেহ কেহ মালদহের পাণ্ডুরাকে পুণ্ড্রনগর বলিতে চাহেন। অল্পগন্ধ বগুড়ায় পৌণ্ড্রবর্ধনের স্থান নির্ণয় করেন। প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা হজরৎ পাণ্ডুরাকে পুণ্ড্রনগর বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিলে ইহা সৰ্ব্ববাদিসম্মত পুণ্ড্রনগর বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। হজরৎ পাণ্ডুরাকে পুণ্ড্রবর্ধন হজরৎ পাণ্ডুরাই যে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগর, ইহার নগর বলিয়া প্রমাণের পথ। প্রমাণগুলি প্রকাশ করিতে হইলে, মালদহের ঐতিহাসিক গ্রামনগরাদির বর্ণনার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। আমার বিশ্বাস হজরৎ পাণ্ডুরাই প্রাচীন পুণ্ড্রনগর। আলোচ্য প্রাচীন এই বিশ্বাসের পোষকতা করিবে বলিয়াই লিখিত হইল। রাক্ষা রামপাল এই পুণ্ড্রবর্ধনের সন্নিকটেই রামাবতীপুরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ রামপাল কৈবর্তজাতীয় রাজবিদ্রোহী ভীম ও হরির সহিত যুদ্ধ করিয়া যেরূপে কৈবর্তরাজ ভীমপ্রতিষ্ঠিত ডমরপুরী বিধ্বস্ত এবং মলানে ভীম কৈবর্তরাজ ভীম ও হরির ও হরির নিরস্বেদন করেন। রামপালের ও ভীমের পরামর্শ এবং নিরস্বেদন। জীবনীর একাংশ বর্ণনা করিলে তাৎকালিক বরেন্দ্র-ভূমির এবং পৌড়নগরীর সহিত পুণ্ড্রবর্ধনের একটি অজ্ঞাত ঐতিহাসিক কাহিনী যুক্ত হইয়া পড়িবে।

গৌড়পতি বিগ্রহপালের তিন পুত্র—মহীপাল, সুরপাল এবং রামপাল। বিগ্রহপাল চেদিপতি কর্ণদেবের তনয়া যৌবনশ্রীর পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনশ্রীর গর্ভে মহীপাল জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন বলিয়া বিবেচনা হয়।

মহীপাল সুরপাল ও রাষ্ট্রকূট বংশীয় মহন দেব রামপাল দেবের মাতুল রামপালকে ক্রিয়াবদ্ধ করেন। হইতেন, স্মৃতরাং রামপালের জননী রাষ্ট্রকূট-বংশীয়া ছিলেন। মহীপাল গৌড়পতি হইয়া বৈশাখের জ্যোতিষ রামপাল ও সুরপালকে শূলভাষ্য করিয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখেন।

রামপাল ও তদীয় জাতী পরপাল তাঁহাদিগের বহুবর্ণের সাহায্যে কারাগার বহুবর্ণের সাহায্যে রামপাল হইতে যুক্তিলাভ করিয়া অস্ত্ররক্ষার্থ রামপালপুত্র ও পরপালের পলায়ন। রাজপাল সহ গোড় ত্যাগ করিয়া অস্ত্র পলায়ন করেন।

মহীপাল যৌবনে অতিশয় গুল্মাপীড়ক ও কুটবুদ্ধি ছিলেন। তাঁহার বাবগারে প্রকৃতিপুঞ্জ উতাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় উত্তর বরেন্দ্রের কৈবর্তগণই মহীপালের অহাচার ও বীর ক্রাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। দিবাক ভীমের বিদ্রোহিত। ও তাঁহার পুত্র রুদ্রক বরেন্দ্র কৈবর্তগণের নেতা ছিলেন। রুদ্রকপুত্র হুবক ভীম মহীপালের অমানুষিক ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া সমগ্র কৈবর্তজাতির সহিত পরামর্শ করিয়া দলবদ্ধ হইলেন, এবং বরেন্দ্রবাসী ভীমক হরি। কৈবর্তগণকে উত্তেজিত করিয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ভীমের এক বন্ধু হরি এই কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিক্রমিত করেন।

মহীপাল কৈবর্তগণের এই ব্যাপার অবগত হইয়া সৈন্তসংগ্রহ করেন, কিন্তু সংগৃহীত সৈন্তগণের মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধকার্যে অশিক্ষিত ছিল। এই প্রকারের বহু সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া তিনি কৈবর্তগণের দমনার্থ অগ্রসর হইলেন। বীর্থাবান্ ভীম হন্তে মহীপালের বণকুশল কৈবর্তগণ মহীপালকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত পরাধীন ও রাজ্যচ্যুত। করিয়া সমগ্র বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়া পাল-রাজধানীর অনতিদূরে ভদ্র নদক নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন-পূর্বক সম্পূর্ণ বরেন্দ্রভূমি শাসন করিতে থাকেন।

এই সময় রাজপালপুত্র রাজাপালসহ দেশপর্যটন করিয়া বরেন্দ্র পাল-পুত্রসহ রামপালের দেশ-রাজত্ব-রক্ষক রাষ্ট্রকূট বংশীয় শিবরাজের * নিকট পর্যটন ও যাতুদপুত্র উপস্থিত হইয়া গোড়সিংহাসন প্রাপ্তি এবং কৈবর্তগণের শিবরাজের সহিত যুক্তি। সহিত ভীমের দমনার্থ পরামর্শ করেন। কাণ্ডবেব ও শিবরাজ কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাজিত করিয়া বরেন্দ্র অধিকারপূর্বক রামপালকে গোড়সিংহাসন প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া আশ্বীরভাজগণের সাহায্য-লাভের জন্য চেষ্টিত হইলেন। হিঠৈবী শিবরাজের উদ্ভোগে মগধাধিপ পীঠাপতি ভীমবশ্য,

* মহেন্দ্রের পুত্র কাণ্ডবেব এবং মহেন্দ্রের জাতী বরেন্দ্রের পুত্র শিবরাজ। শিবরাজ “রামপালের” মাতুলপুত্র, দত্তরায় সঘো জাতী ছিলেন।



কোটাপতি বীরগুণ, দণ্ডকুজপতি বনসিংহ, দেব-
রাজপুত্রের সাহায্য-প্রাপ্তি । গ্রামেশ্বর বিক্রমরাজ, অপগ্রমদ্রাধিপতি লক্ষ্মীশূর,
শূরপাল, তৈলকম্পাধিপতি রুদ্রশেখর, ওজালকুজাল ময়গঙ্গসিংহ, ডেকরীররাজ
প্রতাপসিংহ, কবরশীল, মতলাধিপতি নরসিংহারজুন, সন্তটগ্রামীর চণ্ডীজুন,
নিগ্রাবলীর বিজয়রাজ, কোলাধীপতি ঘোঁরপবর্জন, পদ্মবাধিপতি সোম প্রভৃতি
মন্ত্রপতিগণ রামপালের সাহায্যার্থ সমবেত হইয়াছিলেন ।

রামপালের পরম হিতৈষী মাতুলপুত্রদ্বয়ের নেতৃত্বে সমবেত রাজকুলবর্গ বিপুল
বাহিনীসহ বরেন্দ্র আক্রমণে রুদ্রসুর্জিত হইলেন । ভাগী-
মতী পান্যপানের রক্ত নোসেতু নির্মিত হইয়াছিল । এই
নোসেতুর দ্বারা তাহার গোগনে নদী উত্তীর্ণ হইলেন
এবং বরেন্দ্রে উপনীত হইয়া ভয় আক্রমণ করেন ।

“তস্য ম(ম)হাবাহিত্যাঃ শুশ্রামাঃ তদগিসন্তবেনাভূতং ।

দ্বৈবমভিসেনময়তোমুখরিতদিকোলাহলঃ সমুত্তারঃ ॥”

(রামচরিতঃ)

ভীম ও হরির পরাক্রম ও কৈবর্তাধিপতি ভীম যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দিদশা
বন্ধন । প্রাপ্ত হইলেন । ভীমসৈন্ত - ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন
করিলে ভীমসৈন্ত হরি উক্ত সৈন্তসমূহ একত্র করিয়া ভয়নগর রক্ষার্থ অগ্রসর
হইলে তিনিও পরাজিত ও বন্দী হইলেন ।

রামপাল বরেন্দ্র অধিকার করিয়া গৌড়-সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং
ভয়নগর অধিকার ও রাজদ্রোহী বরেন্দ্রকৈবর্তগণের আতঙ্ক উৎপাদনার্থ
চণ্ডীমতী পরামর্শে ঐহিত্য ঐহিত্যরাজ চণ্ডেশ্বরের পরামর্শানুসারে গঙ্গা ও
রামাবতী প্রভৃতির উত্তোলন করিতে পারিলেন । মধ্যস্থ ভূত্যাগে রামাবতী নামে অসংখ্য
নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন ।

রামাবতী প্রতিষ্ঠার স্থল
উৎসাহ ।

“অমরাবতী সমানিনে(ক) বরেন্দ্র-কৃতাতঙ্কাম্ ।”

(ঐ)

রামপালের এই নবপুরী বরেন্দ্রবারীর আতঙ্ক উৎপাদন
করিবার প্রধান কারণ—

“ভীমসৈন্ত নামক পক্ষী বর্তমান পোমড়াপুর থানার অন্তর্গত রোহনপুরের সাত মাইল উত্তর-
পূর্বে পুনর্বাবতীতে বিস্তারিত রহিয়াছেন ; সম্ভবতঃ ভীমসৈন্ত তথায় অবস্থান করিত । নবাবসম্রাজের
অন্তর্গত মহানগরীতে ভীমপুর নামক গ্রাম আছে ।



“রামাবতীমতিভুভাং সবিভীষণশাসনামুত্তমাতাম্ ॥”

(৩)

ভীষণ শাসন দ্বারা অরক্ষিত ছিল বলিয়া, রামাবতী সৌন্দর্য্যলাকীর্ণ ছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধ প্ৰেব্ধেবীর উচ্চ স্বৰ্ণযুক্ত মন্দিরে মন্দিরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল ।

“কনকময়ধাম লেখাধিকরণমপি মেরুশিখরমিব ॥”

রামাবতীর সেই সমুদায় মন্দিরের মধ্যে অতি সুন্দর বিবিধবর্ণরূপে সজ্জিত “বিনকশ্চনির্দিষ্ট কর্করময় মন্দির” শোভিত

ছিল । কুবেরতুল্য ধনবান্ ও সাধুজন তথায় বাস করিতেন ।

“পুণ্যজ্ঞানানাং বসতিমসামুখ্যবহারশঙ্করামুত্তম ॥”

সুতরাং রামাবতী অমরাবতীর জায় বোধ হইত ।

“পরমারবিকাগ্রাভিসুব্রতিভিরপি দেববারবনিতাতিঃ ।

কণিতমনিককিনীকং কৃতনেপথ্যঃ তটনটতীতিঃ ॥”

মগরের শোভা বারবনিতারও প্রাচুর্য্য পরিণকিত হইত ।

মগরमध्ये সুন্দর মন্দিরে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্তি ৬ প্রতিষ্ঠিত ছিল ।

বিভিন্ন দেশাগত বণিক্গণের বাণিজ্যের সুবিধার্থ অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্তি ।

বহু হাট বাজার ছিল । রাজা বহু সূত্র বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন এবং একটি সমুদ্রবৎ বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন । উক্ত সমুদ্রবৎ জলাশয়ের পাড় এতাদৃশ বড় সারসদ্বিধ প্রতিষ্ঠা । উচ্চ হইয়াছিল যে, উহা সমুদ্রতীরবর্তী পর্বতশ্রেণী সমূহ বোধ হইত ।

“স বিশালশৈলমালিতালীবজ্রমুখি [৭] সাক্ষাৎ ।

অপি পুস্তং পুষ্করীভূতং রচয়ামহু ব ভূপালঃ ॥”

(৪)

ঐ উন্নত পাড়ে তিনি তিনটি শিবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । রামাবতীর

* কর্করময়মন্দির—বিবিধ বর্ণের মীনা করা ইটকে নির্মিত, কি বর্ণলিপ্ত ?

* অমরাবতী সরিকটে (অধিরথের কাঠালে) মানবসম্মান বুদ্ধমূর্তির উর্ধ্ব অর্ধভাগ পতিত হইয়াছে ।

+ শিবালয়সমূহের ।

অপূর্ণতা তীর্থ ও অনতিদূরে তৎকালে “অপূর্ণতা” নামে একটি তীর্থ-
সঙ্গলবিহার। বান বিদ্যমান ছিল। তিনি রামপাল নগরসান্নিধ্যে
“জগদলবিহার” নামে সঙ্গলশ্রেষ্ঠ একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন।

পুত্র রাজ্যপালের উপর গোড়রাজ্য-বাসনের ভারার্ণ করিয়া রামপালদেব
রামপালের গ্রীসহ শুভ রামা-ভাগীরথী তীর্থ শুভ রামাবতীপুরীতে পণ্ডিতমণ্ডলী-
বতী পুরীতে অবস্থান। পরিত্যক্ত হইয়া সন্ন্যাস নিরত অবস্থান করিতেন।

“তত্ত্ব স রাজা নিবপন্নান্যবিষয়সম্মুখেন।

হৃদয়মর্পিতরাজ্যো রামঃ কান্তাসখশ্চিরাংরেনে

(রামচরিতঃ)

যোগদেবের পুত্র বোধিদেব রামপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ও সন্ন্যাসকর নন্দী
সন্ন্যাসকর নন্দীর পরিচয়। তাঁহার সমর সচিব প্রজাপতিনন্দী-পুত্র। এই সন্ন্যাসকর
রামচরিতঃ * নামক কাব্যে রামপালের চরিত্র লিখিয়া
রাখিয়াছেন। এই নন্দীবংশ হইতেই রাঢ়ীয় নন্দীগ্রামীয় থাকের উৎপত্তি
হইয়াছে। রামপালের প্রধান রাজবৈদ্য ভদ্রেস্বর, এই ভদ্রেস্বরের পিতামহ
দেবগণ রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের রাজবৈদ্য ছিলেন। ইহার পুত্র সুরেশ্বর; ইনি
সংস্কৃত ভৈবজ্যোতিধান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুরেশ্বর ভীমপালের অধীনে
অবস্থান করিতেন।

রামপাল যে সময়ে মুদগগিরি মন্দির) নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই
রামপালের স্নেহভাগ। সময়ে তাঁহার প্রিয়বন্ধু মথনের মৃত্যুসংবাদ তাঁহার কর্ণ-
গোচর হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিপুল অর্থাদি দান
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বহুশ্রবণের সন্নিকটে গমন উদ্দেশ্যে ভাগীরথী-গর্ভে প্রবেশ করিয়া
তত্ত্বভাগ করেন।

“জাহবাং জলমধ্যতত্ত্বনশনৈর্ধ্যাঙ্গাপদং চক্রিপো।

হা পাল্যদ্রুমৌলিমণ্ডলমণিঃ শ্রীরামপালমুতঃ ॥

(স্নেহভোগদঃ)

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বেঙ্গলে টহার এক খণ্ড গ্রন্থ হইয়া
প্রকাশিত করিয়াছেন- *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. III, No 1,
pp. 1-56.

রাণাবতী পুরীর স্থান-নির্ণয় ৮

এ পর্যন্ত বাঙা বণিত হইল, তাগতে রাণাবতীর চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং রাণাবতী পুরী প্রতিষ্ঠার কারণ বর্ণিত হইবাচে, কিন্তু রাণাবতী কোন্ নির্দিষ্ট স্থানে পরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই । নিয়ে রাণাবতী পুরীর স্থান-নির্ণয়ের অগ্রসর হইলাম ।

রমোতী ।

আইন-ই-আকবরি পাঠে অবগত হওয়া যায়—সব্রাট্ট আকবরের সময়ে সরকার আইন-ই-আকবরীর রমোতী । লক্ষ্মৌতীর অন্তর্গত রমোতী নামে একটি সহর ছিল । ইহার বার্ষিক কর ধাওয়া ছিল । সেই লক্ষ্মৌতীর (বর্তমান গোড়) সরিকটে “রমোতী” ছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থপাঠেই অবগত হইতে পারা যায় ।

রমতী নগর ।

ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গলে একাধিক বার রমতী নগরের উল্লেখ আছে । দক্ষিণ ঘনরামের রমতী নগর । ময়না • (ময়না গড়—মেদিনীপুর জিলার) হইতে গোড় আগমনকালে, লাউসেন ও কর্ণসেন বড় গঙ্গা পার হইয়া রমতী নগর অতিক্রমপূর্বক পালনাজধানী গোড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন ।

“কর্ণস বলেন দাতা চল এক দৌড় ।

আগে ঐ রমতী নগর ঐ গোড় ॥”

(বনবাণ)

ইহাতে বোধ হইতেছে, রমতী নগর হইতে গোড়-সীমা দৃষ্ট হইত, এবং রমতীর উত্তরে গোড় ছিল ।

রমতী ।

মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে “রমতী” নামক স্থানের উল্লেখ আছে এবং এই মানিক গাঙ্গুলির রমতী । রমতী নামের সহিত রাজগাঁ ও রঞ্জিত নামের উল্লেখ বিবেচনা হয়, মানিক গাঙ্গুলি রমতী, রাজগাঁ, রঞ্জিত ও পালনগরী গোড়ের অবস্থান বিশেষ প্রকারে অবগত ছিলেন ।

* বর্তমান জিলার বর্তমান মেমারি টেবলের অনতিদক্ষিণ-পূর্ণ এক “ময়নাগড়” নামক প্রাচীন চিত্রে চিত্রিত গড়বেষ্টিত স্থান আছে, এই “ময়নাগড়” উত্তর ময়না এবং মেদিনীপুরের ময়নাগড় দক্ষিণ ময়না নামে খ্যাত ।

“রমতী রহিল পাছু রাজগাঁ, রজিত।

দেখা দৈবিক গোড় নগরে উপনীত ॥”

• (রাজসভাধন পাল—মাণিক)

ইহাতে বোধ হইতেছে, রমতী, রাজগাঁ রজিত ও গোড় তখন দেখা যাইত

গোড় রমতী সরিকটে। অর্থাৎ এট কলি পরস্পর অধিক দূরে দূরে ছিল না ;

এবং রমতী, রাজগাঁ, রজিত • দেখিতে দেখিতে

অতিক্রম করিয়া গোড়ের কপূর উপনীত হইয়াছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলি একটি অত্যাবশ্যক কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন—

“উত্তরে গঙ্গার তীর দুকূল সহর।

দেউল দেহার। দেখ মহামোর ঘর ॥”

(২)

উত্তর গঙ্গার উত্তর কূলেই গোড় নগর ছিল। মালদহের কালিন্দী নদীই তৎকালে “উত্তর গঙ্গা” নামে খ্যাত ছিল বলিয়া বোধ করি। কালিন্দী গঙ্গার গঙ্গার উত্তর তীরে বৌড়নগর। একটি শাখা, কিন্তু হরুরং পাণ্ডুরার দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ রাজনগর বঙ্গাল কাঠালাদি + হইতে বর্তমান অমৃতী গঙ্গারামপুর প্রভৃতি স্থান যে প্রাচীন কালে গঙ্গাতীরবর্তী ছিল এবং এই স্থানে গঙ্গার একটি বিদ্যুত দাঁক ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং রমতী হইতে রাজগাঁ বিদ্যুত গঙ্গাবক্ষ দিয়া দেখা যাইত, এবং উহার উত্তরে গঙ্গাতীরস্থ গোড়ও দৃষ্টিপথে ফলি দেখা যাইত।

অমরতী (অমৃতী) ।

মালদহ জিলার সদর টেপন ইংলিশ বাজার হইতে যে রাস্তা রাজমহল ঘাট পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে, সেই রাস্তার উত্তর পার্শ্বেই “অমরতী” গ্রাম বিস্তারিত বর্তমান মালদহের অমরতী। তাহা হইছে। ইংলিশ বাজার হইতে তিন ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক দূরে বর্তমান অমরতী দেয়াড় কুখণ্ডের উপর সংস্থিত রহিয়াছে। পূর্বকালে সম্ভবতঃ গোড় বখন গঙ্গাপ্রবাহে প্রগট হইয়াছিল সেই সময়ে “অমরতী”র প্রাচীন মূত্রি গঙ্গাগর্ভে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল।

ইহা প্রথমে রামাবতী, তৎপরে রামতী নগর, তৎপরে রমতী এবং বাদশাহী আমলে “রমোতী” নামে খ্যাত হইয়াছিল। অত্যাণ অমরতী হইতে গঙ্গাপরিত্যক্ত

* রাজগাঁ রজিত প্রভৃতির বিবরণ পরে লিখিত হইয়াছে।

+ কাঠাল অর্থে বনজুতি।



ভূভাগের উপর নিয়া রাজদার, বঙ্গাল কাঠাল দষ্ট হয়। রামাবতী, রমতী ও রমোতী নাম গ্রহণ করিয়া বর্তমান কালে অমরতী এবং ইংরাজী ভাষায় “অমৃতী” নামে পরিচিত হইতেছে। অমরতী মালদহ জিলার অন্তর্গত, স্তত্রাং পালরাজকালে ভবিষ্যৎ মালদহ জিলার উপরই “রামাবতী” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সদ্ধাকর নন্দীর রামাবতী পুণ্যস্থানে রমতী হইয়াছিল, পানসাহী দপ্তরে ইহা রমোতী হয়, দেশের লোকে অমরতী বলে এবং ইংরাজী দপ্তরে ইহা অমৃতী হইয়া পড়িয়াছে।

রামাবতীর সন্নিকটবর্তী

রামচরিত-বর্ণিত কতিপয় প্রাচীন চিহ্ন ।

(১)

অবলোকিতেশ্বর-বুদ্ধমূর্তি ।

রামাবতী নগরে সুন্দর মন্দিরে অবলোকিতেশ্বরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। রামপাল বৌদ্ধ ছিগেন, স্তত্রাং বৌদ্ধ দেবালয়টি (বিষ্ণুকর্ণনির্মিত কর্করুদ্রমন্দিরটি) মেকশিখর সদৃশ কনকময় মন্দির ছিল বলিয়াই বোধ হইতেছে। কিন্তু বর্তমান বৌদ্ধ দেবালয়। কালে কনকময় মন্দিরের চিহ্ন বর্তমান নাই। অমরতী-সংলগ্ন গঙ্গারামপুরস্থ প্রাচীন ভাগীরথীখাতপার্শ্বস্থ কালু পাছলমানেন্দ্র দয়গার প্রাচীন বৌদ্ধচিহ্ন পতিত রহিয়াছে। ইহারই অনতিদক্ষিণে মানবপ্রমাণ বুদ্ধমূর্তির উচ্চাঙ্ক ভাগ আজিও শায়িত রহিয়াছে।

(২)

অপূর্ণভব তীর্থ ।

“অপাভিতো গঙ্গাকরতোয়ানঘপ্রবাহ(হা) পুণ্যতমাম্ ।

অপূর্ণভবাকরমহাতীর্থং বিকলুবোজ্জামবঃ ॥”

(রামচরিত)

রামাবতী পুরীর নিকটে “অপূর্ণভব” নামে একটি তীর্থস্থান ছিল। আজিও মালদহবাসীর নিকট শুনিতে পাই, বরেন্দ্রাদি দেশ হইতে নরনারীগণ অমরতীর সোলাঘাটে স্থান করিতে আগমন করিত। বলিতে পারি না, কনকময় ও কর্করুদ্রমন্দির-শোভিত ভাগীরথী তীরে অপূর্ণভব তীর্থ ছিল কি না।

পূনর্ভবা ও মহানন্দা নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে হুশরা রাজার বাড়ী বলিয়া খ্যাত একটি বিস্তীর্ণ উন্নত অংশতঃ পাকীর্ণ স্থান বিস্ত্রমান আছে। ইহা বর্তমান রোহণপুর সন্নিকটবর্তী রোহণপুর ষ্টেশনের এক মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। হুশরা রাজার গড়। রোহণপুর ও হুশরা রাজার গড় পূনর্ভবাতে। অত্ৰাপি মহানন্দা-দ্বান উপলক্ষে এই স্থানে গোক-সত্ৰবট হইয়া থাকে। এই স্থান পবিত্র বলিয়া খ্যাত। এই স্থানে মধ্যে মধ্যে সেবদেবীমূর্তির আবিষ্কার হইতেছে। অহুমান এই স্থানেই অপর্যন্তবতীর্থ ছিল। গঙ্গা ও করতোয়া ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী অক্ষর মহাতীর্থ অপর্যন্তব।

(৩)

জগদল-মহাবিহার।*

“মন্ত্রাণাং হিতিসূচাং জগদলমহাবিহারোচিতরাগাম্।

দধতী [২] লোকেষমশি সহস্রারোহীণিতোরমহিমানম্ ॥”

(রাম)

জগদল মহাবিহার নামে একটি বিহার রামপাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং মালদহের জগদল। ইহাতে লোকেষরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। জগদলবিহার রামাবতীপুত্রীর সন্নিকটে ছিল না, থাকিলেও উহার নাম লোপ পাইয়াছে। মালদহাস্থগত বরেন্দ্রভূমে “জগদল” নামক প্রাচীনচিহ্নাক্ত স্থান বর্তমান রহিয়াছে।

জগদলা।

ইহা বর্তমান মালদহ জিলার গাজল পানার অন্তর্গত পূনর্ভবা নদীর পশ্চিম বরেণ্ড জগদলা। তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমান কালে পূনর্ভবানদী জগদলা হইতে ক্রিষ্ণ পূর্বদিকে গমন করিলেও পূর্বে ঐ নদী জগদলার পদপাত দিয়াই প্রবাহিতা ছিল। জগদলা বরেন্দ্রের অন্তর্গত।

গাজল হইতে একটি রাস্তা পূর্ব-দক্ষিণ মুখে প্রসারিত আছে। ঐ রাস্তা দিয়া স্থলপথে জগদলার উপনীত হওয়া যায়। হজরৎ পাণ্ডুরা হইতে প্রায় বার মাইল পূর্বদিকে জগদলার উচ্চভূখণ্ড—ইষ্টক-প্রস্তরাক্ত বনভূমি পড়িয়া আছে।

জগদলার চতুর্দিকে—উত্তরজরী, দুর্গাপুর, মহাদেবপুর প্রভৃতি পল্লী আছে।

জগদল।

ইহা এই জিলার অন্তর্গত গোমস্তাপুর থানার অধীন ; বরেন্দ্রভূমে অবস্থিত

* জগদল-বিহারের বিশেষ বিবরণ বারানসিতে লিখিত হইবে।

প্রাচীন চিহ্নাক্ত হান । ইহার নিকটে জগদল নামে একটি পরী আছে ।

জগদল পরী : জগদল হইতে আর চার মাইল পূর্বে জগদল। বোগাজী নামক হান আছে । হাক্‌মোল, স্বর্ধাপুর, বীরেল প্রভৃতি পরী ইহার সন্নিকটে বিস্তারিত । ইহা সোমতাপুর হইতে আর নয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ।

• জগদল ।

পুণ্ডিয়া জিলায় কুঙ্গগরের এলাকাধীন হরিপুরের সন্নিকটে জগদল নামে পুণ্ডিয়া জগদল। একটি প্রাচীনচিহ্নাক্ত হান আছে । এক সময়ে এই ভূখণ্ডও পালব্রাহ্মণগণের করায়ত্ত ছিল ।

সম্ভব ।

এই প্রকার ছই তিনটি জগদল নামক প্রাচীন হান যেখানায় মনে হয় যে, রামাবতীর নিকটেই জগদল মহাবিহারের অস্থলরূপে, সেই সময়ে পালশাসনান্তর্গত ভূভাগে বর্তমান লোকেশ্বর শ্রীভার্য বিহার নির্মিত হইয়াছিল সে সকলের নামও জগদল-বিহার রাখা হইয়াছিল । রামাবতীর সান্নিধ্যে যে জগদলবিহার ছিল তাহা গঙ্গাপর্বে বিশ্রাম-লাভ করিলে কালক্রমে স্থানীয় মানবজন্ম হইতেও জগদল-স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে । জগদল হানগুলি খনন করিলে প্রাচীন চিহ্ন আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব । জগদলমাজেই বুদ্ধাদি দেবদেবীমূর্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

(৪)

ডমর নগর ।

ডমরের আর পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন নাই । ডমর নগরের স্থাননির্ণয় আবশ্যক । রামচরিত্রের চীকাকার “কৈবর্ত্ত নৃপত” প্রতিষ্ঠিত “ডমরনৃপতঃ” ডমর নগর, বর্তমান ডমর । বলিয়াছেন । বর্তমান কালে প্রাচীন ডমর “ডমরন” “ডমরল” “ডমরাইল” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । মালদহ জিলায় খরবা থানার অন্তর্গত “ডমরল” । ডমরনের হাট মিনাজপুর জিলায় অন্তর্গত । মহানন্দাতীরে প্রাচীন ডমর বর্তমান ছিল ।

“অপিচাপদগুম্বপ্রতিমপ্রবিশোর্হবধূতনিখিলনৃপম্ ।

স ভবভাবিতজনকঃ করণরবদলীলদ্বালাবীৎ ॥”

(রাম)

টীকাকার “ভয়রসুপপুরং” বলিয়াছেন। তীর্থ পালনগরীর নিকটে “ভয়রপুর” স্থাপন করিয়া ছিলেন বলিয়াই “উপপুর” বলা হইয়া থাকিবে।

(৫)

স্বন্দনগর, শোণিতপুর।

“ব্রহ্মকলোত্তরাং স্বন্দনগরেণ মুছিতানিভূতপতিতি (ম)।

তৈত্তির্যব্রহ্মসংহিতা (গা) বাটসরখট্টব্রহ্মসংহিতা (ত) শোণিতপুরাং ৥”

স্বন্দনগর পাণ্ডুর অস্তর্গত, শোণিতপুর তদনুযায়ী, বর্তমান কালে বাণপুর, শোণিতপুর, স্বন্দনগর। শোণিতপুর কাঠাল নামে খ্যাত। বাণপুর, শোণিতপুর, স্বন্দনগর মালদহের অস্তর্গত বয়েসকুন্ডিতে। প্রাচীন চিহ্নে চিহ্নিত।

রামচরিতের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কতিপয় প্রাচীন স্থানের নাম লিখিত আছে, তাহার অধিকাংশগুলিই মালদহের অস্তর্গত।

(৬)

সাগরদীঘি।

রামপালের সময় রামাবতী-পুরী ও ইহার চতুর্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভূত্যাগে বহু জলাশয় খনিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত রামাবতীপুরীর অনতিদূরে অস্থিতমান অর্ধাং সাগরদীঘি জলাশয় খনিত হইয়াছিল। ইহার পাড় সাগরকূলস্থ পর্বতের দ্বারা রামপালের সাগরদীঘি বর্তমান উচ্চ ছিল। এপ্রকার বৃহৎ জলাশয় ও উন্নত—বিশাল মালদহের বড় সাগরদীঘি। পাড় মালদহের মধ্যে একমাত্র সাগরদীঘি ব্যতীত অন্তর্জ দৃষ্ট হয় না। বড় সাগরদীঘি রামাবতী হইতে অধিক দূর নহে। হাণ্টারের মতে ইহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম কৃত্রিম জলাশয়। এই সাগরদীঘি কেমন—না,—

“স বিশালশৈলমালিতালীবক্রমবুধিং সাক্ষাৎ।”

(রাম)

মালদহের বর্তমান এই বড় সাগরদীঘি রামপালপ্রতিষ্ঠিত এবং রামাবতী-পুরীর সন্নিকটবর্তী। সাগরদীঘি সেনরাজগণের প্রতিষ্ঠিত নহে।

(৭)

শিবালয়।

(ক)

রামপালদেবের সময় কেবল যে বৌদ্ধবিহার নিশ্চিত হইত তাহা নহে, তৎসঙ্গে বহু শিবালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উন্নত ভূখণ্ডে শিবালয় বিস্তারিত থাকিবার

• পূর্বক এবং বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে।

কথা রাখচরিতে লিখিত আছে। সম্ভবতঃ বড়গাপরদীঘির পশ্চিম পার্শ্বে সোপানাবলি-শোভিত ঘাটের অনতিপশ্চিমে রাখপালপ্রতিষ্ঠিত একটি শিবালয় রাখপালপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বাদশাহী আমলে সেই স্থানে সেই উপাদানে তিনটি শিবালয়। এবং শিবালয়ের নিরূপণের উপর সেখ আদৌ সিন্নাজ-উদ্দীনের সমাধিগৃহ এবং কনকনিয়া মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। এই স্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধ চিত্রাঙ্কিত অস্তাব নাই। এই স্থানের সন্নিকটে মমলাবাড়ী। সাগর-দীঘির ছয়টি স্তূপস্থং বাধান ঘাট ছিল।

(খ)

পালখন দীঘিভীরস্থ শিবালয়।

হজরৎ পান্ডুর দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান পড়ুয়া ষ্টেশনের দক্ষিণ-পূর্বে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এক স্তূপস্থং দীঘি আছে। রেলওয়েলাইন এই দীঘির উত্তরে বগচর দিয়া বিস্তারিত রহিয়াছে। এই দীঘির দক্ষিণ দিকের রাজমসরের পালখন দীঘি। বাধা ঘাটের পশ্চিম পার্শ্বে এক বিশাল ইষ্টকস্তূপ ও ইহার সান্নিধ্যে স্তূপ, শিব, বিষ্ণু, লক্ষী প্রভৃতি দেবদেবীমূর্তি পতিত আছে।

রাখপালের অন্ত শিবালয় ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দীঘির উত্তর ভীরে একটি মাংসপেক্ষা স্তূপস্থং বুদ্ধমন্তক (প্রস্তম্বর) আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঐ স্থানের সন্নিকটে একটি বিহার বা স্তূপ ছিল। ইহা বিস্তৃত রাজমসর পরগণায় অন্তর্গত। রাজমসর পরগণার পালবংশীর অন্ততম রাজধানী গৌড় বিদ্যামান ছিল।

শ্রীহরিদাস পালিত ।

মদনভাস্করের ফল ।

(রাজশেখর।)

দীনকেতবে দহিয়া বিধি করেছ এ কি ব্রহ্ম,—
মমতাহীন পেয়েছে সে যে ভুবনভরা অঙ্গ !
পঞ্চর ভালিয়া তা'র হয়েছ পর লক্ষ—
করিল দেহ কনকমল বি'দিয়া দেহ-বক্ষ ।

শ্রীকালিদাস রায়

অচলায়তন।

(সমালোচনা)।

‘বচস্যাগাগমৈর্ভিরাঃ পদ্বানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।’

ধর্মসাধনার একাধিক পন্থা আছে। কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, তিনেরই এক উদ্দেশ্য, কিন্তু উপায় ভিন্ন ভিন্ন। কর্মমার্গ আচার, নিয়ম, ব্রত, সংবম, উপবাস, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা জটিল ও গহন। ভক্তিমার্গ শুধু হৃদয়ের প্রীতিপ্রকার প্রিয়তমের স্মরণ ও স্মরণ। জ্ঞানমার্গ আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতির প্রভাবে শুদ্ধ ও কঠোর। তবে জ্ঞান ও ভক্তির মণিকাকনবোশ ঘটলে উজ্জ্বল মধুরে মিশে।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক মনোভাঙ্গণ, বেদগান, বস্ত্র, হোম প্রভৃতি অহুষ্ঠানবাহনো সংহিতাত্রাশ্রয়-আরণ্যকাদি প্রদীড়িত। পুরাণ স্মৃতি তত্ত্বাদিও ঐ ক্রিয়াকাণ্ডের অহুষ্ঠানবাহন্য লইয়া বিব্রত। হৃদয়ের ভক্তি, প্রাণের আকুলতা, আত্মার নিপাসা, এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর বেন হাঁকাইয়া উঠে। ক্রিয়াকাণ্ডের পাবাণচাপে হৃদয়টা একেবারে নিলিষ্ট হইয়া যায়; প্রাণ শুদ্ধ হয়, আত্মা অশাফ হয়, মাহুৎষ একটা যন্ত্র হইয়া পীড়ার। সেইজন্ত ক্রিয়াকাণ্ডের বিকছে আচার, অহুষ্ঠান, বাহ্য-বিচার, জাতিভেদ, সমাজভেদ, বর্ণভেদ, অবিকারিতের প্রভৃতি বিবিধ ভেদের বিকছে চিরদিন মাহুৎষের প্রাণের ভিতর একটা বিরোধ, একটা সংগ্রাম চলিতেছে। সকল ক্ষেত্রেই এই সংগ্রাম ঘটিয়াছে। সকল দেশেই যুগে যুগে প্রকৃত সাধক আবির্ভূত হইয়া জলদগন্তীর করে মাহুৎষকে শুনাইয়াছেন—

জপ তপ আত্ম দেব-আরাধনা

পূজা হোম জাগ প্রতিমা-অর্চনা

এ সকলে এবে কিছুই হ’বে না

প্রাণের প্রভুরে করয়ে পূজা।

ঐতিহাসিক ক্যারিসিদিগের আচারপ্রিয়তার বিকছে বীতশ্রীষ্ট মণ্ডারমান হইয়া-
ছিলেন এবং বন্ধনবৃত্ত স্বাধীন হৃদয় হইতে যতঃ উৎসারিত ভক্তিবারা দ্বারা ঐ
— পাবাণতপ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতে একদল ঘটনা একাধিকবার ঘটনাছে,
বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিকছে বুদ্ধদেবের বিদ্রোহ বোধ হয় সর্বপ্রথম। এক

হিসাবে গীতাও এইরূপ একটা বিশ্লেষণের ফল । ‘সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাংসকং
শরণং ব্রজ ।’ যখন যখন আচার-অহুষ্ঠানের নানাপাশ-বন্ধন আঁটিয়া বসিয়াছে,
তখনই তখনই এক এক জন প্রেমাবতার ‘বাদাঠাকুর’ আসিয়া এই সঙ্গীর্ণতা,
এই ব্যস্তিকতা, এই বাহুতচ্ছিন্নতা, এই আচারনিষ্ঠা অবহেলা করিয়া ছন্দের
সত্যবল প্রেমভক্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে শান্তিকৃত অহুষ্ঠানের নেহালা
ভালিয়া গিয়াছে । কবীর, তুকারাম, গুরু নানক প্রভৃতি এই পথের পথিক ।
বাকালার চৈতন্যদেব এই রসের রসিক । সেদিনও রামপ্রসাদ সেন পৌরাণিক
দেবতার উপাসক হইয়াও অহুষ্ঠানকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ভক্তিকে সেই আসনে
বসাইয়া দিয়াছেন—

‘ভক্তি হ’তে মুক্তি হয় এই সার মুক্তি ।’

‘ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দানী ।’

শত শত বাউল ও আউলিয়া সম্প্রদায় এই ভক্তির ধর্ম, এই প্রেমের
ধর্ম, এই বিশ্ব প্রকৃতির ধর্ম, এই বিশ্বজনীন ধর্ম কর্ণভূমি ভারতভূমিতে প্রচার
করিয়াছেন । ভারতীয় সমাজে একদিকে যেমন আচার-অহুষ্ঠানের, মন্ত্রতন্ত্রের,
ব্রতনিয়মের শুষ্কতা ও কঠোরতা আছে, অপরদিকে তেমনই ভক্তির চিরন্তন
উৎস ভারতীয় মানব-প্রকৃতিকে চিরসরস করিয়া রাখিয়াছে । উপনিষদের
‘রসো বৈ সঃ’ হইতে ‘রসের নবগোরা’ পর্যন্ত এই রসে ওতঃপ্রোত । ভারতবর্ষ
চারি মূণ ধরিয়া এই শুভাভিষেক তত্ত্বের গোপ্তা । বৈদিক কালের কবি হইতে
শাস্ত্রনিকেতনের মহর্ষিমনন পর্যন্ত বিশ্বের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের ভিতর সেই
পরমপুরুষের ‘সত্যং শিবং সুন্দরং’ রূপ দেখিয়াছেন ।

“অচলায়তন” এই চিরন্তন সত্য—আজ বিশ্বব্রহ্মীর শ্রুতার উৎসক-
নিমে নৃতন করিয়া আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ধরিয়াছে ; দৃষ্টকাব্যের সঙ্গীষ চিত্র-
বিচিত্র ভাষায় ও ছলাকলার সূর্ত করিয়া—কবির প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত
করিয়া—সাধকের হৃদয়-রসে সরল করিয়া, আমাদের প্রাণের কাছে আনিয়া
দিয়াছে । এই অচলায়তন-নামক অবিচল স্থায়ী Impregnable Rock বা
Mount Zion, জীটানের Holy Catholic Church, বোড়ের মঠ, হিন্দুর
বেদমুখিতত্ত্ব-পুরাণ-শাসিত বিরাট সমাজ । কলকথা, সকল অহুষ্ঠান-বাহ্য-
খিলিত ধর্মই প্রাচীণে ধরিয়া শোহকবাটে বন্ধ করিয়া নিয়মে বাধিয়া আচারে
আঁটিয়া মন্ত্রতন্ত্রে সাধনার গভী নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে । নিসর্গস্রষ্ট বিশ্বজনীন
পরিপূর্ণাঙ্গ সঙ্গীষ গতিশীল ধর্মের প্রাপত্তয়া প্রেমভক্তি, হৃদয়ত্তয়া আলোক,

মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, এই সঙ্গীর্ণ পঙ্খীর ভিতর—এই পাবান প্রাচীরের ভিতর—এই অচ্ছিন্ন পূরীর ভিতর প্রবেশ করিতে পার না। প্রবেশ করিলে সে সঙ্গীর্ণতা, সে অগুঠানশিরতা, সে যান্ত্রিক “আড়ষ্টতাব, সে পাখরচাপা অসাড়তা দূরীভূত হয়। উচ্চ-অঙ্কের ভক্তিসাধনত্বের এই সারসভ্য।

এই ভাবে দেখিলে “অচলায়তন” সত্য শিব ও স্তম্ভের সমাবেশে • মনোহারী, চমকপ্রদ, প্রাণম্পর্শী ও আত্মার তৃপ্তিকারী হইয়াছে, ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলিব। সাধনার যে উচ্চতরে পৌছিলে শিবভূর্ণা, কালৌকিক তেজবুদ্ধি থাকে না, সেই তরে পরজ্ঞাস করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরিদ্রুতরূপে দেখাইতেছেন যে, আচারনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের গুরুদেব এবং পতিত অনাচারণীর (নমঃশ্রু) দর্ডকগণের গোলাই এবং আহারবিহারে অনাচারী স্নেহবন্ধনের দাদাঠাকুর একই বস্তু। ভেদ কেবল উপাসনার প্রণালীতে। দাস্য ও দাদুর্ভা, পূজাঅর্চ্চা জপতপ হোমযজ্ঞ অপেক্ষা অধিকতর মহৎ ও পবিত্র। কবি এই সনাতনী কথা কাব্যচ্ছলে লিখাইতেছেন।*

কিন্তু “অচলায়তনের” আর একটা দিক আছে। সেটা বোধ হয় বর্ণাশ্রমধর্মী, তত্ত্ববৃত্তিপূরণভক্ত হিন্দুর মনঃপ্রীতিকর হইবে না। বিবেকানন্দ দ্বাছাকে দুঃসম্পর্গ বলেন, বর্তমান কবি তাহার উপর, হিন্দুর সেই আচারধর্মের উপর, বিধিনিষিদ্ধ বিদ্রোহবর্ণ বর্ণন করিয়াছেন। ‘হিং টিং ছুটে’র কবি আবার অনেক দিনের পর তাঁহার অক্ষর তৃণ বাহির করিয়াছেন। ‘গোরার’ কৃকদম্বাল বাবুর ঘোরগুপ্তসংহিতার একান্ত অভিনিবেশ দেখিয়া বুকিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথের অক্ষর তৃণের তীক্ষ্ণ বাণ নিঃশেষ হয় নাই। কিন্তু গোরার যেমন ব্রাহ্মসমাজের হুইশ্রেনীর লোক—পাত্ বাবু ও পরেশ বাবু—চিত্রিত হইয়াছেন, তেমনই হিন্দু-সমাজেরও হুইশ্রেনীর লোক কৃকদম্বাল বাবু ও আনন্দময়ী চিত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু “অচলায়তন” হিন্দুসমাজেরই একচেটিয়া অধিকার। জপতপ যন্ত্রস্তত্র ক্রিয়াকাণ্ড দানদান উপবাসব্রতনিয়ম সমস্তই তাঁর প্রেববিধে অর্দ্ধরিত। অবশ্য এই প্রেব কবির প্রতিভার গুণে পাঠকের উপভোগ্য হইয়াছে।

পক্ষক তোতাপাখীর মত “তট তট ভোতর ভোতর” মুখস্থ করিতে করিতে গলদ্বর্ষ। ইহা ত আমাদেরই গারভী মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তান্ত্রিক বীধ-

* বক্তব্যের প্রবর্তিত্ব দূরের দেখার অক্ষরভ্রমের ‘সনাতনী’ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘অচলায়তন’ আর একই সময়ে প্রকাশিত হইল, significant নহে কি ?

যয় পবিত্র সমস্ত মন্ত্রতন্ত্রের উদ্দেশ্যে তীর রেখ। ইন্দ্রতপ আমাদেরই কল, খেসারিডাল আমাদেরই মাসকড়াই, একজটাদেবী আমাদেরই ‘বাগের পুটে দেবী বান, সম্মুখে দক্ষিণে ধরিয়া ধান।’ কবি করজ্ঞানের পরিবর্তে আমাদেরিগকে বৃদ্ধাকূট দেখাইয়াছেন। বালক স্তম্ভ বধন ‘মহাতানস’ কবিরার জ্ঞান প্রাণের আকুলতা জানাইতেছে এবং কবি সেই উপলক্ষে বলিতেছেন, ‘হাতার বছরের নিছুর বাহ অতটুকু শিশুর মনকেও পাথরের মুঠোর চেপে ধরেচে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়েছে! কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?’ তখন বুঝিতেছি এ ত রঘুনন্দনশাসিত হিন্দুসমাজের বালবিধবার নির্জলা একাদশীর কথা। মহাপুরুষকে বেশ চিনিয়াছি, তবে পরিচয়টা আর খোলসা করিয়া দিব না।

অহুতান-বাহল্যে চমক হয়, মন আড়ষ্ট হয়, প্রাণ অচেতন হয়, আত্মা অসাড় হয়, তাহা অচলারতনের আচার্য্য যেমন বুঝিয়াছেন, পুরুষ যেমন বুঝিয়াছে, আমরাও যে তেমন বুঝি না এরূপ নহে। মন্ত্র তন্ত্র আচমন আসন অঙ্গভাস যে আসল বস্তু হইতে আমাদেরিগকে দূরে লইয়া যায় তাহাও বুঝি। বুঝিয়াও বলিতে ইচ্ছা হয়—ইহার শেষ মীমাংসা কি? পৃথিবীর সর্বত্র সকল ধর্মেরই ত এই মশা। যে খ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্ম রিহদীধর্মের জটা ভানিয়া ধর্মকে গছ করিতে আগ্রসর হইয়াছিল, তাহাও কি ক্যাথলিক মঠমন্দিরে অহুতান-বাহল্যে ভারাক্রান্ত নহে? যে প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম ধর্ম্যাচার্য্য গোপের আসনে ধর্মের মারসতা বসাইতে বহুপরিচর হইয়া ধর্মলংঘ্য করিয়া বসিল, সে প্রোটেষ্টান্ট ধর্মমন্দিরের উপাসনা-এপালীতে পিউরিট্যান্ সম্প্রদায় কেবল অহুতানের আবর্জনা দেখিয়াছেন। যে বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিক আচার, অহুতান, বজ্র, হোম, মন্ত্র, তন্ত্র প্রভৃতি নির্মূল্য করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাতেও ত শেষে অহুতানের জটা বাধিয়াছে। Buddhist Prayer Wheelএর মত মন্ত্রগত সাধনামার্গ ত বৌদ্ধধর্মেরই উৎকট উদ্ভাবনা। খ্রীষ্টকর্তৃত্ব সম্প্রদায়ও যে মালাগুপ প্রভৃতি নিত্যকর্ম ছাড়িয়া শুধু প্রেমের মাতোয়ারা হইয়া গড়াগড়ি দিতেছেন এ সংবাদ পাই নাই। ‘গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গার পূঁথি নিরে বসনুম,’ কথাটা পাকা। গীতার আমল থেকেই বোধ হয় আমরা এ অপকর্ম করিয়া আসিতেছি। ‘বহু জলেই দল বাধে’, এ কথাটাও খুব ঠিক। কিন্তু মাহু বচিরকালই ছুঁকল, তাহার মনের বল পরিস্রিত, সে চিরকালই নিঃসের বোহে অভিতুত। একটা বিরাট মহাশয়মাকসে মোঁহ কাটাইয়া ‘গুণ আলো, গুণ খ্রীতি’ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে, গুণ দাদাঠাকুরকে লইয়া

হটোপুটি খেলিবে, তাহার লক্ষণ খুব হুস্পষ্ট দেখিতেছি না । যেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার বণে বঁদাঠাকুরের সঙ্গে আচার্য্যসেবকে মিলিয়ে দিতে পারবেন সেদিন আমাদের অচলারতনের সব হুঃখ ঘুচবে । *সে দিন বনাইরা আসিতেছে কি না জানি না, কিন্তু সেই শুভ অবসর আসিবার পূর্বে সাবধান, যেন আগাহার সঙ্গে সঙ্গে ফল শুভ নষ্ট হইয়া না যায় ।

অনেকে হয়ত বলিবেন, প্রতিভাবান্ কবি একটা সমাজগত বা ধর্মগত উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া নাটকখানি লিখেন নাই, ইহা written with a purpose নহে । শুধু আনন্দ-প্রদানের জন্য কবির পরিপক্ব বয়সের এই রচনা প্রকটিত হইয়াছে । অতএব কেবল কাব্যকলার দিক্ হইতেই ইহার দোষ শুণ বিচার করিতে হইবে । কিন্তু গ্রন্থখানি যে উদ্দেশ্যহীন একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি । বাহ্য হউক আর্টহিসাবে দেখিতে গেলে নাটকখানির বহু শুণ আছে । বিজ্ঞপ্ত বাকাগুলি উপভোগ্য, পূর্বেই বলিয়াছি, পুরুষের গানগুলি পড়িলে বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা কত উচ্চগ্রামে পৌছিয়াছে । ইহাতে সাধকের প্রেমময় জনের একটি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে । তাহা যেমন সরল তেমনিই মধুর । গানের নৃত্য দোহুল ছন্দে ব্যাকুল জনের আত্মল আত্মান গুনিয়া পাঠকের প্রাণ মন ভরিয়া যায় ।

আর্টহিসাবে নাটকখানির একটি দোষ দেখা যায় । রচনাটি যেন অত্যন্ত diffuse হিং টিং ছটের সে compactness ইহাতে নাই, হৈয়ালি নাটোর সে খোলা প্রাণের (wit) রসিকতা যেন ঈষৎ অপ্রাপ্ত হইয়াছে ।

ধর্মের দিক্ হইতে অচলারতনের বিচার করা চলে । রাজনীতির দিক্ হইতেও ইহার বিচার করা চলে । ‘অচলারতন’ রাজনীতির Chinese Wall, অর্থনীতির closed door, কিন্তু সে বিচার বিনেবজ্ঞ করিবেন । আমরা যেভাবে কাব্যখানি বুঝিয়াছি, সেই ভাবেই সমালোচনা করিলাম । বলা বাহুল্য, এই কর্তৃক কথা বলিয়া কাব্যখানির সিদ্ধি সৌন্দর্য্য নিঃশেষ করা যায় না । অপেরাঙ্গাসে ছই একটা পাখি বৃত্ত হুস্পষ্ট দেখান দাঁইতে পারে । কিন্তু রবির দীপ্তির কাছে এই ক্ষুদ্র কাচখণ্ড অকিকিৎকর ।

রামায়ণ ও মহাভারত ।

(২)

বেদব্যাস-রচিত মূল মহাভারত বা ‘ভারতসংহিতা’ পঞ্চসহস্রবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ, ইহা পত ভাদ্রমাসের ‘আর্যাবর্তে’ আমি সংক্ষেপে সঙ্গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এবার রামায়ণের রচনাকাল-সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই চারিটি কথা বলিব। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার সম্বন্ধের আলোচনা সম্ভবে না। স্মৃতরাং বর কথার কালের নির্দেশ করিয়াই আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

আমাদের দেশে পুরুষ-পরম্পরাগত বিশ্বাস এই যে, রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ। কোনও কোনও দুরোপীয়া এই বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া সঙ্গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অবশ্য এ বিষয়ে দুরোপীয়া অতুলদ্বিজেন্দ্র-গুপ্তের মধ্যেও ঐকমত্যের একান্ত অভাব, স্মৃতরাং সে সকল উক্তি লইয়া বিতর্কিত আলোচনা একান্ত অনাবশ্যক। আমরা সংক্ষেপে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদি দেখিয়া এই কথার আলোচনা করিব।

রামায়ণের প্রথমেই লিখিত আছে যে, বাম্প্রীকিমুনি যেরাধি নারদকে বিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—

“কোষগ্নিন্ সাম্প্রত্যং লোকে শুণবান্ কন্ত বীৰ্যবান্ ।”

“আজ কাল পৃথিবীতে শুণবান্ বীৰ্যবান্ কে আছেন ?” ইহার উত্তরে নারদ বাম্প্রীকিকে রামের কথা জ্ঞাপন করেন। নারদ চলিয়া গেলে বাম্প্রীকি নানার্থ তদসাতীয়ে পিয়াছিলেন। তথায় তিনি এক বিচরণশীল ক্রৌঞ্চ-নিধুনকে দেখিলেন। অকস্মাৎ এক ব্যাধ সেই স্থানে উপহস্ত হইয়াই সেই পক্ষিম্পত্যের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে নিহত করিল। তাহা দেখিয়া ক্রৌঞ্চী কাদিয়া উঠিল। এই ব্যাপারে সদয়-হৃদয় মুনিসত্তমের মনে দারুণ শোক জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন,—

“হা নিবাহ ! প্রতিষ্ঠাঃ বনসমঃ বাঘতীঃ সমাঃ ।

হ্য ক্রৌঞ্চনিধুনাবেকমবধীঃ কামবোধিতম্ ।”

কথাটা সুখ হইতে অকস্মাৎ এরূপ তাবে বিনাশ হইয়া বাহির হইল দেখিয়া বাম্প্রীকি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি ঠাহার পার্শ্বস্থ শিবা তরদ্বাষকে সন্বেদিত করিয়া বলিলেন,—

“পদবন্ধোৎকরসমতরীলসমবিতঃ ।

শোকাক্তস্য শ্রুত্বো মে শ্লোকো ভবতু নামথা ॥”

“এই পদবন্ধ সমানাকুর-সমবিত, তরীলরে সমীতবোণা বাক্য আমায় শোকাক্ত কবর হইতে বৃত্তঃ বাহির হইরাছে, স্ততরাং ইহার নাম ‘শ্লোক’ হউক, অন্তথা না হয়। শিবা শুক্লবাক্যের অহুমোহন করিলেন। অন্নক্ষণ পরেই ব্রহ্মা বাম্প্রীকির সম্মুখে আসিরা উপস্থিত হইলেন। চতুর্ভুজান বাম্প্রীকিকে ঐ রূপ শ্লোকে স্বামায়ণ রচনা করিতে অহুরোধ করিলেন। তদনুসারে বাম্প্রীকি কর্তৃক স্বামায়ণ রচিত হয়।

এই বৃত্তান্ত হইতে আমরা কয়েকটি আবশ্যক তথ্য জানিতে পারি।

(১) স্বামায়ণ-প্রণেতা বাম্প্রীকি স্বামচন্দ্রের সমসাময়িক।

(২) স্বামায়ণ, মহাতারত ও পুরাণাদি বে অষ্টপু-হ্রস্বে রচিত বাম্প্রীকিই সেই হ্রস্বের প্রবর্তক। সেই অল্প বাম্প্রীকি আদি কবি = এবং স্বামায়ণ আদি কাব্য + নামে পরিচিত।

(৩) শাস্তাত্ম্য পণ্ডিতগণ ইদানীং বহু গবেষণার ও চিন্তার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উদ্ধৃতিত শোকাবেগ ছন্দসমতরীতে প্রবল ভাবে আবৃত্ত করিলে কণ্ঠস্বর তরঙ্গাক্রান্ত ও কোমল হয়, কলে সেই শোকাক্ত মানবের কণ্ঠ হইতে পদবন্ধ তরীলসমবিত বাক্যাবলি বৃত্তঃই বহির্গত হইরা থাকে। মহামুনি বাম্প্রীকির কণ্ঠ-নিঃসৃত শ্লোকের উৎপত্তি-বিবরণ সেই মতেই সমর্থন করিতেছে।

স্বামায়ণের এই বিবরণ হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, বেদব্যাস কর্তৃক মহাতারত রচিত হইবার পূর্বে বাম্প্রীকি স্বামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। মহাবিশ্বকর্ম্মৈশ্বর্যর ব্রহ্মব্যাস বাম্প্রীকির প্রবর্তিত অষ্টপু-হ্রস্বের শ্লোকেই মহাতারত রচিতাছিলেন।

এখন দেখা যাউক, এসবক্ষে মহাতারত কি বলেন। মহাতারতের আদিপর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমস্তগুরুকবর্ণনে লিখিত আছে,—

“ব্রোতাবাসকরাঃ সন্তো রামঃ শত্রুত্যাঃ বরঃ ।

অসমুৎ পার্শ্বিণঃ কজাঃ কখনাবর্ধিতাঃ ॥”

* * * * *

এ “আদিকাণ্ডমিহ চার্বঃ পূরা বাম্প্রীকিমা কৃতম্ ।” (লঙ্কাকাণ্ড ১৩-১৩-৫)

এই আর্ধ ও আদিকাণ্ড পুরাকালে বাম্প্রীকি কর্তৃক রচিত হইরাছিল।

“স সর্বঃ কল্পবৃক্ষো বহীষ্যোণবল্লাভিঃ ।

সমস্তপক্ষকে পক্ষচকার হৌধিরান্ হ্রস্বঃ ।” ১২।৩৪ ।

ত্রৈতা ও ষাপরের সন্নিগন সময়ে বোদ্ধৃগণের মধ্যে প্রধান পরত্তরায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীর কজিরদিগকে বার বার হত্যা করিয়াছিলেন । অগ্নির ভায় তেজস্বী সেই পরত্তরায় সমস্ত কজিরদিগকে উৎসন্ন করিয়া তাঁহাদের রক্তে সমস্ত পক্ষকে পাচটি রক্তপূর্ণ হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । ইত্যাদি—

মহাভারতের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে—

(১) পরত্তরায় বে সময়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য কজিরগণকে বার বার নিহত করেন, সেই সময়ের পর হইতেই ষাপর বৃগ প্রবর্তিত হইয়াছিল । অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নামক লোমহর্ষণ ঘটনা যেমন ষাপরের অন্ত করিয়া কলির প্রবর্তনা করিয়াছিল, পরত্তরায়ের সহিত কজিরগণের লোকক্লরকর যুদ্ধও সেইরূপ ত্রৈতার অবসান ও ষাপরের আরম্ভ সূচিত করিয়াছিল । অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র বে সময়ে কিশোরবয়স্ক সেই সময়ে পরত্তরায় যুদ্ধ হইয়াছিলেন । সেই সময়ে রামচন্দ্রের নিকট পরত্তরায় অপদহ হইয়াছিলেন । সুতরাং রামচন্দ্র পরত্তরায়ের আর সমসাময়িক । একপক্ষেত্র তিনি বে বৃষ্টিরের বহু শতাব্দী পূর্বে প্রাহৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই । পূর্বেই বলিগছি যে, রামচন্দ্রের সময়েই বাম্বীক রামায়ণ রচনা করেন । কলির প্রায়ন্তে বেদব্যাস ভারতসংহিতা রচিয়াছিলেন । সুতরাং রামায়ণ মহাভারতের রচনাকাল-মধ্যে আর একটি যুগের ব্যবধান এবং রামায়ণ প্রাচীনতর গ্রন্থ তাহাও বুঝা গেল ।

(২) কুরুক্ষেত্রের প্রাচীন নাম সমস্তপক্ষ । এই স্থানেই ত্রৈতাযুগের অবসানকালে পরত্তরায়ের সহিত কজিরগণের বার বার যুদ্ধে কাক্ষপর্তি বিগুণ্ড-আর হইয়াছিল ।

অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র পুনরায় কজিরপতি প্রপ্রতিষ্ঠিত করেন । কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেই কজিরগণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও দান্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন । সভ্যমধ্যে রক্তবর্ণা হৌগদার বস্ত্রধারণ ব্যাপারই সেই দান্তিকতার প্রকট প্রমাণ । কথিত আছে, কজিরগণ সে সময়ে হুয়োঁধনের প্রভাবে এতদূর অবসন্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই বস্ত্রোচিত ব্যাপারের প্রতিবাদ পর্যন্তও করিতে সাহসী হইয় না । কেবল সভ্য কর্তব্যজন ব্রাহ্মণ এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করিয়া এই দর্শে অভিসম্পাত করেন যে, এই পাণে কুরুক্ষেত্রে কাক্ষ-বীর্ষ্য বিলুপ্ত হইবে এবং কলিতে আর ভারতে কাক্ষকল উৎপাদ হইবে না ।

সুতরাং বুঝা গেল ভাষ্যে যে ক্ষত্রিয়ের অভ্যাস বর্ণিত হইয়াছে, মহাভারতে তাহারই বিলম্বব্যাপার বর্ণিত রহিয়াছে। উক্তর এই উদ্দেশ্য বর্ণিত বিষয়ের সমকালে সিদ্ধি। সুতরাং রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী এই ভাষ্যে আর সন্দেহ নাই।

মহাভারতের বনপর্কে রামায়ণ কথা বর্ণিত আছে। বুদ্ধির কর্তৃক সিজালিত হইয়া মার্কণ্ডের বলিতেছেন,—

“শুশ্রূষাম্। সম্যক্‌স্মিতিহাসঃ পুরাতনম্।

সত্যং যথাশ্রুতং যথাঃ রামেন ভারতম্।”

(বনপর্ক; ২৭৩ অধ্যায়)

“হে রাজন্! ভাগ্যের সহিত রাম যে গ্রন্থ পাইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটি যথাযথ শ্রবণ করুন।” এখানে মার্কণ্ডের বুদ্ধির সন্মুখেই রামের বৃত্তান্ত পুরাতন ইতিহাস বলিয়াই বর্ণনা করিতেছেন। ইহাতে রামের ও সেই সঙ্গে রামায়ণের প্রাচীনত্বই সূচিত হইতেছে। কিন্তু বাহারা মহাভারতকে প্রাচীনতর এই বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহারা মহাভারতীয় রামোপাখ্যানটি অক্ষিপ্ত বলিতে কুণ্ঠিত নহেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে স্থানে স্থানে অক্ষিপ্ত স্লোক ও অধ্যায় আছে, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু বাহা আপনাদের কাল্পনিক মতের পরিপন্থী, তাহাই অক্ষিপ্ত এক্ষণ নির্দেশের আশ্রয় বিরোধী। অবলম্বিত তির কোনও বিষয়েই অক্ষিপ্ততা স্বীকার করা কর্তব্য নহে। বাহ্য হউক, এহানটি ভিন্ন মহাভারতের অন্তর রামায়ণের প্রাচীনতার প্রমাণ আছে স্থি না, তাহাই প্রত্যাখ্যান।

দ্রোণপর্কে লিখিত আছে যে, অর্জুন কর্তৃক হিরণ্যাহ তুরিয়ার রণস্থলে মিশেটে ও মৌনরত অবলম্বন করিলে সাত্যকি ও হার পরিত্যক্ত করেন। সেজন্য সকলেই সাত্যকিকে দণ্ডা করিতে আসিলেন। তাহার উত্তরে সাত্যকি বলিয়াছিলেন,—

“অপিচাং পুরাণীতঃ সোমো বান্দীকিনা কুবি।

ম হতব্যঃ শির ইতি যত্নবীৰি রতনম্।

পীড়াকরমসিজাগাং যৎ সত্যং কর্তব্যমেব তৎ।”

(দ্রোণপর্ক; ১০১ অধ্যায় ৪২)

“পুরাকালে বান্দীকি এই কথা সোমকে সূচিয়া সিদ্ধাছেন, (বান্দীর কথাই উত্তরে দশামম বলিয়াছিলেন,) “ওরে বামন্! তুই সত্যকি কর্তব্য নহে

বলিতেছিল, কিন্তু বাহাতে শত্রুগণের পীড়া অয়ে, তাহা কল্পাই কর্তব্য ।” এখানে ইহাও কি অক্ষিপ্ত ? ইহাকে অক্ষিপ্ত বলিবার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ।

এইরূপ প্রাণ মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত ও অনেক আছে । স্তত্রাং প্রতিপন্ন হইল যে, রামায়ণের আত্মসত্ত্বীয় প্রমাণে ও মহাভারতে রামায়ণের প্রাচীনতা স্বীকৃত । ইহা ভিন্ন ভারতীয় সমস্ত পুরাণ, কাব্য, নাটক প্রভৃতিতেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রামায়ণের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত । তথাপি অনেক যুরোপীয় আপনাদের গবেষণা শক্তির অসাধারণ মৌলিকতা দেখাইবার জন্য মহাভারতের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । আশ্রয় নিয়ে সজ্ঞপে তাঁহাদের হেতুবাদের সমালোচনা করিব ।

যুরোপীয়দিগের প্রথম ও প্রধান হেতুবাদ এই, দ্রোপদী পঞ্চ বামীর সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন ; স্তত্রাং যুধিষ্ঠিরাদির সময়ে এক জ্ঞী এককালীন বহু পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন । যুধিষ্ঠিরের সময় এই প্রথা প্রায় তিরোহিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এই প্রথার স্মৃতি তখনও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই । দ্রোপদীর বিবাহ উপলক্ষে যে বানোদ্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, গোতম-গোত্রীরা ভটিলা সাতজন কবিকে এবং বৃক্ষসত্ত্বা জনৈক সুনিকট্য দশজন কবিকে বিবাহ করিয়াছিলেন । ইহাই সেই স্বাক্ষর নিদর্শন । রামায়ণের কোথাও বহু পুরুষের এক ধর্মপত্নীর উল্লেখ নাই । রামায়ণের বিবাহ-প্রথা সত্য সমাজের রচিত-সম্মত । ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মূল মহাভারত যে সময় রচিত হইয়াছিল, সে সময় ভারতীয় আখ্য সমাজ অসত্য অবস্থা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে নাই ; কিন্তু, যে সময় রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, সে সময় আখ্যসমাজ সত্যপন্থীতে আকৃষ্ট হইয়াছিল । স্তত্রাং মহাভারতই প্রাচীনতর এবং ইহাই প্রতিপন্ন হইল ।

ইংরাজী-শিক্ষিত ও যুরোপীয় চিন্তার আবিষ্ট ভারতবাসীদিগের নিকট এই যুক্তি সহজেই অস্বাস্ত বলিয়া মনে হয় । যুরোপীয়দিগের ধারণা যে, গত কয়েক শতাব্দী ধরিত্রা মানবসমাজ উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে । চারি সহস্র অবস্থা পাঁচ সহস্র বর্ষ পূর্বে মানবজাতি যে কখনও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আকৃষ্ট হইয়াছিল এ কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে চাহেন না বা পারেন না । যে মানবজাতি পৃথিবীতে অস্তিত্বঃ দশ লক্ষ বৎসর আবির্ভূত হইয়াছে, সেই মানব জাতি সভ্য হইতে অসভ্য ও অসভ্য হইতে সভ্য অবস্থার উন্নত ও অবনত হইতেছে । অসভ্য

জাতিকর্তৃক অধু্যবিত আফ্রিকা ও আমেরিকার অতীত সভ্যতার কীর্ণ নিদর্শন অল্পসঙ্খ্যংগণের মনে এই সভ্যতার অশূট আভাসমাত্র প্রদান করিতেছে। ভারতেও প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে সভ্যতার এইরূপ আরোহ ও অবরোহ হইয়াছে। তবে দূরদর্শী কবিগণের সমাজ-বন্ধনের ফলে এদেশ একেবারে অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় নাই। সুতরাং পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্বে আর্য-সমাজ সভ্যতার উচ্চতর চূড়া চইতে অকস্মাৎ একটু অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, একথা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদেরই জ্ঞান সংস্কার।

বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদ ও জীবজগতের তথ্য পরীবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রাণিমায়েই কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক ভাব বহু পুরুষ সংস্কারাবহায় (latent) থাকিয়া অকস্মাৎ এক পুরুষে আবার পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে। মনে করুন, এক ব্যক্তির কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। সেই বিশেষত্বগুলি তাহার পুত্রে, পৌত্রে, প্রপৌত্রে ও বৃহৎ প্রপৌত্রে প্রকাশ পাইল না; সেবে ছয় বা সাত পুরুষ পরে তাহা এক বংশধরে স্বাভাবিকভাবে পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইল। রোগাদিও এইরূপ বহুপুরুষ অন্তর এক পুরুষে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Atavism বলে। বাঙ্গালার ইহাকে পূর্বজগ্গণাবতরণ বলা হইতে পারে। ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন বহুপুরুষ অন্তর এক পুরুষে এইরূপ পূর্বজগ্গণাবতরণ হয়, সমাজেও সেইরূপ বহুপুরুষ পরে এক একটি মূলপ্রথা অকস্মাৎ প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাকে ইংরাজী ভাষায় Social atavism বলে। যদি ইহাই সত্য হইত যে, দৃষ্টিগোচর সময়ে খ্রীষ্টাব্দির কহ-বিবাহ-প্রথ্য প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা হইলে আমরা উহাকে সামাজিক পূর্বজগ্গণাবতরণের একটি উদাহরণমাত্র বলিতাম; মহাভারত রামায়ণের পূর্ববর্তী একথা বলিতাম না। নিরোগধর্ম অল্পদূরে কেন্দ্রজ সম্মানোৎপাদনের ব্যবস্থা রামায়ণে বড় একটা দেখা যায় না। মহাভারতে উহা দৃষ্ট হয়। এই হেতু-বাদে যদি মহাভারতকে পূর্ববর্তী বলিতে হয়, তাহা হইলে বর্তমান যুগের আৰ্য্য-সমাজীদিশকেও রামায়ণের পূর্ববর্তী বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

কিন্তু বাস্তবিকই দৃষ্টিগোচর সময়ে কি খ্রীষ্টাব্দির বহুতর্জুকা হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল? কখনই না। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে পঞ্চ পাণ্ডবই ক্রমশঃ বিবাহ করিবেন,—এই প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই বরং রূপদরাজ্য কখনই বলিতেন না।—

“একত কহোঁ বিহিতা মহিষা: কুলনন্দন ।

দৈকতা বহন: পুণে: সন্মতে পতন: কৰিৎ ।

লোকলোবিত্ত: হা নাধৰ্ম: ধৰ্মবিভূতি: ।

কৰ্ম্মমৰ্শি কোত্তর: । কমাং তে বুদ্ধীমুখি ॥”

“হে কুলনন্দন ! এক পুত্ৰবহ্নি বহ্নি পত্নীবিবাহের বিধান আছে, কিন্তু একটি রমণীর বহ্নি পতির কথা ত কহিও কালেও শুনা যায় নাই । ইহা লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ, হে কোত্তর, তুমি তিষ্ঠ ও ধৰ্ম্মজ্ঞ, এ কাজ তোমার করা কর্তব্য নহে । তোমার এমন বুদ্ধি কেন হইল ?”

সেই সময় স্বয়ং কুলদেবপায়ন বেদবাস সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । তিনি এই প্রস্তাব শুনিয়াই প্রথমে বলিয়া উঠিয়াছিলেন ;—

“অগ্নি ধর্ম্মে বিমগ্নে লোকবেদবিরোধকে”

“লোকাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া এই ধর্ম্ম (রমণীর বহ্নি-বিবাহ) এখন রহিত হইয়াছে ।”

সুতরাং বুঝা বাইতেছে যে, বুদ্ধিগণের সময় এই প্রথা একেবারেই প্রচলিত ছিল না, সুতরাং কেবল জটিল ও বাক্যের দ্বারা দেখাইয়া বুদ্ধিগণ নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই । তাহাকে অল্প বুদ্ধিও দেখাইতে হইয়াছিল । সে বুদ্ধি এই—

“গুরোহি বচন: শ্রীধর্ম্মা: ধর্ম্মজসত্তম ।

শুভশাস্ত্রম সর্গেবাং বাতা: পরমকো গুরু: ।

সি গাণ্ড্যকবতী বাতা: তৈক্ষণং তুলাতামিতি ।

তদ্বাদেতদহং মন্তে পরং ধর্ম্ম: বিজ্ঞাতম ॥”

“হে ধর্ম্মজপ্রধান ! লোকে বলে গুরুর বচনই ধর্ম্মসত্ত্ব অর্থাৎ গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই ধর্ম্মপালন করা হয় । গুরুগণের মধ্যে বাতাই পরমগুরু । হে বিজ্ঞপ্রেষ্ঠ, আমাদের সেই জননীই আমাদের কাছে শিক্ষালব্ধ প্রবোধ জ্ঞান পাকালীকে ভোগ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন । সুতরাং আমি এই কার্যকে আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকার্য্য মনে করিতেছি ।” কৃত্তী ও গীতার বাক্য বাহাতে বিখ্যা না হয়, সেজন্য ব্যাসদেবকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিলেন । সুতরাং বেদবাস এই বিবাহের অনুরোধ করিলেন ।

বিরুদ্ধবাদিসমূহ একটা কথা বলিয়া থাকেন । ঋগ্বেদের কথার উত্তরে বুদ্ধিগণ বলিয়াছিলেন ;—

“গুরুবান্ধবগুরুভ্যং বাতা: বহ্নিহিবাহম্”

এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই যে, আমার পূর্বপুরুষ মহাত্ম্যগণ যে পথে গিয়াছেন আমরা সেই পথেই যাইব। 'ধিওতোর গোন্ডটুক'র ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, We follow the path which has been trodden by our ancestors। বোঝাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলো প্রিন্সিপাল সি. ডি. বৈভ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, This is our family custom. মূল হইতে গোন্ডটুক'র ancestor ও প্রিন্সিপাল বৈভ family custom বা 'কৌলিক প্রথা' একথা কোথায় পাইলেন? উক্ত উক্তির পর দিন বেদব্যাসের সম্মুখে স্থিতির তাঁহার পূর্বপুরুষ বা বংশের মধ্যে বহু বানীর এক পত্নী বিবাহের একটি দৃষ্টান্তও দেখাইতে পারেন নাই। তিনি অতি পূর্বকালের প্রচেষ্টা নামে দশজন তপস্বী ভ্রাতা বৃকসত্ত্বা এক কন্ডাকে বিবাহ করিয়াছিল, আর সাত জন কনি পৌতবংশীরা জটিল নারী তপস্বিনীর পক্ষে সম্মানোৎপাদন করিয়াছিলেন এই দ্বিতীয় বলিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রবংশের অস্ত্র কোনও রাজার এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই। সেই অস্ত্র মহাত্ম্যতের চীকাকার নীলকণ্ঠ 'পূর্ববান্' অর্থে "প্রচেষ্টা-প্রকৃতিনাম্" লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও একটা আপত্তি আছে। ইহাতে "আত্মপূর্বকণ্ঠ" একবার সম্পূর্ণ সার্থকতা থাকে না। কারণ জটিল বা বানীর দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ববর্তী জনগণ ক্রমাগতই ঐ কার্য করিয়া আসিতেছিলেন ইহা সপ্রমাণ হয় না। বরং উক্ত চরণের অর্থ উহার অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যের সহিত যোজন্য করিলে ভাল হয়। ইহার পরই স্থিতির বলিয়াছেন :—

"এবৈব বক্তব্যঃ সম চৈতরনোদতঃ"

"আমাদের মা এই কথা বলিয়াছেন,—আমারও ঐরূপ কার্য করিতে যেন হইয়াছে। পূর্ববর্তীরা বরাবরই ওকর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন এবং সেই আজ্ঞা প্রতিপালনকেই বর্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং আমরাও তাঁহাদের কৃত্ত বার্ষিক যাইব,—ইহাই সনাতন বর্ষ, ইহাই স্থিতিরের 'পূর্ববান্'অপূর্বকণ্ঠ বাতঃ বর্ষাহুবায়ে' এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ। পাণ্ডব-বংশে যদি বহু ভ্রাতার এক পত্নী গ্রহণের প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে ক্রমশঃ প্রকৃতির তাহা অজ্ঞাত থাকিত না। মহাত্ম্যতের বৃত্ত রাজবংশ ও অজ্ঞাত বংশের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে আর কোথাও কোনও বনবীর বহুবিবাহের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। বরং বেদব্যাস ক্রমশঃ একান্তে স্পষ্টই বুঝাইয়াছিলেন যে, শত্ৰুর বরপ্রত্যাবেই ক্রমাৎ এককালীন পঞ্চবানীর পত্নী হইবেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া ক্রমশঃ বলিয়াছিলেন ;—

“যদি চৈবঃ বিহিতঃ পত্রেণ ধর্মোৎপত্তো বা শূত্র সমাপরাধঃ ।

দুঃকৃত্যে বিবিধং পাপিনয়া ধোপাশ্রোয়াং বিহিতবাং বি কৃণা ॥”

ইহার অর্থ—“ভগবান্ পত্রে বধন এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন পক্ষপতির জন্যই বধন কৃকার উত্তর হইরাছে, তখন এই কায ধর্মসম্বিত হউক বা না হউক, ইহার অহুতানে আমার কোনও অপরাধ নাই ।”

আর এক কথা । বেদব্যাসের অহুতাদানে বহু রাজপণের সম্মতিক্রমে পক্ষ পাণ্ডবদিগের সহিত বখাবিধি মন্ত্রপূর্বক বিবাহিতা হইলেও দ্রোণদৌ সর্গসম্মতিক্রমে কখনই কুলললনার সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্ত করেন নাই । শত্রুপক্ষ, বিশেষতঃ দুর্যোধন প্রভৃতি ও সাধারণ প্রকৃতিবর্গ, তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক ‘কানাদুবা’ করিত । যদি তিনি কুলবধুর সম্যক সম্মান পাইতেন, তাহা হইলে দুর্যোধনের রাজসভায় দ্ব্যপাসন কখনই তাঁহাকে বর্জনোচিত নাহনা করিতে সাহসী হইত না । কর্ণ সভামধ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন “হে কুলনন্দন ! দেবতারা স্রীলোকের একমাত্র ভর্তাই বিধান করিয়াছেন ; কিন্তু এই পাকালী অনেকের বন্দনাখিনী হওয়ারে বদ্ধকী বলিয়া নিশ্চিত হইরাছে, হুতরাং আমার বিবেচনার ইহার সভামূলে আনয়ন বা একান্তরধারণতা অথবা বিবস্ত্রা কিছুই বিচিত্র নহে ।” বেদব্যাস যে দ্রোণদৌর বিবাহের বিধান দিয়াছিলেন, ধোমা যে দ্রোণদৌর বিবাহে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, সভামধ্যে, রাজপণের মধ্যে, যে দ্রোণদৌর বিবাহ বখাবিধি নিষ্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইরাছিল, স্বয়ং দ্রুতরাষ্ট্র যে দ্রোণদৌরকে আপনায় বধূপণের মধ্যে প্রদান বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, কর্ণ সভামধ্যে সেই ‘দ্রোণদৌ বদ্ধকী বা বাননারী বলিয়া নিশ্চিত হইরাছেন’ একথা বলিতে কেন সাহসী হইরাছিলেন ? এই উক্তিভেদেই এরূপ বিবাহ তখন সমাজে একেবারেই অপ্রচলিত ছিল, ইহা সপ্রমাণ হয় ।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি,—দুর্বিষ্টিরের সময়ে যদি সভ্য সভাই স্রীজাতির বহু পতি বিবাহপ্রথা সমাজে অব্যবহৃত চলিত, তাহা হইলেও আমরা তদ্বারা মহাত্ম্যরত সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী এ সিদ্ধান্ত করিতে পারিতাম না । কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম অহুসায়ে বহুশতাব্দীর সুপ্রচলিত এক এক বার আশ্চর্যপ্রকাশ করিয়া থাকে । কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহাও হয় নাই । দ্রোণদৌর পক্ষদ্বারীর সহিত উদাহ বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষ ব্যবস্থা । সেই জন্য অব্যাপক লাদেন পাণ্ডবের ব্রতান্তকে ক্রমশঃ মাত্র নির্দিষ্ট করিয়াছেন । কারণ বৈদিকযুগের আশ্রয়ন, বহু প্রভৃতির দর্শনশাস্ত্রে এরূপ বিবাহের বিধান একেবারেই নাই । মহাত্ম্যরতও এরূপ দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র

একটি ; সুতরাং ঐক্য একটি বিশেষ ব্যাপারের হেতুবাৎ মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ববর্তী বলিয়া নির্দিষ্ট করিতে অসম্ভব পাওয়া বাতুলতা মাত্র।

ইহা ভিন্ন রামায়ণের সময়ে প্রচলিত আচার-ব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার সহিত মহাভারতের সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় অবস্থার তুলনা করিলে রামায়ণেরই প্রাচীনত্ব অস্বত্ব হইবে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার পূর্বাভাসিতকালে আনি তাহা সঙ্গোপন করিতে চেষ্টা করিব।

সুতরাং সঙ্গোপন হইল যে, রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ। মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণ কতদিনের প্রাচীন, তাহাই এক্ষণে বিচার্য।

পূর্বে এক্ষণে আমি লিখিয়াছি, মহাভারতের কালনির্ণয় বস্তু সহজ, রামায়ণের কালনির্ণয় তত সহজ নহে। ত্রিযুক্ত বৈদ্য ভাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, জনৈক হিন্দু জ্যোতিষী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খৃষ্ট অব্দিবার ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ১০১ বৎসর পূর্বে রামায়ণের বৃত্ত হইয়াছিল। এই গণনার কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা সম্ভবে না। পুরাণাদিতে কালের যে গণনা দৃষ্ট হয়, তাহাই অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। অনেকগুলি পুরাণের মতে রামচন্দ্র জেতার শেবভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যদি তাহাও সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও বলিতে হয় যে, সমস্ত ষাণ্মত ৬ কলির গত অক্ষগুলি একত্র করিলে বস্তু বৎসর হয়, তত বৎসর পূর্বে রাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পুরাণমতে ষাণ্মতবৃন্দ ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার বৎসর। ইহার উপর কলির গত পক্ষ সহস্র বর্ষ যোগ করিলে ৮ লক্ষ ৬২ হাজার বর্ষ হয়। সুতরাং সাধারণ হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, রামায়ণ ৮ লক্ষ ৬২ হাজার বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ। পক্ষান্তরে তালবরস হইবার নামক জনৈক অতিবুদ্ধি ইন্দ্রাজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ত্রীময় দশম শতাব্দীতে অর্থাৎ গাজনির মাদুদ ভারত আক্রমণ করিবার কয়েক বৎসর পূর্বে, রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখন ইহার মধ্যে কাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ্য বলিয়া স্বীকার করিব ?

সেখা বাউক, রামায়ণ হইতেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভবে কি না ? রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ডে উহা কোন যুগে লিখিত, তাহার বিশেষ কোন নির্দর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু উত্তরকাণ্ডে যুগের একটু আভাস মাত্র পাওয়া যায়। জনৈক ব্রাহ্মণপুত্রের অকালে মৃত্যু ঘটতে তাহার পিতা চীৎকার করিতে করিতে রাজ্যধারে উপনীত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া দারদ-প্রসূত কণ্ঠকণ্ঠি গণিকে ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যুর

কারণ জিজ্ঞাসা করেন । তাহার উত্তরে নারদ বলেন যে, বর্তমান যুগে শূন্যের তপস্যার অধিকার নাই,—কিন্তু তোমার রাজ্যের সীমান্তে শূন্য তপস্যা করিতেছে, সেই পাশে ব্রাহ্মণবালকের এই অকাল-মৃত্যু ঘটিয়াছে । এই উপলক্ষে দেবর্ষি নারদ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বর্ণের “তপস্তাধিকারের কথা বলিয়াছিলেন । সেই উপলক্ষে দেবর্ষি বলিয়াছিলেন—

“ততঃ পাদমবর্ষত বিত্তীকমবতারয়
ততো বাশরসখ্যা সা যুগস্য সমজারত ৷”

তাহার পর (অর্থাৎ ত্রেতাযুগের অবসান হইলে পর) অধর্মের দ্বিতীয় পাদ বাহির হইল, তাহার ফলে বাশর যুগের উদ্ভব হইয়াছে । পাঠক দেখুন, এখানে “অবতারয়ৎ” ও “সমজারত” উত্তর ক্রিয়াপদই অতীতকালবাচক । তাহার পর স্নোকেই আবার আছে—

“তস্মিন্ বাশরসখ্যা তু বর্তমানে যুগকরে
অধর্মস্তাস্মদৈক্য ববুধে পুরুষবর্ত ৷”

“হে পুরুষবর্ত—সেই যুগ (ত্রেতা) কর হইলে পর বাশর যুগ বর্তমান হইলে অধর্ম ও মিথ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ।” ‘ববুধে’ অতীত কাল । অবশ্য এই স্নোকে ‘বর্তমানে’ এই কথাটি যুগকরের সহিত ও তস্মিন্‌টি বাশর সখ্যার সহিত অবয়ব করিয়া তর্ক উপস্থিত করা বাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে পরের স্নোকের সহিত বিবদ বিমোঘ জন্মে । পরের স্নোকেই আছে,—

“অস্মিন্ বাশরসখ্যাতে তপো বৈজান্ সমাবিশৎ ।
জিত্যো যুগেভ্যস্মান্ বর্ণান্ ক্রম্যৈব তপ আদিশৎ ৷”

এই বাশরযুগে বৈজ্ঞান্য তপস্তাধিকার পাইয়াছে ; তিন যুগে ক্রমে তিন বর্ণের তপস্তাধিকার অন্নিয়াছে । এই স্নোকে ‘অস্মিন্’ শব্দ ও ‘ক্রিয়াপদগুলি’ কাল লক্ষ্য করা আবশ্যক । তাহার পর আবার—

“দ্বীদবর্ণো যুগশ্চেত তপাতে হননতপঃ ।
তদ্বিষ্যচ্ছ্রবোজ্যো হি তপস্তর্ঘ্যা কনৌ যুগে ।
অধর্মঃ পরমো রাজন্ বাশরে স্ত্রজজরনঃ ।
স বৈ দিবরপর্ধ্যন্তে ভব রাজন মহাতপাঃ ।
অন্য তপতি চূর্ম্ম ভিত্তেন বালবধো হ্রসব ৷”

হে যুগশ্চেত “আপনার রাজ্যে শূন্য তপস্তার প্রবৃত্ত হইয়াছে, কালযুগে তদ্বিষ্যচ্ছ্রবোজ্যের তপস্তর্ঘ্যের অধিকার অন্নিবে । হে রাজন্ । বাশর যুগে স্ত্রজজরিত তপস্তর্ঘ্যা পরম অধর্ম, তোমার রাজ্যের শেষ সীমার শূন্য দ্বিহৎ

তপস্তা করিতেছে। এই সময় সেই দুর্কৃতি তপস্তা করিতেছে, সেই ভক্ত এই বালক বলিতেছে।” ইত্যাদি। পাঠক এখনে দেখুন, কলিযুগের কথা ভবিষ্যৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহার পরেই উক্ত হইয়াছে, “বাণেরে পুত্রের তপশ্চর্যা অবগত; অত কোন দুর্কৃতি পুত্র তপস্তা আরম্ভ করিয়াছে” ইত্যাদি কথার বুঝা যায়, বাণেরে নামের রাজসভায় এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব রামায়ণ হইতে বুঝা গেল যে বাণেরে নামেই আদিত্য হন ও রামায়ণ রচিত হয়।

মহাভারত হইতেও ঐ রূপ আভাস পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমস্তপক্ষক বর্ণন হইতে আমার এই প্রবন্ধে যে প্রোক দুইটি পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পাঠে জানা যায় যে, দ্রোণা ও বাণেরের সন্ধিকালে পরশুরাম ক্ষত্রিয়গণকে বার বার ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার বহুকাল পরে পরশুরাম যখন শান্তবৃষ্টি ধরিতাছেন এবং ইন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখনই রাম তাঁহার দর্শচূর্ণ করেন। সুতরাং তখন যুগসন্ধি অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণস্থলে ইহাকে বাণেরের ঘটনা অনুমান করা অসম্ভব হইতে পারে না; বিশেষতঃ পরশুরাম যখন তপস্বী, তপস্তা দ্বারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছেন। সুতরাং যুগসন্ধির পরই এই ঘটনা সম্ভবতঃ সম্ভাবনা। মহাভারতের বনপর্বে যে স্থলে রামকথা বর্ণিত আছে, সে স্থলেও উহা দ্রোণার ঘটনা এক্ষণ উল্লেখ নাই। উহা ‘পুরাতন ইতিহাস’ এইমাত্র উক্ত আছে। বনপর্বের ভীম-হৃষ্মৎ সংবাদেও যে রামরাক্ষসের যুদ্ধ দ্রোণায়ুগের ব্যাপার একথা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। বিষ্ণুপুরাণেও কোন যুগের উল্লেখ নাই। এক্ষণ কেন্দ্রে স্বতঃই মনে হয় যে মূল রামায়ণ বাণেরেই রচিত হইয়াছিল।

মহাভারত রচনার কত বর্ষ পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে তাহার অনুমান করা সম্ভব নহে। তবে বিষ্ণুপুরাণের বংশতালিকাদি বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, রাম হইতে ক্রমের সময় পর্যন্ত আর চরিত্রজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমি ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে, খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার আর সেড় হাজার বৎসর পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে ইহাই আমার ধারণা। রামায়ণের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ৪৫১০ অব্দ।†

ঐশ্বর্যকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

† প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল বলিয়া এ সম্বন্ধে অত্যন্ত সূত্রিত অবতারণা করিতে পারিলাম না, সম্ভবতঃ অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাটি পরিষ্কৃত করিতে সক্ষম করিব।

মুরোপ-ভ্রমণ ।

ইংলণ্ড ।

(২)

বিলাতের সুবিধার কথা কিছু বলিয়াছি, অসুবিধার কথাও কিছু বলিব । প্রধান অসুবিধার বিষয় গতবারে আভাস দিয়াছি—সেখানে পরস্পর মূল্য বড় কম । আমাদের দেশে সচরাচর বাঁহাদিগকে বড়লোক বলা যায়, ইংলণ্ডের অধিবাসীদের তুলনায় তাঁহারা গরীব ভিন্ন কিছুই নহেন । যে দেশে একটা দেশালাইয়ের বাসনের দাম চারি পয়সা, সে দেশে আমাদের মত মধ্যবিত্ত লোক যে দরিদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

এদ্বারা সে দেশে থিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না । আমরা এদেশে কত কাপ বিনা খরচে চালাই, তথায় সব জিনিষেরই মূল্য আছে । দরজার গাফী বামিলে কোথা হইতে একজন ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিবে, তাহাকে অন্ততঃ এক পেনি বা চারি পয়সা দাও । কাহাকেও একখানা গাফী ডাকিয়া দিতে বল, সে এক পেনি পাইবার আশা করিবে । তাহা না দিলে নিশ্চিত হইতে হয় । থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে বাস্তবিকই শারীরিক ক্রিয়ার জন্য পরসাদ দিতে হয় । কোথাও গিয়া ওতারকোট হুগিরাক, আসিবার সময় তৃত্য কোটটি ধরিয়া পরাইয়া দিল, তাহারও কিছু প্রত্যাশা ।

তাহার পর লওনে রবিবারে ডাক বিলি হয় না । সত্যজগতে আর কোথায়ও এ নিয়ম আছে কি না জানি না, কিন্তু পূর্ণ একদিন ডাক বন্ধ রাখা যে কত অসুবিধাজনক তাহা বেশ বুঝা যায় । বিশেষ বরুণ যদি ভারতবর্ষীয় ডাক পরিবার স্বাক্ষিতে বিলম্বে পৌছায়, তবে লওনই সকলে সোমবারের পূর্বে চিঠি পাইবে না, কিন্তু লওনের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে রবিবারেই ডাক বিলি হইবে, এ বড় চমৎকার ব্যবস্থা ।

বোশা ও মাপিতের খরচ লওনে অত্যন্ত বেশী । সাধারণতঃ একটি সার্ট কাটিতে ১০ ছয় আনা, একখানি রুমাল কাটিতে ১০ আনা এবং একখানি কলার কাটিতে ১০ আনা লাগে । নাপিত বাড়ি কাঁচাইতে ১০ আনা ও চুল ছাটিতে ১০, ১৫/০ হয় । বড় ফ্যানসনেব্ল জার্সার অবত ইহার অপেক্ষা অনেক অধিক খরচ ।

ইংলণ্ডের থিয়েটারের প্রশংসা অনেকদিন হইতে জনিত। পূর্বেই এত অধিক প্রশংসা শুনিয়াছিলাম যে, প্রথম দিন বাতাবিকই হতাশ হইয়াছিলাম। কারণ কল্পিত আদর্শটাকে এত উচ্চ করিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, বস্তবটা কিছুতেই তাহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। তবে ক্রমে উপলব্ধি হইয়াছিল যে, বাতাবিকই লণ্ডনের থিয়েটার প্রশংসনীয়। থিয়েটারের কিছু বিবরণ দিব। কিন্তু পূর্বাঙ্কে একটা কথা বলিয়া রাখি; থিয়েটার দেখিতে গিয়া ইংরাজজাতির সহজ সরলতার যুগ্ম হইতে হয়। উহার বৈকল্প সব simple situationsএ অভ্যস্ত বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহাতে বেশ কৃত্তা ধার যে, উহাদের ভ্রম তাবটা একেবারেই বাহ্যিক, উহাদের অভ্যস্তর খুবটী কোমল। আর থিয়েটার দেখিতে গিয়া লক্ষ্য করা যায়, বয়সের বিপরীত অল্পপাতে রমণীর বেশভূষা। বাহার বয়স বত অল্প, তাঁহার পোষাক তত সাদাসিধা। অতি বর্ধিত রমণীদের আরই বেশের পোষাক; স্বর্ণরোপ্যবিশিষ্ট। ইহাতে কি তাঁহারা নিতান্তই আপনাদের বয়সের দিকে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করেন না!

লণ্ডনে আর ত্রিশটি থিয়েটার আছে। তন্মধ্যে আর ১০টি মিউজিক হল। থিয়েটারে রবিবার চিত্র প্রত্যহ অভিনয়। বুধ ও শনিবারে প্রায়ই ছুইবার অভিনয় হয়। সাতা ৮টা ৮-১০ টার আরম্ভ হইয়া ১১টার অভিনয় বন্ধ হয়। বুধ ও শনিবারের অতিরিক্ত অভিনয় ২৪-১টা ৩টা হইতে ৫টা ৬টা পর্যন্ত চলে। নিজা নুতন পুস্তকের অভিনয় হয় না। আর একই নাটক প্রত্যহ অভিনীত হয়। হরত কোনও একখানি নাটক এক বৎসর খেড় বৎসর ধরিয়া প্রত্যহই অভিনীত হইতেছে, অথচ প্রত্যহই লোকারণ্য, পূর্বাঙ্কে আসন সংগ্রহ না করিলে স্থানান্তরে কিরিতে হয়। টিকিটের মূল্য ১ শিলিং হইতে ১০৪ শিলিং। অবশ্য বক্সের আরও অধিক দাম, ছই, তিন, পাঁচ গিনি! সর্বনিম্ন ছই শ্রেণী (প্যালারি ১ শিলিং ও পিট ২৪ শিলিং) তিন সর্বত্রই অগ্রে স্থান ভাড়া করা যায়। এই ভাড়া করার কারণ লণ্ডনের প্রত্যেক রাত্তির অনেকগুলি করিয়া আছে। ভাল ভাল অর্থাৎ বেশী popular অভিনয়ের জন্য ৪১ দিন অথবা তাহারও পূর্বে স্থান ভাড়া না করিলে আসন পাওয়া যায় না। টিকিটে নম্বর দেওয়া থাকে, সেই নম্বর দেখিয়া চেয়ারে বসিতে হয়। অনেক সময় কত লোক অনেকগুলি টিকিট কিনিয়া রাখে, পরে অভিনয়ের স্মৃতিতে হরত বিক্রয় না চতুর্ভূষণ লাম্বের কর্ণকরণের নিকট বিক্রয় করে।

থিয়েটারে বর্ষকালের জন্য অনেক Opera গ্লোজ রক্ষিত থাকে। প্রত্যেক

সারির দর্শকদিগের অত্যন্ত সম্মুখের সারির চেয়ারের তলভাগে কোটার জায়
আধারে Opera glass সংরক্ষিত । একটু ছয় পেনি ফেলিয়া দিলে কোটা
আপনিই খুলিয়া যায় । পরে অভিনয়ক্ষেত্রে দর্শক Opera glass বখান্ধানে
রাখিয়া থাকেন । প্রোগ্রাম দাম দিয়া কিনিতে হয়, বিনামূল্যে দেয় না । দাম
আবার একই প্রোগ্রামের সর্বত্র সমান নহে । যে প্রোগ্রাম গ্যালারিতে এক
পেনিতে পাওয়া যায়, টেলে তাহারই দাম ছয় পেনি । বক্সে কত দাম জানি না ।
অভিনয়ের সময়ে দর্শকদিগের বসিবার স্থানে আলোক থাকে না । প্রত্যেক
অঙ্কের অভিনয়ের পূর্বে আলোক নির্বাপিত হয় । কায়েই দর্শকদিগের পর-
শ্বরের কথাপকষনের গুরুত্ব খুব কমই প্রতীয়মান হয় । দুই অঙ্কের অভিনয়ের
অবকাশকালে তত্ত্ববেশপরিহিতা পরিচারিকাগণ চা, কফি, চকোলেট প্রভৃতি
বিক্রয় করে । এতদ্বির বস্ত্র ও ধূমপানের ব্যবস্থা আছে । চকোলেট খাওয়াটা
ইংরাজ জাতির বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের একটা রোগের মধ্যে । যখন তখন এবং
বত ইচ্ছা চকোলেট ইহার খায় এবং খাইতে পারে, ইহাতে বরষে কিছু বাধে
না । আবালবৃদ্ধ সকলেই চকোলেট খায় । এক একটা থিয়েটারে আদায়ের
ঘণ্টার রজার অপেক্ষা অনেক অধিক দর্শকের স্থান হয় । পিট ও গ্যালারিতে
স্থান পাঠিতে হইলে অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টা আগে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় ।
পুলিস হুইজান করিয়া সার গাঁথিয়া দাঁড় করাইয়া দেয় । টিকিট-বর খুলিলে
একে একে সিরা টিকিট কিনিয়া স্থান অধিকার করিতে হয় । হয়ত টিকিট-বর
হইতে আরম্ভ করিয়া সার সে রাত্তা পার হইয়া অল্প রাত্তা পর্যন্ত প্রকাণ্ড সর্পের
জায় লম্বান । এই সারকে queue বলে । শুনিয়াছি কোনও কোনও নাটকের
প্রথম অভিনয় উপলক্ষে লোকে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে হইতে সার গাঁথে, সেই রাত্তার
মধ্যে দাঁড়াইয়া পান ভোজন সবই সমাধা করে, কেহ কেহ বা বাড়ী হইতে
ক্যাম্প টুল প্রভৃতি লইয়া সিরা প্রান্তি অপনোদন করে, কেহ বা লোক তাক
করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখে, পরে নিজে বখাকালে উপস্থিত হয় । থিয়েটারের
মঞ্চগুলিও অতি প্রকাণ্ড ; একসঙ্গে বহু লোকের স্থান হয় । আনি একটা
অভিনয় দেখিয়াছিলোম, তাহাতে একখানি বটরগাড়ী আনিয়া দেখায়, দশ বাড়ী
খোঁড়া বক্সের উপর খোঁড়খোঁড় করে এবং একটা রেলওয়ে এঞ্জিন একটা
পুরানো HOFER-boxএর উপর আনিয়া পড়ে এবং সমস্ত চুম্বার হইয়া
যায় । সভাখান্য জানি না, শুনিয়াছিলোম এই অভিনয় প্রতি রজনীতে ১২৫০,
১৫০০ টাকা খরচ হয় । বাস্তবিক দৃষ্টান্তস্বরূপ অতি অসাধারণ ও অনিবার্যম্বর ।

আমি সেন্সপিয়ালের Henry VIII অভিনয় দেখিরাছিলাম। যে সময়ের ঘটনা অভিনীত পুরস্কার প্রভৃতি ঠিক সেই সময়ের; এবং যে সব অভিনেতা অভিনেত্রী ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের কৃত্রিম। অভিনয় করিরাছিলেন তাঁহারা সেই সেই ব্যক্তির ভাৱ চেহারাও করিরাছিলেন। বাস্তবিক রঙ্গমঞ্চের সাজা হেনরিকে খেন ক্রাশানাল গ্যালারী চিত্রালয়ের স্কেনারীর সজীব সংকরণ বলিয়া বোধ হইতেছিল।

যত অভিনয় দেখিরাছিলাম, দুইটি গাফ'হা নাটক আমার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট ভাল লাগিরাছিল; কিন্তু সে দুটিতে দর্শকের তত তিড় দেখিলাম না। ইংরাজ-জাতি বিধ গজীর অভিনয় ভালবাসে বলিয়া বোধ হইল না।

আমি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের অনেকেরই অভিনয় দেখিরাছিলাম। তন্মধ্যে স্যার চার্লস উইণ্ডহাম, স্যার হার্বার্ট টি, ব্রুসিয়ার এবং ডুমরিয়ারের অভিনয় আমার নিকট সর্বোত্তম মনে হইরাছিল, বিশেষতঃ উইণ্ডহামের। এমন সহজ স্থলর অভিনয় আমি খুব কমই দেখিরাছি। দেখিলে অভিনয় বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের দেশের এক টার থিয়েটারের ত্রীভুক্ত অমৃতলাল বসুর অভিনয়ে ঐ সহজ ভাব পরিগল্ভিত হয়। পনের বোল বৎসর পূর্বে অমৃতবাবুর অভিনয় দেখিতাম। উইণ্ডহামকে দেখিরা অমৃতবাবুর কথা খুব মনে পড়ে। Mannerismএর একান্ত অভাব, বাহা আছে তাহা ঠিক অমৃতবাবুর মত।

ইউরোপে থিয়েটার ভিন্ন মিউসিক হল নামক আর একরূপ প্রমোদ-গৃহ আছে। তথায় নাটক অভিনীত হয় না, বাহা কিছু অভিনয় হয় তাহাও কেবল ভাবতক্ষীতে; অভিনেতা অভিনেত্রীবর্গ বাক্যস্মরণ করে না, শুধু হাবভাবে ব্যাপারটা বুকাইরা দেয়। তত্ত্ব মিউসিক হলে গান, নাচ, ব্যাজিক, জিম্জাজিক প্রভৃতি দেখায়। এইরূপ উহার আর এক নাম Variety Stage বৈচিত্র মঞ্চ। এই সব স্থলে দর্শকদিগের বসিবার ও বেড়াইবার স্থান থাকে, অনেকে সমস্তকণ পছন্দাৱণা করে। এই মিউজিক হলগুলি ক্রমশঃগামী গ্রীপক্লেবের সম্মিলনস্থান। সে চিত্তের পরিচয়ে আর কাব নাই।

এই থিয়েটারের প্রসঙ্গে আলবার্ট হলের বর্ণনা করিতে হয়। মহাত্মাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয়া আলবার্টের প্রতিচ্ছবিরূপ জিম লক যুগ্মাৱয়ে এই প্রকাণ্ড গোলাকার হল নির্মিত। দশ হাজার লোক ইহাতে বস্কে বসিতে পারে। পতনের বড় বড় রাজনৈতিক সভা এবং সঙ্গীতবৈঠক এই স্থলে হয়। এই দালানে প্রায় ১০০০ পাইপযুক্ত একটি প্রকাণ্ড অর্গ্যান আছে। সববেত

বাক্সিবর্ণের পানচারণের স্থানও আছে। রাজ্যের প্রবেশদ্বার, বলিবার ঘর প্রভৃতি স্বতন্ত্র। এই হল দেখিতে চিন পেনা দর্শনী নিতে হয়। পৃথিবীতে এত বড় সভ্যত্বই খুব কমই আছে। অথচ ইহা একদম কৌশলে নির্মিত যে, মকের উপর বস্তুতা করিলে অন্ন আঘাতে সকল প্রোত্যাই বস্তুর কণা ভুজিতে পায়; আমাদের সেনেট হাউসের মতনচে। মকটির উপরেই সতন্ত্র বাক্সির স্থান হয়। দশকদিগের জন্ত বলিবার আসন আছে। বক্ষীর নিকট ভূনিলাম যে, বণ নাচ বা Charity performance উপলক্ষে আসন সরাইয়া ফেলা হয়; তখন বার হাজার লোকের স্থান সম্বলান হয়।

এলবার্ট হলের সম্মুখেই কেনসিংটন উদ্ভানের এক অংশে Albert Memorial বিদ্যমান। প্রকাণ্ড চম্পাতপের নিরে গিল্প আলবার্টের ১৩ ফুট উচ্চ রোজ-নির্মিত প্রতিমূর্তি। তাঁহার চতুর্দশে নানাদেবীর কবি, চিত্রকর, শিল্পী প্রভৃতির প্রতিমূর্তি; চারিকোণে কৃষি, বাণিজ্য, স্থাপত্য ও উৎপাদকশিল্পের কল্পিত মূর্তি। নিরে মর্ম্মরশোপান ও সর্ব্বনিরে যুরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার রূপক মূর্তি। ১৮ লক্ষ মুদ্রাবারে এই দ্বিতিচিহ্ন নির্মিত।

অল্প কিছু বলিবার পূর্বে আজ ইংলণ্ডের বানাদি সম্বন্ধে কিছু বলিব। টিউব রেলওয়ে বা ভূমধ্যস্থিত বৈজ্ঞানিক গাড়ী সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। ইহাই লণ্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত বান এবং ইহার দ্বারা এক স্থান হইতে অল্প স্থানে বাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত ও স্বল্পসময়সাধন। সকলেই জানেন যে, লণ্ডন খুব বড় সহর এবং ইহার প্রসার ক্রমশঃই বাড়িতেছে। এখন ভূমধ্যস্থিত গাড়ীর ৮১০টি লাইন লণ্ডনে আছে এবং তাহাদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ মাইল। সহজেই বুঝা যায়, লণ্ডনের এক অংশ হইতে অংশান্তরে বাওয়ার ইহাই প্রকৃত উপায়। লণ্ডন অবস্ত্র টেমস নদীর চুই তীরেই বিস্তৃত। কিন্তু টেমসের দক্ষিণ বা সহরের দিকের অংশ অপেক্ষাকৃত অল্প কর্ম্মকোলাহলকল্পিত। ঐদিকে চুইটি রাজ টিউব রেলওয়ে আছে। চুইটিরই অবস্ত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র tunnel বা সুড়ঙ্গ আছে। তন্ত্রির ‘পদ্মপাঠের’ সেই “উপরে জাহাজ চলে নিজে চলে নর” সে সুড়ঙ্গ ত আছেই। মোট এই তিনটি সুড়ঙ্গ নদীর নিরে আছে।

এই হলে বলা উচিত যে, প্যারিসেও এইরূপ ভূমধ্যস্থিত রেলওয়ে আছে এবং তথাকার লাইন সমস্তই বৈজ্ঞানিক আলোকমালায় আলোকিত। লণ্ডনের রেলপথগুলি অন্ধকার, কেবল গাড়ীর মধ্যে খুব আলো থাকে। চুই একটি লাইনে অভ্যস্ত শব্দ হয়, গাড়ীর ভিতর কথোপকথন একরূপ অসম্ভব, তবে সব লাইনে

একরূপ নহে। কেহ কেহ বলেন যে, এই সব ভূমধ্যস্থিত গাড়ীতে নয় আটকানর মত ভাব হয়। আমার মেক্রপ কিছু হয় নাই। তাহার পর রেলগাড়ী। রেল-ওয়ে সবকিছু প্রধান কথা এই যে, লণ্ডনে বসন্তগুলি লাইন আছে, সকলেরই সীমান্ত ষ্টেশন লণ্ডনের খুব জনাকীর্ণ ও কণ্ঠবহুল অংশে; আমাদের দেশের স্তায় সহরের এক প্রান্তে নহে। কোথাও হুড়ক কাটিয়া কোথায়ও বা রাস্তার খুব উত্তে পূলের স্তায় গাণবী ওহার উপর দিয়া রেলওয়ে লাইন সহরের মধ্যে আশিরাছে। লণ্ডন হইতে ১০১২টি বড় বড় রেলওয়ে লাইন ইংলণ্ডের সর্বত্র গিয়াছে। ইহাদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন সীমান্ত ষ্টেশন আছে, তন্মধ্যে ৮৯টি প্রধান। ইংলণ্ডের বাহিরে মুরোপীয় মহাদেশে বাইবার প্রধান ষ্টেশন তিনটি—চেরিং ক্রস, ভিক্টোরিয়া ও ওয়াটালু। এই তিনটি পরস্পর খুব সন্নিকট। সব ষ্টেশনই খুব প্রকাণ্ড; প্রায় সকল ষ্টেশনেই ১২১১৪টি স্মার্টক্স এবং পাঁচ সাত মিনিট অগুয়ই ট্রেন ছাড়ে। আমাদের দেশে ষ্টেশনের বাহিরে মাত্র দুইটি লাইন, একটি আস্ট্রেণ ও একটি ডাউন ট্রেনের গুহ, বিনাও আরই ৫৬টি লাইন; এক সঙ্গে ২১৩ থানা আস্ট্রেণ ও ২১৩ থানা ডাউন ট্রেন লাইনের উপরে চলে। অবশ্য লণ্ডন হইতে দূরে গেলে আরই ছইতিমাত্র লাইন। কিন্তু এই ভরানক ট্রেনের বেসার্ঘ্যসিতে লণ্ডনের কাছাকাছি আরগার লাইনের অবস্থান ঠিক রাখা যে কি সাবধানতার পরিচায়ক তাহা সহজেই অধ্যবের। বড় বড় গ্রাম বা সহরের গুহ অনেক ধরনের ট্রেন আছে। সে সব ট্রেন লণ্ডন হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে সেই সব স্থানে থাকে; কখনও কখনও বা দুই এক খানি গাড়ী চলন্ত ট্রেনের পশ্চাত্তাগ হইতে কোনও গ্রামে কাটিয়া রাখিয়া যায়। বার্মিংহামপারী এইরূপ ট্রেনের গাড়ীতে আমি ট্রিটকোড অন অ্যান্ডনে গিয়াছিলাম। যখন পথে এক ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী থামিল তখন ট্রেনের এঞ্জিন ও পুষ্কাংশ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

রৈলে কেবল তিন শ্রেণী। তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতেই প্রায় সব যাত্রী বাওয়া আসা করে। ধনীরা বা বাঁহারা একাকী গমনাগমন করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে বাওয়া আসা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী-সংখ্যা সর্বাধিক। সেজন্য অনেক ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী আরই থাকে না। সব শ্রেণীর গাড়ীরই বাসবার বন্দোবস্ত একরূপ, কেবল গাড়ীর চামড়ার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের; তবে যে সব গাড়ী খুব অল্প দূর যায়, তাহাতে আমাদের দেশের suburban বা নগরোপকণ্ঠপারী ট্রেনের মত বেক বেত দিয়া ছাওয়া। ঐক্য গাড়ী ক্রান্তের গাড়ী থেকে গিবিয়াছি সেইরূপ। যে সব ট্রেন একটু

বেশী দূর যাত্রা অথবা যে স্থানি যাওয়া দাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ে চলে, সেগুলিতেই আহারের জন্য গাড়ী থাকে। রাত্রিতে যে সব ট্রেন একটু বেলা দূর যাত্রা তাহাতে ঘুমাইবার গাড়ী থাকে; এ ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর জন্য এবং তাহাতে ১৫ টাকা অধিক দিতে হয়। অন্য শ্রেণীতে কেবল দ্বিসবার ব্যবস্থা; তবে নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক যাত্রী কোনও কামরার নয়। গাড়ীর স্থানগারে জাভা ও গরম জল, সাবান, তোরাগে, শৌচার্থ কাগজ সবই পাওয়া যায়। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাইল পিছু এক আনা (আনারের দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ন ভাড়ার সমান)। রিটার্ন টিকট সব শ্রেণীতেই পাওয়া যায়, তবে প্রায়ই ভাড়ার কিছু সুবিধা হয় না। দুই এক বুলে মাত্র রিটার্ন টিকিটের ভাড়া বাতাসাতের সাধারণ ভাড়ার কিছু কম। অনেক যাত্রী তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্রারাত করেন বলিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে খুব ভাল বন্দোবস্ত। পার্লামেন্টের অনেক সভ্যও তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়া আসা করেন। তৃতীয় শ্রেণীর আর একটি নাম পার্লামেন্টারি (Parliamentary Class) শ্রেণী। ছুটি অথবা পঞ্চদিন উপলক্ষে লণ্ডন হইতে অথবা লণ্ডন পথান্ত Excursion Trains ছাড়ে, তাহার ভাড়া অতি-পর কম; যাত্রারাতও অনেক সময় একবারের ভাড়ার অপেক্ষাও কম।

এই ত গেল ট্রেনের অবস্থা। এতদ্বিষয় ট্রাম বা ওমনিবাস (চলিত কথায় 'বাস') আছে। দেশের অনেক ভাগেই ওস্তাল চলে। লণ্ডনে হিসাবে জানা গিয়াছে যে, বঙ্গের লণ্ডনের প্রত্যেক আধবাসী গড়ে এক শত বারেরও অধিক ট্রামে বা বাসে চড়ে। এগুলি প্রায় আমাদের দেশের গাড়ীরই মত। তবে প্রায়ই দ্বিতল ও ছাতের উপর বাহারা বলে তাহারাই যখনই কলিতে পারে। সব গাড়ীরই পশ্চাত্তাগে দরজা ও তাহার পার্শ্বেই ছাতে উত্তিবার ঘুরাণ শিঁড়ি। দুরত্বাহসারে, বাইল খানেকের ভাড়া অল্প পেনি বা দুই পয়সা। বাস বা ট্রামের ছাত হইতে সহর দেখার বড় সুবিধা। ট্রামে, ডিউবে, রেল স্টেশনে সর্বত্রই বিজ্ঞাপনের খুব ছড়াছড়ি। বিজ্ঞাপনের আকার নবায়নের পক্ষে ট্রাম কোম্পানি যাইবে জানা অনেক সময় কষ্টকর। তবে যে সব নির্দিষ্ট স্থানে ট্রাম থামে, সেই সব স্থানে কণ্ডাক্টর পক্ষত্ব স্থানের নাম হাঁকিয়া জানাইয়া দেয়। বিজ্ঞাপনের মধ্যে ড্রাইন্ট ও মের দেশলাইয়ের বিজ্ঞাপনই খুব বেশী; তাহারদের বিজ্ঞাপনের বহান Support Home Industries স্বদেশী শিল্প পোষণকর। টেম্‌স্‌ নদীতে অনেক ষ্টাম-বোট আছে, তাহাতেও অনেক যাত্রী যাত্রারাত করেন। ভাড়াও খুব কম।

তাহার পর লণ্ডনের দোকানের কথা। বড় বড় দোকান অতি সুন্দর ভাবে

সাজান। অনেক নিরুপা লোক শুধু রাস্তা হইতে দোকান দেখিয়া সময় কাটান ও
সব মিটান। বাস্তবিক রূপিতে যখন সব দোকান বন্ধ হয়, তখনও বড় বড়
জানালায় (plate glass windows) ভিতর দিয়া বিদ্যাতালোকবিভাজিত
মুদ্রাঙ্কিত দোকান পাট দেখিতে অতি সুন্দর। পথিকের মন আপনা আপনি
তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, Stores বা জুতা সেলাই হইতে
চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত হয় (অথবা হংসার্তা ভাবার বলিতে গেলে হুচ লইতে হস্তী পর্য্যন্ত
বিক্রীত হয়) এরকম দোকান লগুনে অনেকগুলি আছে। এই সব দোকানের
শোভা ও ঐশ্বর্য বাস্তবিকই দেখিবার মত। দোকানে ঢুকিলে ইংরাজ যে দোকান-
দায়ের জাতি তাহা বেশ বুঝা যায়। একটা সামান্য কিছু জিনিষ চাহিলেও
তৎক্ষণাত্ খরিদারের মনের মত জিনিষ জোগাইবার জন্য একটি আশ্রয় দেখা যায়।
আমাদের দেশে শুধু লোকের দোকানে জিনিষ কিনিতে গেলে বিক্রোতা যেন
ক্রেতাতে যথেষ্ট অহুগ্রহ করিতেছেন, এ ভাব আরই দেখা যায়; এখানে ঠিক
তাহার বিপরীত ভাব। একটা চারি পয়সার জিনিষ কিনিতে গেলেও যত বড়
দোকানই হউক, বিক্রোতা এরূপ ভাব দেখায় যেন সমস্ত দোকান খস হইতেছে;
তাহার পর যদি খরিদারের মনের মত জিনিষ না দিতে পারে তাহা হইলে ক্রেতার
ফরমাইল মত দ্রব্য তৈয়ার করা হইয়া দিতেও সচেষ্ট হয়। পরে জিনিষ কিনা
হইলে আবার তাহা বাটীতে পাঠাইয়া দিবে। তৎক্ষণাত্ কোনও আদায় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিলাত আমাদের দেশের ভ্রমণ সমতল নহে, খুব অসমান;
কাবেই সব গাড়ীতেই ব্রেক থাকে; ঘোড়ার গাড়ীতেও গাড়োয়ানের হাতের
কাছে ব্রেকের হাতল থাকে। উপর হইতে নীচে বাওরার সময় সেই হাতল টানিয়া
ব্রেক জ্বাটে। যুরোপে এক মিলানো (ইটালির অন্তঃপাতী মিলান) সহরে গাড়ীতে
ব্রেক দেখি নাই; ভিত্তি সজ্ঞ আছে। এই অসমতলার জন্য মধ্যে মধ্যে বড় মজা
দেখা যায়। লগুনে একটা খুব লম্বা রাস্তা আছে, তাহার কতক কতক অংশ
বিভিন্ন নামে পরিচিত। এক অংশের নাম Holborn Viaduct (এই রাস্তার
উপর প্রসিদ্ধ Tabloid মার্কা ঔষধ-বিক্রেতা Burroughs Wellcome কোম্পা-
নীর দোকান) ইহার নীচে দিয়া খুব চওড়া অন্য এক রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। উপর
হইতে নীচে নামিবার সিঁড়ি আছে। গাড়ীতে গেলে অনেক বুরিয়া যাইতে হয়।

এই অসমতলতার জন্যই বিলাতে গাড়ীর ঘোড়াগুলি খুব বৃহদাকার ও বল-
বান। আমাদের দেশের ভাড়া গাড়ীর ঘোড়ার ভ্রমণ অহিচর্যসার পক্ষিরা-
নন্দন যুরোপে কোথায়ও দেখা যায় না।

ঐনয়ের প্রকৃতির বস্তু।

তীর্থযাত্রা ।

১

যে বিবিধ ভগ্নাদানে মানব-স্বভাব পতিত হয়, তাহার মধ্যে কাব্য ও দার্শনিক দুইটি আবশ্যক উপাদান । প্রথমটি ব্যতনে “গরম মসলারই” মত ; নামান্ত সংস্কারে সুখদ, কিন্তু আভিসম্বো বিশ্বাস উৎপাদক । বাহার ধাতুতে কবিত্বের প্রাবল্য থাকে সে আপনিও সুখী হয় না—স্বজনগণকেও সুখী করিতে পারে না ; সংসারে তাহার অগ্রুথ অনিবাধ্য । কারণ, সে কর্মমাতেই সুখ পায়—কল্পনাবলে অসম্ভবকে সম্ভব ভাবিয়া যে আদর্শ পতিত করিয়া রাখে, সংসারে তাহা না পাইয়া পদে পদে বেদনা ভোগ করে ; এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বজন-গণকেও অসুখী করে । কিন্তু বাহার ধাতুতে দার্শনিকতার প্রাবল্য প্রস্ফুট, সে সুখেও যেমন চঞ্চল হয় না—দুঃখেও তেমনই কাতর হয় না ; অবস্থান্তর-প্রাপ্তি সে সংসারে অনিবাধ্য বোধে শান্তি পায় । মনোরঞ্জনের ধাতুতে দার্শনিকতার যেমন অভাব ছিল, কবিত্বের তেমনই প্রাবল্য ছিল । কাবেই সংসারে সে সুখী হইতে পারে নাই । সে স্বয়ং সুখী হইতে পারে নাই, আর সঙ্গে সঙ্গে পত্নী সন্তানকেও সুখী করিতে পারে নাই । তাহার প্রধান কারণ, সে কল্পনার অসম্ভব বর্ণে পত্নীর যে চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, সন্তান সহিত সে চিত্রের অধিক সাদৃশ্য ছিল না । সে প্রেমের স্বর্ণবর্ণে পরিবৃত্তাকে রক্তিতা দেখিবার পূর্বেই আপনার কল্পনারচিত চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্যের অভাব দেখিয়া হতাশ হইয়াছিল ।

এদিকে তরুণী সরমা স্বামীর নিকট যে ব্যবহার পাইবে আশা করিয়াছিল, সে ব্যবহার না পাইয়া বিচলিত হইল—তাহার সন্মুখে প্রেম বিকশিত হইবার পূর্বেই ঐদাসীক স্বামী হইয়া উঠিল ।

এই অবস্থার সংসার চলিতেছিল । ইহারই মধ্যে মনোরঞ্জনর সংসারে তৃতীয় ব্যক্তি—তাহার জননী—পুত্রকে অসুখী দেখিয়া—সে বেদনার কণ্টক বন্ধে বহিরা সংসার হইতে চির বিদায় লইলেন । তখন সংসারে কেবল স্বামী ও স্ত্রী—দুই জনে এত নিকটে, তবু এত দূরে !

ইহার অমদিন পরে যখন সরমার একটি পুত্র হইল—তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বেন অকূলে কুল পাইল । আশ্রয়কে পাইয়া—সরমা বেন তৃষ্ণার ধারি পাইল ; তাহার সমস্ত অকৃষ্ট বাসনা বেন তৃপ্তি-লাভ করিল । আর পুত্রকে লইয়া সে

সকল হুঃখ ভুলিল দেখিয়া মনোরঞ্জন অসীন হুঃখ লাভ করিল; তাহার হৃদয় হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। স্বামিহুখে সরমা সুখী হইতে পারে নাই বলিয়া যেন মনোরঞ্জন আপনাকে অপরাধীর মত মনে করিত; এবার তাহার সে ভাবটা কাটিয়া গেল। সে যেন মুক্ত হইল। তাহার পিতা বিপুল সম্পদ রাখিয়া যারেন নাই। বাচা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে একটা ছোট পরিবারের “ভাত-কাপড়ের” অভাব হয় না—এট পর্য্যন্ত। তাহার মধ্য হইতে সে কিছু টাকা। একজন বন্ধকে দগ্ন দিয়াছিল এবং বন্ধু বাদসারে লোকসান দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং মনোরঞ্জনকে উপাধ্বনের উপায় করা আবশ্যক হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এত দিন কোন কার্যোই তাহার মন বসে নাই। এবার সে একটা চাকরী লইল।

সরমা পুত্রকে লইয়া ও মনোরঞ্জন চাকরী লইয়া ব্যাপৃত রহিল—উভয়ের হৃদয় হঠাৎ উভয়ে ক্রমেই দূরে বাইতে লাগিল।

২

এই ভাবে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। সরমা ও মনোরঞ্জন এই পাঁচ বৎসরে পরস্পরের নিকট হইতে মধ্য সম্ভব দূরে গেল, বন্ধন রহিল কেবল পুত্র। এই সময় এক দিন মৃত্যু অত্যন্ত ভাবে আসিয়া সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। সরমার সর্বনাশ হইল। তাহার শূন্য জীবন ও শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিবারে বিয়াক্ত ছিল—বাহাকে পাইয়া সে পতি-প্রেম-বিক্ত হুঃখময় জীবন সুখের মনে কল্পিয়াছিল, বাচাকে লাভ করিয়া সে দারুণ হতাশা সঙ্গেও আপনাকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করিত, যে তাহার ও মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া তাকে জীবনে আকৃষ্ট করিয়াছিল, মৃত্যু-মুহুর্তন তাহাকে লইয়া গেল, তখন তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিবার আর কিছুই রহিল না।

কিন্তু বন্ধনবিহীন হইয়া কেহ বাস করিতে পারে না; তাই প্রকৃতি এক বন্ধনের স্থানে আর এক বন্ধন রচনা করেন। এখন স্বামীস্ত্রীর মধ্যে নূতন বন্ধন রচিত হইল। সে বন্ধন শোকের—সমবেদনার। উভয়েই শোককাতর; কাবেট উভয়ের মধ্যে সমবেদনার বন্ধন সহজেই দৃঢ় হইয়া উঠিল।

শোকে যখন হৃদয় কোমল হয়, তখন তাহাতে সহানুভূতির উৎস সত্যই উৎসারিত হয়। মনোরঞ্জনকে শোককাতর হৃদয় সহজেই সরমার ভক্ত বেদনার ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিন্তু সরমা সে সহানুভূতিতে শান্তি বা সাহায্য লাভ করিতে পারিল না।

পূৰ্বেই মনোরঞ্জনৰ সহিত তাহাৰ মনোমালিন্ত প্ৰেমৰ প্ৰবাহে বাধাৰ মত হইয়া ধাঁড়াইয়াছিল—এখন শোকৰ আবেগেও তাহা অপনীত হইল না । ইহাতে মনোরঞ্জন আঁৰও বিৰত হইবী পড়িল । সৰমাকে সুখী কৰিবার বাসনা—তাহাৰ শোককষ্টকবিক্ষত মনৰে সাধনাৰ প্ৰিয় তেবজ-প্ৰদানৰ প্ৰবল কাহনা যেন তাহাৰ প্ৰাণবিক চৰ্ছলতাৰ মত হইয়া উঠিল । যে মনোরঞ্জন পত্নীৰ সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ উদাসীন ছিল—তাহাৰ ব্যবহার তাহাকে স্বৈৰাদলভুক্ত কৰিবার মত হইয়া উঠিল ।

৩

শোকে সাক্ষ্যনালাভেৰ অন্ত উপায় না পাইয়া সৰমা প্ৰাণপণে ধৰ্ম্মেৰ বাহা-চানকে চাপিয়া ধৰিল । ব্যস্ততাদিৰ অহুঠানে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়া সে শোকজালা প্ৰশমিত কৰিতে সচেষ্ট হইল । তাহাৰ সে সকল অহুঠানে মনোরঞ্জন যথেষ্ট উৎসাহ ও বথাসম্ভব সাহায্য দান কৰিতে লাগিল ।

অন্নদিনেৰ মধ্যেই সৰমা কোন তীৰ্থস্থলে বাইয়া বাসেৰ বাসনা বাক্ত কৰিল । মনোরঞ্জন তখন পত্নীৰ সুখবিধানৰে জন্ত এমনই ব্যস্ত যে এ প্ৰস্তাবেও সে আগতি কৰিল না । কিন্তু পূৰ্বেই বলিয়াছি, কোন বন্ধুকে সন্নিহিত অৰ্থ গণ দিয়া সে সন্নিহিত হইয়া পড়িয়াছিল । সন্নিহিতে আয়েৰ পথ চাকৰী ত্যাগ কৰিয়া বিদেশে বাস অসম্ভব । তাই সে নানারূপ ওজৰ কৰিয়া বিলম্ব কৰিতে লাগিল । ক্ৰমে যখন ওজৰ আঁৰ চলে না—সত্য বলিতে হয় এমন অবস্থা ধাঁড়াইল, সেই সময় একটা অতিক্ৰমিত দুৰ্ঘটনা সৰমাৰ সম্বন্ধে পৰিৱৰ্ত্তিত কৰিয়া দিল । মনোরঞ্জন ইাক ছাড়িয়া বাটিল ।

৪

মনোরঞ্জনৰ বঙাৰ মহাশয় সমাজে বিশেষ সমাদৃত ছিলেন । তিনি সমাজ পৰিৱাৰেৰ সন্তান, যয়ং কৰ্ম্ম—কৃতী পুৰুষ । তিনি অধিকাংশ বাল্যসীৰ অহুসৃত মূল ও হুগম চাকৰীৰ পথ গ্ৰহণ না কৰিয়া ব্যবসায়ৰে গহনে গহন কৰিয়াছিলেন এবং ভাগ্যশুণে সাক্ষ্যেৰ কলতক্কৰ কললাত কৰিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন । সেই সাক্ষ্যে তিনি সমাজে সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন । মহলা মুক্কা আসিয়া তাহাকে তাহাৰ অসমাপ্ত কৰ্ম্মকৰননাৰ মধ্য হইতে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেৰ দেশে লইয়া গেল । তাহাৰ পৰিৱাৰে যেন বিনামেৰে বজাখাত হইল । সৰমা শোকার্ত্তা জননীৰ সেৱা কৰিতে গেল । তাহাৰ কালীবাসকলনা আঁৰ কাৰ্য্যে পৰিপত হইল না ।

সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জনর কার্যেরও অনেকটা পরিৱর্তন হইয়া গেল। খণ্ডরালয়ের সহিত মনোরঞ্জনর ঘনিষ্ঠতা বা খণ্ডরালয়ে জামাতার প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না; তাহার কারণ যাহার অল্পসে সকল সম্ভব হয়, সেই পত্নীর সহিত তাহার ব্যবহার তাহার খণ্ডরালয়বাসিগণের মনোমত ছিল না। এবার এই আকস্মিক বিপদে মনোরঞ্জন খণ্ডরালয়ের সহিত একটু অধিক ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। সেইরূপ ব্যবহারে সরমাকে সুখী করাই তাহার উদ্দেশ্য।

তাহার এই ঘনিষ্ঠতাব তাহার কোঠা ছালক সুধীনের পক্ষে ঈর্ষিত অব-লম্বনের মত হইল। সকলেই তাহাকে বলিতেছিলেন—ব্যবসা শুটাইয়া ফেল—টাকাগুলার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া নিশ্চিন্ত হও। এই প্রস্তাবটা প্রেলোভনীর হইলেও তাহার পক্ষে অসম্ভব—কেন অসম্ভব সে তাহা কাহাকেও বলিতে পারিতেছিল না। এখন মনোরঞ্জনর ভাব দেখিয়া সে মনোরঞ্জনকে সব কথা ভাদিয়া বলিল। মনোরঞ্জনর খণ্ডর ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া ব্যবসার প্রসার বুদ্ধিকল্পে বে প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত মূলধন ব্যয়িত হইয়াছিল—তিনি “বোম” বরিবার আশার “গোলাম পাড়িয়া” খেলিয়াছিলেন। মনোরঞ্জন সব শুনিয়া বৃথিল—এখন ব্যবসা শুটাইলে হাতে কিছুই থাকিবে না, আরও টাকা ঢালিয়া জল দিয়া জল বাহির করিবার চেষ্টা ব্যতীত এখন অন্য উপায় নাই। কাবেই সে ছালককে ব্যবসা চালাইতেই পরামর্শ দিল এবং আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহাকে আবশ্যক অর্থ-সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিল।

• সুকর্কই বলিয়াছি, মনোরঞ্জনর খণ্ডরের আত্মীয়বন্ধুবর্ণ তাঁহার পুত্রকে ব্যবসা তুলিয়া দিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। সে সে পরামর্শ শুনিয়া না, পরন্তু অপরিপক্ববুদ্ধি ভগিনীপতির উৎসাহে ব্যবসা করিতে লাগিল—বৃথিল না, ব্যবসা পাশার দান—কি পড়িবে কেহ বলিতে পারে না—ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; যেন সে তাঁহাদিগকে অপমানিত করিয়াছে।

মনোরঞ্জনর উৎসাহে ও সাহায্যে তাহার তরুণবয়স ছালক যেন সমুদ্রে কুল পাইল! আর তাহার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সরমা অত্যন্ত প্রীত হইল। সরমার এই আনন্ডই মনোরঞ্জন তাহার যথেষ্ট পুরস্কার বিবেচনা করিল—সে তাহাতেই যথেষ্ট সুখ পাইল।

এই ভাবে কয় বৎসর কাটিল।

এ কয় বৎসর মনোরঞ্জনের সমস্ত সঞ্চয় ও শক্তি সুধীরচন্দ্রের ব্যবসায়ের উন্নতিচেষ্টার ব্যয়িত হইয়াছিল—যেন সে স্থানকেই মন্ত্র ভাগ্যদেবীর সহিত প্রাণান্তসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পাঁচ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় সে সফলপ্রসূ হইল। সুধীরচন্দ্র পিতার প্রার্থিত কার্য সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল—ব্যবসারে প্রচুর লাভ হইল।

কিন্তু ভাগ্যচক্রের যে আবর্তনে সুধীরচন্দ্রের মন্ত্র নির্দিষ্ট কর্মকল্পবিশিষ্ট মুক্তিকালংগণ অংশ উর্দ্ধে উথিত হইল, সেই আবর্তনেই মনোরঞ্জনের মন্ত্র নির্দিষ্ট অংশ নিম্নে পতিত হইল। আকিসের চাকরীতে মনোরঞ্জন দিন দিন উন্নতিলাভ করিয়াছে—তাহার বেতন ও তাহার প্রতি আকিসের বড় সাহেবের বিশ্বাস দিন দিন বদ্ধিত হইয়াছে। সহসা এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। আকিসের “বড় সাহেব” দীর্ঘকাল কাণ্ড করিয়া কারবারে আপনায় অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন,—অর্থ লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন। ঠিক সেই সময় আকিসের একটা বিভাগে চুরি ধরা পড়িল—তদন্তে প্রকাশ পাইল, কিছুদিন ধরিয়া চুরি হইতেছিল, ধরা পড়ে নাই। নূতন ‘বড় সাহেব’ সকল বিভাগে জাহীনের ব্যবস্থা করিলেন; মনোরঞ্জনকে কার্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অধিক বলিয়া তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক জাহীনের দাবী করিলেন। মনোরঞ্জন এতদিন একরূপ সম্মান ও সুখ্যাতির সহিত কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে যে, সে এই নূতন ব্যবস্থার আপনাকে অপমানিত মনে করিল। সে বড় সাহেবের নিকট বাইরা বলিল, “কোন অপরাধে আমার প্রতি জাহীন দিবার আদেশ হইল?”

‘বড় সাহেব’ সম্মুখে রক্ষিত পত্রগুলি সহি করিতেছিলেন; চামরাঙ্গী একখানি পত্র সরাইয়া ব্রুট করিতেছিল, তিনি পরবর্তী পত্রখানি সহি করিতেছিলেন। তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, “ইহাই আমার আদেশ।”

“কিন্তু আমার এতদিনের কাণ্ড—”

‘বড় সাহেব’ বাধা দিয়া বলিলেন, “আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না।”

মনোরঞ্জন বলিল, “মনিব যে কর্মচারীকে বিশ্বাস করেন না: মনিবের পক্ষে সে কর্মচারী না রাখাই শ্রেয়ঃ, আর কর্মচারীর পক্ষেও সে মনিবের কাণ্ড না করাই ভাল।”

কর্মচারীর এইরূপ ব্রুটতার ‘বড় সাহেব’ একান্ত বিস্মিত হইলেন—বলিলেন, “সেই কথাই ভাল। তোমার সহকারী কাণ্ড বুলিয়া লইলেই তোমার বিদায়।”

“ভিনি এখনই কাথ বুঝিয়া লইতে পারেন। আমার কাথে বকেয়া নাই।”

মনোরঞ্জন নাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনের চাকরী ছাড়িয়া দিল, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রশংসা লাভ করিল। সে দ্বির করিল—যদি জামীন দিয়া চাকরী করিতে হয়, নূতন আফিসে অধিক জামীন দিব, কিন্তু যে আফিসে এতদিন বিনা জামীনে কাথ করিয়াছি, সে আফিসে অল্প জামীনও দিব না।

১

গৃহে ফিরিবার পথে মনোরঞ্জন সুধীরচন্দ্রকে আপনার কথ্যত্যাগের সংবাদ দিয়া গেল। শুনিয়া সুধীর গম্ভীরভাবে বলিল,—“তাই ত। কন্ করিয়া চাকরীটা ছাড়িলেন। অবশ্য আপনি ভাল করিয়া বুঝিয়াই কাথ করিয়াছেন।” তাহার কথার আন্তরিকতার উজ্জলিত ব্যাকুলতা ছিল না। এতদিন তাহার উন্নতিতে আপনার একান্ত স্নিপিত করিয়া মনোরঞ্জন আজ তাহার নিকট যে সহাত্বৃত্তি পাইবে আশা করিয়াছিল, তাহা না পাইয়া সে ক্ষমের কিছু বেদনা অহুত্ব করিল। আশা করিলেই নিরাশার মংশন ভোগ করিতে হয়।

গৃহে ফিরিয়া মনোরঞ্জন সরমাকেও এ কথা বলিল। শুনিয়া সরমা বলিল, “পুত্রব মাতৃব—বিশেষ এখন খাটিবার বয়স, চাকরীর ভাবনা কি? না হয় ছই চারি দিন বিলম্বই হইবে। বন্ধুকে দিয়া টাকাগুলো জলে না ফেলিলে চাকরীর দরকারই বা কি?”

সেই পুরাতন কথার আলোচনা বন্ধ করিবার মন্ত মনোরঞ্জন বলিল, “আজ এতদিন খাটিয়াও কি কিছু সঞ্চয় করিতে পারি নাই?”

সরমা কখন সে সংবাদ লয় নাই, মনোরঞ্জনও কিছু বলে নাই। আজ এ কথা শুনিয়া সরমা বলিল, “তাহা ত আমি কিছু জানি না।”

“এই কয় বৎসর যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি সব দিয়া সুধীরের ব্যবস্যাটাকে ঝাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুখের বিষয়, এতদিনে চেষ্টা সফল হইয়াছে। এবার সুধীর প্রচুর লাভ করিয়াছে।”

ব্রাত্যর ব্যবসারে উন্নতি ও স্বামীর সঞ্চয়—এক সঙ্গে এই উভয় সংবাদ পাইয়া সরমা পরম আনন্দিতা হইল। তাহার মুখে ও চক্ষুতে আনন্দদীপ্তি দেখিয়া মনোরঞ্জনও আপনার সকল শ্রম সার্থক বোধ করিল।

•

• সৌভাগ্য-ক্রমে মনোরঞ্জনের চাকরীর সন্ধান পাইতে বিলম্ব হইল না। কাথ

জানা লোকের আদর সর্বদাই থাকে । কাষে মনোরঞ্জনের বিশেষ সূখ্যাতি ছিল, কাষেই অন্তান্ত আকিষের অনেকেই তাহার কথা জানিত । একটি আকিষে সেই সময় কাষ খালি হইল ।” মনোরঞ্জন আকিষের কর্তার সহিত লাক্ষ্য করিলে তিনি সব গুনিয়া তাহাকে কাষ দিতে চাহিলেন । সে পদের জামীন পূর্বে দশ হাজার টাকা ছিল ; তিনি বলিলেন, মনোরঞ্জনের কার্য্যদক্ষতা ও যোগ্যতা সন্দেহে তিনি বাহা গুনিয়াছেন, তাহাতে তাহার পাঁচ হাজার টাকা জামীন দিলেই হইবে । গুনিয়া মনোরঞ্জন সানন্দে গৃহে ফিরিল ।

জামীনের টাকার সন্দেহে তাহার কোন দুর্ভাবনাই ছিল না । কারণ গত পাঁচ বৎসরে সে সূধীরকে দশ হাজারের অধিক টাকা দিয়াছে । সূধীর বরাবরই টাকার সূদ দিবে বলিয়াছে এবং সে তাহাতে বিশেষ বিরক্তি দেখাইয়াছে । সে সরমার অন্তই সূধীরের কাষে অর্থ ও অবসর উভয়ই অকাতরে ব্যয় করিয়াছে । এবার সূধীর বাবসারে লাভ করিয়াছে—পাঁচ ছয় দিন পূর্বে সে একটা দমকা টাকা পাইয়াছে । এখন যে অনায়াসেই মনোরঞ্জনকে টাকা কিরাইয়া দিতে পারিবে—বিশেষ পাঁচ হাজার টাকা হইলেই তাহার চলিবে । তাই সে নিশ্চিন্ত ছিল । এ বিষয়ে যে তাহার ঠিকে ভুল হইতে পারে সে একরূপ সম্ভাবনাকে মনে স্থান দিতে পারে নাই । সে সানন্দে এই চাকরীর সংবাদ সরমাকে জানাইল ।

কিন্তু সত্য সত্যই তাহার ঠিকে ভুল হইয়াছিল । সে সূধীরের নিকট টাকা পাইবার সন্দেহে এমনই নিশ্চিন্ত ছিল যে, পরদিন একেবারে তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া আকিষে বাইবার ব্যবস্থা করিয়া বাহির হইল ।

সূধীর তাহার চাকরী-প্রাপ্তির সংবাদে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিল । কিন্তু মনোরঞ্জন যখন জামীনের কথা বলিল, তখন তাহার সে আনন্দ বেগুৎস্রোতে জ্যোৎস্নার মত বিলুপ্ত হইল । সে বলিল,—“তাই ত ; এখন কি করা যায় ?”

মনোরঞ্জন বিস্মিত হইয়া বলিল, “কেন, তুমি ত সে দিন অনেক টাকা পাইয়াছ।”

সূধীর বলিল, “আপনার টাকা দিতে বিলম্বে আমি বড়ই লজ্জিত । কিন্তু কি করি ? সে টাকাটা আমার হস্তগত হয় নাই । আমি আমার নিকট টাকা. লইয়াছিলাম ।” তিনি বিশেষ আবক্তকে ঐ টাকাটা কাটিয়া লইয়াছেন ।”

বিস্ময়ে মনোরঞ্জন নির্বাক হইয়া রহিল । টাকাটা যে সূধীরের হস্তগত হইয়াছে, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহের কোনই কারণ ছিল না । তবে সূধীর এ মিথ্যা কথা বলিল কেন ? তাহার বেদনা-চকল হৃদয়ে মাতৃষের প্রতি অশ্রুতা ও ধূলা উখলিরা উঠিল ।

মনোরঞ্জন গৃহে ফিরিলে সরমা জিজ্ঞাসা করিল, “চাকরী কি হইল?”

মনোরঞ্জন কেবল বলিল, “হইল না।”

তাহার মুখভাব দেখিয়া সরমা তাবিল, চাকরী না হওয়াতে সে অভ্যস্ত হুঃখিত হইয়াছে। সে বলিল, “তাহার অস্ত্র হুঃখ কেন? এটা হয় নাই—আর একটা হইবে। আর এমনও ত নহে যে দুই দিন চাকরী না হইলেই তোমার চলিবে না।”

“কেমন করিয়া চলিবে?”

“তুমিই বলিয়াছ, এ কর বৎসরে কিছু সঞ্চয় হইয়াছে।”

মনোরঞ্জনের প্রবল বাসনা হইল সে বলে, “সে সঞ্চয়ের সর্বনাশ হইয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যের প্রতি তাহার বিশ্বাস গিয়াছে।” কিন্তু সে আশ্ব-সংযম করিল। সম্ভান-হীনা, সংসারে বন্ধন-হীনা পত্নীর ভ্রাতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস বিনষ্ট করিয়া তাহাকে বেদনা দিতে তাহার মন সরিল না। সে আর কোন কথা বলিল না।

আজ কেবল বার্ষিকসংক্রান্ত-সঙ্কট—নীচতা-নিম্নতা—সমাজ ত্যাগ করিয়া দূরে ঘাইবার অস্ত্র তাহার হৃদয়ে ব্যাকুল ব্যগ্রতা বিকশিত হইতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই। যখন সম্ভান-শোকাভূরা সরমা সে প্রস্তাব করিয়াছিল, তখন যে অর্থাভাবে সে সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই, আজও সেই অর্থাভাবে সে এ বাসনা চরিতার্থ করিতে পারিবে না। ক্ষতবিক্ষত হৃদয় লইয়া আবার তাহাকে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া কায় করিতে হইবে। সে ভাবনাও কি কষ্টের!

— • —

২

সমস্ত দিন মনোরঞ্জন হুঃশিস্তার কণ্টকশরমে অভিযোজিত করিল। সন্ধ্যার পর ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একটি অপরিচিত শুভ্রলোক তাহার সাক্ষাৎপ্রার্থী। একান্ত অনিচ্ছায় সে বৈঠকখানায় গেল। সুহৃৎ দীপালোকে সে প্রথম দর্শনে আগন্তুককে চিনিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, “আমাকে খুজিতেছেন?”

আগন্তুক হাসিয়া উঠিল, বলিল, “হঁ। আমাকে চিনিতে পারিতেছে না। যে দাড়ী রাখিয়াছি—চিনা হুঃসাধ্য বটে। আমি ভবানীচরণ।”

এ ত সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর! মনোরঞ্জন বলিল, “তুমি কোথা হইতে?”

“ব্যবসারে সর্বস্বান্ত হইয়া আর দেশে সুখ দেখাইব না স্থির করিয়া আমি বিদেশে গিয়াছিলাম। যদি তোমাদের ঋণ শোধ করিতে পারি, তবেই ফিরিব

নছিলে নহে—এই সকল করিয়া গিয়াছিলাম । স্বদেশে অদৃষ্টের সঙ্গে খেলার আমি কেবলই হারিয়াছি—বিদেশে সে খেলার আমার জয় হইয়াছে । তাই আমি আবার আসিয়াছি ।”

ভবানীচরণ এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বন্ধুকে দিল, বলিল, “চৌদ্দ বৎসর পরে আজ আমি শান্তি পাইলাম ।”

মনোরঞ্জন বলিল, “তুমি কোথায় আছ ?”

“আমি আজই আসিয়াছি । যদি স্বদেশে আসিলাম, একবার জন্ম-ভূমি দেখিতে যাইব । আগামী কল্য তথায় যাইব ।—তাহার পর আবার ফিরিয়া যাইব ।”

“কেন ?”

“আমার কর্ম-প্রোত আমাকে ভালাইয়া সেই কূলেই আশ্রয় দিয়াছে । আর আমার আর স্বদেশ বিদেশ কি ? যত দিন না ছিলেন, তত দিন এক এক বার দেশে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা হইত ।” অশ্রুর উচ্ছ্বাসে বলিষ্ঠ ভবানীচরণের কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল । একটু সামলাইয়া সে বলিল, “এত দুঃখ না আমার দুর্ভাগ্যে কাঁদিয়া গেলেম—ভাগ্য-পরিবর্তন দেখিয়া যাইতে পারিলেন না ।”

অকৃতদার বন্ধুর জীবনের নিষ্ফলতা আজ মনোরঞ্জনের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল ; তাহার রুদ্র বন্ধুর বেদনার বাধিত হইল । সে বলিল, “কেন আবার বিদেশে যাইবে ?”

ভবানীচরণ বলিল, “আমি তথায় যে কাণ্ড করিয়াছি—তাহা সম্পূর্ণ হইলে আমার দেশবাসীদিগের অর্থোপার্জনের একটা নূতন পথ হইবে । সেই পথের প্রদর্শক বলিয়া হয় ত আমার কথা লোক মনে করিবে । তাহাতে আমার নিষ্ফল জীবন সার্থকতা লাভ করিতে পারে । আমার পুত্র নাই যে আমার বংশে আমার নাম কেহ স্মরণ করিবে ; আমার কীর্তি নাই যে, আমার কথা লোক মনে রাখিবে । আমি যেন সংসার-সমুদ্রে শৈবালমাত্র—ঘটনার তরঙ্গ-তাড়নে ইতস্ততঃ চালিত হইতেছি । আজ কত দিন পরে মাতৃ-ভাষার আলাপ করিয়া যে সুখলাভ করিলাম—সে সুখলাভ আর জীবনে ঘটিবে কি না সন্দেহ । জন্মিয়া যে মাতৃ-অঙ্কে স্থান লাভ করিয়াছিলাম, সে মাতৃ-অঙ্কে ভ্রূত্যাগ—সে দেশের ধূলিতে দেহ-তন্ত্র মিলাইবার সৌভাগ্যলাভ আমার হইবে না ।”

মনোরঞ্জন বন্ধুকে প্রবাসে প্রত্যাগমনবিরত করিতে অনেক চেষ্টা করিল ; পারিল না ।

সে স্বাক্ষিতে মনোরঞ্জন ঘুসাইতে পারিল না। সমস্ত দিনের ঘটনা তাহার নিকট স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। প্রভাতে সে মানব-চরিত্রের এক রূপ দেখিয়া পণায় সঙ্কুচিত ও লজ্জার স্রিয়মাণ হইয়াছিল। স্বাক্ষিতে সে মানব-চরিত্রের আর এক রূপ দেখিয়া প্রশংসার উৎকল ও ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছে। মানব-চরিত্রের জটিল রহস্য কে ভেদ করিতে পারে ?

১০

পর দিন মনোরঞ্জন জামীরের টাকা লইয়া কপ্পপ্রার্থী হইল; তনিল, পূর্ণ-দিনই লোক বহাল হইয়াছে। অতঃপর সে জানিল, সুখীরই জামীরের টাকা জমা দিয়া বাতুলপুত্রের বেনামীতে কাব লইয়াছে।

তনিল মনোরঞ্জন আশ্রিত হইল। তাহার নিকট মানব-চরিত্র আরও জটিল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে মানব-জীবনে বিকার প্রদান করিল; তাবিতে তাবিতে গৃহে ফিরিল। তখন সে সঙ্কল স্থির করিয়াছে।

১১

গৃহে ফিরিয়া মনোরঞ্জন পরমাকে বলিল, “তুমি তীর্থে বাইরা বাস করিতে চাহিয়াছিলে। বাইবে ?”

সরমা এই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত প্রশ্নাবে একান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ?”

মনোরঞ্জন দৃঢ়স্বরে বলিল, “আমি বাইতেছি।”

শোকের প্রথম প্রবল আঘাত সরমার হৃদয়ে যে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিয়া বিচার ও বিবেচনার অবকাশ রাখে নাই, কালের সাধনার তাহার কঠোরতার ও উগ্রস্বভাব হইয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে সংসার তাহার মায়াবন্ধনে সে হৃদয় আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল। সে বলিল, “তুমি কি এ সব ছাড়িয়া বাইরা থাকিতে পারিবে ?”

মনোরঞ্জন বলিল, “পারিব।”

“যে তুমি যতই বল—তুমি পারিবে না। তোমার সে ভাল লাগিবে না; শরীরও নষ্ট হইবে।”

“তুমি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। আমি বাইব। যদি তুমি না যাও, তবে তোমার ব্যবস্থা করিয়া বাইতে হইবে।”

তাহার পর সরমা যে সকল স্মরণ আশ্রিত করিল, মনোরঞ্জনের দৃঢ়সঙ্কল্প তাহাতে বিচলিত হইল না।

যে শুনিল সে-ই মনোরঞ্জনকে নিরন্তর করিতে প্রয়াস পাইল । কিন্তু কাহারও চেষ্টা ফলবতী হইল না ।

বাজার দিন হির হইল । “মনোরঞ্জন সকলের নিকট বিদ্যার লইয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া চলিল ।

১২

স্বর্গীয় মনোরঞ্জন ও সরমাকে ট্রেণে তুলিয়া নিতে গেল । একটা সংসার তুলিয়া যাওয়া, দ্রব্যাদি যথেষ্ট । গাড়ীতে দ্রব্যাদি শুছাইয়া মনোরঞ্জন নামিয়া প্র্যাট্‌কর্ষে দাড়াইল । স্বর্গীয় ভগিনীর নিকট বিদ্যার লইয়া আসিয়া তাহার নিকটে দাড়াইল—বলিল, “আপনাকে এত বলিলাম—শুনিলেন না, আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিগেন ! আপনি আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে আপনি থাকিতে আমার বুক বণ ছিল ।”—মনোরঞ্জন বলিল,—“স্বপ্নের বিষয়, তোমার এখন আর কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই ।”

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, মনোরঞ্জন যাইয়া গাড়ীতে উঠিল, স্বর্গীয় বলিল, “আমি বত সত্বর পারি টাকাটা পাঠাইয়া দিব ।”

সরমা পরিচিত সব ছাড়িয়া বাইতে বড় বেদনা অনুভব করিতেছিল । কিছুক্ষণ পরে একটু হির হইয়া সে বলিল, “স্বর্গীয় গাড়ী ছাড়িবার সময় কি বলিতেছিল ?”

মনোরঞ্জনের বুক কাঁপিয়া উঠিল । পাছে কোন দিন কোন রূপে সরমা স্বর্গীর ব্যবহারের বিষয় জানিতে পারে—পাছে তাহার নিষ্ফল জীবনের বেদনা-ভার বর্ধিত হয়—এই ভয়ে সে দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছিল । তবে কি তাহার সে চেষ্টা সাকল্যের কুলে ব্যর্থ হইয়াছে ? সে বলিল “ও একটা অল্প কথা—”

সরমা আর কিছু বলিল না । সে বাতায়ন-পথে নৈশ অন্ধকারাবৃত প্রকৃতির বিস্তর রূপ দেখিতে লাগিল ।

তখন মনোরঞ্জন নিশ্চিন্ত হইল । পরীকে—তাহারই উপর নির্ভর-নিরতা, সজ্ঞান-হীনা পরীকে বেদনার বিষম আঘাত হইতে রক্ষা করিয়া দে পরম আনন্দ ও আশ্ব-প্রসাদ লাভ করিল—তাহার প্রবাস-বাজা তাহার নিকট সত্য সত্যই তীর্থ-বাজা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(১১)

১লা আশ্বিন, ১৩১৮।

আজ পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম “আপনার মুখ” হইতে আজ স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সষকে কিছু তুলিতে চাহি। কিন্তু তৎপূর্বে আমার গোটা দুই কথা নিবেদন করিবার আছে, অগ্রগ্ৰহ করিয়া শ্রবণ করুন।—

“প্রথম কথা,—‘নিক’ শব্দের কনিক হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধ-জনক হইয়া পাড়াইয়াছে।* শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী মহাশয় ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ হইতে এই পদটি আমাকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

“দেশাচ্ছেদাং সমোক্তানাং সর্কাসাম্যাত্যহুহিতুণাং।

দশাদমাং সহস্রাত্তাত্তয়ো নিককথাঃ ॥”

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)।

আমাদের কণেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী মহাশয় মহাত্মারত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

“নতং দাসীসহস্রানি কোত্তেরস্ত মহাশ্বনঃ।

কথুকেয়ুরধারিণ্যো নিককথাঃ স্বলঙ্কতাঃ ॥”

(মহাত্মারত। বনশর্ক, ২৩২।৪০)

“দ্বিতীয় কথা, যুধিষ্ঠিরাল সষকে আলোচনাটা বেরূপ পাড়াইল তাহা আপনাকে শুনাইতে চাহি। শশীবাবু গত ভাদ্রমাসের ‘আর্য্যাবর্তে’ বে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রথমে আমরা সেই মত সষকে আলোচনা করি। সে দিন রামেন্দ্র বাবুর মত আপনাকে শুনাইয়াছি; আপনার বক্তব্যটুকুও রামেন্দ্রবাবুকে শুনাইয়াছি; তাহার শেষ বক্তব্যও লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি। এখন কি পাড়াইল শুনুন।

“রামেন্দ্রবাবু বলেন, যুধিষ্ঠিরাল সষকে তিনরকম tradition আছে। (১) বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের—পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দাভিষেকের মধ্যে এক হাজার বৎসরের কিছু অধিক ব্যবধান, এই হিসাবের ফলে কুরুক্ষেত্রের বৃদ্ধ আর খুঃ :পুঃ দেড় হাজার বৎসর পাড়ায় (round numbers দেওয়া গেল, দু’শ’ এক’শ’

বৎসর ধর্ম্ম বা নহে ।) (২) খ্রীষ্টকের তিরোধানের সঙ্গে জেলির আবির্ভাব ; এটটাই শব্দ বা লইয়াছেন । এই হিসাবে বুদ্ধির সময় খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসরের কিছু বেশী দাঁড়ায় (কলি ৫০০০ বৎসরের কিছু উপর, এখন খৃষ্টাব্দ ১৯১১, বাদ আশ্বাষ ৩১০০ ।) (৩) কলির আরম্ভের আশ্বাষ পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে । বোধ হয় এইট বরাহমিহিরের Theory, বৃহৎসংহিতায় দেখিয়াছি । তাহা হইলে খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর দাঁড়ায় ।

“বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে কৃত্তিকাকে নক্ষত্রচক্রের আদিনক্ষত্র বলিয়া গণনা করা হইত । তাহার একমাত্র অর্থ এই যে, সেই সময়ে কিংবা তাহার কিছু দিন পূর্বে সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে Vernal Equinox মহাবিবুৎ সংক্রান্তি হইত এবং সেই সময়ে বৎসরারম্ভ হইত । আজকাল পঞ্জিকার অধিনী নক্ষত্র নক্ষত্রচক্রের আদিনক্ষত্র বলিয়া গৃহীত হয় এবং সূর্য্য অধিনী নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে বৎসরারম্ভ হয় । পঞ্জিকার ১লা বৈশাখের পূর্ব্বদিন মহাবিবুৎ সংক্রান্তি লিখে, কিন্তু আজকাল বিবুৎসংক্রমণ তাহার ২১ দিন পূর্বে, ৯ই চৈত্র হয় । ঐ বিবুৎসংক্রমণের দিনই দিব্যরাজি সমান হইয়া থাকে । পঞ্জিকাগণনার বর্ত্তমান পদ্ধতি প্রায় পনের শত বৎসর পূর্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সময়ে চৈত্র মাসের শেষ তারিখে বিবুৎসংক্রমণ হইত এবং ১লা বৈশাখ বৎসরারম্ভের এবং অধিনীকে নক্ষত্রচক্রের আদিনক্ষত্র গ্রহণের সার্বকতা ছিল । প্রায় বাট বৎসরে বিবুৎসংক্রমণ একদিন করিয়া পিছাইয়া আইসে । এইরূপে দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ২১ দিন পিছাইয়া আসিয়াছে । পঞ্জিকার যদি আর সংশোধন করা না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে নীতকালে দিনরাজি সমান হইবে ।

“এখন বেদের ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কৈনিককালে সূর্য্য কৃত্তিকানক্ষত্রে উপস্থিত হইলে বিবুৎসংক্রমণ এবং বৎসরারম্ভ হইত । এখন গণনা করিলে দেখা যাইবে যে, খৃঃ পূঃ আড়াই হাজার বৎসর বা তাহার কিছু পূর্বে কৃত্তিকার বিবুৎসংক্রমণ ঘটিত । কাণেই ঐ সময়কে আমরা বেদের ব্রাহ্মণবৃণ্ডের সময় বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিতে পারি । বেদের ব্রহ্মবৃণ্ড তখন প্রায় শেষ হইয়াছে । এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ।

“সুবিধিতের প্রপিতামহ শাস্ত্রহর ব্রাহ্ম দেবাণি রাজ্যগ্রহণ না করিয়া বনে বাগ্ভার শাস্ত্রহর রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন । ঋগ্বেদ সংহিতায় দশম মণ্ডলে একটি হুক্তের স্তোত্র দেবাণি । ঐ হুক্তে দেবাণির নাম আছে । শাস্ত্রহর রাজত্বকালে অনাযুক্তি ঘটায় দেবাণি আসিয়া অনাযুক্তি নিবারণের জন্ত যত্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ

প্রসিদ্ধি আছে। এই ক্ষুদ্র সূর্য উপলক্ষে দেবগণিকর্ষক দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা হইতে অহুমান করা যাইতে পারে যে, বুদ্ধিতির বেদের মন্ত্রবৃগের শেষকালে বর্তমান ছিলেন।

“অন্তরিক্ষ হইতেও এই অহুমান সমর্থিত হয়। বশিষ্ঠ, তাহার পুত্র শক্তি এবং পৌত্র পরাশর স্বয়ংদলসংহিতায় বহু মন্ত্রের সৃষ্টি। পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ-বৈশ্যায়ন মন্ত্রগ্রন্থে কবি বলিয়া সেরূপ প্রসিদ্ধ নহেন, কিন্তু তিনি বেদের সম্বলন ও বিভাগ দ্বারা বেদব্যাস আখ্যা পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণবৈশ্যায়নকে বুদ্ধিতির সমকালবর্তী এবং মহাভারতের রচনাকর্তা বলিয়া গ্রহণ করিলে বুদ্ধিতিরকে মন্ত্রবৃগের শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহা হইলে উল্লিখিত গণনাগুলারে ষ্: পু: ২৫০০ বা তাহার কিছু পূর্বকালকে বুদ্ধিতির আবির্ভাবকাল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

“বৈদিকবৃগের কৃত্তিকা নক্ষত্র ঠিক পূর্বদিকে উদ্ভিত হইত এক্ষণ প্রমাণ বেদের মধ্যেই আছে। বিবৃৎসংক্রমণের কাল ক্রমশঃ সরিষা বাগরার কৃত্তিকা এখন ঠিক পূর্বে উদ্ভিত না হইয়া একটু উত্তর-পূর্বে উদ্ভিত হয়। এই উন্নয়ন কতটুকু সরিষা গিয়াছে তাহা দেখিয়াও বেদের কালনিরূপণের কতকটা সাহায্য হয়। এতদ্বারা পূর্বোক্ত অহুমানই অনেকটা সমর্থিত হয়।

“তাহার পর ‘মহান্ন মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং বুদ্ধিতির নৃপতো’ এই উক্তি সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু বলেন ‘কৃষ্ণকমল বাবু বাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। মধ্য ও সমগ্র Fixed Stars তাহাদের relative positions বদলায় না। এই অল্প মহান্ন মুনয়ঃ কথাটার কোনও অর্থই হয় না। তবে আমি একটা মানে করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমাদের একটি ভ্রান্তি-বচন ভুল বলিয়া মনে হয়। আমার ব্যাখ্যা এইঃ—The Pole of the Equator is travelling around the fixed Pole of the Ecliptic in consequence of the precession of the Equinoxes. One complete revolution of the pole of the Equator is effected in about 25000 years. The pole of the Ecliptic is a fixed point but the pole of the Equator is shifting. The stars (নক্ষত্র) which are arranged approximately on the plane of the Ecliptic are fixed in position. The Saptarshis (সপ্তর্ষি) are also fixed in position. Now, if a line be drawn from the pole of the Equator through some definite point in the Saptarshis, this line on being produced will cut the ecliptic at a point within

some নক্ষত্র । The Saptarshis may then be said to be lying in that নক্ষত্র । As the Pole of the Equator moves, this line will be moving also, and the point where the line cuts the ecliptic will be moving in the opposite direction ; or, the Saptarshis will move successively through all the stars (নক্ষত্র) once in about 25000 years. As the number of stars is 27, the Saptarshis' duration in every নক্ষত্র is about one thousand years and not one hundred as a Jyotishic text implies."

পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম "এখন আপনি অহুগ্রহ করিয়া কবি বিহারীলালের কথা বলুন ।"

তিনি বলিলেন—

"বিহারীলাল আমার খুব বালাকালের বন্ধু ছিলেন । আমি অপেক্ষা বয়সে তিনি ৩৪ বৎসরের বড় হইতেন, কিন্তু সে কারণে আমাদের উভয়ের গলায় গলায় ভাব হইবার পক্ষে ব্যাঘাত হয় নাই । তিনি দীর্ঘাকৃতি, সবলকার, তেজীয়া ও অকুতোভয় ব্যক্তি ছিলেন । আমি চিরকালই স্বীর্ণজীবী, তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা, এমন কি ভক্তি বলিলেও হয়, ছিল । সাংসারিক অভিজ্ঞতা, লোকজ্ঞতা, আমি অপেক্ষা তাঁহার অনেক অধিক ছিল ; কিন্তু আমার এই সকল হীনতাসমূহেও আমি লিপাণড়ার কিছু অগ্রসর থাকিতে উভয়ের শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা দেখে কান্নিল হইয়া পরস্পর অনেকটা গোবাইয়া গিয়াছিল এবং উভয়ে প্রসাদ বহুত্ব ও মেহাগ্রস্ততা ঘটিয়াছিল ।

"বিহারী বালাকালে একটু দাঙ্গাবাজ গোছ ছিলেন । আহিরীটোষাত্ত নিকটো তাঁহার বাড়ী এবং আহিরীটোলার ছোকরারা দাঙ্গাবাজির জন্ত কতকটা প্রসিদ্ধ ছিল । তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, কোনও এক বালক বালাকালোচিত বিবাকলহপ্রসঙ্গে লাঠির মধ্যে গোপন করা থাকে যে ভণ্ডি ওন্দারা তাঁহার মস্তকে একরূপ আঘাত করিয়াছিল যে, রক্তে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গিয়াছিল । সন্নিহিতে একজন পাহারাওয়াল ছিল, সে রক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু কি হইয়াছে ? কে আপনাকে মারিয়াছে ?' বিহারী পুলিশে জানান কাপুরুষের কার্য্য বিবেচনা করিয়া কহিল, 'কেহ আপাকে মারে নাই, চোকাটে মাথার চোট লাগিয়াছে ।' আঘাতকর্ত্তা বালক তখনও পলায় নাই, মিকটে দাড়াইয়া ছিল, এবং বিহারীর কথা শুনিতে পাইল । বিহারী পুলিশে জানাইতেছে না দেখিয়া

তাহার হৃদয়ে একটা উকট ভর করিল; সে ভাবিল—বিহারী নিজেই তাহাকে খুন করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পুলিশের কাছে গোপন করিয়াছে। এই ভয়ে সে এতদূর অভিকূত হইল যে, সে দিনই হউক বা তাহার পরদিনই হউক, নিজে আসিয়া বিহারীর পারে ধরিয়া দাঙ্গা মিটাইয়া কেলিল।

“বিহারীর লিখাপড়ায় সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, দিনকতক সে সংস্কৃত কলেজে, ভক্তি হইয়া মুদ্রবোধ পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু ইঙ্গুল কলেজে বাধাবাদি নিয়মের বশবর্তী হইয়া থাকা তাহার স্বভাবের সহিত মিলিল না। তাহার individuality (ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য) এতই তীব্র ছিল। অল্পকালমধ্যেই সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া সে বাড়ীতে পণ্ডিতের নিকট মুদ্রবোধ কিছুদিন পড়িয়াছিল; সাজ করা হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। তাহার বাড়ীর শিক্ষক ও বড় ‘কেও কেটা’ ছিলেন না। তিনি আমাদের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ভাইস-চেয়ারম্যান নীলাধর বাবুর পিতা। তিনি ঐ পাড়ার অনেক বালককে মুদ্রবোধ পড়াইয়াছিলেন। মুদ্রবোধ সাজ হউক আর না-ই হউক, বিহারীর সংস্কৃত ব্যাকরণে এতটুকু অধিকার জন্মিয়াছিল যে, তিনি সাহিত্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারক হইয়াছিলেন। সাহিত্য-শাস্ত্রের কয়েক খানি গ্রন্থ যথা,—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, আর বোধ হয় ভারবি, সুদারাসঙ্গ, উত্তর-চরিত এবং শকুন্তলা আমি তাহাকে পড়াইয়াছিলাম। তিনি আমার কাছে সকালে বৈকালে পড়িতে আসিতেন। এই সময়ে Monier Williams শকুন্তলার এক অপূর্ণ সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন, নাটকের প্রাকৃত ভাষা লাল অক্ষরে, তাহার ঠিক নীচেই প্রাকৃতের সংস্কৃত অর্থবাদ কাল অক্ষরে, এতোক পৃষ্ঠার হৃদ ৪১৬ ছত্র মূল সংস্কৃত, বাকি অংশ ইংরাজী ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। ইংরাজী ব্যাখ্যায় মধ্যে আমার হাতে স্বাক্ষর ভিন্ন জন টাকাকারের সংস্কৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত ছিল। কিন্তু এই সংস্কৃত ব্যাখ্যাগুলি ইংরাজী অক্ষরে ছাপা ছিল। কালিদাসের শকুন্তলার প্রতি মূত্রণ-কার্য্যে কেহ কখনও এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। বহিখানির দাম হইয়াছিল, উনিশ টাকা। বিহারীদেও যদিও অল্পকট ছিল না, তথাপি ১২ টাকা দামের একখানি শকুন্তলা-কিনেন এরূপ সঙ্গতিপন্নও তাহার ছিলেন না। বিহারীর পিতা বাধ্যক্ৰিয়া করিতেন, অনেকগুলি ধনবান স্রবর্ণবণিক তাহার বজমান ছিল। অত্যন্ত জাতির পুরোহিতদিগের অপেক্ষা স্রবর্ণবণিক জাতির পুরোহিতদিগের আর অনেক অধিক। বিহারী পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাই তাহার আদার অগ্রাহ্য হয় নাই; পিতা ১২ টাকা পুত্রকে ‘শকুন্তলা’ কিনিয়া দিয়াছিলেন। আমিও বড়ই আনন্দের সহিত বিহারীর সঙ্গে সেই শকুন্তলা

একত্রে পড়িয়াছিলাম। বোধ হয় বিহারীর তখন ইংরাজী ব্যাখ্যা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই, কিন্তু পরে হইয়াছিল। ইংরাজীও তিনি কতক দূর আমার কাছেই পড়িয়াছিলেন। আমার মনে আছে, বাগ্নরের Childs Harold এবং সের্গ-পীয়ারের ওয়েলো, ম্যাকবেথ, লীরর প্রভৃতি ছ'পাচ খানি নাটক একত্রে পাঠ করা হইয়াছিল। বিহারীর শীশক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল, বিশেষতঃ কাব্যশাস্ত্র পর্যালোচনাতে এরূপ একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল যে, অতি সামান্ত সাহায্যেই তিনি ভালরূপ ভাবগ্রহ করিতে পারিতেন। ইহার আরও এক কারণ ছিল যে, বাক্যলাসাহিত্যটা তিনি অতি উত্তমরূপে আরও করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ঈশ্বরগুপ্ত, বাগ্নর ইত্যাদি তৎকাল-প্রচলিত অনেক বাক্যলা গ্রন্থ তাঁহার ভালরূপ পড়া ছিল। তিনি অল্প বয়সেই পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই পত্রগুলিতে প্রথমাবধিই আমি একটি নূতন 'ধর্তা' লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাহা আমার খুবই ভাল লাগিত এবং সেই 'ধর্তা' উত্তরকালে তাঁহার সমস্ত লিখাতেই লক্ষিত হয়। আমার ছোট তাঁহার পত্ররচনার বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং উল্লিখিত নূতনবয়সের লোক বিহারীকে উৎসাহ দিতেন। সেই নূতনবয়স আমি কিরূপে বুঝিয়াছি, তাহা ঠাওরাইতে পারিতেছি না। বোধ হয় ইংরাজীতে পোপ ও তাঁহার অহংগামী কবিদিগের পর জ্যাক, কাউপার, বাগ্নর ইহারা যে এক নবীনতা আনিয়াছিলেন, বিহারীর নবীনতা কতকটা সেই প্রকারের ছিল। ভাবব্যঞ্জক কোনও প্রচলিত শব্দই প্রয়োগ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না; এবং সেকেন্দ্রে ভাবসকল লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেন।

“তাঁহার দক্ষপ্রথম রচনা ‘সদীতশতক’ পাঠ করিলে ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই গ্রন্থখানি বাক্যলা পাঠক-সমাজে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই অপ্রতিষ্ঠা গ্রন্থের রচনার দোষে নহে, পাঠক-দিগের সন্দেহভার অসম্ভবে। সদীতশতক গ্রন্থ এক শত বাক্যলা গানে প্রণীত। গানগুলি ‘কাণ্ঠ ছাড়া গীত মাই’ সে ধরণের গান নহে। কোনটিতে তাঁহার মিলের মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, কোনটিতে একটি সুন্দর কৃষ্ণের বর্ণনা বা একটি চমৎকার সজ্জার আকাশের বর্ণনাদি বা একটি ফুলের বাগানের কথা ইত্যাদি। সর্বত্রই রচনা এরূপ স্থূললিখিত ও হৃদয়গ্রাহী যে, পড়িতে পড়িতে পরম আপ্যায়িত হইতে হয়। বিহারীর গলায় হ্রস্ব ছিল না কিন্তু হ্রস্ববোধ ছিল, এবং অনেকগুলি হ্রস্ব তিনি আমাকে শিখাইয়াছিলেন। অনেক গান আমার নিজের মনে গাহিয়া গাহিয়া সুখ হইয়া আছে। একটি গান—

(ছয় বেহাগ)

নথৰ নুতন তৰুৰ কিবা হুশোতন ।
সাবন্ধে নিৰেছ এসে লতাৰধু আলিঙ্গন ।
উত্তৰ উত্তৰ পাশে, বাঁধা বাহ-নাখা-পাশে
হুহুম বিকাশি হাসে ভাসে ভ্রমর-গুপ্তন ।
দিলোয়ে বায়ুৰ ঘৰে, হুহুঘৰে গান কৰে
নাচে আনন্দেৰ ভৱে ক'ৰে বাহু একল্পন ।

আৰু একটি গান—

(পূৰ্বী)

আজি সন্ধ্যা গাভিৰাহে অতি মনোহৰ
কৰিগাহে পাঁচুৱা হুন্দৰ অধৰ ।
হালি হালি চক্ৰানন, আৰ ঘন আবরণ
আৰ একশিত আতা কিবা শোভাকর ।
কাণো বেধ কেশমাৰে, সাধা বেধ সিঁচি সাজে,
তাৰ বাবে অলে মণি তারকহুন্দৰ ।
নীল জলধৰ পত্ৰে, বেদ নীল শিৰিষৰে,
বাঁড়োয়ে ৰয়েছে ৰূপে উজলি অধৰ ।

এৰূপ স্তুতিমান্ গন্ধা-বৰ্ণনা আমাৰ ত অতি অপূৰ্ণ বোধ হয় । আৰু
একটি গান—

(সোহিনী)

কোখায় রয়েছ, এসে, বাও দরশন
কাতৰ হয়েছি আমি কৰি অবেদন ।
কপটতা কুৰ্মতি, বিধমরী বহুশক্তি
হুশিৰে তোমাৰে হুঁকি কৰেছে নিধন ।

আৰু একটি গান—

(তিঁখিট)

এপ এৱলী আমাৰ,
জল-জুখ কত বতনৰ হাৰ ।
বৈছিলো তব বদন, বেদ পাই মিতুবন,
অন্তরে উজলি ওঠে আনন্দ অপাৰ ।

আবার—

(বাহার)

হাত, হৃৎকণ্ঠ তুলনন হয়েছে বাহন ।
 নীরব এখন কোকিলের কুহরব অলির গুঞ্জন ।
 আজ পুর্নিমার তাগে, তুল তুটে নাহি হালে,
 করে না মধুর বাসে অনুদিত বন ।

একশতটি গানের প্রত্যেকটির মধ্যে এক একটি অপূর্ণতা আছে । বিহারী বিশেষ বস্ত্র করিয়া উত্তম অক্ষরে উত্তম কাগজে কিছু অর্থব্যয় করিয়া গানগুলি ছাপাইয়াছিলেন । But the book fell stillborn from the press. পঞ্চাশখানিও বিক্রীত হইয়াছিল কি না সন্দেহ । এইত বাঙালা পাঠকসমাজের সঙ্কটরতা । কিন্তু বিহারী নিরুৎসাহ হইবেন নাই । তাঁহার বিলম্ব বিবাস ছিল যে, তাঁহার রচনাতে পদার্থ আছে । এই বিবাসে ভর করিয়া তিনি কবিতা রচনা ছাড়েন নাই ।

“ইহার পর তিনি ‘বঙ্গভূমিরী’ ‘সুরবালা কাব্য’ ‘সাধের আসন’ ‘সাম্রাট-মঙ্গল’ এই কয়েকখানি অসুখকষ্টে অতি চেষ্টাকর গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন । তাঁহার ঐক্য জ্ঞান ছিল যে, উপস্থিত লোকে যতই অগ্রাহ্য করুক, কোনও না কোনও সময়ে তাঁহার রচনার প্রতি পাচজনের লক্ষ্য পড়িবে এবং তাহা সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে । অধিক দিন হয় নাই, তাঁহার পুত্ররা তাঁহার গ্রন্থাবলি ছাপাইয়াছেন । আজকাল বাজারে সেগুলির কাঁড়ি কিন্তু আশি আশি না, এবং বিহারীর উন্মিষিত ঐক্য জ্ঞান সত্যে পরিণত হইয়াছে কি না তাহাও বলিতে পারি না । তবে তাঁহার রচনার প্রতি আমার সেই প্রথমকার admiration এখনও আজ্ঞান্যমান রহিয়াছে এবং একটি সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের দ্বারাও সেই admiration প্রসূত্রিত হইয়াছে দেখিতেছি । ইনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ‘সাধনা’ নামক মাসিক পত্রিকায় তিনি বিহারীর বিষয়ে এত প্রশংসাপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে, তাহা আমি হেন বেহারীর ভক্তও যথেষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করি । এমন কি রবি ঠাকুর এক প্রকার নিজস্বখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পদ্মরচনা বিষয়ে তিনি বিহারীর ছাত্র, তাঁহার লিখা হইতে অনেক hint পাইয়াছেন ।

‘বঙ্গভূমিরী’ একখানি অতি সুগলিত পদ্যগ্রন্থ । ইহাতে নারীজাতির সুকোমল বিচিত্রতা পরিপাট্যরূপে প্রকটিত হইয়াছে । বিহারী কোমলতার বিষয় বাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বড়ই সমাদরপূর্ণক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ‘বঙ্গভূমিরী’ মধ্যে কোমলতার ভাব অনেক স্থলে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন ।

নারীশক্তিকে বিহারী কোণঠাসা, দেহময়তা, করুণাপরাণতা এই সকল স্তম্ভে পুরুষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ভাবিতেন এবং সেই অতিপ্রাণ উক্ত কাব্যে হুচাক-রূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

‘স্বরবালা’ কাব্যের চমৎকারিতা সমালোচনা দ্বারা বুকাইবার বিষয় নহে। স্বয়ং পাঠ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য বিনি অহতব করিতে না পারেন, কাব্যের ভাবগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই বলিলে অত্যাক্তি হয় না।

‘সাধের আসন’ ও ‘সারদামঙ্গলের’ বিষয়েও ঐক্লম মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। তবে আমার নিজের মত বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, ‘সারদামঙ্গল’ বিহারীর শেবাশেষে সময়ের রচনা। আমার বোধ হয়, তাঁহার জীবনের এই অংশে তাঁহার হৃদয়ে অর্ধাণধরণের একটু অশুটতার ভাব (Vagueness) আসিয়াছিল। কিন্তু এ কথা আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলিতেছি। আমার নিকট বাহা অশুট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাবশ্রাবী ব্যক্তির নিকট তাহা স্বেকপ না বোধ হইতেও পারে। ভাবগ্রাহিতা-বিষয়ে আমার আস্থনাশা নাই। বিজ্ঞানের পরিহারতা আমার চিত্ত কিছু পছন্দ করে, স্তম্ভতাঃ আমি বাহা অশুট বলিব, তাহার মধ্যে হরত মূগভীর তববিশেষ নিহিত আছে। আমি ত কোন কীটাপূর্কট—নিউটনের মত মহীয়ান পুরুষ মিল্টনের *Paradise Lost* পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন *What does it prove?* ইহাতে প্রদাণ হইল কি? কিন্তু তাহা বলিয়া *Paradise Lost* কেহ অনাদর করে না। লোক কেবল এই সাজ স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, নিউটন বিজ্ঞানে বড়লোক হইলেও কাব্যশাস্ত্রে বালকের জার ছিল।

—“বেগুনাকোর ঠাকুর-বাড়ীতে বিহারীর বিশেষ আদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রবৎ মেহ করিতেন; বেগুনাকোরের সহিত তাঁহার দ্বাত্বব্যং ভাব ছিল। সে পরিবারের মহিলাগণও বিহারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ত্রিযুক্ত ঘোষতরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী তাঁহাকে বহুস্ত-রচিত একখানি আসন উপহার-দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে বিহারী ‘সাধের আসন’ লিখেন।

‘বিহারীর স্বভাবচরিত্র অতি নির্মল ছিল। নিতান্ত শৈশবে কিবা প্রথম উঠুতি বয়সে যৎসামান্ত কিকিং চরিত্রখলন হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমি বতদিন দেখিয়াছি, একরূপ সচ্চরিত্র, সদাশয়, নির্মলস্বভাব ব্যক্তি আমি দেখি নাই। তজ্জ্ব আমি যে তাঁহাকে কতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম, তাহা স্বাক্ষর্য্যাতীত। আমার নিজের চেয়ে এ বিষয়ে তাঁহাকে যে কতদূর শ্রেষ্ঠ

বিবেচনা করিতাম তাহা বলিয়া কি জানাইব। তিনি আমাকে যথেষ্ট বেহু করিতেন, ইহা আমি অত্যন্ত স্রাব্য বিষয় ভাবিতাম। একবার মাত্রে তাঁহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য ঘটয়াছিল, কিন্তু অল্পকাল পরেই আমি সুস্থিরাছিলাম যে, সে বিষয়ে আমারই সম্পূর্ণ দোষ। তাহাতে আমার পূর্বতন সম্ভাব পুনরুজ্জীবিত হইল এক আমি দেখিলাম যে, আমার প্রতি বিহারীর যেহেতু কিছুমাত্র হানি হয় নাই।

“তাঁহার রচনাগুলি সর্বত্র সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইলে আমি যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হই বলিতে পারি না।

“দেখিতে বিহারী প্রথমে যে প্রকার বলিয়াছি, যাবজ্জীবন সেই রকমই ছিলেন, দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, খাড়াদেহ ও রুটপুট। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, খুব বালাকালে তিনি কতকটা ছিপছিপে ও কাহিল ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার একবার ঐকিত্তে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে তৎকালপ্রচলিত নিরমাত্মসারে হাঁটপথে যাওয়া হইয়াছিল। প্রত্যাহ ১০।১২ ফ্রোশ হাঁটিয়া এবং চিড়া, মুড়কি, মুড়, দধি, বৎস ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য কুণ্ডার উপর প্রচুর পরিমাণে আহ্বার করিয়া তাঁহার শরীর গঠিত হইয়া গেল। সেই অবধি তিনি বরাবর রুটপুট ছিলেন এবং বিলক্ষণ আহ্বার করিতে পারিতেন। সাহস ও অকুতোভয়তা তাঁহার যে প্রকার ছিল, বাঙ্গালীজাতির সেরূপ খুব কমই আছে।

“একবার তাহাতে আমাতে গন্ধাতীরে ট্রাও পথ দিয়া আসিতেছিলাম। এক জন পোরা আমাদিগের সামনা সামনি হইল। এরূপ স্থলে প্রায় বাঙ্গালীকেই পথ ছাড়িয়া দিতে হয়, পোরা সোজা চলিয়া যায়। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, পোরাটি বিহারীর মূর্তি দেখিয়া এবং তাঁহার সুখপানে একবার তাকুটিল আশ্রয় হইতেই পাশ কাটাইল, এবং আমরা দু'জনে সোজা চলিয়া আসিলাম।

“আর একবার, বিহারীর মুখে শুনিয়াছি যে, বড়বাঙ্গারের বাশতলার গলিত ভিতর দিয়া মহাসমারোহে বর বাইতেছিল। অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। রাস্তার দুই ধারে বিস্তার লোক বর দেখিবার জন্য গোলমাল ও হটোপাটি করিতেছিল। এরূপস্থলে বাহা হইয়া থাকে হইতেছিল, পুলিশের লোক দু'ধারি দাড়া চালাইতেছিল, তাহার মধ্যে একজন গোরা কনেটবল ছিল, সে আবার একটু অধিক মাত্রায় ঐ কাৰ্য করিতেছিল। বিহারী সেই সময়ে পথের ধারে এক রোবাকের উপর দাড়াইয়া ছিলেন। পোরা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার দিকে দাঙা উত্তেজিত করিল। পোরা রাস্তায়, বিহারী একটু উচুতে, কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, গোয়ার

মার খাইতে হয় । তখন তিনি আর কিছু না করিয়া অমানবদনে গোয়ার বৃকের উপর এমনই সম্বোরে এক লাথি হাঁকরাইলেন যে, তাহাকে চিংপাত হইতে হইল । সেই সময়ে তিড় ভয়ানক বাড়িয়া গেল । গোরাটি উঠিয়া অত ভিডের মধ্যে বিহারীকে ঠাहर করিতে পারিল না । বিহারীও পুলিশের হাতে পড়িবার ভয়ে পশ্চাৎপদে সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন ।

ত্রিপিপিনবিহারী শুভ ।

শোক ।

১

কুটুপে শিশির-বিশ্মু না পারে তিষ্ঠিতে—
করি' পড়ে অঁখির নিষেবে ;
বিকচ কুণ্ঠে কিস্ত হইলে পতিত,
বৃকে বসি' নাশে তা'রে শেবে !

২

ভঙ্গন ছন্দে শোক রহিবারে নাহে,—
মুহুর্তেই পূরে চলি' যায় ;
প্রবীণের হৃদে কিস্ত রহি' দীর্ঘকাল,
দীর্ঘ,—পেবে শুক করে তার ।

ত্রিবিহুতিভূষণ মহাশয় ।

ঐতিহাসিক যৎকির্ষৎ ।

“বাজী” পোড়ান দীপাণীর একটা অবচ্ছিন্ন অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য্য সৌধকিরীটিনী মহানগরী কলিকাতার কেহ ‘বাজী’ হইতে অগ্নি-বিস্তারের আশঙ্কা করেন না। কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্বে কলিকাতার অবস্থা অল্পকাল ছিল। ১৭৬২ খ্রষ্টাব্দে ১২শে জুলাই তারিখে ইংরাজগণ স্থির করেন—“বাজী” পোড়ান হইতে সহরে বহুবার অগ্নিদাহ হইয়াছে এবং “বাজী” পোড়াইলে সহরের বাক্যদ্বয়ের বিপদ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং সহরে “বাজী” পোড়ান বন্ধ হইল এবং বাজীর কারখানা তুলিয়া দেওয়া হইল।

দেড়শত বৎসর পূর্বে কলিকাতার যথেষ্ট অঙ্গল ছিল। তখন চৌরঙ্গীর দক্ষিণাংশে ব্যাঘ্রের ভয় ও বর্জমান গড়ের মাঠে বস্ত্র শূকরের উপদ্রব ছিল। তখন (১৭৬২ খ্রষ্টাব্দে ১২ই জুলাই) কলিকাতার কর্তারা স্থির করেন, সহরে কলাগাছ ও গুল্মাদি কাটিয়া ফেলিলে সহরের বাহ্যোন্নতির সম্ভাবনা। এই লক্ষ্যে তাঁহারা মার্চিটো খাতের মধ্যবর্তী সহরে লক্ষল কাটিবার আদেশ প্রদান করেন। ইহার পরবর্তী কালে গুপ্ত কবি কলিকাতার অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

“রেতে মশা, দিনে মাছি,
এই নিরে কলকাতার আছি।”

তখন আর এখন !

—০—

দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার বাহ্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। তখনও দেশে ম্যালেরিয়ার বিজয়ভেরী নিনাদিত হয় নাই, জলকটের সহচর কলেরা আমাদের অতিথি হইতে ঘরের লোকে দাঁড়ায় নাই। উপন বে সকল স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছিল, এখন অনেক স্থলে সেগুলি যমের দক্ষিণ দ্বার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কান্দিমবাজারের উল্লেখ করা বাইতে পারে। ১৭৬০ খ্রষ্টাব্দে মিটোর ম্যাগুয়ার ভদ্রস্বাস্থ্য হইয়া বাহ্যলাভের আশায় কান্দিমবাজারে বাইবার অহুমতি প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। শত বৎসর পরে (১৮৬৯ খ্রষ্টাব্দে) এই কথার মিটোর লং বণেন, বাঙ্গালার নানা স্থানেরই যত কান্দিমবাজার আর স্বাস্থ্যকর নহে, তথায় পুরাতন কুমিগুলি লক্ষ্যাকীর্ণ। এখন বর্ষার বায়ুপাত আরম্ভ হইলেই কান্দিমবাজারের মহারাজকে সৈন্যবাদের পলায়ন করিতে হয়। বর্জমান ও কিছুকাল পূর্বে স্বাস্থ্যদেবীর অধঃপতন ছিল।

—০—

দেড়শত বংসর পূর্বে সৌদামিনীকে স্থির করিয়া চেরণে পুরার কল্পনাও হাতোশীপক ছিল। তখন তৈলের আলোক ও বাতিই রজনীর অন্ধকার বখা-সজ্জব দূর করিত। তখন কলিকাতার ইংরাজের গোঁরাবারিকে দৈনিক ২৪ সের তৈল ও ২৮টা বাতি পুড়িত। কিন্তু এ খরচ কর্তাসের কাছে বড় অতিরিক্ত বোধ হওয়ায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহারা স্থির করেন, প্রচলিত অপব্যয় নিবারিত করিয়া প্রতি রাত্রিতে প্রহরীর ঘরে ২টি, রোঁদের কল ২টি ও টাউন মেয়রের আফিসে ১টি একুনে ৫টি বাতি দেওয়া হইবে। পূর্বে টাউন মেয়র প্রত্যহ ৬টি বাতি পাইতেন। বাতির বরাদ্দ কমাতে তিনি কি করিয়া-ছিলেন ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই।

—•—

এখন বৈজ্ঞানিক বলেন, বিদ্যুতের ও বাষ্পের শক্তি সুপ্রযুক্ত করিয়া দ্রব-নাশই বিজ্ঞানের এক অক্ষয় কীর্তি। এ কথা বখার্থ। সে কালের “অথমোদ্রথ” একালের বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক যানকে আসর দিয়া সরিয়াছে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ‘সাইরেন’ নামের প্রার চারি মাসে ভারত হইতে ইংলণ্ডে পৌছিয়াছিল। তখন তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইত। আর এখন একুশদিনও বড় লম্বাপাড়ি মনে হয়।

—•—

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। এদেশে বধ্যাক্ষে রবিকরতাপে বেহ অবসর হইয়া আইসে। সেইজন্য পূর্বে এদেশে প্রভাতে ও অপরাহ্নে কাছারী প্রভৃতি হইত। এখনও সরকারী ও সওদাগরী আফিস ব্যতীত অনেক স্থলে এই ব্যবস্থাই বিদ্যমান। প্রথম আমলে ইংরাজও এই দেশাচার অবহেলা করেন নাই। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা নভেম্বর তারিখে হুকুম জারী হয় যে, কর্মচারীদিগকে প্রভাত ৮টা হইতে ১২টা পর্যন্ত কাৰ করিতে হইবে। কেবল যে দিন কাউন্সিল বসিবে সে দিন তাঁহাদিগকে কাউন্সিল না ভাঙ্গা পর্যন্ত থাকিতে হইবে ও উপরওয়ালারা বলিলে অপরাহ্নেও আসিতে হইবে।

—•—

১৭৬২ খৃষ্টাব্দের একটা আদেশেও পূর্বোক্ত ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। ঐ বংসর মিটার উইলিয়ম পার্কস একটি বাগানবাড়ী কিনিয়া উহা তদ্রলোকদিগের বিনোদবাটিকা করিবার জন্য বোর্ডের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বোর্ড এই অনুমতি দিবার সময় বলেন, প্রভাতে ঐ বিনোদবাটিকা বন্ধ রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে হয়ত অনেকে কাৰ করিতে আসিবে না।

ঐঅকপেশপ্রসাদ ঘোষ।

পাষাণের কথা ।

(২)

বলীর্ঘর্ষবাহিত রথে বৃদ্ধ সম্রাট্ জুপসরিধান হইতে পাটলীপুত্রে নীত হইতেছেন । ব্রহ্মাবার অস্তহিত হইরাছে, করেতজন অঝারোহী বীরে বীরে লকটের পশ্চাতে চলিতেছে । মহিষী জীর্ণবস্ত্রের ভ্রাতৃ বৃদ্ধ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পাটলীপুত্রে রাজদণ্ড অধিকার করিতে সিরাজেন । কণিক-নিম্নিত পাষাণ-জ্বালিত পথে বর্ষের শেষে বন সুধরিত করিয়া বীর মন্থর পতিতে সম্রাটের রথ চলিয়াছে । তখন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল পাটলীপুত্রে মহোৎসবের আয়োজন হইরাছে ; আর কাজকুলে, প্রতিষ্ঠানে ও সুদূর মহাসমুদ্রের তীরবর্তী আনন্ডে অসংখ্য নরনারীর মর্ম্মভেদী আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতেছে । শতবর্ষ পরেও সে কথা শ্রবণ করিয়া মাতৃকোড়ে জীড়াষত শিশু নিশ্চল হইত । হৃণপ্রাবন ত্রিবেণী হইতে সুদূর প্রান্তীচ্যে রোমক নগরীর ভোরণ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইরাছিল । তোরমাণ বধন কাজকুল ধ্বংস করিতেছেন, তখন হৃণবিপ্লবে নবীন প্রান্তীচ্য জ্ঞানালোক পৃথিবী হইতে মুগ্ধ হইবার উপক্রম হইরাছে । পঞ্চপাল আসিলে বেক্রপ ভ্রামল ভূপক্ষেত্রে দুর্ভাবল পর্য্যন্ত দেখা যায় না, সেইরূপ যে পথে হৃণগণ চলিয়া যাইত, সে পথে জীবের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইত । উচ্চ ভূমি হইতে বেধিলে দীর্ঘ কৃষ্ণ সর্পের ভ্রাতৃ ভস্মীভূত গ্রাম ও নগরশ্রেণী হৃণপ্রাবনের পথ নির্দেশ করিয়া দিত । কুদ্রাকার, গৃহংশীর্ষ, কুদ্রনাসিক মলিন খেতবর্ণ হৃণ অঝারোহীকে দেখিবারাত্র উত্তরাপথবাসিগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত, কালাভকবস্ত্র হৃণগণ অরণ্য বেঠেন করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিত ও পলারনপর নরনারীগণকে দূর হইতে বর্ষা বা শরবিদ্ধ করিত । নগরাক্রমণ করিলেই ঋতিকাহত সমুদ্রতটের ভ্রাতৃ হৃণগণ হুর্গপ্রাকার বা হুর্গপ্রাচীর অতিক্রম করিয়া অসংখ্য নাগরিকগণের উপর পতিত হইত, এক সময়ে নগরের নানা স্থানে অগ্নিসংযোগ করিত ; তৈলসিক্ত বস্ত্রে জড়িত জীবিত শিশুর গুণ্ডে অগ্নিসংযোগ করিয়া রাজিকালে আলোকের কার্য্য নির্বাহ করিত ; মাতার সমুখে শিশুকে উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া শাপিত তরবারীর উপরে ধারণ করিত, হস্ত-ভাগ্য শিশুর বিখণ্ডিতদেহে ধুলিতে স্তম্ভিত হইত । বৃদ্ধ সম্রাট্ অত্যন্ত পীড়িত । গোবিন্দ গুপ্ত বহু কষ্টে মগধের সীমান্ত রক্ষা করিতেছেন । সাম্রাজ্যের অর্ধাঙ্গ প্রবেশ্য সংরক্ষণ অসম্ভব । এই সময়ে পুরগুপ্তের নামে তৎকালী মহাদেবী

সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন; বৃদ্ধ সচিব দামোদর শৰ্ম্মার সকল আশায় অবসান হইল।

সম্রাটের শিবির স্তম্ভসামিথ্য পৱিত্র্যাগ করিলে ক্রমশঃ চই একজন তিস্ত সজ্জারামে আসিয়া বাস করিল। ইহারা সকলেই নিরক্ষর, বৃদ্ধ অপেক্ষা উদরের প্রতি অধিক ভক্তিপরায়ণ, নির্ভীক লাভাশ্রয়ী তরুণী লাভের জন্য অধিক লোলুপ। ইহারা অর্থের জন্য নিরীহ তীর্থ বাজিকগণকে উৎপাদিত করিত। ক্রমে ইহাদিগের ভয়ে তীর্থবাজিগণ আর স্তম্ভসামিথ্যে আসিতে চাহিত না। বেঠেনী পরিক্রমণের পথ ও প্রাচীন গৰ্ভগৃহের দ্বার বনময় হইয়া উঠিল। এক দিন নিশীথে দূরে বহু অশ্বপদময় ক্রত হইল। লক্ষ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইলে দৃষ্ট হইল, হৃৎসৈন্ত দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে সাম্রাজ্যের সৈনিকদিগকে ঘীরে ঘীরে স্তম্ভসামিথ্যে তাড়িত করিয়া আনিতেছে। পরদিন প্রত্যতে সম্রাটের সৈনিকগণ ভিক্ষুগণকে সজ্জারাম হইতে দূর করিয়া দিয়া বেঠেনী স্তম্ভকিত করিল। বৃথিলাব, পুণ্যক্ষেত্রে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে। শূর্য্যোদয়ের পূর্বে দূর হইতে হৃৎ অশ্বারোহিণীরা অবিস্রান বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। স্তম্ভক ফলকবৃক্ষ শরাঘাতে বেঠেনীর হানে হানে আমাদিগের গাত্র কত হইতে লাগিল, বহু পরিশ্রমলব্ধ চিত্তগুলি বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু হৃৎ বা আৰ্য্য কোন জাতীর সৈন্তই সে দিকে লক্ষ্য করিল না। প্রথম প্রহর অতীত হইলে হৃৎগণ অশ্বপৃষ্ঠে প্রথম বেঠেনী পার হইবার চেষ্টা করিল, তখন বেঠেনীর মধ্য হইতে সাম্রাজ্যের সৈনিকরা নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে নিবারিত করিল। এইরূপে সমস্ত চেষ্টা বিফল হইলে হৃৎ অশ্বারোহিণী-সমূহ হইতে কিকিৎ দূরে গমনপূর্বক বিশ্রামের উদ্ভোগ করিতে লাগিল। তখন বীৰ্য্যকার আপাদমস্তকবর্ষমণ্ডিত জনৈক যুবা সৈনিক দক্ষিণ তোরণের বাহিরে আসিয়া শত্রুসৈন্তের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বেঠেনীর মধ্যে হতাবশিষ্ট সৈন্তগণ বিশ্রামের আরোজন করিতে লাগিল। তখনও-দিসহস্তের অধিক সৈনিক বেঠেনীর মধ্যে বর্তমান ছিল। সেনাধ্যক্ষগণ হৃৎগণের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিয়া অনুমান করিলেন যে, কিরংকর্ণের জন্য বৃদ্ধ হস্তিত থাকিবে। সন্ধ্যা বৃক্ষসমূহ কর্তৃক তোরণদ্বার চতুষ্টয় স্তম্ভভাবে বন্ধ করিয়া সেনাধ্যক্ষ ও সৈনিকগণ বিশ্রামার্থ স্তম্ভের উপরিতাপে ও ঔরিক্রমণের পথে শয়ন করিলেন। ক্রমে কেবল কতিপয় পদাতিক ও কয়েকটি কীরদেন্দীর সারসের আগিয়া রহিল। ক্রমে হৃৎকর্তাবারে বৃক্ষের অগ্নি নির্বা-

পিত হইল, উত্তর পক্ষের সেনাই সুস্থিমন হইল। নিশাধিগ্রহর অতীত হইল। কুচাচতুর্দশীর ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া পিপীলিকার জ্বার ধীরে ধীরে কয়েকটি নিশাচর জন্তু বেন বেটনী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। নিকটে আসিলে দেখিতে পাইলাম যে, তাহারা মহা, পশু নহে। ধীরে ধীরে একে একে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে পঙ্কবিশ্ণুতিজ্ঞান হুণসৈনিক বেটনী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তখন প্রহরীদলও নিদ্রিত, কীর্ণমেহ দীর্ঘাকার কুকুরগুলি বেটনী রক্ষা করিতেছে। পূর্বতোরণের নিকটে আসিয়া হুণগণ নিম্নেবের জন্ত দণ্ডারহান হইল ও ব্রাহ্মভাষ্যর হইতে কপূরচূর্ণ চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিতে করিতে ভোরণ-অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু কপূরের তীব্র গন্ধ সারথেরগণের তীক্ষ্ণ স্রাবণশক্তিকে অতিক্রান্ত করিতে পারিল না, কুকুরগুলি তারতরে চীংকার করিয়া উঠিল। রক্ষীগণ নরন উদ্ভীণন করিয়া দেখিল যে, হইজন হুণ আলম্বনের উপর উঠিয়াছে ও তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে পরাধাতে নিহত করিল। অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়া হুণসৈনিকগণ শূন্যনিদ্রা করিল। দূর হইতে শৃঙ্খরে তাহার উত্তর আসিল। দূরে হুণশিবিরে শত শত উচ্চ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন সাত্রাজ্যের সৈনিকগণ চেতনা লাভ করে নাই। বজ্রের জ্বার অবশিষ্ট হুণবাহিনী আসিয়া বেটনী আক্রমণ করিল ও পরক্ষণেই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া শত হস্ত সিঁছাইয়া গেল। এইরূপে বার বার আক্রান্ত হইয়াও সাত্রাজ্যের সৈনিকগণ আত্ম-সমর্পণ করিল না। বৃদ্ধ শেব হইবার পূর্বে পূর্বদিকে আলোক দৃষ্ট হইল, সাত্রাজ্যের সৈনিকগণ অরধ্বনি করিয়া উঠিল। হুণগণ পুনরায় বেটনী আক্রমণ করিল। যখন আলম্বনের উপরিত্তাগে বৃদ্ধ চলিতেছিল, তখন কতিপয় হুণসৈনিক তৈলসিক্ত বস্ত্রধোঁর সাহায্যে বৃক্ষাণ্ডগুলিতে—অগ্নিসংকলন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এইরূপে প্রভাতের আক্রমণ শেব হইবার পূর্বেই বেটনীর চতুর্দিকে ভীষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন বেটনীর মধ্যে অবস্থান করা মহাবীর সাধাভীত। উন্নানে ক্রতান্তদৃশ হুণ অবাধোহিগণ চীংকার করিতে লাগিল ও বৃদ্ধাকারে পাবাণবেটনীর চতুর্দিকে বেষ্টিত করিল। তাহারা জীবিত অবস্থায় একজনকেও বেটনী হইতে বহির্পত হইতে দিবে না। সিংহের জ্বার গর্জন করিয়া পূর্বোক্ত বন্দারত যুবক ভোরণপথে অগ্রসর হইলেন। জনৈক হুণ পদাতিক তাহার শিরদ্বারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরও নিক্ষেপ করিল। ফলে শিরদ্বারের উর্দ্ধদেশ ভূমিতে পতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সহস্রকণ্ঠে সম্বরে উন্নাসে কলকণ্ঠের অরধ্বনি ধ্বনিত হইল। বাহিরে হুণগণ প্রমাদ পলিল।

বহুদিন পরে কন্দগুপ্তের দেবীরা সৈনিকগণের উৎসাহ বিভূষিত হইল, কন্দ-
গুপ্তের নেতৃত্বে পঞ্চদশ সৈনিক অবলীলাক্রমে হৃণবাহু ভেদ করিয়া অরণ্যমধ্যে
প্রবিষ্ট হইল, পঞ্চাশংসহ হৃণসৈনিক চিত্রের স্তম্ভ দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল,
সেই পঞ্চদশের গতিবোধ ভাঙ্গাধিগের সাধ্যাশীত। কেহ কেহ অরণ্য-
মধ্যে ভাঙ্গাধিগের অতঃস্থান করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই পঞ্চদশের পশ্চাতে
বাহারা অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ভাঙ্গাধিগকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।
অর্কশতাব্দী পরে জলকরে বা উচ্ছিন্ননীতে হৃণবৃক্ষগণ বালকগণের নিকট কন্দ-
গুপ্তের কোশবসুন্দের কাহিনী বলিত ও শিশুদিগকে বহুশ্রুত করিয়া রাখিত।
শতবর্ষপরে আব্বাযবর্ষের মহিলাগণ শ্রুতান্তে হৃণবৃক্ষগণের কবল হইতে দেবতা,
রমণী ও শতক্কেত্রের ত্রাণকর্তৃবরূপ কন্দগুপ্তের নাম স্মরণ করিতেন;
সুদূর বহুদেশে বীষর ষোড়শগণ মহাবিশ্রান্ত। কন্দগুপ্তের নাম গান করিত ও
তত্ত্বনির্ভিত অশ্রুজলে ভাঙ্গাধিগের বক্ষ প্রাণিত হইত।

দহনের অদৃশ্য বস্তু যে কখনও অদৃশ্য করে নাই তাহার পক্ষে ভাঙ্গাধিগের
বর্ণনাশীত বস্তু বোধগম্য নহে। আলম্বন, তন্তু ও হঠীর অভ্যন্তরস্থ স্থান ও
তোরণগুলি ব্রহ্মকালে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। তাহাতে অগ্নি প্রবৃত্ত হইলে
সহস্র তরুগুলি ধীরে ধীরে শুষ্ক হইতে লাগিল ও অগ্নি একবার প্রজ্বলিত হইয়া
উঠিলে তাহার লিখা গগন স্পর্শ করিল। তখন বুদ্ধিলাভ, প্রাচীন তুণের
বিনাশের দিন আসিয়াছে। আতিমিহর তরু বহুস্ত বহুস্ত নির্মিত দক্ষিণ
তোরণের শীর্ষস্থিত ধর্মচক্র সম্মুখে ভূমিতলে পতিত হইল, উত্তর তোরণের
অষ্টকোণ তন্তু সম্মুখে বিদীর্ণ হইয়া গেল, নানাহানে বেটনীর তন্তুগুলি ধরাশায়ী
হইল। লেন্সিয়ান অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করিল। ক্রমে বেটনীর পার্শ্ববর্তী ব্রহ্মসুহ
প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বেটনীর চতুর্দিক হইতে বিদীর্ণ পাষাণের আর্দ্রনাথ
উখিত হইল, উত্তাপ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। বহুলাভূতি তুণ কণ্ঠিত হইতে
লাগিল, সহস্র সহস্র বহুনির্ঘোষের মিলিত ধ্বনির স্তর শব্দ পৃথিবী হইতে
উখিত হইতে লাগিল। অগ্নির বহুনির্ঘোষিত তুণ, বহুনির্ঘোষের
ভিকালক অর্ধে নির্মিত তুণ, সিংহদন্তের প্রাণাশেখা প্রিহ, তথাগতের শরীর
একত্র সমাহিত হইতে চলিয়াছে। বহুশব্দে গর্জগৃহ শরীর-নিধানের আধারের
উপরে পতিত হইল। তদশেখা ভীষণ শব্দে পাষাণনির্মিত অর্ধবর্তুল বিধা হইয়া
গেল। গুরুভার পাষাণ পতনের ও বিদ্যারূপের শব্দ সর্বপ্রাসী অগ্নির ধ্বংসশব্দ
শব্দে কণিকের মত পরাত করিল, ধূলি ও ধূবের তন্তু নীল আকাশ স্পর্শ করিল।

বয়সের লাবণ্য হইবার পূর্বেই চিন্তা করিতে লাগিলামু তুপধ্বংস হইল, কিন্তু সিংহদত্তের বহুআয়াসসঞ্চিত তথাগতের শরীর তক্ষশিলার প্রেরিত হইল না। অনিরাঙ্কিতাম, তক্ষশিলার মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষের উপস্থিত প্রামল্য তখনকে বক্রনাশা ধ্বংস মেঘপাল মেঘচারণ ও বংশীবাদন করে। পঞ্চাশবর্ষ পূর্বে তক্ষশিলার আবালবৃদ্ধ বনিতা তুপধ্বংস কর্তৃক নিহত হইয়াছে। আকুল হইয়া সিংহদত্তকে ডাকিলাম। তুপ ধ্বংস করিয়া তখন অগ্নিরাশি অরণ্যের চতুর্দিকে ধাবিত হইয়াছে, মণ্ডলাকার ধূমরাশি মেঘরাশ্যে উদ্ভিত হইতেছে; মেঘিলাম বেন তেজঃস্রোত দিবাদেহ সিংহদত্ত সহানুভবনে দিবাকরের রাজ্য হইতে অবতরণ করিতেছেন। সিংহদত্তের দ্বারা তুপের ধ্বংসাবশেষের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, দাক্ষণ বয়সের আকুল পাষণকণাগুলিকে বেন বলিতে লাগিল “বাহার অগ্নির উপরে এই তুপ নির্ধিত হইয়াছিল, তিনি যেখানে আসিয়াছেন আমিও সেইখানে আসিয়াছি। পাটলীপুত্রবাসী মহাবীর, অগরাজ, অপূর্ণশিল্পদক্ষ যবনশিল্পিগণও সেইখানে আসিয়াছেন। তথায় ধর্ম, কর্ত্তব্য, ভ্রমণ, ভক্তি বা ভিক্ষু, তুপ বা মন্দির কাহারও আবশ্যকতা নাই। তক্ষশিলার নাগরিকগণ চিরদিনের অস্ত তক্ষশিলা পরিত্যাগ করিয়াছে। অগরাজের নগরবাসিগণ তাহার শত শত বর্ষপূর্বে তাহাদিগের নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমি দর্শন করিয়া বলিয়াছিলাম যে, নগরবাসিগণ তথাগতের দর্শনে যদি কখনও বীতশ্রদ্ধ হয় তাহা হইলে তথাগতের শরীর-নিধান বেন তক্ষশিলার মহাবিহারের অধাফকে প্রত্যর্পণ করা হয়। আমার দর্শন চূর্ণ হইয়াছে, অগরাজের নগর তক্ষশিলার পূর্বে ধ্বংস হইয়াছে। বটে, কিন্তু তথাগতের শরীর-নিধান সমভাবে পুজিত হইয়া আসিয়াছে। তুপ যে দিন ধ্বংস হইল, সে দিন কিন্তু আর তক্ষশিলার তথাগতের শরীর-নিধান গ্রহণ করিতে জনমাত্রও নাই।” অশরীর সিংহদত্ত ধূম ধূলি ও সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেলেন। তখন দূরে পর্বতের সাহসদেবে প্রজলিত বনরাশি অমানিশার ঘোর অন্ধকার নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

পঞ্চত সৈনিক লইয়া তদন্তগুপ্ত কোন্‌খানে গমন করিয়াছিলেন তাহা তাহাদিগের পিতৃপুরুষরা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কীটদষ্ট জীর্ণ গ্রন্থ উদ্ধার কর, তাহার সন্ধান পাইবে। চাহিয়া দেখ, কিছ্রদূর পঞ্চত সৈনিক গঙ্গাবদ্বীপদর্শনে উপস্থিত হইয়াছে, ত্রস্ত নগরবাসিগণ অত্রধারী পুরুষ মেঘিরা পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। একজন সৈনিক উঠেঃঃঃঃঃ কি বলিল। চাহিয়া দেখ, পলায়নপর নগরবাসিগণ কিরিতেছে, দলে দলে নাগরিক ও নাগ-

রিকাগণ নগরদ্বার পিরত্নাধিহীন, বুধকের সম্মুখে নতজাগ্রু হইতেছে। আগন্তুক-গণের আগমন-সংবাদ বিজ্ঞাতের দ্বারা দ্রুত নগ্ৰাবশিষ্ট নগরীর চতুর্দিকে ঘাষিত হইল। নগরের প্রধান দণ্ডনায়ক হৃদয়দত্ত আসিতেছেন। যে জনতা পথভ্রমে ক্রান্ত, মলিনবেশধারী, বৃদ্ধ সৈনিকগণের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহারা সমস্তই পথ ছাড়িয়া দিল,। কল্পিতপদে হস্তী ও অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পলিতকেশ হৃদয়দত্ত নগরীর্ষ বুধকের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, সৈনিকগণ প্রত্যেকে শিরত্ৰান ল্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিতেছে। প্রতিষ্ঠানের দণ্ডনায়ক হইবার পূর্বে হৃদয়দত্ত দ্বিতীয় চন্দ্রশেখর বিশাল সাম্রাজ্যের মহাবলাধিকৃত ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রশেখর পার্শ্বে তাঁহার অশ্ব প্রতি বৃদ্ধ দৃষ্ট হইত। তিনি কুমারগুপ্ত ও গোবিন্দশেখর শিক্ষাগুরু, বন্দশেখর পিতামহকর। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে জ্যেষ্ঠপুত্র তদুদত্ত, তিনি স্পর্ধা করিয়াছিলেন যে, রাজশক্তির সহায়ত। পাইলে বৃদ্ধ পিতার অঙ্গুষ্ঠাক্রমে তিনি হুণবাহিনী মরুপারে রাষিয়া আসিবেন। সেই জন্ত হুণরাজ তৌরমানের আমোদে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহার পুত্র হরিন্দত্ত প্রতিষ্ঠান নগরীর রক্ষাকরমে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। হৃদয়দত্তের বামপার্শ্বে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রতিষ্ঠান নগরীর অধিষ্ঠানধরণ বিচারপতি নাগদত্ত। অপুত্রক নাগদত্ত বৃদ্ধ পিতার ক্রেশ, জ্যেষ্ঠের মানসিক ও দারীদ্রিক অবস্থা দেখিয়া আকুলগণ, হরিন্দত্তের বিরোগজনিত অস্ত্র তখনও শুক হর নাই। লৌহনির্মিত ত্রিশূলে ভর দিয়া হৃদয়দত্ত অগ্রসর হইলেন। শিরত্ৰাণ-বিহীন বুধকে দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্ভীষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি ‘মহারাজ’ শব্দ উচ্চারণ করিয়া নির্ঝাঁক হইলেন। সন্মোহনে বন্দশেখর চমকিত হইয়া উঠিলেন।

বীয়ে বীয়ে তদুদত্ত সকল কথা বিবৃত করিলেন কুমারগুপ্ত ইহাধাম পরি-ত্যাগ করিয়াছেন, বালক পুরগুপ্ত নামেযাত সন্তাট; বুধতী বিধবা মজ্জমোদুখ তরুণীর কর্ণধার, কিছ দ্বিতীয় চন্দ্রশেখর অলৌকিক শিক্ষার কলে দামোদরশর্মা ও গোবিন্দগুপ্ত নতশিরে আত্মাহুপালন করিতেছেন। বৃদ্ধ দামোদরশর্মা হুচরিত্রা মহাবীর বিলাস বাসনের ব্যয়বহন করিবার জন্ত প্রজাপীড়ন করিতেছেন, অর্দ্ধ-ভুক্ত অস্ত্রবিহীন সেনাবল লইয়া গোবিন্দগুপ্ত মগধরক্ষার দিশুকু আছেন। নত-জাগ্রু হইয়া তিন শিতাপুত্র তিখারীকে সন্তাট বলিয়া অভিবাদন করিলেন তদন্বরে

‘হৃদয়দত্ত কহিলেন, “সমুদ্রশেখর নীতি অহসারে সাম্রাজ্যের বাহা অবশিষ্ট আছে আপনি তাঁহার অধীশ্বর। বংশলোপ হইয়াছে ওথাপিও জীবনের শেববুদ্ধ পর্বাত

সাম্রাজ্যের কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। নাগদত্ত প্রতীষ্ঠান রক্ষা করিবে, একহস্তে পুত্র ও অশীতিপর পিতা ছায়ায় ভ্রায় সম্রাটের অহুসরণ করিবে। মহারাজ, এই শীর্ণ দুর্কল হস্তে মহাভার গুরুধ্বজ সিংহাসী হইতে পশ্চিম সমুদ্রের তটে আনয়ন করিয়াছিলাম। সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য এখনও তাহা পুনরায় সিদ্ধতীরে স্থাপিত করিতে পারি।” নগশীর্ষ, নগপদ, ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, ভয়বর্ধারূপ দীন দীন ভিক্ষুক সম্রাট পিতামহের পার্শ্বচরকে আলিঙ্গন করিলেন। চাহিয়া দেখ, নবীনবলে রক্ত হাহুদত্ত হস্তিপুটে গুরুতার গুরুধ্বজ ধারণ করিয়াছেন, সাম্রাজ্যের সেনাদল হৃৎপুষ্পে পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে। জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মাবর্তে তোরমান পরাজিত হইলেন, বৃকিলেন; গুপ্ত সাম্রাজ্য নূতন বলে বলীমান হইয়াছে। আর্য্যাবর্তে এই তাঁহার প্রথম পরাজয়। হ্রস্বা গোপাত্রিশিখরে হৃৎপদ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রেবা হইতে জাহ্নবীতীর পর্য্যন্ত আটবীক প্রদেশসমূহ হৃৎপদের গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে। জাহ্নবীর উত্তর তীর হইতে হিমাদ্রির চরণপ্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে; উত্তর মরু হইতে নূতন সেনাদল না আসিলে তোরমানের আর রক্ষা নাই, গোপাত্রিশ পতন অবশ্যস্বাবী। বিধাতার ইচ্ছা। অন্তরঙ্গ। দূত আসিয়া সংবাদ দিল, চরণাত্রিশিখরে গোবিন্দগুপ্ত মৃত্যুশয্যা পরান, কন্দগুপ্তের প্রত্যাবর্তনের কথা পাটলীপুত্রে জ্ঞাপিত হইয়াছে, বৃদ্ধ বৃদ্ধতাত ব্রাহ্মপুত্রের দর্শন বাছা করিয়াছেন। সম্রাটের গোপাত্রি অধিকার করা হইল না, নভশির ক্ষুর কন্দগুপ্ত তোরমানের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, সন্ধিহস্তে কন্দগুপ্ত গোপাত্রিহর্গ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাহাই তাঁহার সাম্রাজ্যের পশ্চিমসীমা রহিল। গুরুকেশ হাহুদত্তকে গোপাত্রি-রক্ষণে নিযুক্ত রাখিয়া কন্দগুপ্ত অঝোরোহী সেনা সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে চরণাত্রি অভিমুখে আসিতেছেন। চাহিয়া দেখ, চরণাত্রিশিখরে গিরিহর্গের ‘অভ্যন্তরে কন্দমধো দুবু’ গোবিন্দগুপ্ত সম্রাটকে শেষ উপদেশ প্রদান করিতেছেন। শ্রবণ কর, কন্দমধো শুদ্ধ পত্নীর স্বর এখনও ধ্বনিত হইতেছে “কন্দ, সমুদ্রগুপ্তের গুরুধ্বজের সম্মান রক্ষা করিও, দেখিও তোরমানের বংশজাত কেহ বেন কখনও পাটলীপুত্রের সিংহাসনে না আরোহণ করে। দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশুকে সর্বদা রক্ষা করিও। আর দেখিও, কন্দ, যদি পায় বাহার জন্য সমুদ্র গুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল তাহার বধোদ্বিত পীড়িতবিধান করিও। বিধাতা বলিয়া ভীত হইও না। সে তোমার পিতার পরিনীতা পত্নী নহে। চাহিয়া

দেখ, মঙ্গল তীরভুক্তি কার্ণী ও কোশলের প্রাধান্যস্থ রাজ্যের দিতে অস্বীকার করিয়াছে; তাহার কারণে, রাজ্য শাসন করা করিলে বর্ষভাগ পাইবেন নতুবা নহে । সমুদ্র-শুশ্রূষের বিখ্যাত নীতি অগ্রসারে গুপ্তবংশের জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের অধিকারী ; সাম্রাজ্য স্বলম্বশ্রেণের, পুরাশ্রেণের নহে । চাহিয়া দেখ, উদয়পুরশ্রেণের মহাদেবী ও পুরাশ্রেণ আবদ্ধ রহিয়াছেন । বিশ্বাসঘাতক তোরমান পুনরায় গোপালি আক্রমণ করিয়াছে, দত্তপ্রেরণ না করিয়া সন্ধিতত্ত্ব করিয়াছে, পুনরায় হরণবুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে ; দ্বিতীয় হরণবুদ্ধে বৈদ্যকসেনাপতি ভট্টারক কেন রাজপদে বৃত্ত হইয়া ছিলেন, স্বলম্বশ্রেণ কেন স্বহস্তে সমুদ্রশুশ্রূষার মুকুট লইয়া ভট্টারকের শিরে স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস এখনও লুপ্ত হয় নাই । শুণ্ডলম্বসের সহিত আশা দিপের মনুষ্যদর্শনের আশা দূর হইয়াছে, বহিজগতের সংবাদ পাইবার আশাও দূর হইয়াছে ।

ঐরাধালম্বাস বন্দোপাধ্যায় ।

রাধেশচন্দ্র শেঠ ।

নূতন শিক্ষার শিক্ষতি ও নূতন দীক্ষার দীক্ষিত বাঙ্গালী যখন বুদ্ধিগ—জাতীয় ইতিহাসের আলোচনা ব্যতীত জাতীয় উন্নতির পথ হৃদয় হইতে পারে না, তখন সে যে সাধনার প্রেরণ হইল—অতি অল্প দিনেই আমরা তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিতেছি । আজ বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চার ফলে আমরা অনেকগুলি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক চিত্র পাইয়া আমাদের অতীত গৌরবের ও অতীত দুর্কলতার বিষয় জানিতে পারিয়াছি ; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুরাবস্তু সংগৃহীত হইতেছে, ইতিহাস উদ্ধারের জন্য অভিযানও হইতেছে । বাঁহারা এই সাধনার প্রবর্তক, বাঁহারা এই পথের পথপ্রদর্শক রাধেশ বাবু তাঁহাদের অন্ততম । রাধেশ বাবু বিবিধ সাময়িক পত্রে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন সে সকল তাঁহার অক্লান্ত প্রমত্ততার, অসাধারণ উৎসাহের ও অনন্তসাধারণ ইতিহাসাহরণের পরিচায়ক । বাস্তবিক “তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ বাঙ্গালী পৌরুষের, পাণ্ডুরার ও পৌণ্ডর্যের ইতিহাস আলোচনার প্রলোভিত হইয়াছেন ।” রাধেশ বাবুর পাণ্ডিত্য যেমন প্রগাঢ় ছিল—তিনি তেমনই অনাড়ম্বর ছিলেন । তিনি কোন দিন আপনার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইয়েন নাই, বরং স্বাভাবিক বিনয়বলে আপনাকে যথাসম্ভব অন্তরালে রাখিয়া কাঁধ করিতে ভাল বাসিতেন । তাঁহার বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংগ্রহকালে প্রকাশনের ব্যবস্থা হইতেছে জানিয়া আমরা পক্ষমূলকিত হইয়াছি ।

সংগ্রহ ।

ইতিহাস ।

দিল্লী ।

দিল্লী ইংরাজাধিকারের পূর্বে পর্য্যন্ত ভারতের রাজধানী ছিল । এখনও দিল্লীর সহিত ভারতের রাজধানীর স্মৃতি এমনই বিজড়িত যে, ইংরাজের পরবারও কলিকাতায় না হইয়া দিল্লীতে হইতেছে । বর্তমান দিল্লী অধিক দিনের নহে । কিন্তু যে ভূমিতে বর্তমান দিল্লী নগরস্থান সে ভূমি অতীত-স্মৃতি-সম্বল । ভারতে এই উর্বর ভূমিতে, বহুবার কূলে কত রাজধানী গঠিত হইয়া কলোবশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ? দিল্লীতে ইতিহাসে এখন বৃষ্টির একাংশ পরাধীনতায় দিল্লীর উল্লেখ পাওয়া যায় । কিন্তু তাহার কত কাল পূর্বে হইতে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী ছিল, তাহা জানা যায় না । 'টাইমসে' দিল্লীর একটি অতি সুকৃতি বিবরণ বিবৃত হইয়াছে ।

বর্তমান দিল্লীর দক্ষিণে অন্ততঃ দুইটি সহর গঠিত হইয়াছিল । এই সকল সহর ভিন্ন ভিন্ন রাজ-বংশের শোণিতে সিক্ত ভূমিতে গঠিত—ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের কীর্ত্তিস্তম্ভ । আজ সে সব রাজধানী কলেকবলম্বন । কেবল তথ্য বা তথ্যস্বরূপ লতাভ্রম্মবিবর্তিত সমাধিস্থানে বা বর্ধমানের তাহাদের স্মৃতি আদিয়া আছে । দিল্লীতে কৃতব্য বিদ্যার অতি বিপ্লবকর তত্ত্ব ; ইহার ইতিহাস কিম্বদন্তীর শৈবালসমাহার । আর ঐক্য বা ভোগলক শাহার অনুষ্ঠান—ভোগলকাবাদ । এই নগর নির্মিত হইয়াছিল । কিন্তু ইহাতে রাজধানী সংস্থাপিত হয় নাই ।

দিল্লীর প্রান্তরে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশ রাজ্যশাসনের আশায় আশ্রয় লুপ্তপ্রায় ভাঙ্গা-পত্নীকর করিয়াছে । দিল্লীর প্রান্তরে যে জঙ্গী হইয়াছে, সে-ই ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে । পানিপথে তিসবার যুদ্ধে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণীত হইয়াছে—এই তিস যুদ্ধে অপর্য্যন্ত ইতি-পূর্বে-কেন্দ্রে । হাঙ্গেরা-বটন । তাহার পর সিংহী বিদ্রোহে দিল্লীতে জঙ্গী হইয়া ইংরাজ ভারতের আধিপত্য লাভ করেন । দিল্লীর দক্ষিণে মোঘলের ইতিহাস ও উত্তরে ইংরাজের ইতিহাস লিখিত রহিয়াছে ।

দিল্লীর দুর্গই দিল্লীর সৌন্দর্য্যস্বরূপ । এই দুর্গই সম্রাট্ শাহজাহানের প্রাসাদ ছিল । অপর্য্যন্ত আর কোন্ প্রাসাদের এমন বনোহর সিংহদ্বার নাই । বহু দিন সেবাদিবাসরূপে ব্যবহৃত হইয়া দুর্গ-মধ্যর দুর্গভাগি মলিনশ্রী হইলেও তাহাদের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই । সেওয়ার-ই-দুর্গ । আবে রাজসভা হইত । এই কক্ষেই শাহজাহানের ইতিহাস-অনিষ্ট যত্ন সিংহদাস মূল্যে । 'সুউনলোদুপ' বর্ষের সাহ সে সিংহদাস লইয়া যাতন । সেওয়ার-ই-দুর্গে বিলাসকর । এই দুর্গ যেত সর্ব্বের রচিত—যেন পঞ্চলোকের সৌন্দর্য্যস্বরূপ । ইহার পশ্চিম ও পূর্ব, তৎকালীনের সবই স্থান । তৎকালে হইতে রত্নরাজি অপর্য্যন্ত হইয়াছে । কিন্তু এখনও এ দুর্গ স্থান । দ্বাদশ শতাব্দীর সময় নির্মিত সারিগো এই দুর্গে সম্রাট্ মহিপালবিরচিত হইয়া

বিজ্ঞানসম্মত ভোগ করিতেন। ইহাও আচারে লিখিত উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য—“যদি অগতে ঘণ্টা থাকে, তবে সে এই স্থানে—তবে সে এই স্থানে—তবে সে এই স্থানে।”

বিবিধ।

প্রাসাদ-প্রসাধিকা।

সম্রাট বেনহুবার্ত্রুজি কাব্যে ও ইতিহাসে অসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পার্শ্ববাসীরাই পুত্রকে পদে পদে তাহার অনাথ পাইতে হয়। যুরোপে ও আমেরিকায় ফেশনেবল বেশনির্ভাতার প্রত্যাবর্ত্তনকারকের প্রত্যাবর্ত্তনকে অজ্ঞান নহে। আরও প্যারিস কাণাবনের কেন্দ্র; যুরোপের সকল বেশ ও আমেরিকা হইতে ধনবতীরা পোশাকের জন্য প্যারিসে আসিয়া থাকেন। এই সেদিন প্যারিসের কোন বেশনির্ভাতার প্রতিবিম্বিত কতকগুলি নৃতন নমুনা লইয়া ইংলণ্ডে আসিলে সেগুলি দেখাইবার জন্য প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার অ্যান্ড্রুইথের পুত্র একটা মহিলা-সমিতির আয়োজন করিয়াছিলেন।

কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রবিষয়ের সময় রাজ্যী বেরৌ অ্যাটর্নেনেটের প্রসাধিকা রোজ ব্যারট'গার মত

প্রসাধিকা।

প্রসাধিকাগুলিও গোলাগালাত বোধ হয় আর কোন প্রসাধিকার ভাগ্যে ঘটে নাই। অ্যাটর্নেনেটের মত অসিতব্য রাজ্যী বিবল।

তিনি রোজের নির্মিত পোষাক না পরিয়া মহিলাসমাজে বাহির হইতে লজ্জা বোধ করিতেন। আর ত্রিশ বৎসর রোজ যুরোপের বেশনির্ভাতাবিকার প্রতিঘনীহীন ছিলেন বলিলেও অত্যাধিক হয় না। যুরোপের সকল রাজী ও ধনবতী মহিলা রোজের নির্মিত বেশ পরিধান করিবার জন্য পাসল হইয়া উঠেন। রোজ বৃদ্ধিবলে তাহার সকলবিশেষ দ্বারা যে কোন ঈপ্সিত কাব্য করা হইয়া লইতে পারিতেন। মন্ত্রী ও রাজপুত্র অপেক্ষা তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রত্যাপন প্রবল ছিল। সে সময় কালের রাজনৈতিক কোন কথাই তাহার অজ্ঞাত ছিল না। সম্রাট তাহার এক জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। রোজের জীবনকথা উপভাসেরই মত বিষয়কর ও চিত্তাকর্ষক।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে পুত্রসহস্রের রোজের জন্ম হয়। তাহার পিতা সামান্য সৈনিক ও মাতা গৃহস্থ-কারিণী ছিলেন। রোজ বাল্যকাল হইতেই রূপবতী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও

উচ্চাকাঙ্ক্ষাশালিনী ছিলেন। বোভন বর্ষ স্বতন্ত্রকালে তিনি

প্যারিসের অসিদ্ধ প্রসাধিকা শ্রীমতী প্যায়েলের নিকট কার্যে ব্রতী হইলেন। সম্রাট পঞ্চদশ লুইর ভবিষ্যৎপ্রশ্রিতী (কাউন্টেন্স ডুয়ারী নামে পরিচিতা) জিহাদে বহু তখন আর একজন প্রসাধিকার সোঁকানে সামান্য সীবনকার্যে নিযুক্ত। কার্যোত্তরের অজ্ঞান পথেই রোজকে কয়েকটি বেশ লইয়া প্রিন্সেস ডি কস্তির নিকট বাইতে হইল। তাহাকে যে কক্ষে বসিতে বলা হয়, সে কক্ষে একজন বৃদ্ধা উপবিষ্টা ছিলেন। তাহাকে পরিচালিকা মনে করিয়া প্রিন্সেসের আশ্রয়প্রার্থীকার রোজ তাহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করেন ও তাহাকে বেশ দেখান। কিছুকাল পরে একজন পরিচালিকা আসিয়া বৃদ্ধাকে সতর্কণ করিলে রোজ দীর্ঘকাল উপলব্ধি করিয়া এমন নিশূণ ভাবে ক্রমাগত আর্থনা করেন যে, প্রিন্সেস মনুষ্ট হইয়া রোজকে তাহার ছুইজন অজ্ঞানকারী বহুদূর বিদ্যাবেশ প্রদত্ত করিতে দেন।

এই ব্যাপার অবগত হইয়া প্যালেস রোজকে ব্যবসারে অশ্লীলকরিয়া নহেন । ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে

ক্রসোরতি ।

রোজ বহুঃ ব্যবসা পুলেন ও কয়েক সপ্তাহমধ্যেই প্যালেসে সর্ব-

প্রধান অসাধিকা বলিয়া পরিগণিত হইলেন । তিনি মকলমিগকে

তোষামোদে ভুট করিতে ও নুতন নুতন রকমের বেশ প্রস্তুত করিয়া ব্যবসারের উন্নতি করিতে

বিশেষ পটু ছিলেন । তিনি কেবল গোপ্যক প্রস্তুত করিয়াই নিরস্ত হইতেন না, পরন্তু অলঙ্কার

হইতে কিতা পর্য্যন্ত গোপ্যকের সকল আবশ্যক অঙ্গই প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতেন । বেশবিশিষ্টসেও

ঔহার পটু ছিল । সেরী এটরনেট রাজবদ্বন্দ্বেরে ক্রালে আসিলে রোজ ঔহার সহিত পরিচিতি

হলেন । সেরী ঔহার ব্যবহারে এমনই প্রীতি হইয়াছিলেন যে, তখনই ঔহাকে বহু মূল্যবান

বেশ প্রস্তুত করিতে দেন । পরে সেরী সাম্রাজ্যী হইলে রোজের প্রভাব সমগ্র ফ্রান্সে ছড়িয়া

পড়ে । তখন চূড়াকারে বহু করিয়া কেনসজ্জা করা রেওয়াজ ছিল । রোজ প্রতি সপ্তাহে নুতন

নুতন ধরনের কেনসজ্জার উদ্ভাবন করেন, কোন মহিলার মুতকের কেশে বেন পক্ষী ফল তৎকণ

করিতেছে, কাহারও কেশে প্রাকৃতিক বৃন্ত—কাহারও কেশে ঐতিহাসিক চিত্র—ইত্যাদি ।

প্রবীণারা একমুখে কেনসজ্জার ভাববাদিতেন না । তাই রোজ এমন ব্যবস্থা করেন যে, একটি

জিঃ টিপিলে নিম্নেবে কেনসপাণ স্বাভাবিক আকার ধারণ করিত, আবার আর একটি জিঃ টিপিলে

কেনসপাণ পূর্ণলঙ্কার শোভিত হইত । রাজ্যের উপর ও দেশের মহিলাগণের উপর রোজের

অসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সম্রাট বোড়প লুই ঔহাকে বিচুপ করিয়া কেনসের মন্ত্রী

বলিতেন । বাস্তবিক ঔহার জন্ত যে ব্যয় হইত কোন মন্ত্রী জন্ত তত ব্যয় হইত না ।

রাজ্যীই প্রবানতঃ দেশের বাবদে রোজের নিকট ছুই বৎসরের ১৮০০০০ টাকার স্বর্ণমাল্যে জড়িতা

হইয়া পড়েন । রোজকে সর্বদাই নব নব বেশে সজ্জিত পুতল ফ্রান্সের নানা স্থানে পাঠাইতে

হইত । তাহা দেখিয়া মহিলারা দেশের ফরমাইল করিতেন । রোজের নামে—বশকে ও

বিশকে, শীত সজ্জিত হইতে লাগিল । রোজের প্রভাব ও প্রভাপ প্রবর্তিত হইতে লাগিল । রাজ্যী

ঔহাকে সির ও বিশ্বস্ত বহু করিয়া তুলিলেন ।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রোজের ব্যবসারে অবনতি আরম্ভ হয় । ফ্রান্সের নানানামে বহু

মহিলার নিকট ঔহার বহু অর্থ ব্যক্তি পড়ে ও অনাধার থাকে । এ বিবে করাসী বিম্বেবের সূচনা

ভাষ্যবিশদ্য ।

পতিত হয় । করাসী সাম্রাজ্য তখন পতনোন্মুখ ; অভিজাত

বংশীয়গণ ব্যয়সঙ্কোচ চেষ্টায় চেষ্টিত—কিন্তু তখন আর উপায়

নাই । তাহার পর বিম্বেব রাজা ও রাজ্যী নিহত হইলেন । রাজ্যীর বহু রোজ লগনে পলায়ন

করিলেন ও তথা হইতে জঙ্গীকৃতিে গমন করিলেন । বিম্বেবের প্রথম অঙ্কে বসিকা পুতন হইলে

রোজ বহু চেষ্টায় কালে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে আবার

পূর্বব্যবসারে প্রতী হইলেন । কিন্তু তখন ঔহার সৌভাগ্য-তপন চিরন্তনে অস্তিত । ক্রালের

রাজ্যী, রাজপারিষদ ও অভিজাতবংশীয়গণের অসিতব্যয়িতা ও তাহারই অনিবার্য্য ফল—প্রভার

প্রতি অভ্যাসের প্রবানতঃ করাসীবিম্বেবের কারণ । এই অসিতব্যয়িতার প্রসারে রোজ সাহায্য

করিতে অসমর্থ করেন নাই । তাই করাসীবিম্বেবের ব্রতসিদ্ধ ইতিহাসে এই অসাধিকা একটু স্থান

পাইবার দাবী আছে ।

আর্য্যাবর্ত—



কুতুব মিনার ।

কুতুব মিনার, কলিকাতা ।



মার্লদহের পালনগরাদি ।

স্বাচরিত-বর্ণিত নগরাদির সহিত

বর্ধমন্ডলাদি গ্রন্থ-বর্ণিত

নগরাদির সম্বন্ধ-

নির্ণয়

(১)

রাজগাঁ ।

মাণিক গাঙ্গুলীর বর্ধমন্ডলে রাজসম্ভাবণ পালায়—

রাজগাঁ

“রমতী রহিল পাছু রাজগাঁ রঞ্জিত ।

বা

রাজনগরের

শেখা দেখি গোড় নগরে উপনীত ॥”

বিবরণ ।

লিখিত আছে । রমতীর পর রাজগাঁ । এই রাজগাঁ রাজনগর

ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । রাজনগর শেবে শ্রীহীন হইয়া রাজগাঁর পরিণত হইয়া গড়িয়াছিল ।

ছত্রসং-পাতুয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে রাজনগর নামে একটি মানবহীন গ্রাটীন ধ্বংসস্থাপাদি-চিহ্নিত ভূখণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে । বর্তমান কালে মহানন্দার পূর্বতীরে অবস্থিত হইলেও পালশাসনকালে ইহা গঙ্গাতীরেই বিদ্যমান ছিল । রাজনগর যে পূর্বকালে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহার নিদর্শন স্বরূপ বর্তমান কালে “রাজনগর পরগণা” বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে । ইহা একটি বিস্তীর্ণ পরগণা । এই পরগণার মধ্যে “মদনাবতী” চাকনগর বা চক্রনগর, দৌলংপুর প্রভৃতি গ্রাটীন স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে ।

(ক) মদনাবতী ।

রায়গামেশ্বরী মদনাবতী-

জিলা মালদহ, থানা বামুনগোলা, লাট দৌলং-

প্রতিষ্ঠিত-মদনাবতী নদরী । পুত্রের অন্তর্গত দোজা মদনাবতী, ওরফে কন্দা ।

সংস্থান ও বর্তমান অবস্থা ।

ইহা বামুনগোলা হইতে ছয় কোশ পূর্বোত্তর ভাগে অবস্থিত ; প্রায় তিন চারি হাজার বিঘা উন্নত ভূখণ্ডোপরি পরিখা ও উন্নত গ্রাটীয়-বেষ্টিত ভূখণ্ড । গ্রাটীরেই ইষ্টকম্পূর্ণ মাল্যের স্তায় মদনাবতী-দুর্গ বেষ্টিত করিয়া আছে । অত্যন্তরে চারি পাচ শত বিঘা পরিমিত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হুন্দর দীঘী বর্তমান । ইহার চারিটি পাড়ই

ইষ্টক-পাৰাণ-মণ্ডিত ছিল এবং উহার উপর রাজপ্রাসাদ শোভিত ছিল। সমগ্র ভূখণ্ড ইষ্টক-প্রস্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। কোথাও কোথাও সুন্দর, সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ-সমূহ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন স্থানে গম্বুজের কিরদংশ, কোথাও ভদ্র প্রাচীর ও গৃহাদির সামান্য অংশমাত্র বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের বিশাল নিদর্শন ব্যক্ত করিতেছে। ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত বিকৃত দেবদেবীর পাৰাণমূর্তি একত্র করিলে একটি স্তূপে পরিণত হইতে পারে। নগর-প্রবেশের চারিটি তোরণদ্বার ছিল।

ঐতিহাসিক তথ্য।

রামপালদেবের এক জ্যৈষ্ঠ নাম মদনদেবী। ইনি মদন পালের মাতা। রামপাল বরেন্দ্র অধিকার করিয়া উত্তর বরেন্দ্রে রাজ্যের নামে মদনাবতী পুরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই পুরী উত্তর বরেন্দ্রের সীমান্ত-দুর্গবৎ ছিল।

(খ) লাট দৌলতপুর (লালাগোলা)

মদনাবতীর এককোণ দক্ষিণে ভজনতীরে অবস্থিত। ইহা মদনাবতীর বাণিজ্য-প্রধান বন্দর ছিল। মদনাবতী হইতে দৌলতপুর পর্য্যন্ত সৌধমালা শোভিত ছিল। ভদ্র বিকৃত প্রস্তরময় বায়ুলী চামুণ্ডা, কালী, শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুমূর্তি ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

(গ) চাকনগর (চক্রনগর)

চাকনগর বা চক্রনগর। লাট দৌলতপুর (তৌজিনদ্বর ২৩৭) থানা গাজোল।

বর্তমান অবস্থা।

ত্রিশ চল্লিশ বিঘা উন্নত ভূখণ্ড—প্রাচীর-বেষ্টিত। চারিদিকে চারিটি সৌভীক ধরনের উচ্চ সিংহদ্বার শোভিত রহিয়াছে। অভ্যন্তরস্থ ভূখণ্ডে কতকগুলি কবর। তদ্ব্যতীত মক্কাহ সাহেবের সুবৃহৎ সমাধি বিদ্যমান। ডায়া নামক কবির উক্ত দরগাহ সেবাইত।

এই চক্রনগরের পরিসর বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ থাকার স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। দরগাহ বাহিরে গড়ের উত্তরে দশ পনের রশি দূরে বহু দেবদেবীর ভদ্র—অভয় পাৰাণমূর্তি পতিত আছে। সর্বোত্তম চক্রবর্তী তাঁহাদের ফুল মল যোগাইয়া থাকেন। এই স্থান বুদ্ধধর্মচক্র-প্রবর্তক বা বৌদ্ধধর্মপ্রচারকগণের বাসস্থান বা বিহার বলিয়া মনে হয়।

(ঘ) রঞ্জিত (রঞ্জ) *

পুৰাতন মালদহের কয়েক ক্রোশ উত্তর-পূর্বভাগে তখনতীরে। বহু
অট্টালিকার চিহ্ন বিস্তারিত আছে। প্রবাদ—এইখানে
হিন্দুরাজার রাজধানী ছিল। নিকটে রজবিল, গান্ধীমাক
(গান্ধী বিল) রোহিত (রোহিতবাসী) নামক বিল ও স্থান আছে।

(২)

গৌড়হাও

ইহা একটি পরগণা। উত্তর বরেন্দ্রের অন্তর্গত। প্রাচীন স্থান। বহু
প্রাচীন চিহ্নে চিহ্নিত। পালগৌড়ের উত্তরসীমা।
গৌড়হাওমধ্যে বহু প্রাচীন গ্রাম ও পল্লীর ধ্বংসাবশেষ
দৃষ্ট হয়।

(৩)

হাতীণ্ডা

মালদহের অন্তর্গত হাতীণ্ডা একটি বিস্তীর্ণ পরগণা। চাঁচল হইতে
কৈবর্তনগরী ডমর তিন ক্রোশমাত্র ব্যবধান।
হাতীপ্রপুতী বা হাতীণ্ডা। চাঁচল হইতে হাতীণ্ডা এক মাইল উত্তরে অবস্থিত।
বর্তমান অবস্থা।

লোকহীন অরণ্যময় স্থান। বিস্তীর্ণ উন্নত ভূখণ্ডোপরি প্রাচীন হাতীণ্ডা
নগর নির্মিত হইরাছিল। নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ সহস্রাবিক জলাশয় বিস্তারিত
রহিয়াছে। হাতীণ্ডার পাদদেশ দিরা সোমানদী প্রবাহিতা ছিল। ইহা
মহানন্দার শাখা। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ইষ্টকরাশি ও ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তরে সমাকীর্ণ
রহিয়াছে। সেখিলেই বোধ হয়, ইহা একদা গৌড়নগরের জ্ঞান স্থান নগর ছিল।

শিবপুখর, শিবলিঙ্গ

হাতীণ্ডার বহু ভগ্ন দেবদেবী মূর্তি পতিত থাকিলেও এক বিপুলকলেবর
শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ অক্ষত শরীরে বিস্তারিত রহিয়াছেন। নিকটে
শিবলিঙ্গ। শিবপুখর। প্রবাদপরম্পরার বশবর্তী হইয়া বরেন্দ্র-

* লাউগেনের মতে। রজাবতীর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না বলিতে পারি না।

বাণী আজিও শিবরাত্রির দিন এই স্থানে আগমন করিয়া শিবসরোবরে হান ও শিবপূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

শ্রবান এই নগরে শিবরাজ্য রাজ্য করিতেন, তিনিই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন ।

ঐতিহাসিক তথ্য ।

রামপালের আদ্যীয় মহমদেব ও জুবর্ণদেব * বরেন্দ্রে বাস করিতেন । দ্বার-নির্কীর্ষার্থ সেকালের কথামুতাবে তাঁহার পালরাজ্যের নিকট বিত্তীর্ণ হতীন্দ্র বা হাতীওর ভূখণ্ড পাইয়াছিলেন । শিবরাজ রামপালের মহাশ্রুতি-দামোৎপত্তির কারণ হার ছিলেন । মহমদেব বীর ছিলেন এবং তাঁহার সমরকুশল বহু হতী ছিল । তিনি হস্তিবেশে বণীমান্ ছিলেন । তাঁহার হস্তিশালায় বহু হতী ছিল । তিনি “হস্তিপতি” আখ্যায় বিদ্বিত হইয়া থাকিবেন । বহু সংখ্যক হস্তিযো “বিক্রমাদিকা” নামে সর্কশ্রেষ্ঠ এক হতী ছিল । সেই বিদ্বা-দানিকো আরোহণ করিয়া তিনি দেবরক্তিনামা রাজাকে পরাজিত করিয়া বিপুল ধনস্বী হইয়াছিলেন । বিদ্বাদানিক্য হতীন্দ্র এবং মহমদেব হতীন্দ্রপতি ছিলেন । সমরকুশল বহু হতীর অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া মহমদের হতীন্দ্র (হতী রাজ) খ্যাতির অস্ত্র কারণ হইতে পারে ।

রামচরিতের টীকাকার লিখিয়াছেন—

“মহমদেব বিদ্বাদানিক্যং করেণুরাজবাক্ষ” ইত্যাদি

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—রাম—টীকা)

“করেণুরাজ বিদ্বাদানিক্য হইতেই হতীন্দ্রপুর বা হাতীওর নামের উৎপত্তি হইয়াছে ।

ভদ্রনগর হতীন্দ্র (হাতীওর) পুরী হইতে অনতিদূরে অবস্থিত । কৈবর্তরাজ ভীম বরেন্দ্র অধিকার করিয়া পালরাজভগনের বরেন্দ্রশাসনভূমি হতীন্দ্রপুরের সান্নিধ্যে ভদ্রন নামক উপপুর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । বরেন্দ্রভূমি ও ভদ্রনগর রামপালের হস্তগত হইলে, হতীন্দ্রপুরের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছিল ; এবং তথায় কাপ্তদেব ও শিবরাজ অবস্থান করিতেন । শিবরাজ হতীন্দ্রপুরে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।

হাতীওর পরদগায় অন্তর্গত কয়েকটি প্রাচীন চিত্রে চিত্রিত গ্রাম ও নগর বিস্তারান প্রদিয়াছে । ইহার অধিকাংশই জনহীন বনাজ্বর ।

* ইহারের বিবরণ পুণে লিখিত হইয়াছে ।

হাতিশা পল্লবগণার অধীন তিনটি প্রাচীন চিহ্ন।

(ক) মকছুমপুর

নিরোজপুর তালুকের অন্তর্গত মোজা মকছুমপুর; খানা খরবা; ঘোনা নদীতীরবর্তী উন্নত ভূখণ্ড। চাঁচল ও সঙ্গলগঞ্জের কাঁচা রাস্তার পূর্বপার্শ্বে। হাতিশা হইতে তিন মাইল উত্তরে।

বর্তমান অবস্থা।

বহু তথ্য গৃহাদির চিহ্নস্বরূপ ইষ্টকপ্রস্তর পণ্ডিত গ্রহিয়াছে। অত্ৰাপি একটি উচ্চ প্রাচীরের অংশবিশেষ বর্তমান আছে।

এবাদ।

এই স্থানে মকছুমলাহের গাম্বির সমাধি বিদ্যমান আছে। এবাদ তিনি জীবিত অবস্থায় সমাধি লাভ করিয়াছিলেন।

(খ) ওয়াড়ী

খানা তুলসীগঞ্জের এলাকাধীন এবং ঐ স্থান হইতে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। শাসিত প্রস্তর ও ইষ্টক প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন ঘোষণা করিতেছে। এই স্থান হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবালয়ে পূর্ণ ছিল।

বিশেষত্ব।

এইস্থানে বহুসংখ্যক হস্তপদতর বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর প্রস্তরমূর্তি ইত্যত্যা বিক্ষিপ্ত গ্রহিয়াছে। সে সকল একত্র করিলে একটি বৃহৎ স্তূপে পরিণত হইতে পারে।

(গ) লক্ষণপুর।

খানা তুলসীগঞ্জের অধীন, চাঁচল হইতে তিন কোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে প্রস্তরময়ী শ্মশানবাণী মূর্তি বিস্তারিত আছে। ইহা প্রাচীন-নিদর্শন-পূর্ণ স্থান।

উপসংহার।

পালনগরী রামাবতীর স্থাননির্দেশ-করে বাহা বাহা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বারা নিম্নলিখিত কতিপয় পালনগরীর সন্ধান মালদহে প্রাপ্ত হইতেছি।

রামাবতী বর্ণনার মালদহ কতিপয় পালনগরী ও কীর্তির আবিষ্কার।

(১) বর্তমান মালদহের অন্তর্গত (অনুতী) প্রাচীন পালনগরী রামাবতী। রামতীনগর, রমতী ও রমোতী বর্তমান অন্তর্গত।

(২) পৌণ্ড বর্দ্ধন নগরপার্শ্বে বয়েস্র হুতাপাত্তর্গত (সেনরাজ্যগণের সময়ের) বৌদ্ধগোড় (পালরাজধানী গোড়) রামাবতীর অনতি উত্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(৩) বিখ্যাত জগদলবিহার রামাবতীর পার্শ্বে ছিল। এই নামে আরও কয়েকটি জগদলবিহার (জগদল) প্রাচীন কালে বর্তমান মালদহ জিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৪) বয়েস্র হু কৈবর্তনগর “ডমর” বর্তমান ডমরল বা ডমরইল। বর্তমান কালে মালদহ জিলার অন্তর্গত।

(৫) “হাতীতা” (বর্তমান মালদহে) পালশাসনকালে হতীপ্রপুর নামে খ্যাত ছিল। রামপালের মাতুলপুত্র রাষ্ট্রকূটবংশীর অনঙ্গদেবের বিখ্যাত হতী “বিক্রামাণিকা” এই নগরে ছিল। কংগুয়াজ বিক্রামাণিকা হইতে হতীপ্রনগরের উৎপত্তি হইরাছে। হতীপ্র হইতেই হাতীতা হইরাছে। অধুনা “হাতীতা পরগণা” বিভ্রম্যন।

(৬) বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত গোড়ের অন্তর্গত বড় সাগরদীঘী, অমরদীঘী, রাজনগরের পালধনন-দীঘী রামপালের ধর্মিত।

পৌণ্ড বর্দ্ধন নগর।

‘রামচরিত’ লেখক সক্ষ্যাকরনন্দী রামপালের দ্বিতীয়পুত্র মদনপালের সময় রামচরিত সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পিতামহ পিনাকরনন্দী এবং পিতা সাক্ষি-বিগ্রহিক প্রজ্ঞাপতিমন্দী পৌণ্ড বর্দ্ধনে বাস করিতেন।

“বহুধানিরোবরেস্ত্রী মণ্ডল চূড়ামণিঃ কুলজ্ঞানং ।

ঐপৌণ্ড বর্দ্ধন পুরাপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহৎসুঃ ॥”

(রামপালচরিতঃ কবিশ্রবণিঃ)

সক্ষ্যাকর নন্দী—বহুধার শীর্ষস্থানীয় বয়েস্রমণ্ডলের চূড়ামণিরূপ ঐপৌণ্ড-বর্দ্ধন নগরের অন্তর্গত কুলীনগণের বাসভূমি বৃহৎ বটু* (১) নামক স্থানে বাস করিতেন। এই সময়ে পৌণ্ড বর্দ্ধন রাজধানী ছিল না, উপনগরবৎ ছিল।

“অবদান (না) মৃ মৃপরিবৃদ্ধ গোড়াবিপরামদেবতোতং ।

কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরসি কলিকাল বাসীকি ॥”

(৩)

রামপাল গোড়াধিপ ছিলেন। এই গোড় “বৌদ্ধ গোড়”; রামপালের রাজধানী এবং বয়েস্রের অন্তর্গত ছিল। পৌড়নগর তৎকালে স্থলীর্ষ ছিল।

* বহুৎ—বড় বটর (বটোরী) বা বড়জাম।

শৌণ্ডবর্দ্ধন,* ভালেশ্বরী এবং আদিনাপুর তখন গৌড়নগরের ত্রিকিঙ্গুর-বর্তী উপনগর ছিল। সঙ্ঘাতকরনন্দী এই শৌণ্ডবর্দ্ধনে বাস করিতেন।

ঐতিহাসিক তথ্য।

মহীপাল গৌড়-বরেন্দ্রে রাজত্ব করিতেন। গৌড়ান্তর্গত রাঢ়ে তাঁহার সামন্ত-শাসনভুক্ত নববিজীত ভূভাগে স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। মহীপাল, সুরপাল ও রামপাল বিগ্রহপালের পুত্র। মহীপালের প্রকৃতি সৎ ছিল না। তাঁহার শাসনকালে বীর্থাহীনতার নিদর্শন বিস্তরান রহিয়াছে। বরেন্দ্র কৈবর্তগণ প্রবল হইয়া বরেন্দ্র অধিকার করিয়া ডমরনগর স্থাপন করিলে পালরাজ্য কৈবর্তগণের হস্তগত হয়।†

রামপাল পিতৃরাজ্য পুনরাধিকার করিয়া পুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং রামাবতী নগরে জীবন বাস করিতেন। আশ্রয় স্বজন লইয়া গমগ্র পালরাজ্যে অবস্থান ও রাজ্যশাসন রামপালের শাসননীতি ছিল। কৈবর্তগণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার জন্য ও অপর নরপতিগণদ্বারা উদ্ভ্যক্ত হইবার আশঙ্কায় রামপাল রাজ্যের বহু স্থানে দুর্গ ও সামন্তশাসননগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুরপাল রাঢ়ে, রাজ্যপাল গোড়ে এবং মদনপাল মদনাবতীতে অবস্থান করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন।

কালে শৌণ্ডবর্দ্ধনসিংহাসন—গৌড়সিংহাসন নামে খ্যাত হইয়াছিল। পাল নরপতিগণের সময় শৌণ্ডবর্দ্ধনের প্রভাব হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে গঙ্গা শৌণ্ডবর্দ্ধন-পার্শ্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন ও রাজনগরাদি স্থান গৌড়নামে খ্যাত হইয়াছিল অর্থাৎ সেই সময়ে বঙ্গের রাজধানী গৌড় উক্ত স্থানে ছিল।

ত্রিহরিদাস পালিত।

* শৌণ্ডবর্দ্ধন আতীন রাজধানী; সুরবংশের সময় খ্যাতিলাভ করে। বহুকাল “শ্রীশৌণ্ডবর্দ্ধন” নামে সম্মান পাইয়াছিল। গৌড় ও বঙ্গের রাজধানী ছিল। গৌড় রাজহর ও বঙ্গীয় রাজহর দুইটি শৌণ্ডবর্দ্ধনের সিংহাসনোপরি শোভা পাইত। দুইটি রাজহর একসিংহাসনে ছিল বলিয়া ইহার বর্ণেই সমান ছিল। বাংলারাজ (গুর্জররাজ) গৌড় নাম করিয়া উক্ত হর দুইটি লইয়া অতিশয় পবিত্র হইয়াছিলেন। (Ep. Ind. Vol VI. p. 243)

+ মালদহে মহীপাল সম্বন্ধে কয়েকটি দান পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মহীপালে দুই পুত্র হইবার পর বিনাভপুর অঞ্চলে প্রস্থান করেন এবং ওখায় মহীপালেশ্বরী বনন ও সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া সাধুজীবন বাসন করেন একগু আতাস পাওয়া যায়। কিন্তু সামন্তরিতের বর্ণনানুসারে আসন্ন জাতিতে পারি যে তিনি দুই পুত্র ও দিহত হইয়াছিলেন। অতএব বিনাভপুর অঞ্চলে তাহার সাধুজীবন বাসন এবং সংকার্য অশ্রুতানের কথা অসীক বলিয়া বোধ হয়।

চুড়ামণিযোগ ।

১

পুন্ডার সময় কোন বহুগৃহে নিমন্ত্রণ রাবিতে গিয়াছিলাম। তথায় নবপ্রকাশিত বহু উপজ্ঞাস দেখিয়া “বাপবনে ভোমকাণা” হইয়া কতকগুলি উপজ্ঞাস আনিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর আপনার ঘরে একাকিনী একখানা উপজ্ঞাস পাঠ করিতেছিলাম। সহসা ঘরে কে আসিল। মুখ তুলিয়া দেখি—আবার বড় জা। তিনি একটা নিমন্ত্রণে আমার বাড়ী গিয়াছিলেন। তিনি কিরিয়া আসিয়া গহনা না খুলিয়া—কাপড় না বদলাইয়াই আমার ঘরে আসিয়াছেন দেখিয়া বুদ্ধিগাম—একটা কোন অবর থবর আছে; পেটা না বলিতে পারিলে “বড়দিবির” পেট হুলিয়া উঠিতেছে। আমি মুখ তুলিলেই তিনি বলিলেন, “ওনিরাহ, ছোট বো, এবার ভ্রাম্যপুন্ডার পরদিন চুড়ামণিযোগ।”

আমি বলিলাম, “বটে ?”

“হঁ। নিমিষা ও বড়মানী কানী বাইতেছেন।”

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, “বেল পাকিলে কাকের কি ?” আমার পদাশ্রয়, তীর্থধর্ষন—আমাদের শান্তি এ সব “বাড়াবাড়ি” ভাল-বাসেন না। তিনি বলেন, “এখনকার মেয়েদের সবই বাড়াবাড়ি।”

আমার বড় জা একটু জঁম্বয়েল গোছের লোক। তিনি বলিলেন, “তুমি বল কি ? এত বড় একটা যোগ—পরকালের কাব করিব না ?”

আমি বলিলাম, “কেমন করিয়া করিবে ?”

“তোমার সঙ্গে আমার মাহুৎ পরামর্শ করে! আমার যেমন মরণ নাই—তাই তোমাকে এ সব বলি। তুমি বাহাই বল—আমি কানী না হয় জিবেণী বাইব। জিবেণী ত দূর নহে।”

রাজিকালে স্বামীকে বলিলাম, “এবার চুড়ামণিযোগে অনেক কানী—জিবেণী প্রভৃতি স্থানে বাইতেছে।”

স্বামী বিহ্বল করিয়া বলিলেন, “কেন, কলিকাতার অপরাধ ?”

“সে সব তীর্থে যে পদা উত্তরবাহিনী।”

“ত্রি বটে! সেইজন্যই আমাদের স্থানের ঘরে চৌবাচ্ছাটা কলের উত্তর দিকে—জল উত্তরদিকে বার। যে এজিনিয়ার বাড়ীর নক্সা করিয়াছিল—তাহার বর্ণবুদ্ধিটা খুবই প্রবল ছিল।”

ঠাট্টা করাটা আমার বাবীর এমনই অভ্যাস যে, অনেক সময় তাঁহার কোন কথাটা ঠাট্টা আর কোনটা নহে, হির করা দু'টি হইয়া উঠে। ঠাট্টাটা সময় সময় কিছু অতিরিক্ত এবং কঠোরও যে না হয়, এমন নহে। আমি আর কিছু বলিলাম না। উদ্দেশ্যে গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া নিরন্ত হইলাম।

তখন কে জানিত—আমি যখন চুড়ামণিযোগে উত্তরবাহিনী গঙ্গার ধান-বিষয়ে নিরাশ হইলাম, তখন অদৃষ্টদেবীর মিষ্টমুখে হুইয়াছি কুটিয়া উঠিতেছিল।

২

চুড়ামণিযোগের আর পাঁচ দিন মাত্র বিলম্ব আছে। প্রত্যবে আমাদের বাটীর সম্মুখে রাস্তার-ঘোড়ার গাড়ী থামিল। স্বামী উঠিয়া জানালা খুলিয়া দেখিলেন, বলিলেন, “এ কি?” তিনি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চশমা পরিলেন।

আমি উঠিয়া বাইরা দেখিলাম, বাটীর সম্মুখে হুইখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়াছে। গাড়ীর উপর তোরঙ্গ ও বিছানার মোট হইতে ধান, কুলা প্রভৃতি বহু প্রকারের স্তুপ। দেখিয়া আমিও বিস্মিত হইলাম।

গাড়ী হুইখানি হইতে অনেকগুলি ক্রীণোক নামিলেন। তাঁহাদের সঙ্গী পুরুষদ্বিগকে দেখিয়া স্বামী বলিলেন, “ওঃ—গঙ্গানানের বাবী। মাঝার বাড়ী হইতে সকলে আসিয়াছেন।”

তিনি নিরন্তলৈ বৈঠকখানার চলিয়া বাইলেন। আমি শক্তিত্বদ্বয়ে ঘোমটা টানিয়া শাওড়ীর ঘরের দিকে চলিলাম। আমার শরীর কারণ—এ কয়দিন কত সাবধানেই থাকিতে হইবে! আমি কলিকাতার ঘরে—কলিকাতার ঘরেদের “বাবু” ও “বিবি” অপবাদ ত আছেই, আবার অসাবধান হইয়া অপবাদ-উপাধির সংখ্যা না বাড়াই।

৩

গঙ্গানান উপলক্ষে বাহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিদিশাওড়ী, তাঁহার দুই ছা ও এক ননদ প্রধান। এই ননদ অর্থাৎ আমার শাওড়ীর পিসি ভাতৃপুত্রীকে লাঞ্জনপালন করিয়াছিলেন। ভাতৃপুত্রীর উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। তিনি কালী বাইরা যোগে গঙ্গানানের প্রস্তাব করিলেন।

শাওড়ী সে প্রস্তাব উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাহারা গঙ্গানানের জন্য এত দূর আসিয়াছেন, তাঁহারা সহজে নিরন্ত হইবার পাত্র নহেন। তাঁহারা পুনঃপুনঃ শাওড়ীর যুক্তির বিরুদ্ধযুক্তি বাহির ও তাহির করিতে লাগিলেন।

শেষে আর কোন যুক্তি না পাইয়া ভূমিবার সময় মাথায় বেমন কুটীগাছটা

যবে, শান্তকী তেমনই ভ্রাতৃবিত্তার কথ। তুলিলেন ; বলিলেন “তাহাও কি হয় ?
বোগের পরদিনই যে তাইকেঁটা—বোদের সব গোছগাছ করিয়া দিতে হইবে ।”

আমি ঘোষটা টানিয়া একপাশে বলিয়া নানাবস্তুরের অত্যন্ত হ্রস্ত, গ্লিমলিন
ছেলেটিকে “আমর করিয়া” একটু সুখ্যাতি অর্জনের চেষ্টায় ছিলাম । দিদি
শান্তকী আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বল, ছোট বোদিদি,
তাইকেঁটার সব গুছাইয়া লইতে পারিবে না ?”

আমি শান্তকীর তাইকির মারফৎ বলিলাম, “পারিব । না হয় আগের দিন
বাপের বাড়ী বাইয়া সব গোছ করিব । যেজমিদি ত বাড়ীতেই থাকিবেন ।”
কিছুদিন পূর্বে আমার মেজ আ’র ভ্রাতৃবিরোগ হইয়াছিল । সুতরাং তিনি এবার
তাইকেঁটার পিত্রালয়ে বাইবেন না, ছেলেরাও একদিন তাঁহার কাছে থাকিতে
পারিবে ।

আমার উত্তরে গলাহানার্থিনীরা সোৎসাহে শান্তকীকে কানী বাইবার অঙ্ক
ধরিলেন । শান্তকী অনন্তোপার হইয়া সন্মতি দিলেন ।

৪

শান্তকী কানী বাজা করিলেন । আমার বড় আ বলিলেন, “এইবার জিবেণী
বাইবার জোগাড় কর ।”

আমি স্বামীর নিকট সে প্রস্তাব করিলে তিনি বলিলেন, “সে কি করিয়া
হইবে ?”

আমি বলিলাম, “যদি আমি বাপের বাড়ী হইতে বাইবার ব্যবস্থা করিতে
পারি ?”

“কে লইয়া বাইবে ?”

আমার ভ্রাতা হেমন্তকুমার বি. এ. পাশ করিয়া এম. এ. পড়িতেছিল, ফুটবল
খেলায়—বাইক চড়ায় ও সস্তরপে তাহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল । পঞ্চচলা বিষয়ে
তাহার পটুত্বে স্বামীর বিশেষ আস্থা ছিল ।—তাহা আমি জানিতাম ; বলিলাম,
“যদি হেমন্ত লইয়া যার ?”

স্বামী বলিলেন, “তাহা হইলে বাইতে পার ।”

আমি পুলকিত হইলাম । পুলকের কারণ দ্বিবিধ—প্রথম গলাহানার
সজ্জাবনার, দ্বিতীয় আপনার চেষ্টার সাকল্যে । আমরা জীরা যদি স্বামী মহাশয়-
বিগের দৌর্যল্য বুঝিয়া সুবিধা বুঝিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পটু না হইতাম,
তবে সংসারে আমাদেরকে পদে পদে হাদিতেই হইত ।

আমার শাকলো আমার বড় জা বড়ই প্রীতি হইলেন, বলিলেন, “আমাকে সঙ্গে লইয়া বাইতে হইবে।”

আমাদের দুইজনের বাপের বাড়ী একপাড়ার। উভয়ে পরিচর্য বিবাহের পূর্বে হইতে। পাড়ার ষষ্ঠানদিগের একটা বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। যে বাড়ীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার উঠানে এক পিণা জমার্ট লিফ্ট পড়িয়া ছিল—আমার জা সেইজন্য স্কুলকে “ছিমস্তম্ভাটীর স্কুল” বলিতেন। আমরা দুইজনেই ছেলোবেলার সেট স্কুলে “কর” “বল” পার্শ্বের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির কীর্তি-কথা শুনিডাম। তথায় উভয়ে পরিচর্য। তাহার পর আমার বিবাহের সময় হেমন্তকুমার বালক। তখন হইতে সে আমার স্বত্তরবাড়ী আসিতেছে। হুতরাং তাহার সহিত বাইতে আমার বড় জা’র কোনরূপ সঙ্কোচের কারণ ছিল না।

৫

ভাবিয়াছিলাম, কলিকাতার ভিড়ে হানে কষ্ট পাইতে হইবে—ত্রিবেণীতে স্বচ্ছন্দে আরামে শ্রান করিতে পাইব; সে অবধি বাইবার উৎসাহ করজনের থাকে? কিন্তু হাওড়ার যাইরা সে ভুল ভাবিল। বৃহৎ ষ্টেশনে স্থান নাই। ভিড়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেমন্ত বলিল, “মফঃব্বলের অগঙ্গাঘোষের লোক গঙ্গামান করিতে কলিকাতার আইসে, আর তোমাদের মত কলিকাতার লোক ত্রিবেণী প্রভৃতি হানে যায়।”

আমি তা’কে বলিলাম, “কি হইবে? ত্রিবেণীতে কি? এত লোকের দানের উপবৃক্ষ ঘাট আছে?”

তিনি বলিলেন, “এত লোক যদি শ্রান করিতে পারে—আমরাও পাইব। ভিড়—ও আমাদের কপাল। বলে—

‘আমি যা’ব সঙ্গে
কপাল যা’বে সঙ্গে।’

তাছাড়া তর্য কি?”

মগরার নামিলাম—গাড়ী বদল করিতে হইবে। সে গাড়ী কলিকাতার টামেরই “বড় দাখা।” এত বাজীর বাইবার মত গাড়ী নাই—তাই বাগগাড়ীতে লোক বোকাই দিতে লাগিল। গাড়ী আর ছাড়ে না। আমরা ব্যস্ত হইতে লাগিলাম—বুঝি গোড়া অদৃষ্টে “সব পথ দোড়াদোড়ি—খেয়াঘাটে গড়াপড়ি” হয়।—বুঝি এখানে শ্রান হয় না! শেষে ট্রেন ছাড়িল।

আমরা জিবেণীতে পৌঁছলাম । হেমন্ত ঘড়ী দেখিয়া বলিল, “আর পনের মিনিট আছে । দীপ্ত চল ।”

সে বলিল, ‘দীপ্ত চল’ । কিন্তু সে ভিড়ে দীপ্ত যাই কিরূপে ? বহু কষ্টে হেমন্ত আমাদিগকে জলকূলে আনিল । কিন্তু আমার জা বলিলেন, “এ যে আঘাটা ! আঘাটার দান করিব না ।”

আমি বলিলাম, “গঙ্গা সর্বত্রই সমান ।”

তিনি বলিলেন, “তবে কলিকাতা ছাড়িয়া জিবেণীতে আসিলে কেন ?”

আমি নিরুত্তর হইলাম ।

হেমন্ত বলিল, “ঐ বাধাঘাট দেখা বাইতেছে । কিন্তু ও ভিড়ে কি করিয়া দান করিবে ? চল । আজ অদূরে অনেক কষ্ট আছে ।”

হেমন্ত অনেক চেষ্টার আমাদিগকে ঐষণের দান ও মুক্তির দান করাইয়া টেনেনে কিরাইয়া আনিল । অল্পকণ পরেই টেণ ছাড়িবার কথা ।

৬

টেণ যথাকালে আসিল না । টেণ আসিতেই প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হইল । তাহার উপর যাত্রীর ভিড় । আমরা যখন মগরায় আসিলাম, তখন কলিকাতার গাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে ; পরের গাড়ী আসিতে এক ঘণ্টার অধিক বিলম্ব আছে ।

হেমন্ত হাসিয়া বলিল, “বলিয়াছি আজ অদূরে অনেক কষ্ট আছে । এখন চল, ঘরে বাইরা বসিবে ।” সে হাসিল বটে, কিন্তু আমার কষ্ট হইতে লাগিল । বেচারী সারাদিন উপবাসী রহিল ! এ সব কষ্ট কি পুরুষের সহ্যে ?

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বসিবার ঘরের ঘারে বাইরা দেখি, ঘরে তিনচারিজন তরলোক । আমরা পিছাইয়া আসিলাম । হেমন্ত বলিল, “আমি বলিতেছি যে, তোমরা বসিবে । তরলোকরা শুনিলে নিশ্চয়ই বাহির হইয়া বাইবেন ।”

আমাদের অদূরে ভোগ আছে ; কে খণ্ডাইবে ? আমি বলিলাম, “বাক্ আমরা ঐ দিকে বাই ।”—যথার অস্তান্ত শ্রেণীর যাত্রী মহিলারা বসিয়া ছিলেন, আমরা তথায় বাইরা বসিলাম ও পার্শ্ববর্তী ছইটা সুবতীর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম । তাঁহারাও ছই জা ; গঙ্গাদানে আসিয়াছিলেন, হৃগলী বাইবেন । আমরা তাঁহাদের ছেলেমেয়ের কথা, শশুরশাশুড়ীর কথা—সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম । তাঁহারা খুব অমারিক ; বেশ আলাপ জমাইয়া লওয়া গেল ।

সহসা আমার বড় জা আমার গা টিপিলেন । আমি চাহিয়া দেখিলাম—

কক্ষে কাটুকিনাট্‌কি জিনিগতরা একটি ধামা লইয়া একজন প্রৌঢ়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। কি সর্বনাশ—“বেখানে বাঘের তর—সেইখানেই লক্ষ্য হইল?” ইনি বে শাওড়ীর কৃষ্ণদাসী! ইনি শাওড়ীর সম্পর্কে মাসী। কতকগুলি স্রীলোক অকারণে বনিষ্টতা করিতে যেমন পটু, অহেতুক কলহ করিতেও তেমনই পটু। ইহার সম্পর্কের একটু হত্ব পাইলেই বনিষ্টতা করে—কাবকর্ণে আসিয়া অত্যন্ত আত্মীয়তার নামে কর্তৃত্ব করে, গোল করিতে বড় ভাগবাসে, অন্যবস্ত্রক চীৎকারে আপনার অতিরিক্ত অনশীলতার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পায় এবং লোকের মুখের উপর কট্‌ কট্‌ করিয়া অশ্রির কথা বলে। এই লক্ষ লক্ষ মুখের ভোরে সর্বত্র জরী। কৃষ্ণমণি সেই ঘরের লোক। তাঁহাকে দেখিয়া অমরা উভয়েই ঘোমটা টানিয়া দিলাম। আমার আশা ছিল, তিনি আমাকে বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারিবেন না, কারণ আমি আমার জা'র পশ্চাতে ছিলাম এবং আমার জা একটু হাড়মাংসে সজ্জিত।” কিন্তু আমার ঘোমটার খটটা বোধ হয় কিছু অধিক হইয়াছিল, আর সেইজন্য তিনি আমাকেই লক্ষ্য করিলেন। ধামা মাদাইয়া তিনি বলিলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া লিঙ্কাস করিলেন, “তোমাকে কোথায় বেধিয়াছি?”

আমি বলিলাম “তাঁহা আমি কেমন করিয়া বলিব?”

তখন তিনি বিরলকেশ জুবুলা পরস্পর নিকটবর্তী করিয়া কোথায় আমাকে দেখিয়াছেন স্বয়ং করিতে সচেষ্ট হইলেন ও আগনা আগনি বলিতে লাগিলেন,—“বড় খুসীঘের বাড়ী? নাঃ। কুমোরটুণী? উ—হঁ। গোরা-বাগানে? না—”

আমার জা বলিলেন, “হয় ত থিয়েটারে কি কোন নিমন্ত্রণবাড়ী দেখিয়া থাকিবেন।”

তিনি কক্ষস্থরে বলিলেন, “না, গো না। আমাদের কি আর তোমাদের মত দ্বিধিপনার বয়স আছে যে, থিয়েটারে দেখা হ'বে?”

সহসা তাঁহার স্মৃতি, আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়া, তাঁহাকে সাহায্য করিল। তিনি বলিলেন, “মনে পড়েছে গো। তোমাদের বাড়ী শিমলার। তুমি আমার তাইখি বোন্ধার বড় ঘো।”

আমার জা দারুণ দ্বঃসাহসবলে বলিলেন, “আমাদের বাড়ী শিমলার নহে।” তবে “মরিয়া হইয়া” তিনি এই অসত্যের আশ্রয় লইলেন।

একথা শুনিয়া শাওড়ীর মাসী চুপ করিলেন। কিন্তু তিনি সম্মুখস্থিত ধামার

মুহু মুহু করাঘাত করিতে করিতে যেভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল, তিনি আমাদের মিথ্যাটা ধরিয়া ফেলিয়াছেন ।

আমাদের পূর্কপরিচিত ‘স্বভীষ্ম’র আমাদের অবস্থা দেখিরা মুখে কাপড় দিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন । আমরা দু’জনে কেবল ভাবিতে লাগিলাম, যদি শান্তকী জানিতে পারেন ?

•

টুপে উঠিয়া আমি আমার জা’কে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছা যদি এক দিন ঐ জীলোকটি বাড়ীতে বাইরা উপস্থিত হইয়া সব বলিয়া দেয় ?”

আমার জা’র মেজাজটা তখন ভাল ছিল না । সমস্ত দিন উপবাস, পঞ্চদশ, শান্তকী জানিলে কি বলিবেন, সেই প্রশ্ন—এই জাহ্নপর্ষে মেজাজ ভাল না থাকিবারই কথা । তিনি বলিলেন, “দেয় ত’ আর কি করিব, বলিব—দিশাশান্তকী বলিয়া রক্ত করিতেছিলাম । দেখ না, আর কি জারগা ছিল না ? চূড়ামণিবোধের দিন মিথ্যাকথাগুলি বলাইল ?”

হেমন্ত হাসিয়া উঠিল, বলিল, “মিথ্যাকথাগুলো কি জোর করিয়া কেহ বলাইরাছে ?”

আমি বলিলাম, ‘দার পড়িয়া । এসব তোমরা বুঝিতে পারিবে না ।’

জা বলিলেন, “এবার মরিয়া যেন পুরুষ হই ।”

হেমন্ত বলিল, “তাহা হইলে আমার আপিস করিতে হইবে ।”

আমি বলিলাম, “সে কথার আর কাণ নাই । এখন গন্ধাদান করিতে আসিরা বে পাপ করিয়া চলিলাম, তাহাতে না জানি অদৃষ্টে কি ভোগ আছে ।”

•

করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল । জা’কে তাঁহার শিকালয়ে নামাইরা দিয়া বাড়ী ফিরিলাম । হাতেমুখে জল দিয়া আসিলেই মা বলিলেন, “আহা সারাদিন অনাহারে আছি! আমি খাবার আনি ।”

এমন সময় স্বভীষ্মবড়ীর পুরাতন ঝি গছর মা সেই ঘরে প্রবেশ করিল ।

আমি একান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি, গছর মা ?”

গছর মা এক নিশ্বাসে বলিল, “ছোটখোদিনি, শীঘ্র বাড়ী চল । বেয়েরা ও জামাইরা সব আসিরা উপস্থিত ।”

‘সে কি ?’

“ছোট দাদাবাবু সব নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীতে কিছু বলেন নাই। এখন আমাকে বলেন, ‘এখনই বাইরা বড় বোঠাকরুণকে ও ছোট বোকে লইয়া আইস।’ কোন গোছ নাই : মেজবোদিদি ছেলেনের লইয়া বাস্তব শীঘ্র চল।

“বড় দিদির বাড়ী ঘাইতে হইবে?”

“তিনি গাড়ীতে।”

আর বাক্যবার না করিয়া বাইরা গাড়ীতে উঠিলাম। বুকিলাম, আমাদিগকে জন্ম করিবার জন্ত এই আয়োজন। আমার কা বলিলেন, “এ বিরূপ বন্ধ, কোন গোছগোছ নাই, এ অবস্থায় কি জামাই নিমন্ত্রণ করে?”

৯

রাজিতে স্বামীর সঙ্গে খুব একপাশা ঝগড়ার আয়োজন করিলাম, কিন্তু ঝগড়া জমিল না। আমি অনেক বুকিলাম, তিনি কেবল হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন “তোমরা পুণ্য করিতে পার, আর আমরা একটু আমোদ করিতে পারিব না?”

ঝগড়ার ঝড়টা কাটরা গেলে তাঁহাকে সে দিনের সব কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি খুব হাসিলেন—বলিলেন, “দেখ আমি তোমাদের কত উপকার করিলাম। পাপের প্রারম্ভিত হাতে হাতে হইয়া গেল, পুণ্যটার হাত পড়িল না।”

শুনিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, “তোমার কথাই ঠিক হউক—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। এমন সুখের—এমন আনন্দের পরিভ্রমেই যেন পাপের প্রারম্ভিত হইয়া যায়।”

তিনি বলিলেন, “আমার মুখে সহসা ফুলচন্দন পড়িবার কোন কারণ দেখিতেছি না। তাহাতে আমার বিশেষ আগ্রহের কারণও নাই। তবে আপাততঃ জামাইদিগের আগমনে আমার মুখে যে সকল সুখাধা পড়িয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহাদের পুনরাবর্তি হইলে মন্দ হয় না।”

বিদেহরাজ জনক ।

বিদেহের অপর নাম মিথিলা । ইহা অতি পুরাতন জনপদ । যে প্রাগৈতিহাসিকযুগের পুরাতন অতীতের বিশ্বস্তিগর্ভে লুপ্ত হইয়াছে, সেই যুগ হইতেই বিদেহের নাম দেশবিদেশে পরিচিত হইয়াছিল । কিন্তু আজ সেই অতীত সৌরব-দিনের কণমুতি মাত্র বিস্তমান । তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস অনাধরে কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে । আজ সেই পুরাণ-বিস্তৃত মিথিলার স্থান ও সীমা নির্দেশ করা পর্য্যন্ত একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ।

মিথিলার স্থান নির্দেশ করিতে বাইরা ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ নানারূপ বিকল্পমতের সৃষ্টি করিয়াছেন । কাহারও মতে, বিদেহ বর্তমান ত্রিহতের অন্তর্গত, আবার কাহারও মতে অন্তর্য । সেই তর্কবিতর্কের আলোচনা করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া কল নাই । আমাদের মনে হয় যে, আলোচ্য মিথিলা বা বিদেহ ত্রিহত জিলার অন্তর্গত ছিল । এই মতপ্রতিপোষক যুক্তি আমরা প্রদর্শন করিতেছি ।

১। ইংরাজ ঐতিহাসিক হণ্টার-প্রমুখ ব্যক্তিগণ ম্পষ্টতঃ মিথিলাকে বর্তমান ত্রিহতের অন্তর্গত জনপদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন । *Buddhist India* নামক পুস্তকের ৩৭ ও ৩৮ পৃষ্ঠার বিদেহের আলোচনা করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ বিখ্যাত অধ্যাপক রিড ডেভিডস বাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই :—

বিদেহ একটি প্রাচীন জনপদ ; মিথিলা ইহার রাজধানী ছিল । এক সময়ে বিদেহরাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল । নানা বৌদ্ধ ভ্রাতৃকে ইহার উল্লেখ আছে । এক সময়ে মিথিলা নগরের পরিধি ৫০ মাইলের অধিক ছিল । ইহা বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র বৈশালী বা বিনালীর ৩৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল । ইহা বর্তমান ত্রিহতের অন্তর্গত ।

২। ত্রিহত জিলার অন্তর্গত জনকপুর, মহর্ষি গৌতমশ্রমের জন্মাবশেষ এবং লোকপরিম্প্রদাচলিত বহু কিম্বদন্তী এই অতীত জনপদের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে । ইহা যে ত্রিহত জিলার অন্তর্গত জনপদ—এই মত পোষকতার পক্ষে ইহারা যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে ।

৩। আমরা রামায়ণ হইতে জানিতে পারি যে, তপোথন বিখ্যাত রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া আবোধা হইতে অর্দ্ধবোজন পথ অতিক্রমপূর্বক সরস্ব

দক্ষিণতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সে স্থান হইতে তাঁহারা নৌকাযোগে গঙ্গা-বক্ষে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া একটি খাপদলছুগ অরণ্য দেখিতে পারেন। নদী-তীর হইতে অর্ধবোজন পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা তাড়কার বাসভবনের সন্নি-
হিত হইলেন। তাঁহারা তাড়কার বধসাধন করিয়া বিখ্যামিত্রের আশ্রমে উপনীত হইলেন।
এই স্থানে বহু-সমাধিপূর্বক, উত্তরদিকে গমন করিয়া ক্রমশঃ গিরিতরঙ্গ (মগধ)
অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বিশালাধিপতি স্রুতির আতিথ্য গ্রহণ করেন। পরদিবস
তাঁহারা বিশালা হইতে যাত্রা করিয়া পূর্বোক্তর কোণাতিমুখে জনকের বহুদৈর্ঘ্যে
উপনীত হইলেন। এই বর্ণনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বিখ্যামিত্রের সঙ্গে
রামলক্ষ্মণ মগধ অতিক্রম করিয়া ত্রিহত অতিমুখে যাত্রা করেন।

৪। মিথিলা যে প্রাচীন তীরভূমি বা ত্রিহতের অন্তর্গত ছিল, এ কথা চীন-
পরিব্রাজক হুয়েংসাং স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে গঙ্গার উত্তর
তীরস্থ সমস্ত প্রদেশ বৃদ্ধি নামে অভিহিত হইত। এই প্রদেশ আবার নানা
জনপদে বিভক্ত ছিল। উদ্যম্যে বৈশালী বা বিশালা, তীরভূমি বা ত্রিহত এবং
মিথিলাই প্রধান।

৫। ত্রিহত প্রদেশে মিথিলার অবস্থান সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব
নাই। এ বিষয়ে ভবিষ্যৎপুরাণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

নিম্নে পুত্রস্ত তৈজস মিথিণ্যম মহানৃষতঃ।

প্রথমং ভূজবলৈর্বেন তৈরহতস্ত পার্বতঃ ॥

নির্মিতং স্বীয় নামা চ মিথিলাপুরমুত্তমম্

পুরীজননসামর্থ্যাক্ষনকঃ স চ কীর্তিতঃ।

এই রাজ্য কখন বা মিথিলা কখন বা বিদেহ কখন বা ত্রিহত নামে পরিচিত
হইরাছে। শক্তিসম্বন্ধে গণ্ডকীতীর হইতে আরম্ভ করিয়া চম্পারণ্যের শেষ
সীমা পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত ছিল বলিয়া কথিত হইরাছে।

গণ্ডকীতীরমারম্ভা চম্পারণ্যাস্তগে শিবে।

বিদেহভূঃ সমাখ্যাতাঃ তৈরহতস্তাভিধঃ স চ ॥

এইরূপ আরও বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা বাইতে পারে। তাহাতে
মিথিলাকে প্রাচীন ত্রিহতের অন্তর্গত ভূভাগ বলিয়া অনুমান করিবার বথেষ্ট সম্ভব
কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। রামায়ণে বিদেহ, মগধ প্রভৃতি দেশকে অপবিজ্ঞ
বলা হইরাছে। ইহাতে বোধ হয় যে, তখনও এই সকল দেশে আধাসত্যতা
সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই কারণে বহুদেশে আসিতে হইলে প্রারম্ভিকের

ব্যবস্থা ছিল। এ কারণেও আমরা মিথিলাকে ত্রিহত্যের সরিহিত কোন জনপদ বলিয়া মনে করি।

ভারতের ইতিহাস নাই। কত নত পুণ্যজনপদের পবিত্র স্থতি বিস্তৃতি-সাগরে লীন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হুতরাং মিথিলার ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশ করা সম্ভব নহে। কেবল ইহার গৌরবময় দিনের অস্তিত্ব বৃত্তিবার উপযোগী একটি কীর্ণস্থতি আশ্রয় ভারতবাসীর চক্ষুরে বর্তমান রহিয়াছে। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা এককালে গৌরবের স্থান ছিল। শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, এককালে নত নত পুণ্যস্থান অধির পবিত্র তপস্যার এই স্থান পুত হইয়াছিল। মহাভারতের সময়েও মিথিলার গৌরবের হ্রাস হয় নাই। ভারতীয় মহাসমরে বিদেহরাজ কোরবের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। অতি প্রাচীন কালেই এই জনপদ সভ্যতার উচ্চতম প্রায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমান সময়েও জ্ঞানশাস্ত্রের জন্ত এ স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ।

বাক্যলার প্রসিদ্ধ নৈরাসিক বাসুদেব সার্কভৌম মিথিলার জ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, কেবল কলনাপুটে প্রুই একটি কিম্বদন্তী এই প্রাচীন স্থানের ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

মিথিলার রাজনৈতিক ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। তাহা যতটুকু অবগত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপতঃ এষ্ট—চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের আবাবহিত পরেই মহা-ভারতের সময়ে যদুবংশীয় নৃপতিগণ মিথিলার শাসনব্যপ্ত পরিচালন করেন। ঐতিহাসিক যুগে যে সকল নরপতি মিথিলা শাসন করিয়াছেন, তন্মধ্যে কণাট হইতে আগত প্রমথবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বংশের অধিন্যপতি ১০১১ শকে বা ১০৮১ খৃষ্টাব্দে ত্রিহত্যে আগমন করেন। আর ২০৫ বৎসর রাজত্বের পর এই বংশের শেষ রাজা হরিসিংহ দেব যখনহুত্তে পরাজিত হইয়া নেপালের অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎপরে এক ব্রাহ্মণ-বংশ মিথিলা শাসন করেন। এই বংশের শিবসিংহ দেবের সময়ে মিথ্যাত কবি বিভূষণতি বর্তমান ছিলেন। ইহার পর হইতে ত্রিহত্যের নাম আর শুনা যায় না, সে প্রাচীন জনপদ অতীতের স্বপ্নসমুদ্রে ডুবিয়া যায়।

আমরা বিদেহরাজ জনকের বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়া প্রসঙ্গক্রমে মিথিলার পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। এই বার রাজবির বিষয় আলোচনা করা যাউক।

মহাভাগ জনকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে :—

রাজা নিমি অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার সূত্ৰা হইলে রাজ্যে অরাজকতার আশঙ্কা করিয়া সূত নিমির শরীর সুনিগূণ অস্ত্রগিতে মথন করেন; এই মথনের ফলে বে কুমার উৎপন্ন হইলেন তাঁহারই নাম জনক। তাঁহার পিতা বিদেহ (দেহ-রহিত) বলিয়া তাঁহার নাম বিদেহ। মথনের ফলে উৎপন্ন বলিয়া তিনি মিথিল নামেও প্রসিদ্ধ। স্তত্রাং মিথিলা, বিদেহ এবং জনক এক ব্যক্তিরই নামান্তরমাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই উক্তি সমর্থিত হইয়াছে, যথা—

অরাজক ভরমূগ্যম্ মস্তমানামহর্ষয়ঃ

দেহম্ মমাসুঃ ম নিমে কুমারঃ সমজায়ত।

জন্মনা জনকম্ সৌহৃদ্বিদেহস্তবিদেহকঃ

মিথিলো মথনচ্ছাত্তো মিথিলায়েন নির্মিতা।

কিন্তু রামায়ণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নিমির পুত্র মিথি এবং মিথির পুত্র জনক। রামায়ণকে অধিকতর গ্রামাণিক গ্রন্থ বোলে পণ্ডিতরা জনককে মিথির পুত্র বলিয়াই অস্বীকার করিয়া লয়েন। অব্যোধ্যাপতি মহাশ্বা দশরথ যে সময়ে প্রহ্লাদভূত হইলেন তৎকালে মিথিতম্বর জনক মিথিলা শাসন করিতেন। তিনি ধার্মিক ও ব্রাহ্মণপ্রিয়। তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়াও ভিখারী। তিনি মণিষ্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও এই স্বর্ষসংস্কৃত জগতের নীচতা তাহাকে স্পন্দ করিতে পারিত না। ফলতঃ তিনি সর্বপ্রকার ভোগাবস্থা দ্বারা নিৰ্বৃত্ত পরিবেষ্টিত থাকিয়াও এক দিকে তৎসমুদায়ে যেমন একেবারে স্বেচ্ছাপূর্ণ হইয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই প্রজাপালনপরিদর্শনেও কিছুমাত্র পরাশ্রয় ছিলেন না।

ভারতে যে সময় কন্দকাণ্ডের মহাশ্বা কীর্তন করিবার জন্ত মানাহাসনে বজ্র-ধেন্বী নির্মিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের গৌরব অক্ষুর করিতেছিল, সেই সময়ে ব্রাহ্মবিজ্ঞা নামে পরিচিত উপনিষদবর্ষিত তত্ত্বজ্ঞান ভারতের রাষ্ট্রভঙ্গন কর্তৃক ধীরে ধীরে উদ্ভাবিত, প্রচারিত ও পরিপোষিত হইতেছিল। এই অভিনব বিদ্যা ব্রাহ্মণগণ কত্রিগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিতেন। ইহারই ফলে উদার বুদ্ধিবশ্বের আবির্ভাবের পথ সুগম হইয়াছিল। মহাত্মা জনক এই অসুখ্য তত্ত্বজ্ঞানের অবিকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বজ্ঞান হইয়া তাঁহার নিকট আসিতে কিছুমাত্র কৃষ্ঠা বোধ করিতেন না। তাঁহার বন্দ্রজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া প্রাচীন আর্ষ্যসমাজ তাঁহাকে রাজর্ষি আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন। বিখ্যাত বাজবল্য ঋষি তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া শতপথ ব্রাহ্মণ রচনা করেন। এই শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজর্ষি জনক কতিপয় ব্রাহ্মণকে অগ্নিহোত্রের বিবরণ শ্রবণ করেন।

তাহারা কেহই তাঁহার প্রবেশ উত্তর দিতে পারিলেন না। কেবল বাজবন্দ্য আংশিক ভাবে তাঁহার প্রবেশ উত্তর দিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মগণ কুপিত হইয়া প্রস্থান করিলে বাজবন্দ্য জনকের অহসরণ করেন। ক্ষত্রিয়গণের নিকট ব্রাহ্মগণের পরাভবের কথা বহু উপনিষদের নানাস্থানে লিখিত আছে। তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন জনকের নিকট তবজিজ্ঞাসু অধিগণের আগমনবিষয় পাঠ করিয়া বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মগণের খণ্ডিত ও রাজমাশক্তি হ্রাসিত হয়। উপনিষদ সেই যুগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

জনকের সময় হইতেই এই ব্রহ্মবিজ্ঞান ক্ষয়পাত হয়। যে মহাত্মার আবির্ভাবে এমন মতের সৃষ্টি হইয়াছে, যে তাহার উদারতার নিকট বিংশ শতাব্দীর অধ্যাক্ষ তত্ত্বও হীন হইয়া যায়, এবং তাহার প্রতি সভ্যতাপ্রসিদ্ধ যুরোপীয় সমাজও সম্মান দেখাইতে কুণ্ঠিত হইবেন না, সেই মহাপুরুষের জীবনের একটি চিত্র রাখা যেন দেখিতে পাওয়া যায়। সে চিত্র কি উন্নত! সংসারভাগী বিরাট পুরুষ কর্তব্যাহুরোধে সিংহাসনে উপবিষ্ট। তপোবনের দ্বিধা দ্বারার রাক্ষস জনক ক্রীপূত্র লইয়াও সন্ন্যাসী।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ মিত্র ।

লজ্জাতুরা ।

(সংকৃত হইতে)

আধেক হৃদয় তা'র প্রেমরসে পূর,
আধেক হৃদয় তা'র লজ্জার আতুর,
একটি নয়ন তা'র প্রিয় যুগ পানে,
একটি নয়ন তা'র যুক্ত বাতায়নে;
একখানি পদ তা'র আছরে শয্যায়,
একখানি পদ তা'র কুণ্ঠিতলে রয়,
না পারে উঠিতে নারের রক্তিবারে আর,
রক্তনী প্রভাতে একি দায় অবসার !

রাজা মটুক রায়।

১

কেতাব প্রথম বয়ানেই আরম্ভ করিয়াছেন—

“ছেকন্ডর নামে বাদশা বিরাট নগরে।

সংসারের কর জিনি লিল বাহ জোরে ॥

তার মত বাদশা কেচ না হইল আর।

তামাম দেশেতে আছে প্রশংসা তাহার ॥”

জলুহাস নামে সেকন্ডর বাদশার এক পুত্র জন্মিল। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একদিন যুগরায় বহির্গত হইলেন ও একটি যুগের অহসরণ করিয়া গভীর জঙ্গলে বাইরা পড়িলেন। হরিণ এক শূভ্র বাহিরা পাতালে প্রবেশ করিল। তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাতালে জঙ্গ রাজার মূর্খকে গমন করিলেন। অশুচিবর্গ রাজপুত্রের কোন সন্ধান না পাইয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ দিল। বাদশা সেকন্ডর ও বেগম অজুপাহন্দরী এই দাম্পত্য সংবাদে মগ্নোহত হইলেন। গণক ভাকা হইল। গণকর বলিল, রাজপুত্র পাতালে জঙ্গ রাজার দেশে বাস করিতেছেন; কিছুদিন পরে সেই রাজার কন্যা বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিবেন।

“উচাটন ঘন অতি পুত্রের বিহনে।

কোন মতে সাধনা করিতে পারি মনে ॥

সাগর দেখিতে জাই মনে অভিলাষ।

তাহাতেও হয় যদি মনেতে উল্লাস ॥”

বেগমের মনস্তি করিবার জন্ত এক বিস্তৃত নদীর তীরে হাওয়ারানা প্রস্তুত হইল, বেগম সাহেবা অজুপাহন্দরী দাসদাসী সমভিষাঘারে সাধনা পাইবার আশায় নদীতীরে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন নদীর স্রোতে একটি বাস্র ভাসিয়া বাইতেছিল। বেগম আগ্রহসহকারে এক দাসীকে বাস্র ধরিতে হুকুম দিলেন। বাস্র ধরা দিল না। অবশেষে বেগম স্বয়ং বাস্র ধরিবার জন্ত জলে নাথিলে বাস্র আপনিই আসিয়া ঠাহার হাতে উঠিল। বেগম সিন্দূকের আবরণ উন্মোচন করিয়া ভয়ধো একটি স্বর্ণবর্ণের শিশু দেখিতে পাইয়া তাহাকে অপত্যনির্জিন্বেষে পালন করিতে লাগিলেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই পালিত পুত্রের নাম রাখা হইল—কালু। কাণ্ড বাদশার ভবনে দিনদিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে রাণী একটি পুত্র প্রসব করিলেন, যতিগণ গণিয়া বলিয়া সেল,—

“এই পুত্র শুভবর, হবে অতি ছত্রধর, আর হবে কামেল ককির । না করিয়া রাজ্যাকর্ষ, সদা রবে দয়াধর, ঘরে নাহি রহিবেক স্থির । গাজীনাথ ফাশে কর, গুন কহি মহাশয়, শুণবান পুত্র তব এই । ছেকন্দর এত শুনে, বড় তুষ্ট হইল মনে, জদি গনে করিল বিদাই ॥” ওকর নিকট কালু ও গাজী বীতিমতন শাস্ত্র বিজ্ঞা শিক্ষা করিলেন । “পড়িতে লাগিল দোহে কাশাম আলার । পড়িয়া আশেষ হইল দোহে বরাবর ॥ জাহেরি বাতেনি এলেম মাগুম হইল । ছনিয়ার মায়া বত তুচ্ছ সে জানিল ॥ ককিরি হাফেল হইল কালু ও গাজীরে । মনে মনে থাকে কেহ জানিতে না পারে ॥” গাজীসাহেব উপযুক্ত হইলে, সেকন্দর পুত্রের উপর রাজ্য-ভার অর্পিত করিবার বাসনা করিলেন । এই সময় গোলযোগ উপস্থিত হইল । গাজী সাহেব কিছুতেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না । তখন দৈত্য-রাজ হিরণ্যকশিপু কৃষ্ণভক্ত পুত্র প্রজ্ঞাদকে বশে আনিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ব্যবস্থার পুনরুত্থান আরম্ভ হইল । পুত্র অবস্থা জানিয়া অবশেষে শিঙা পুত্রকে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার অন্ত সাহসের প্রার্থনা করিলেন । পুত্র অগত্যা এক রাত্রির অবকাশ লইলেন । সেই রাত্রিতে কালু ও গাজীসাহেব সেকন্দরের বিরাট রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ককিরি লইয়া পলায়ন করিলেন । বিরাট নগর হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহার এক প্রকাণ্ড বনে প্রবিষ্ট হইলেন । গজীর জঙ্গলে সমুখে সাগর-সমান এক নদী দৃষ্টি-গোচর হইল । কি প্রকারে এই নদী পার হইবেন উভয়ে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে গাজীসাহেব হতহস্ত আশা আলার নাম করিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন । আলার মহিমার সেই আশা নৌকার পরিণত হইল । “উত্তম হইয়া তরি সাগরেতে ভাসে । গাজি কালু আনন্ডিত মনেও উন্নাসে ॥ বিছাখিলা বলিয়া মুখে চড়িল নৌকার । সু বাও পাইয়া তরি ভেসে চৈলে আর ॥ হাঙ্গর কুস্তির কত গুণক বকর । গাজিকে প্রণাম করে হুঁড়ি চাই কর ॥ প্রভুনাথ জপে বোহে বসিয়া নৌকাতে । নানাধেশ ফিরি শেবে আইল বাটেতে ॥ সাগরের ধারে বোহে দেখে সুন্দরবন । সে দিগে ঢালায় তরি তাই হুই কম ॥”

নদী পার হইয়া দুইজনে সুন্দরবনে আসিলেন । “গাজী বলে তাই কালু এই কোন্ বন । কালুবলে হয় বটে এই সুন্দরবন ॥ সুন্দরবনেতে বোহে হেরিতে হয় । সে বনের বাঘ বত আসিয়া ডবার ॥ মাথা নড়াইয়া সবে ছালাম করিল । জত বাঘ ছিল তাহা স্মরণ হইল ॥ ঢেণা বাঘ বাঘগণ হইল গাজীর কাছে । আনন্ডিত গাজীসাহা অতি দিল বিচে ॥ এই বত অষ্টম বৎসর সেই বনে । বনফল

বাইরা থাকএ চইজনে ॥” কিছুদিন এই ভাবে কাটাইয়া কালুসাহেবের মনে পড়িল,—

“ককিরের বিধি নাহি থাক। একটাই। এই বনে আর না রহিব গাজী তাই ॥”

এইরূপে সুলতানবনে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি সুলতান নগর তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। তাঁহারা পরিতোষে জানিতে পারিলেন যে, তামা খ্রীশামরাজ্যের ছাপাই নগর। ফকিরবংশ সুদার্স চইয়া ছাপাই নগরে প্রবেশ করিলেন, যবন বলিয়া খ্রীশামরাজ্য তাঁহাদিগকে রাজধানীতে স্থান দিলেন না। ফকিরের সাপে রাজার রাজ্য নষ্ট হইতে লাগিল। খ্রীশামরাজ্য ইহা বৃত্তিতে পারিয়া ফকিরবংশের লতপাগত হইলেন। গাজীসাহেব ছাপাইনগরের খ্রীশামরাজ্যকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া নগর পরিত্যাগ করিলেন। পুনরায় চইজন বন ভ্রমণ করিতে করিতে এক নদীকূলে উপনীত হইলেন—“এতক কহিয়া পির বেছ-মিয়া বলিয়া। সিদ্ধকূলে নদীধারে পৌছিল বাইরা ॥”

এই নদীকূলে গভীর জঙ্গলে কতকগুলি কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছিল, তাহারা আসিয়া কালু ও গাজীসাহেবকে বধেষ্টে সম্মান করিল। গাজীসাহেব সেই বনে এক নগর স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। আশ্রয় অগ্রহায়ে সঙ্কল্প তখনই কার্য্যে পরিণত হইল। স্বর্ণ হইতে পরীগণ আসিয়া সাতদিনের মধ্যে বন জঙ্গল সাক করিয়া সুলতান নগর নির্মিত করিয়া দিল। নগরের মধ্যস্থলে সোণার মসজিদ প্রস্তুত হইল, মসজিদের চতুর্দিকে মণিযুক্তা খল-মল করিতে লাগিল। রত্নকাঞ্চননির্মিত অলংকা অগ্রপম প্রাসাদরাজি উভালোকের রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া বনমধ্যে এক অনির্কমণীর শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। কালু ও গাজী মনের আনন্দে বর্ণমন্দিরে বাস করিতে লাগিলেন। নগরের নাম হইল স্বর্ণপুর বা সোণারপুর। “রাখ নাম স্বর্ণপুরি, এইত মিনতি করি, কিবা হয় কহ মম স্থানে। গাজি বলে এহা হইতে, নাহি বেধি কোনমতে, আর ভাল নাম কোন খানে ॥ জত লোগ জন ছিল, সবাক আদেশ দিল, এই স্থান জান স্বর্ণপুরি। এতক বলিয়া পরে চই সিংহাসন পরে, বৈসে দোহে মন লাভ করি ॥” এই স্থানে গাজীসাহেবকে ভূতে ধরিল, রমণীয় রূপের নিকট ভগবৎ প্রেমের পত্নীকর হইল। গাজীসাহেবের সোণাপুর দেখিবার জন্য রাজনীযোগে ধলে ধলে পরীগণ আসিতে লাগিল। কালু গাজী দুই ভাই স্বর্ণসিংহাসনে নিম্নিত আছেন, পরীগণ আসিয়া গাজীর রূপের কুয়নী প্রশংসা করিতে লাগিল, অবশেষে এমন সুলতান পুরুষের কোন সুলতানী গাজী

পাওয়া যায় কি না তাহারই আলোচনা আরম্ভ হইল । কথাশ্রবণে এক পরী বলিয়া উঠিল—“এক কল্পা আছে আমি দেখিয়াছি তার । তার রূপ যেহি চন্দ্র-
 পূর্ণা লক্ষ্য পায় । রূপধরী তার মত না দেখিছ আর । কোটী শব্দরূপের
 নিছনি তাহার । • • • ”পুনরায় সেই পরী লাগিল বলিতে । সে বেশ অনেক
 দূর দক্ষিণ দিগেতে ॥ সে দেশের নাম ডাকে ব্রাহ্মণানগর । গড় তার চারি দিগে
 বেধিতে স্তম্ভ ॥ • • • মকুট নামেতে জান রাজা সে দেশের । না ছিল রাজ্যতি
 হেন লঙ্কার রাবণের । রায়েত প্রজা যত তার ব্রাহ্মণ সকলে । তেরায়ে করেন
 তারী ববন দেখিলে ॥ • • • দক্ষিণা রায় নামে পোলাই রাজার । তার মত বীর
 নাই পৃথিবী মাঝার ॥ সাত মন চালের ভাত মহিষ গোটা চার । রোজ সে তক্ষণ
 করে,এরছা অরওয়ার ॥ চম্পাবতি কল্পা তার পরমসুন্দরি । গাজি হৈতে রূপ তার
 রূপে বিভাধরি ॥” এই স্থানে আরব্য উপক্ৰান্তের সেই কুমার লজ্জমন ও চিনার
 রাজকল্পা বেদৌরার উপাখ্যানের পুনরুত্থান হইল । পরীগণ উভয়ের রূপের তুলনা
 করিবার বাসনার গাজীকে নিদ্রিত অবস্থার ব্রাহ্মণানগরে চম্পাবতীর ঘরে লইয়া
 ধাইয়া ছইজনকে এক শব্যায় শয়ন করাইল । মাগাবলে অগ্রে চম্পাবতীর নিদ্রাভঙ্গ
 হইল । গাজীর রূপে চম্পা বিমুগ্ধ হইলেন, বলিতে লাগিলেন—“না লোক মন্দিতে
 চোর আসিয়াছে হেথা । না জান মটুক রাজা হর মোর পিতা ॥ শুনিলে মটুক রাজা
 কাটিবে তোমার ॥ তোমাকে বাঁচাতে কিছু না দেখি উপায় । দক্ষিণা নামেতে রায়
 পোলাই রাজার । বাহার বলতে লিল সকল সংসার ॥ মনিষ্ঠ ধরিয়া সেই আহার
 করায় । তাহার হস্তেতে নপি দিবেক তোমার ॥ ব্রাহ্মণানগর এই গুন বিবরণ ।
 এ রাজ্যের লোক যত সকলি ব্রাহ্মণ । অস্ত্র জাতিরে রাজা না দেখ থাকিতে ।
 জবন পাইলে শোশে দক্ষিণার হাতে ॥ শোন চোর বল তোমার শোন সমাচার ।
 নিলবতী নামে জান জননী আমার । সাত ভাই বড় মোর অণ্ডর জিনি বল ।
 চম্পাবতী নাম মোর কহিছ সকল ॥”

চম্পাবতীর পরিচয়ের পর গাজীসাহের পরিচয় আরম্ভ হইল । গাজীসাহের
 চম্পাকে বলিতে লাগিলেন, “বিরাট নগরে ঘর, পিতা মোর ছেকন্দর,
 অছপা স্তম্ভরী মাতা মোর । গাজীসাহা মোর নাম, গুন ওহে গুণধাম, এখানে
 আসিয়া হইছ চোর । আমার পিতার দাপে, সন্তত সংসার কাঁপে, কম্পমান সব
 দেবগণ । কত খেব পাগাইল, ত্রোদে কম্পমান হইগ, কত দেল পাভাল ছুখন ।
 • • • বেড়াইছ কত দেশে, বানাগাতে আসি লেখে, বলিলাম স্তম্ভর কন্যেতে ।
 সাত দল সেইখানে, থাকিলাম তুট মনে, ছাপাইনগরে কের গিয়া । শ্রীরামরাজার

তবে, স্বদেশে সজাতি কোরে সোনাপুরে গেলাম চলিয়া। নিবিড় কানন পুরি তাহাতে কর্তন করি, সাহা পরিয় ওছিলাতে জার। হাজার হালান তাতে, বানাইল পাতিজাতে, মছজেব বানার এক তার। সেই মছজেব ভিতরে, আছিগ্ন ঘূমের ঘোরে, ছট ছট পালকেতে। কে আনিল এতখানে, তাহা নাহি জানি মনে, বলিলাম তোমার সাক্ষাতে।”

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উভয়ের ভালবাসা চরমে উঠিল। চম্পাবতী জীবন-বোধন সমস্তই গাজীর চরণে অর্পণ করিলেন। পরস্পরে অনুরী-বিনিময় পর্য্যন্তও হইয়া গেল। উভয়ে এক লম্বায় শয়ন করিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলেন যে, পরীদিগের কৃপায় উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটয়া গিয়াছে। গাজীসাহেব আগত হইয়া দেখিলেন, তিনি সোণাপুরের মসজিদে ভাতা কালুর পার্শ্বে শুইয়া আছেন। অকস্মাৎ বিরাহে উভয়েই উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন, কপায় আছে রমণীর ‘বুক কাটে ত মুখ ফুটে না,’ চম্পাবতী মনের আশ্বাসে মনে মনেই পুড়িতে লাগিলেন। এথিকে গাজীসাহেবের প্রেমের আগার কালুসাহেব আর সোণাপুরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তখন অগত্যা ব্রাহ্মণানগরের অঙ্গসন্ধান হই ভাই বহির্গত হইলেন। যাত্রা করিবার সময় তাহারা দক্ষিণে সর্প দেখিলেন, সমুখে কে “আর” বলিয়া সতর্কতা করিল, মাথার উপর টিকটিকি ডাকিল, জননী পুত্রকে ছুড় খাওয়াইতে-ছেন দেখিতে পাইলেন। মাহুত হস্তীর উপর বসিয়া আছে, হালিনী ফুলের ডালা লইয়া বাইতেছে, গোয়ালিনী হুধের কেঁড়ে লইয়া সমুখ দিয়া গমন করিতেছে, ভরা কুম্ভ, সবংসা গাজী প্রকৃতি বাবতীর “স্থলকণ” তাহাদের নয়ন-ধে পতিত হইল। এই সমস্ত দেখিয়া গাজীর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। পথে কালু গাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কোন ভরকেতে দেশ পারিবে বলিতে। উত্তর দক্ষিণ কিবা পশ্চিম পূর্বেতে।” গাজী বলে ঠিক তাহা না পারিক হিতে। অগ্রমানে বৃষ্টি হবে দক্ষিণ দিকেতে। এইরূপে তিন মাস পথে চৈলে ঘুর, কোন খানে সে দেশের ঠিকানা না পার তার পর তিন মাস আবার চলিল, তবেত ব্রাহ্মণানগর নজরে পড়িল।”

ব্রাহ্মণানগরের চতুর্দিকে নদী, নদীর এপারে কান্তিপুর, দুই ভাই ডেরা কেলিয়া দূর হইতে নগরের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। খেত পাতরের বাধাঘাট, সূর্যের নিশান, দূর হইতে বোধ হয়, সহরখানি যেন অগ্নিবর্ণে জলিতেছে। ব্রাহ্মণানগরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিও গেলে প্রবন্ধ সাতশত বর্ধিত হইয়া পড়ে, কারণ সেটি তখন গাজী সাহেবের নজরে অমরাপুরী হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

শ্রীমৎস্যরায়।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চৎ ।

সম্রাট্ আকবরের রত্নভাণ্ডার ।

সম্রাট্ আকবরের রত্নাগারের সমুদায় রত্নের সংখ্যা করিতে অথবা তাহাদের ভগ্নবর্ণনা করিতে গেলে আমরা বহু পৃষ্ঠা লিখিণেও ফুঁসাইতে পারি কি না সন্দেহ । তবে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনার্থ তৎসমুদায়ের প্রধান প্রধানগুলির শ্রেণীবিভাগ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব ।

এই রত্নাগারের নিমিত্ত সম্রাট একজন বুদ্ধিমান, বিখ্যাত ও কার্যাদক্ষ অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সাহায্যার্থ একজন অস্ত্রজ্ঞ মুন্সী, একজন দারোগা এবং বহুসংখ্যক ভহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রকারে রত্ননিচয় বিভাগ করিয়াছিলেন :—

পদ্মরাগমণি ।

১ম শ্রেণী	মূল্য	১০০০ মোহরের কম নহে
২য় "		৯৯৯ হইতে ৫০০ মোহর পর্য্যন্ত
৩য় "		৪৯৯ " ৩০০
৪র্থ		২৯৯ ২০০
৫ম		১৯৯ ১০০
৬ষ্ঠ		৯৯ ৬০
৭ম "		৫৯ ৪০
৮ম "		৩৯ ৩০
৯ম "		২৯ ১০
১০ম		৯ ৫
১১ম		৪ ১
১২ম "		১ " ১ "

ইহার নিম্নমূল্যের পদ্মরাগের কোনও বিশেষ হিসাব লওয়া হইত না ।

হীরক, মরকতমণি, রক্ত এবং নীল যাকৃত (yaqut)

১ম শ্রেণী ৩০ মোহর ও তদ্রূপ মূল্যের প্রস্তর

২য় শ্রেণী ২৯ $\frac{১}{২}$ মোহর হইতে ১৫ মোহর পর্য্যন্ত মূল্য

৩য় ১৪ $\frac{১}{২}$ " ১২ "

৪র্থ ১১ $\frac{১}{২}$ " ১০ "

৫ম ৯ $\frac{১}{২}$ " ৭

৬ষ্ঠ ৬ $\frac{১}{২}$ " ৫

৭ম ৪ $\frac{১}{২}$ " ৩

৮ম ২ $\frac{১}{২}$ " ২

৯ম ১ $\frac{১}{২}$ " ১

১০ম ৮ $\frac{১}{২}$ তক্বা হইতে ৫ তক্বা পর্য্যন্ত মূল্য

১১ম ৪ $\frac{১}{২}$ " ২ তক্বা পর্য্যন্ত মূল্য

১২ম ১ $\frac{১}{২}$ " ১

মুক্তা।

মুক্তাগুলি ১৬ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং ২০টি করিয়া এক একটি মাণায় বা ছড়ার গাথা থাকিত।

১ম শ্রেণীর ছড়ার এক একটি মুক্তার মূল্য ৩০ মোহর এবং তদ্রূপ

২য় শ্রেণীর ছড়ায় ২৯ $\frac{১}{২}$ হইতে ১৫ মোহর পর্য্যন্ত মূল্যের মুক্তা

৩য় ১৪ $\frac{১}{২}$ " ১২ "

৪র্থ ১১ $\frac{১}{২}$ " ১০

৫ম ৯ $\frac{১}{২}$ " ৭

৬ষ্ঠ ৬ $\frac{১}{২}$ " ৫

৭ম ৪ $\frac{১}{২}$ " ৩

৮ম ২ $\frac{১}{২}$ " ২

৯ম ১ $\frac{১}{২}$ " ১

১০ম ১ মোহরের নিম্ন হইতে ৫ তক্বা পর্য্যন্ত মূল্যের মুক্তা

১১ম ৫ তক্বার নিম্ন হইতে ২

১২শ শ্রেণীর ছড়ায় ২ তরকার নিম্ন হইতে ১৫ তরকা পর্য্যন্ত মূল্যের মুক্তা			
১৩শ	১৫	,,	৩০ দাম পর্য্যন্ত মূল্যের মুক্তা
১৪শ	৫০ দামের নিম্ন হইতে ২০		
১৫শ	২০		১০
১৬শ	,,	১০	৫

যে শ্রেণীর ছড়া সেই শ্রেণীর সমসংখ্যক হুজ্রে মুক্তাগুলি গ্রথিত হইত ; অর্থাৎ ১৬শ শ্রেণীর ছড়ায় ১৬টি হুজ্রের ব্যবহার হইত । ছড়ার হুজ্রের প্রান্ত-ভাগে সান্নাভ্যের মোহর থাকিত, এবং প্রত্যেক মুক্তার একটি বর্ণনা তৎসঙ্গে সংলগ্ন থাকিত । পাঠকগণ, শ্রবণ রাখিবেন যে, সেই সময়ে তরকা বড় দ্রুতপা দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইত । অধুনা টাকার মূল্য বড় কম ; অর্থাৎ টাকা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে সহজলভ্য হইয়াছে । উপরিলিখিত তালিকার মণিমুক্তার মূল্য তরকার নির্দিষ্ট হইয়াছে । আজকালকার টাকার নির্দিষ্ট হইলে ঐ সমুদায়ের মূল্য অনেক অধিক হইত, সন্দেহ নাই ।

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় ।

— ১০:—

প্রিয়স্মৃতি ।

(শৈলী)

শুভরিতা শুভরিতা গানটি গেলে মরে
রত গো স্মৃতি জেগে তোহার অনুরণনহরা ;
মজরিতা মজরিতা কুহুম ঝরি' পড়ে
গন্ধ তা'র বন্ধ থাকে পরাণমনতরা ।

গোলাপগুলি বরঝরিয়ে পড়িয়ে গিয়ে ঝরে'
পাপড়ি দিয়ে প্রিয়জনদের শয্যা রুচে তা'রা ;
ধরঝরিয়ে বর্ষভরা তোমার স্মৃতি'পরে
স্নেহটি ঘুমে আঁকড়ে র'বে বখন তোমাহারা ।

শ্রীকালিদাস দাস ।

পুরাণকথা।

(১)

আজকাল প্রতীচ্য প্রথার পুরাতত্ত্বের যেরূপ আলোচনা হইতেছে প্রাচ্য প্রথার সেরূপ হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য প্রথমোক্ত প্রথা নানা অতুলকানপ্রসূত বলিয়া অনেক স্থানে অত্রান্ত ও অপ্রমাদ; পরবর্তী সেরূপ হইবার সম্ভাবনা অল্প। তথাপি যেন মনে হয়, উহাও যখন এক প্রকার পুরাতত্ত্বের আলোচনা তখন উহাও ত্যজ্য নহে।

এই প্রতীচ্য ও প্রাচ্য উভয় প্রথার একটি ইংরাজী—অপরটি সংস্কৃত। সংস্কৃত ধরণের মূল গ্রন্থ আমাদের পুরাণাদি। আমি এই পুরাণাদি হইতে আমাদের পুরাণবৃত্তে প্রচলিত পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

পুরাণের মধ্যে প্রথমে বিষ্ণুপুরাণ আমার আলোচ্য বিষয়। পুরাণ বলিতে আমরা বুঝি—

“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোদ্ব্যস্তরাপি চ।

বংশাচ্চরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥”

অর্থাৎ সৃষ্টি, লয়, বংশ, বদ্যস্তর ও বংশকাহিনী এই পাঁচটি লইয়া পুরাণ। রাজগণের বংশাবলি প্রদানকেই বংশ বলা হইয়াছে ও তাঁহাদের মধ্যে যাহারই কোন উল্লেখযোগ্য কাহিনী থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাও পুরাণে বর্ণিত হইবে।

এখন রাজবংশের মধ্যে আমাদের পুরাণবৃত্তে সর্বাচল্যবংশই রাজবংশ। বিষ্ণুপুরাণে এই দুই বংশের বে বংশবলী ও কাহিনী আছে তাহা সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিলে বিশেষ অকৌতূহলকর বলিয়া বিবেচিত হইবে, এরূপ মনে করি না। যেহেতু তাহাও এই পুরাতত্ত্বের আলোচনার দিগে সর্বজনবিদিত থাকা আবশ্যক।

সূর্য্যবংশ ও তৎসংক্রান্ত কতিপয় কাহিনী।

- (১) ব্রহ্মা
- (২) দক্ষ
- (৩) অদিতি
- (৪) বিশ্বদেব

(৫) নগ

(৬) ইক্ষাকু, বৃগ, দ্রুত, শর্বাতি, নর্রিবাত্ত, প্রাংগু, নভগ, নেদিষ্ট, করুস, পুষত্র ।

(৭) বিকৃক্ষি, নিমি, দণ্ড

(৮) পরত্তর (ককুংহ)

(৯) অনেনা

(১০) পুগু

(১১) বিষগণ

(১২) আদ

(১৩) বুবনাথ

(১৪) প্রাবত্ত

(১৫) বৃহন্নথ

(১৬) কুবলয়া

(১৭) দৃঢ়াথ, চন্দ্ৰাথ, কপিলাথ

(১৮) হর্ষাথ

(১৯) নিকুন্ত

(২০) সংহতাথ

(২১) কুশাথ

(২২) এসেনজিৎ

(২৩) বুবনাথ

(২৪) দাছাতা

(২৫) পুরুকুংস, অধরীষ, দুচুকুস

(২৬) জগদম্বা,

বুবনাথ হরিত

বিষ্ণুপুরাণ বলেন, ইক্ষাকুর (৬) একশত পুত্র । তাহার মধ্যে বিকৃক্ষি, নিমি ও দণ্ড এই তিনজনই প্রধান । অপর ২৭ পুত্রের মধ্যে ৫০ জন (ইচ্ছাদের মধ্যে একজনের নাম শকুনি) উত্তরাংশ প্রদেশের ও ৪৭ জন দক্ষিণাংশ প্রদেশের রক্ষকরূপে প্রেরিত হইলেন । বিকৃক্ষির (৭) আর একটি নাম শনাথ । পিতা ইক্ষাকু অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবেন বলিয়া বিকৃক্ষি বনে শীকার করিতে বাহ্যেন । শীকারের পরিশ্রমে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হইয়া বিকৃক্ষি হত গৃহীত পশুগণের মধ্যে একটি শবক খাইয়া জল পান করেন ; তাই তাহার শবদ নাম হয় । পরত্তরের (৮) অপর নাম ককুংহ । দেবাসুরের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের মধ্যে দেবতারা এক সময়ে সময়ে পরত্তরের সাহায্য প্রার্থনা করেন । তাহাতে পরত্তর এই সর্ভে সম্মত হইলেন যে, তিনি বৃদ্ধ করিতে পারেন, যদি দেবরাজ ইন্দ্র তাহার বাহনরূপে নিয়োজিত হইলেন । দেবতারা অগত্যা তাহাই স্বীকার করেন ও ইন্দ্র বৃষভরূপে পরত্তরের বাহন হইলেন । বৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুংহের উপর বলিয়া বৃদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া পরত্তরের অপর নাম ককুংহ হইয়া গেল । তদবধি পরত্তরের অধস্তন পুরুবংশ কাকুংহ বলিয়া বিখ্যাত ।

এই প্রাবত্তই (১৪) প্রাবত্তী (বর্তমান Sabot-Mahel) নগরী প্রস্তুত করেন । কুবলয়া (১৬) ঋষি উত্তরের পরম শত্রু ;

- (২৭) সমুদ্র
(২৮) অনরণ্য
(২৯) পুষ্পদম্ব
(৩০) হর্ষব
(৩১) বসুমনস্
(৩২) সুধম্বা
(৩৩) জ্যোত্বক
(৩৪) সত্যবত (ত্রিশঙ্কু)
(৩৫) হরিশ্চন্দ্র
(৩৬) রোহিতাম্ব
(৩৭) হরিত
(৩৮) চকু
(৩৯) বিজয়, বভ্রদেব
(৪০) কুরুক
(৪১) ব্রক
(৪২) বাহু
(৪৩) সগর
(৪৪) অসমরস
(৪৫) অংগুমান
(৪৬) দিলীপ
(৪৭) ভগীরথ
(৪৮) ক্রত
(৪৯) নাত্যগ

ধুন্ধ্রনামক এক দানবকে বধ করেন বলিরা
ঊহার অপর নাম ধুন্ধ্রন।

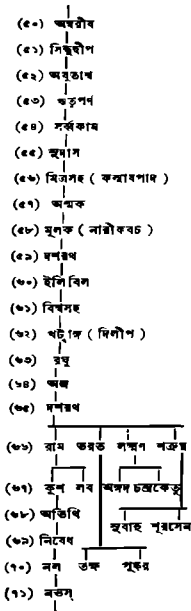
মাকাতার (২৯) এষ্ট তিন পুত্র ব্যতীত
৫০টি কন্যা ছিলেন। অধি দৌতরি তাঁহাদিগকে
বিবাহ করেন। মাকাতার পত্নীর নাম বিন্দু-
মতী; ইনি চন্দ্রবংশের অশ্বর্গত বগবানীর রাজা
শশবিন্দুর কন্যা।

মাকাতার দ্বিতীয় পুত্র অধরীষের পুত্রস্বরূপ
রাক্ষস হইয়াছিলেন। রাক্ষস সমাজে ইহারাই
যথাক্রমে আদিরথ ও হারীত গোত্রদ্বয়ের
প্রবর্তক।

অনরণ্য (২৮) লঙ্কাধিপতি রাবণ কর্তৃক
নিহত হইলেন।

রাজা সত্যবতই (৩৪) পরিশেষে ত্রিশঙ্কু
নামে অভিহিত হইলেন।

সগরের (৩৩) অসমরস (৪৪) ভিন্ন
অপর ৬০ হাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহাদিগকে
কপিলশাপে ভস্মসাৎ হইতে হয়। সগরকে
ঊহার পৈতৃক রাজ্য পাইতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে
হইয়াছিল। সগর যখন মারুগর্ভে তখন হৈহয়রা
আসিয়া শক, যবন ও তালকজ্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয়
গণের সাহায্যে সগরের পিতাকে রাজ্যচ্যুত
করিয়া দেয়। তখন রাজা ও রানী কোনক্রমে
বনে পলায়ন করেন। সগর বনেই জন্মগ্রহণ
করেন। ক্রমে তিনি বহুবলিক্রমে হৈহয়দিগকে
পরাজিত করিয়া পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন।
তাঁহাদের সাহায্যকারী শক, যবন, কাছোজ,
পারদ ও পল্লবদিগের সহিত তাঁহাকে সংগ্রাম
করিতে হইয়াছিল। সংগ্রামে তাঁহারা পরাজিত
হইয়া গ্রাণরক্ষার জন্য সগরের কুলশুরু বশিষ্ঠের



অশ্বত্থ লক্ষ্য । গুরুত্ব অধিকার সগর তাহাদিগের প্রাপনকা করিলেন ; কিন্তু যখনদিগকে মুণ্ডিত, শকদিগকে অর্ধমুণ্ডিত, পারদদিগকে প্রলম্বিত-কেশ ও পল্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের এক একটা পার্থকা করিয়া দিলেন ও তাহাদিগকে ব্রাহ্মণা ধর্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ার তাহারাও ক্রমে ক্রমে স্নেহ হইয়া গেল ।

ভগীরথ (৪৭) গঙ্গা আনয়ন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন । ভগীরথের গঙ্গানয়নব্রতান্ত পাঠে মনে হয়, ভগীরথের সে কৃত্তিবীর পূর্বে মর্ত্যভূমিতে গঙ্গা ছিলেন না । কিন্তু পাঠক-গণ ভগীরথের উদ্ধতন একাদশ পুরুষ হরিশ্চন্দ্রের গল্পের বিষয় যদি স্মরণ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, হরিশ্চন্দ্র কাশ্মীরাণ্যে গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকার ঘাটে চণ্ডালের কার্য্য করিয়াছিলেন । এখন ভগীরথই যদি মর্ত্যে গঙ্গানয়নের মূল পুরুষ হইলেন, তবে হরিশ্চন্দ্রের সময়ে গঙ্গা আসিলেন কোথা হইতে ? এ জিজ্ঞাসার উত্তরে আমরা মন্তব্যপুর্বে ১১৫—১২১ অধ্যায়ের অন্তর্গত ব্রতান্তের মধ্যে এই ব্রতান্তটি পাই যে, পুরাণ-প্রসিদ্ধ আটটি মহত্ত্বের মধ্যে যখন বর্ষ চাক্ষুষ মহত্ত্বের অধিকার কাল ছিল, তৎকালের সূর্য্যবংশীয় ভগীরথই গঙ্গানয়ন করিতে তপস্বী করিয়াছিলেন । সুতরাং তৎপরেবর্ত্তী বৈবস্বত মহত্ত্বের হরিশ্চন্দ্র বৈবস্বত মহত্ত্বেরই ভগীরথ হইতে উদ্ধতন পুরুষ হইলেও কাশ্মীতে যে গঙ্গা দেখিবেন তাহাতে আর বিশ্বাসের বিষয় কি ? গঙ্গা পৃথিবীতে পূর্বে মহত্ত্ব হইতেই অবস্থান করিতেছিলেন ।

(৭২) পুণ্ডরীক	(২৬) বিষ্ণুতবান্
(৭৩) কেমথবা	(২৭) বৃহদ্বল
(৭৪) দেবালীক	(২৮) বৃহদক্ষণ
(৭৫) অধীনস্ত	(২৯) শুকক্ষেপ
(৭৬) কুরু	(৩০) বংশ
(৭৭) পারিষাত	(৩১) বংশবাহ
(৭৮) মল	(৩২) প্রতিবোধ
(৭৯) শল	(৩৩) দিবাকর
(৮০) উকথ	(৩৪) সহদেব
(৮১) বজ্রনাভ	(৩৫) তরদম্ব
(৮২) নখনাভ	(৩৬) ভাহুরথ
(৮৩) বাখিতাথ	(৩৭) অপ্রতীক
(৮৪) বিশ্বসহ	(৩৮) মরুদেব
(৮৫) হিরণ্যনাভ	(৩৯) অনক্ষত্র
(৮৬) পুষ্প	(৪০) কিল্লর
(৮৭) একবসন্তি	(৪১) অন্তরীক
(৮৮) হৃদর্শন	(৪২) সুবর্ণ
(৮৯) অগ্নিবর্ণ	(৪৩) মিত্রজিৎ
(৯০) শীত	(৪৪) বৃহজাম
(৯১) মরু	(৪৫) কৃতজ্ঞ
(৯২) প্রহুত	(৪৬) রনজ্ঞ
(৯৩) সুগবি	(৪৭) সজ্ঞ
(৯৪) অমর	(৪৮) শাকা
(৯৫) মহাবান্	

(১১৯) শুদ্ধোদন

(১২০) রাতুল

(১২১) এসেনজিৎ

(১২২) কুঙ্গক

(১২৩) কুণ্ডক

(১২৪) প্রব্রথ

(১২৫) সুমিত্র

ইক্ষাকুণামরং বংশঃ সুমি-
ত্রাস্তো ভবিষ্যতি—বলিরা বিষ্ণু-
পুরাণ এই স্থানে ইক্ষাকুবংশ
শেব করিয়াছেন ।

জৈমিনীর শিষ্য বাজবল্লা এই হিরণ্য-
নাভের (৮২) নিকট বোগ শিক্ষা করিয়া-
ছিলেন ।

এই কলিশেবে যখন সত্যযুগের পুনরাগমন
হইবে, তখন এই পৃথিবীর রাজদণ্ড গ্রহণ
করিবার জন্য মহা (৯১) নাকি আজও
কোথাও গুপ্তভাবে কাল কাটাইতেছেন ।

ভারতবর্ষে সূর্য্যবংশীয় রাজা বৃহদ্রথ (৯৭)
অর্জুনপুত্র অতিমহা কর্ষক নিহত হইলেন ।

পাঠকগণ দেখুন, বিষ্ণুপুরাণে কেমন শুদ্ধো-
দনের (১১৯) পুত্র বৃদ্ধ লিখিত না হইয়া রাতুল
লিখা হইয়াছে । অথচ যেন মনে হয়, রাতুল
নামটি বৃদ্ধপুত্র রাহুলেরই মত । বৃদ্ধপুত্র রাহুল
কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করার শুদ্ধোদনবংশ নির্বংশ
হইয়া যায় । এখানে রাতুল পুত্রবান্ । এ সমস্ত
বুঝিয়া উঠা কঠিন । আর শাক্য বিষ্ণুপুরাণে
এক ব্যক্তি ; কিন্তু বৌদ্ধগণের বুদ্ধরাজ-
সম্বলিত গ্রন্থে “সকাবত ভো রাজকুমার পরমা
সকাবত ভো রাজকুমারায়ো” এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ
বাক্য অবলম্বনে শুদ্ধোদন বংশে শাক্যনামের
ব্যবহার । ইহাও একটা বেশ রহস্যময়
ব্যাপার ।

শ্রীবিনোদবিহারী বিজ্ঞাবিনোদ ।

অদৃষ্টচক্র।

উপক্রমণিকা।

দর্শন।

কে সে?

ভাষ্যের গঙ্গা ; অঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের ললিত লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে। নদীমধ্যে বালুকার গঠিত চর ডুবিয়া গিয়াছে ; ছই কূলে বিস্তৃত সৈকতের অর্ধাংশের অধিক জলতলে। ভাগীরথী যেন পূর্বের বিবৃতি কিরিয়া পাইয়াছে। পূর্বকূলে গ্রাম ; এককালে জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল ; এখন হ্রতসম্পদ, গতগৌরব। বাজারের সর্বত্রই পল্লীগ্রামের এই দশা ; নগর-মানবের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য গ্রামবাসীরা স্থলশ্রমের পল্লীবাস ছাড়িয়া কস্মাকোলাহল-বহুল নগরে গিয়াছে। গ্রামের উচ্চ শৌধচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ; গৃহাগ্রে কাশতৃণ জন্মিতেছে ; জনহীন গৃহে শৃগাল-কুকুর-বিষধর আশ্রয় পাইয়াছে ; পুণ্যকামীর পুণ্যকীর্ত্তি সন্ধ্যার শৈবালসমাজের ; দেবমন্দিরের জীর্ণসংস্কার হয় না ; বাধা ঘাটে ইষ্টক বসিতেছে, ইষ্টকের মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ জন্মিতেছে। বাহারা ধনে, বিদ্যায়, গুণে প্রধান—তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। গ্রামের উন্নতি হইবে কিরূপে ? নদীপথে গতান্নাতে নৌকা হইতে দেখিলে ইচ্ছাপূর পরিভ্রাত্ত পল্লী বলিয়াই মনে হয় ; কেবল বনপল্লব বৃক্ষভাজির মধ্যে মধ্যে ছই একটি গৃহ ইহার পূর্বগৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামের অবস্থা যেমন, নদীর অবস্থাও তেমনই। পূর্বের গ্রাম নদীতীরে ছিল ; এখন নদী বহুদূর সরিয়া গিয়াছে। বর্ষার পর হইতে জল সন্নিহিত আরম্ভ হয় ; তখন গ্রাম হইতে প্রায় এক পোয়া পথ বালুকাকীর্ণ ভীরভূমি অতিক্রম করিয়া জলে আসিতে হয়, নদীর মধ্যভাগেও চড়া পড়িয়াছে।

এখন ভাষ্যের নদী ; কূলে কূলে ডরা। তাই জল আবার গ্রামের নিকটে আসিয়াছে। শিবমন্দির হইতে বে সোপানশ্রেণী পূর্বের জলে নামিয়া গিয়াছিল, এখন বঙ্গদেশের অধিকাংশ সময় তাহার ও নদীর মধ্যে বে দীর্ঘ ব্যবধান থাকে, এই সময় তাহা কমিয়া আসিয়াছে।

অপরূহ ; কিন্তু সারাহের বিলম্ব আছে ; তাই এখনও দ্বানের ঘাটে জনতা নাই। নদীবক্ষে বীঘরগণ নৌকা বাহিয়া মৎস্য সংগ্রহ করিতেছে ; নৌকায়

পাড়াইরা আল ছড়াইরা কেলিতেছে যখন শুটাইরা তুলিতেছে, তখন জালে রক্তববল মস্তগুলি মুক্তিলাভের চেষ্টায় দারুণ চাকলা প্রকাশ করিতেছে। সেগুলিকে নৌকার খোলে ফেলিয়া ধীরগণ আবার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আল কেলিতেছে। আকাশে লবু মেঘ ভাসিয়া বাইতেছে; কেহ ধূসরাত খেত, কেহ কুমুদ্রত। হুই একটি মাছরাঙ্গা আহাঃ সন্দেশে জলে ডুব দিতেছে, যে বার মৎস্য ধরিতে পারিতেছে সে বার উড়িয়া যাইয়া বৃক্ষশাখায় বসিয়া আহাঃ আশ্বসাৎ করিতেছে; তাহাদের বর্ণবৈচিত্র্যমানোরম দেখে রবিকরে সমুজ্জ্বল দেখাইতেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক দল জলচর বিহগ গগনে উড়িয়া বাইতেছে; রবিকরদীপ্ত নদীজলে তাহাদের ছায়া পড়িতেছে; পবনে তাহাদের পক্ষাঘাতলব দূরগত ঝটিকা-গর্জনের মত শুনাইতেছে।

গ্রামের মানের ঘাটে জনতা নাই; এখনও ঘাট রমণীমণ্ডলীর কথাও কলহান্তে শুভ্রনমুখর মধুচক্রের মত হয় নাই। ঘাটে কেবল দুইজন রমণী। প্রথমা বোড়শী, দ্বিতীয়ার বয়স দ্বাদশের অধিক হইবে না। প্রথমা ঘাটে স্নানার্থীদিগের সুবিধায় অল্প রক্ষিত বৃহৎ কাঠখণ্ডের উপর অলঙ্কৃতরাগ-রেখাঙ্কিত দক্ষিণ চরণ তুলিয়া গাজমার্জিনী দ্বিরা মার্জিত করিতে ছিলেন। দ্বিতীয়া একটু অধিক জলে গিয়াছিল। সে কিছুক্ষণ আগ্রীব জলমগ্ন থাকিয়া সন্তরণের আয়োজন করিতেছিল। সে কেবল জলের উপর পদ্মভদেহ ভাসাইয়া প্রদারিত করে জল সঞ্চালিত করিয়াছে, এমন সময় প্রথমা বলিলেন “সন্দেশা, আবার সাঁতার দিতেছিস্?”

বালিকা বলিল, “দিদি, তোমার বড় ভয়।”

“ভোর আর সাহস দেখাইরা কাঁচ নাই। তাসের নদী। এই স্রোতের টানে কি কখনও সাঁতার দিতে আছে?”

বালিকা কিরিয়া আসিল।

নদীর মধ্যভাগে একখানি লালভিন্দি উজান বাহিয়া বাইতেছিল। পাড়ীরা সবগে দাঁড় টানিতেছিল; নৌকা নদীর উজান স্রোত অবহেলা করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিল। নৌকার আরোহী চারিজন যুবক; তিন জন সমবয়স্ক—বয়স ঊনবিংশ হইতে একবিংশের মধ্যে, কেবল একজনের বয়স সপ্তবিংশ বা অষ্টাবিংশ হইবে। বাহ্যিক বয়স অপেক্ষাকৃত অধিক সে কিছু গম্ভীর। কিন্তু সে গাম্ভীর্য্য যে কৃত্রিম, তাহা একটু চেষ্টা করিলেই বুঝা যায়। সে সঙ্গীদিগের “মুকুঝির” পদ লইতেছিল; অন্তর্য্য চলিত কথা—অতি সাধারণ মত এমন গম্ভীর

ভাবে ব্যক্ত করিতেছিল, যে সহসা মনে হয়, যেন লোকটা প্রকৃতই হৃদয়পূর্ণবেশ-শক্তি-সম্পন্ন দার্শনিক; তাহার কথিত মত যেন একান্তই মৌলিক। সে আপনাতঃ অল্প বিদ্যাকে প্রচুর দেখাইবার কৌশলে অভ্যস্ত।

নোকামধ্যে যুবকগণ ঘাটে রমণীস্বরকে দেখিল। একজন বলিল, “দেখ, কি সুন্দরী!”

আর এক জন দাঁড়ীদিগকে নোকার বেগ ভ্রাস করিতে বলিল। ক্রান্তগতি নোকা মন্যগতি হইল।

বালিকা পূর্ক হইতেই নোকা দেখিতেছিল। যুবতী চরণ-মার্জন শেষ করিয়া কিরিয়া নোকা দেখিতে পাইলেন।

তিনি দেখিলেন, নোকা হইতে যুবকগণ তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া আছে। তিনি একবার তাহাদিগের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখে বিরক্তি ও বিষন্ন সপ্রকাশ হইল। তখন দুই ভগিনীর মুখে অপরাহের রবিকর পড়িয়াছে। নোকাবাত্তী যুবকদিগের নয়নে উত্তরের মূর্ত্তি সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

যুবতী তন্ত্রে কবরীর উপর অবস্ফুটন তুলিয়া দিলেন, বালিকাকে বলিলেন, “সরোজা, বাড়ী চল।”

বালিকা কিরিয়া দাঁড়াইল; রবিকরে তাহার প্রচুর কেশমধ্যস্থ স্বর্ণাশ্রয়াবৃত্ত প্রসাধনী স্বকৃ স্বকৃ করিতে লাগিল। সে বিস্মিত ভাবে ছোঁটাকে বলিল, “সে কি? তুমি যে জলে নাম নাই!”

“দেখিতেছিল না, নোকা হইতে কতকগুলি ছোকরা আবাদিগকে দেখিতেছে?”

বালিকা সরল ভাবে বলিল, “দেখিলই বা?”

যুবতী মুহূর্ত্তেরে বলিলেন, “না।”

তিনি গৃহান্তিমুখগামী হইলেন। বালিকা তাহার অনুসরণ করিল। সিক্ত বসন তাহার অঙ্গে জড়াইয়া রহিল। তাঁহারা যখন সৈকত অতিক্রম করিয়া ঘাইতে লাগিলেন, তখন নোকামধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক যুবক বলিল, “এইরূপ চলন দেখিয়াই কালিদাস সকারিণী পরমবিনী লভিকার সহিত উয়ার তুলনা করিয়াছিলেন।”

যুবকদিগের মধ্যে এক জন বলিল, “এই দুইজনের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী?”

আর এক জন বলিল, “বালিকা।”

“কেন ?”

“বে দুল হুটিয়াছে, তাহার আর গোরব কি ? বে দুটিবে তাহারই আদর অধিক ।”

“বে দুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই গোরব । বে দুটিবে তাহার পথ ত বিঘ্নবহল ।”

“কিন্তু সেই ত স্পৃহণীয় ।”

অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক যুবক এতক্ষণ রমণীঘরের দিকে চাহিয়া ছিল । এখন গম্ভীরভাবে বলিল, কিন্তু বলিকার কথাতেই কালিদাস বলিয়াছেন, :—

‘অনাম্রাতং পুষ্পং কিসলয়মপুনঃ করকটৈহ

অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাম্বাদিতরসম্ ।

অথন্তঃ পুণ্যানাং কলমিব চ তদ্রূপমনথং

ন জানে ভোক্তারং কহিহ সমুপস্থাস্যতিবিধিঃ ন’ *

কি বলেন যতীশ বাবু ?”

যে যুবক এইরূপে লিঙ্গাদিত হইল, তাহার বয়স উনবিংশ বৎসর অতিক্রম করে নাই । সে একটু হাসিল । তাহার ভাবে বোধ হয়, সে স্বভাবতঃ একটু লাজুক ; এই সকল প্রগলভ ও উচ্ছৃঙ্খল যুবকদিগের সংসর্গে পড়িয়াও এখনও স্বাভাবিক লজ্জানীলতা পরিভ্রাণ করিতে পারে নাই ।

এক জন যুবক বলিল, “অমূল্য বাবুর সংস্কৃত সাহিত্যটি ভালরূপই পাঠ করা আছে ।”

অমূল্যচরণের অভিমান তৃপ্ত হইল । সে বলিল, “এককালে কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেরই আশোচনা করিয়াছিলাম । এমন সম্ভ্রান্তহৃদয় সাহিত্য আর নাই ।” অমূল্যচরণ এমন ভাবে এ কথাটা বলিল যেন অগতের সকল সাহিত্যের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে । বাস্তবিক তাহার পরিচয় আধুনিক বাঙালী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ, সংস্কৃতের সহিত অল্প, ইংরাজীর সহিত নগণ্য । অল্প কোন সাহিত্যের সহিত তাহার কোনরূপ পরিচয়ই নাই । অপরেষ্ট নিকট হইতে সংগৃহীত মতকে বোলকতার আবরণ দিতে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ।

যে যুবক তর্কে যুবতীর সৌন্দর্যের প্রাধান্ত কীৰ্ত্তন করিয়াছিল, সে বলিল, “কালিদাসের কথার আশ্রয়ের কাব্য কি ?” ভাবে বোধ হইল, সে স্নোকটির অর্থ বুঝিতে পারে নাই ।

* এই অনবধ্যদেহ অনাম্রাত কুহব, নথরে অজিহ কিসলয়, অনাবিদ্ধ রত্ন, অনাম্বাদিতরস মধু, পুণ্যের পূর্ণ পুরকার—জানি না কে ইহা ভোগ করিতে পাইবে ?

অম্বলাচরণ বলিল, “আমি বলিতেছি, জানি না, কে এই সৌন্দর্য্য ভোগ করিবে।”

সুবক বলিল, “যতীশের বিবাহের চেষ্টা হইতেছে। দেখ না?”

অম্বলা বলিল, “তাঁহা হইলে ত পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে আগতাকে দেখিয়া কালিদাসেরই মত বলিতে ইচ্ছা হইবে—যেন গুণাগুণাসিণী লক্ষ্মী পুরাতন পদ্ম হইতে প্রস্ফুটিত উৎপলে আসিলেন।”

যতীশ বলিল, “এইবার নৌকা কিরাইয়া গৃহে যাওয়া বাউক।”

নৌকা ফিরিল। সুবকগণ নানাকথার আলোচনা করিতে লাগিল।

প্রথম খণ্ড ।

গ্রহণ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পরিচয় ।

মানগর গ্রাম গঙ্গার পশ্চিম কূলে অবস্থিত। বহমিন পূর্বে বাঙ্গালার মুসলমানের শাসনকালে এই গ্রামে একজন সমৃদ্ধ মুসলমান বাস করিতেন। এখন লক্ষ্মীর কুপায় বঞ্চিত হইয়া শাহসাহেবের বংশধরগণ এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্রাণ গমন করিয়াছেন। এখনও জনবলে প্রধানরূপে যে স্থানে বাস করা যায়, তথায় হীনবিত্ত হইয়া বাস করা বড় কষ্টের কারণ। তবে এখনও গ্রামস্থ মসজিদে, বারিশূক দীর্ঘিকায়া, গৃহের ও গৃহবেষ্টন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষে এবং গ্রামের নামে শাহসাহেবের স্মৃতি রহিয়াছে। এখনও গ্রামের কোন কোন অধিবাসী শুশুধন পাইবার দ্রব্যান্য শাহসাহেবের ভিটা খনন করিয়া থাকে। গ্রামখানি পুরাতন; হুতরাং গ্রামে সকল বর্ণের বাস। হিন্দু গ্রাম অতপনাতে আপনি সম্পূর্ণ থাকিত; গ্রামেই গ্রামবাসীদিগের সকল অভাব পূর্ণ করিবার উপায় থাকিত, তাহাদিগকে সেজন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইত না। আবার সমৃদ্ধ মুসলমানের বাসহেতু গ্রামে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাও অল্প নহে। পরী ছই ভাগে বিভক্ত। ছই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সম্ভাবের অভাব নাই।

এই গ্রামে মাতুলালয়ে ধরণীধর মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ধরণীধরের জন্মের ছই মাস পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতামহ একমাত্র সন্তান

কজাকে ও দৌহিত্রকে স্বীয় গৃহেই রাখিয়াছিলেন । সুতরাং ধরনীধর মাতুলালয়ে প্রতিপালিত । মাতুলালয়েই তাঁহার বাস । মাতামহের মৃত্যুতে তিনিই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন ।

ধরনীধরের মাতামহ বাঙ্গালী-গৃহস্থ ছিলেন । তখন “গৃহস্থ” বলিলে লোক বুঝিত, লোকটির অন্নসংস্থান আছে—হুই চারি বিধা ধনীও আছে । ঘরে শালগ্রামশিলা, গোশালায় গাভী ও গোলায় ধাত্ত তখন সকল গৃহস্থেরই ছিল । বাস্তবিক তখন লোকের অভাব ও আকাজক্ষা উভয়েরই পরিমাণ অন্ন ছিল—উভয়েরই তৃপ্তি সহজসাধ্য ছিল । ধরনীধরের মাতামহ সাধারণ গৃহস্থ হইলেও দৌহিত্রের শিক্ষার জন্য বার করিতে কৃষ্টিত হইতেন নাই । তাঁহারই সাহায্যে ধরনীধর এজিনারারীং কলেজে পাঠ করিয়া পূর্ববিভাগে চাকরী পাইয়াছিলেন ।

ধরনীধরের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল । তিনি সঙ্কল্প ও পরোপকারী ছিলেন, কিন্তু প্রথম পরিচয়ে তাঁহাকে কঠোর বলিয়াই বোধ হইত । ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যতীত অন্তের নিকট তিনি অন্নভাবী ছিলেন ; তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যাও অধিক ছিল না ; তাই লোক তাঁহাকে অসামাজিক মনে করিত । তিনি পঠদশায় যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ণবাহ্য লোকের স্বাভাবিকের কারণ হইত । তাহাতে তাঁহার ব্যায়ামাত্মক সুগঠিত দেহে অল্প কোনরূপ অপকার হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্রাব্য হ্রাস হইয়াছিল ; সেই জন্য তিনি গোলমাল সহ্য করিতে পারিতেন না । পারিবারিক জীবনেও তিনি যে সুখী ছিলেন, এমন নহে । তাঁহার ঘোবনে—প্রথম সন্তান বতীশচন্দ্রের জন্মের হুই বৎসর পরে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয় । তিনি বিদেশে—কর্মস্থানে ছিলেন । পত্নী গৃহে ছিলেন । এক দিন প্রত্যুষে তাঁহার পত্নীর বিহুটিকা দেখা দিল । তাঁহার জননী প্রথমে বধূর পীড়ায় বড় মনোবোগ দিলেন না ; পরে—রোগ বাড়িয়া উঠিলে ডাক্তার ডাকাইলেন । এদিকে ধরনীধরের নিকট টেলিগ্রাম করা হইল । টেলিগ্রাম পাইয়া ধরনীধর গৃহাভিমুখ-গামী হইলেন । তিনি তৃতীয় দিনে যখন গৃহে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার পত্নীর অবস্থা শোচনীয় । সাময়িক দেবিয়া পত্নীর নরনয়ন একবার উন্মুল হইয়া উঠিল । তিনি শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট পতির গলদেশে দক্ষিণবাহু বেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে আরও নিকটে আনিয়া কি বলিবার চেষ্টা করিলেন । সেই চেষ্টাতেই তাঁহার প্রাণবিরোগ হইল । শেষ কথা আর বলা হইল না । সে কথা ধরনীধর ভুলিতে পারেন নাই ; সে স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ছিল । জননীর ও মাতামহীর

অত্র, বহুবাক্যবের উপদেশ, কস্তাদারগ্রন্থদিগের অত্রোধ কিছুতেই তাঁহাকে আর বিবাহ করাইতে পারে নাই। তিনি বিদেশে চাকরী করিতেন, অবসরকালে গৃহে আসিতেন; আর পুত্রের অল্প অর্থ সংগ্রহ করিতেন, বেন তাহাকে অর্থের অভাবে একাকী বিদেশে থাকিতে না হয়।

ধরনীধরের ধনসংগ্রহেটা বার্থ হয় নাই। আরের আভিশয়া অপেক্ষা বারের অল্পতাতেই অধিক অর্থসংগ্রহ হইয়া থাকে। ধরনীধরের বাদবাহল্য ছিল না। তিনি স্বয়ং বিলাসবর্জিত জীবন যাপন করিতেন। গৃহেও তাঁহার জননী ও মাতামহী কখন বিলাসে অভ্যস্তা ছিলেন না। কাবেই তিনি বখেটে অর্থসংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বতীশচন্দ্র ধরনীধরের মাতার ও মাতামহীর মেহে লালিত হইয়াছিল। ধরনীধরের মাতামহী তাহাকে কিছু অতিরিক্ত আদর দিতেন। সেই আদরে সে বালাকালে কিছু ছরস হইয়াছিল, পাঠেও তাহার বখেটে মনোযোগদান ঘটে নাই। কিন্তু বতীশচন্দ্রের সপ্তমবর্ষবয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতামহীরা স্বভাবতঃ পৌত্রপৌত্রীদিগকে অত্যন্ত মেহ করিয়া থাকেন। জগতে এমন লোক দেখা যায়, বাহারা আসল অপেক্ষা মৃদু অধিক ভালবাসে; পিতামহীরা সেই শ্রেণীর লোক। বতীশচন্দ্রের পিতামহী যে তাহাকে অত্যন্ত মেহ করিতেন, তাহা বলাই বাহল্য; কিন্তু তিনি মেহাভিশয়াহেতু কখনও তাহাকে আবশ্যিক শাসন করিতে কুস্তিা হইতেন না। তাহাকে শাসন করিতে তাঁহার আপনার হৃদয় ব্যথিত হইত; কিন্তু পৌত্রের ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিয়া তিনি সে কর্তব্য পালন করিতেন। স্বয়ং তাঁহার জননীর শাসনহীন মেহে পৌত্রের যে অনিষ্ট হইয়াছিল, তিনি তাঁহার সংশোধনে সচেষ্ট ছিলেন।

এদিকে ধরনীধর পুত্রের সুশিক্ষার জন্য বখেটে বাবদা করিয়াছিলেন। গ্রামের নিকটে একটি বিদ্যালয় ছিল। বতীশচন্দ্র সেই বিদ্যালয়ে পাঠ করিত। ধরনীধর সেই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে আপনার গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিক্ষক গৃহে বতীশচন্দ্রকে পড়াইতেন; বতীশচন্দ্র তাঁহার সহিত বিদ্যালয়ে বাইত ও বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইত। এতদ্ব্যতীত গ্রামের টোলের অধিকারী পণ্ডিতমহাশয় বতীশচন্দ্রকে সংস্কৃত পড়াইতেন। সংস্কৃতের প্রতি ধরনীধরের অত্যন্ত অগ্রহাগ ছিল। তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে, কার্য্য গ্রহণের পর, সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, সংস্কৃতসাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। পুত্রকে সংস্কৃত সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ধরনী-

ঘরের এই ব্যবহার প্রফলও কলিয়াছিল। তিনি যখনই গৃহে আসিতেন, পুত্রের পাঠে উদ্বিগ্ন লক্ষ্য করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। সপ্তদশ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে যতীশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইল। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বলিলেই সব কথা বলা হইল না ; কারণ, সে যে বিভাগ হইতে পরীক্ষা দিয়াছিল, সে বিভাগের উত্তীর্ণ বালকদিগের মধ্যে সে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া র্ত্তি লাভ করিয়াছিল।

তাহার পর যতীশচন্দ্র কলিকাতার পড়িতে আসিল। তাহাকে প্রক্তি শনিবারে এবং অন্ত সমস্ত ছুটি গাইলেই বাড়ী আসিতে হইত। ধরনীধর সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

আশৈশব পিত্তরে আবদ্ধ বিহগ যদি সহসা পিত্তরের বাহিরে আসিয়া দেখে যে, সে স্বাধীন, তবে সে যেমন সেই নূতন অবস্থা সম্যক উপভোগ করিবার জন্য মুক্ত আকাশে উড্ডীয়মান হয়—বিপদের আশঙ্কাকে মনে স্থানদান না করিয়া যথেষ্টা বিচরণ করে—কলিকাতার আসিয়া যতীশচন্দ্র তেমনই নব-প্রাপ্ত স্বাধীনতা সাগ্রেহে উপভোগ করিতে লাগিল। পুত্র এখন বিদেশে যাব নাই ; পাছে তাহার কোন অসুবিধা ঘটে এই আশঙ্কার ধরনীধর স্বভাবতঃ নিতবারী হইয়াও পুত্রকে আবশ্যকান্তিরিহিত অর্থ দিতেন। বৃদ্ধমান লোকেরও ভুল হয়। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, সর্ববিষয়ে সাবধান ধরনীধর স্নেহবশতঃ এই ভুল করিলেন। অর্থ সর্বত্র—বিশেষতঃ সমাজে ছাড়পত্রের কাণ্ড করে। সভায়, সমিতিতে, সম্মিলনে যোগ দিয়া যতীশচন্দ্র ছাত্রদলে এবং ছাত্রদল হইতে ক্রমে অস্ত্র দলেও পরিচিত ও সমাদৃত হইতে লাগিল। সে যখন বাড়ীতে যাইত তখন সময়ে সময়ে ছুইচারিজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পিতামহী তাহাদিগকে পরম সমাদরে সমাদৃত করিতেন। ধরনীধর এ সব কথা জানিতে পারিতেন না।

এবার বন্ধুদিগের সহিত গৃহে আসিয়া যতীশচন্দ্র অলপক্বে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। এই ভ্রমণকালে ইচ্ছাপুরে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনার পর যতীশচন্দ্রের বন্ধুবর্গের মধ্যে একজনকে আরও দুই দিন শানগরে দেখা দিয়াছিল।

যতীশচন্দ্রের বন্ধুও নানাতরুণ। পিতার ব্যবস্থাপ্তে সে ইংরাজী ও সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ বৃৎপন্ন হইয়াছিল—সাহিত্যরসে রসিক হইয়াছিল। তাহার রচিত প্রবন্ধের খ্যাতি বিদ্যালয়ের অর্কসভা হইতে ক্রমে বাঙ্গালা শাসিক পত্রের কার্যালয়ে

পহিরা ছিল। বশোলাভের স্পৃহাময় পরিণতবয়স্কের পক্ষেও সহজ-সাধ্য নহে। অপরিণামশীল তরুণবয়স্ক যুবক যে সেই স্পৃহাহেতু আপনার ভবিষ্যৎ মঙ্গলবিষয়ে অন্ধ হইবে, তাহাতে বিম্বিত হইবার কারণ নাই। কাবেই বতীশচন্দ্র দুর্কোষ অকল্যাণের ও নিরস স্ত্রারের চর্চা ছাড়িয়া সাহিত্যচর্চায় ও প্রবন্ধরচনার অতিশক্ত মনোযোগ দিতে লাগিল।

এই কারণে তাহার কতকগুলি সাহিত্যিক বন্ধুও সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাদিগের সংসর্গে বতীশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ উপকারের সম্ভবনা ছিল কি না সন্দেহ;—কারণ অপরিণতবুদ্ধি, অসমিষ্ট যুবকের সাহিত্যচর্চা প্রায়ই স্থায়ী স্বকল প্রদান করে না—তাহার সাহিত্যকীর্তি একান্ত অপরিণত অবস্থায় সংগৃহীত কলের মত বিবাদ ও অব্যবহার্য্য হয়। কিন্তু ইহাতে যে বতীশচন্দ্রের বর্তমানে ক্ষতি হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই; কারণ, ইহাতে তাহার পাঠে অত্যন্ত অবহেলা হইতেছিল। এই অবহেলার অনিবার্য্য কলের বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশ বা প্রকৃতি কিছুই তাহার ছিল না।

তাহার সাহিত্যিক বন্ধুদিগের মধ্যে অনুল্যচরণ বিনোব উল্লেখযোগ্য। বতীশচন্দ্রের তরুণ কবেই অনুল্যচরণের প্রভাবকলে তাহার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল,—সেই প্রভাবকল তাহাকে অভিনব পথের পথিক করিয়াছিল।

কালি।

মধ্যাহ্নের গুহ্র—তীব্র রবিকর বধা
অপরাহ্নে শান্ত সৌম্য মনোরম হয়।
বৌবনের সে উদ্দাম বেগচকলতা
যাঙ্ক্যো বিগুহ্র হ'য়ে হয় গুহ্রময়।
কাল কতু চোর মত কাল বড় দাতা
অপূর্ণতা হরি' দেয়—বিচার—বিজ্ঞতা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জাতিভেদে বিবাহের পদ্ধতিভেদ ।

বিবাহ সামাজিক জীবনের ভিত্তিধরণ ; এইজন্য সকল দেশের সভ্য অসভ্য সমস্ত নরনারীই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে । কিন্তু বিবাহ-পদ্ধতি, বিবাহের আচার অহুষ্ঠানাদি সকলের একরূপ নহে ; পরন্তু জাতি ও সম্প্রদায় প্রভৃতি ভেদে সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ । এই সকল বিবাহ-বিধি যেমন পরস্পর বিভিন্ন, তেমনই বিস্ময়োদ্দীপক । পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত, কতকগুলি পৃথক্ পরিণয় পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে ।

উড়িষ্যা, ছোটনাসপুর ও সীওতালপরগার এক শ্রেণীর পার্শ্বত্যা জাতির নাম ‘মাহিলী’ ; (Mabili or Mahli) ইহাদের বিবাহ-নিয়ম অদ্ভুত । বিবাহ-সময়ে সংবদ্ধ হইবার পূর্বে, ইহারা বৃক্ষের সহিত পরিণীত হয়—পাত্রী নিজপত্নীস্ব একটি মহিলা এবং পাত্র একটি আশ্রয়স্থলে পতি-পত্নীত্ব বরণ করিয়া থাকে ! বিবাহ-কালে পাত্র কিকিং সিন্দূর লইয়া পাত্রীর সৌমন্ত্রে লেপন করিয়া দেয় এবং পাত্রী আপনায় বামহস্তে শৌক-কঙ্কণ (নোরা) পরিধান করে, ইহাতেই মাহিলীজাতির বিবাহ সম্পন্ন হয় ।

চীনসাম্রাজ্যের পূর্বাংশে কোরিয়া দেশ । এদেশের বিবাহ-পদ্ধতি অতীব বিচিত্র । এখানে ‘চুংমাই’ বা ঘটক বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন ; কিন্তু বিবাহ একটি হংসী ব্যতীত নিষ্পন্ন হয় না । বিবাহ আইনসম্মত এবং বরকস্তার প্রণয় প্রগাঢ় ও চিরস্থায়ী করাই উহার অভিপ্রায় । কোরিয়ার বর বিবাহদিনে ঘোড়কে বা পাকীতে আরোহণ করিয়া, মহাসমারোহে কস্তাগৃহে উপনীত হনেন এবং ঘরদেশে জাহ্নবোপে উপবিষ্ট হইয়া একটি হংসী ছাড়িয়া দেন । হংসীটি গৃহান্তর্য্যয়ে প্রবিষ্ট হইলে কস্তাকর্ত্তা বরের নিকটে আগমন করেন এবং তাঁহাকে মহাসমারোহে বিবাহস্থলে কস্তার নিকটে লইয়া যানেন । তথায় ‘হুনুসেটা’ বা চুক্তিপত্র বরকস্তার নাম দ্ব্যক্ষরিত হইলে বিবাহ সমাধা হইয়া যায় । বিবাহের পরে বরকে ‘ভায়াই’ বা আইবড় কেন অর্থাৎ পূর্বের পৃষ্ঠলব্ধ ‘বাবরীচুল’ কর্ত্তন করিয়া, শিখাবদ্ধন করিতে হয় । কোরিয়ার অবিবাহিত ব্যক্তির কোনও সম্মান নাই । সে বুঝ বা বৃদ্ধ হইলেও শিশু বলিয়া পরিগণিত হয় এবং শিশুর জায় ব্যবহার করিলেও দিম্ব্যভাজন হয় না । তথায় বিবাহকে এক

প্রধান ও সম্মানার্থে বাপার বলিয়া গণ্য করা হয়। কোঠিয়ার বর প্রায়শই কস্তা অপেক্ষা বরঃকনিষ্ঠ হইয়া থাকে।

বঙ্গালা দেশের এক শ্রেণীর হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত জাতিকে ‘মাল’ কহে। ইহাদের বিবাহ-সময়ে, কস্তা সাত-বার বরকে প্রদক্ষিণ করে এবং উভয়ে একত্রিকে পূর্বাভিমুখ হইয়া উপবিষ্ট হয়। অতঃপর বরকস্তার মন্তকোপরি শাক্তিঙ্গল বা ব্রাহ্মণশূট বারি পেচন করা হয় এবং পুরোহিত মহাশয় বধারীতি মন্ত্রপাঠ শেষ করিয়া তাহারিগের বস্ত্রে ‘গাঁইটছড়া’ বাধিয়া দেন। তখন উভয়ে পুষ্পমালা-বিনিময় করিয়া বিবাহ শেষ করে। বৃক্ষবিশেষের শাখানিশ্চিত গৃহে রাজ্বিশেষে ইহাদের উদ্বাহক্রিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

উত্তর বেকশ্রেণেশের একটি স্থানের নাম লাপলও। এই স্থানের অধিবাসীরা ‘লাপ’ নামে অভিহিত। লাপদিগের বিবাহ প্রণালী কৌতুকবহু। কস্তাকর্তার সম্মতি ব্যতীত ইহাদের বিবাহ হয় না। এইমন্ত বর, বধু মনোনীত করিয়াই সম্মতিলাভের লক্ষ্য, তাহার পিতার অঙ্গবর্তনে প্রসূত হয়—বারবার মুখা উপহার দিয়া তাহার বনোরঞ্জন করিতে থাকে। কস্তার পিতা যদি তাহাতে সন্তুষ্ট হয় ও সম্মতিদান করে, তাহা হইলে বিবাহের আর কোনও প্রতিবন্ধক থাকে না। তখন বর, বধূদর্শনে—ভাবী পত্নীর সহিত প্রেমমালাপে অধিকারী হয়, কিন্তু সে দর্শন—নে প্রেমমালাপও উপহার ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। বিবাহের পূর্বাধিন পর্য্যন্ত, প্রত্যেক সাক্ষাতে বরকে ভাবী বস্তুরের পরিতৃষ্টির লক্ষ্য এক এক বোতল মন্ত এবং ভাবীপত্নীর সম্ভাব্য উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যাদ্রব্য, মিঠাই প্রভৃতি উপহার দিতে হয়। কিন্তু বধূ উপহার প্রেক্ষণভাবে, অস্ত্রের অপোচরে প্রদান করাই নিষেধ, নচেৎ বধু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, প্রত্যর্পণ করিতেই বাধ্য হইয়া থাকে। অতঃপর কস্তাকর্তার অভিপ্রায় অনুসারে বিবাহের দিন-লগ্নাদি ধার্য্য হয়। বর বধাপাক্ষি মূল্যবান বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া কস্তাতবনে গমন করে। কস্তা মুকুটের মত একটি বিচিত্র পিরোদ্ধরণ ধারণ করিয়া নানাবর্ণের অসংখ্য ক্রীড়নক-নিবদ্ধ চৌপদ মাথার দিয়া বিবাহস্থলে উপস্থিত হয়। পুরোহিত বধাবিধি মন্ত্রপাঠাদি সম্পন্ন করিয়া বিবাহকার্য্য শেষ করিয়া দেন। কিন্তু বিবাহ শেষ হইলেও বর, বধুসহ গৃহ-গমনে সমর্থ হয় না, অপিচ, গৃহদ্বারাত্তরণে, বস্তুর ভবনে থাকিয়া বস্তুরের সহায়তা করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোণাক্ষিত অর্থে আপনায় ও আপন পত্নীর তরুণপোষণ নির্দ্ধার করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে চান্দ্রবর্ষ পূর্ণ হইলে তবে সে পত্নীর সহিত, গৃহগমনের অনুমতি লাভ করে।

তখন কস্তার পিতা, দুই একখানি পিঠল কাঁসার বাসন, একটি জরঢাক ও কয়েকটা মেঘ বোতুক দিয়া কস্তাকে জামাতার সহিত পাঠাইয়া দেয়। লাপ জাতীয় বরকে সময়ে সময়ে দুই তিন বৎসর ভাবী যুগেরের তোষামোদ করিয়া বিবাহ করিতে হয়।

দক্ষিণপথে ‘বোগেরু’ নামে এক প্রেয়স লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রধানতঃ তিস্তার তীর দ্বারাষ্ট্রী জীবিকানির্ভর করিয়া থাকে। ইহাদের বরণাজ, পাত্রীগৃহে সমাগত হইলে পাত্রীর পিতা বা কোনও নিকট আত্মীয় তাহাকে বিবাহস্থলে লইয়া যায় এবং পাত্র ও পাত্রীকে নৃতন কাপড় পরাইয়া পরস্পর সমুখবর্তী হইয়া বড় কুড়ির মধ্যে দাঁড় করায়; কুড়ি দুইটি খাত্তাদি শব্দে পূর্ণ করা থাকে। পুরোহিত মহাশয়, একখণ্ড হলুদমাখান কাপড় উভয়ের মধ্যে ব্যবধানরূপে, স্থাপিত করিয়া মন্ত্রপাঠ ও সঙ্গে সঙ্গে পাত্রপাত্রীর মস্তকে ধাত্তমুষ্টি বর্ষণ করিতে থাকেন, চারিজন সখা নারী উভয়কে বেটন করিয়া দণ্ডায়মান থাকে এবং এক একটি হস্ত আপনাপন দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলীতে পাঁচ পাঁচ দিয়া জড়াইয়া রাখে। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ শেষ করিলে তাহারা সেই হস্তগুলিকে দুই দুই খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং পাত্র-পাত্রীর হস্তে বন্ধন করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। পরদিন প্রাতে বর বধূসহ গ্রামের দেবাগারে গমন ও তথায় একটি নারিকেল ফল ছেদন করিয়া বিবাহের শেষ অঙ্গ সম্পূর্ণ করে। বোগেরুজাতির বিবাহের দুই দিন পূর্বে, কস্তার বাটীতে বরকস্তার ‘পাত্র-হরিদ্রা’, একদিন পূর্বে বরের বাটীতে ‘বরতোজ’ এবং বিবাহ-দিনে কস্তার বাটীতে ‘কস্তাতোজ’ সমাধা হয়।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ও কুচবিহারে ‘গারো’ নামে এক অসভ্য পার্শ্বভাজাতির বাস। এই জাতির উদ্বাহ-পদ্ধতি অনেকাংশে আধুনিক ‘সভ্য’ সম্প্রদায়ের অনুরূপ। ইহারা যুরোপীয়দিগের মত ‘প্রেমপরিচয়’ (Courtship) করিয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইহাদের পাত্রপাত্রী প্রথমে মনোমলয় ও পরস্পর প্রীতির আদান-প্রদান সম্পন্ন করে; অবশেষে প্রণয়ের প্রসঙ্গতঃ অন্তরে প্রিয়পর্যাপনে সংবদ্ধ হইয়া পতিপত্নীরূপে বাস করিতে থাকে।

ব্রাহ্মপুতানার বণিক সম্প্রদায় ‘মাড়োরারী’ নামে পরিচিত। ইহাদের বিবাহোৎসব পাঁচদিনে সমাপ্ত হয়। ইহারা প্রথম দিনে ‘পাত্রহরিদ্রা’, দ্বিতীয় দিনে ‘আত্ম-ভার’, তৃতীয় দিনে ‘বিবাহ’, চতুর্থ দিনে ‘তোজ’ এবং পঞ্চমদিনে ‘কস্তা-বিসর্জন’ ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাদের বর বিবাহদিবসে,

প্রথমে গর্দভে ও তৎপরে ঘোটকে আরুঢ় হইলেন এবং তদবস্থায় মাড়বক্ষে মস্তক স্থাপন করেন। অতঃপর দুইজন লোক ছত্র ও বাজলী লইয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হয় এবং একজন তাহার মস্তকে ছত্রধারণ ও অন্তরজন বাজলী বাজন করে। এই সময়ে বরের ভগিনী তাহার গমনপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাহার নিকটে পুরস্কার প্রার্থনা করেন। বর যথারীতি তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বটহাড়ে আত্মীয়স্বজনাদিসহ অগ্রসর হইলেন এবং কল্যাভবনে গমনপূর্বক হস্তস্থ বটির দ্বারা গৃহের সম্মুখবর্তী 'বিবাহ-তোরণ' ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন, তখন কল্যায় জননী 'বরণ-ভালা' হাড়ে লইয়া কয়েকজন সধবা প্রমহিলার সহিত বরের সম্মুখে উপনীত হইলেন এবং তাহাকে বরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করেন। এদিকে কল্যা প্রথমে সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে মিঠাই প্রদান এবং পরিশেষে গৌরীগণপতি ও কৃষ্ণাণচক্রের পূজা সমাপন করিয়া বিবাহস্থলে বরের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। তাহার পর পুরোহিত মহাশয় বরকল্যায় বস্ত্রে গ্রহিষ্ণু ও হোমাদি কৰ্ম্মসমূহ একে একে সমাধা করিলে বিবাহ শেষ হইয়া যায়। বিবাহের পরদিবস কল্যায় পিতা যশাশক্তি মৌতৃকাদি দ্বারা জামাতার এবং উৎকৃষ্ট ভোজ্যপানীয়ে সমাগত বর ও কল্যাভাগিন্যের সৎকার করেন। বর সেদিন খণ্ডগৃহে অবস্থিতি করিয়া তৎপরদিন প্রাতে পত্নীসহ স্বত্ববনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাহাদিগের সম্মুখে একে একে সাতটি মুগ্ধরপাতি সংরক্ষিত হয়। বর পূর্বোক্ত বটির শৃংখলো ক্রমে ক্রমে সেন্দুলিকে অপসারিত করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অবশেষে কঙ্কণ-বিসম্পর্জন-ক্রিয়া সমাধিত হইলে বিবাহের সমস্ত অহুষ্ঠান শেষ হইয়া যায়। এই বিবাহে, বিবাহের পূর্ব হইতে গণদেবের পূজা আরম্ভ হয় এবং গঙ্গা ও শীতলাদেবীর পূজার দ্বারা সমস্ত কার্য শেষ করা হইয়া থাকে। মাড়োয়ারী কুলকাষিনীরা বিবাহের রশ দিবস পূর্বে 'জল সন্ধিয়া' থাকেন।

মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শ্রেণীবিশেষের নাম মাড়েশ্বরী। ইহাদের বিবাহে পাজীর মাড়ুল পাজের সর্ঘর্দনা করেন এবং পাজীকে জোড়ে লইয়া তাহাকে প্রথক্ষিপ করিয়া থাকেন। সাতবার প্রদক্ষিপ করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়।

প্যাসেটাইন এনিয়ার মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র দেশ। এই দেশের পূর্বতন অধিবাসীদিগের নাম 'রিহদী'। রিহদীরা এখন পৃথিবীর নানান্থানে বসবাস করিতেছেন। ইহাদিগের বিবাহ-বিধি অতি চমৎকার। ইহারা সর্বাগ্রে 'শীকার-পত্র' লিখিয়া বিবাহ-সম্বন্ধ দৃঢ়ীকৃত করেন। অতঃপর পাজপাজী ও তাহাদিগের বহু আত্মীয় কুটুম্বাদি এক প্রকাণ্ড কন্ডে, কি কোনও পরিবেষ্টিত স্থানে সমবেত

হয়েন । বালকবালিকাগণ এক একটি ক্ষুদ্র মুগ্ধরপাত্র বা ঘট হস্তে লইয়া সেই সঙ্গে মিলিত হয় । পুরোহিত বা কোনও প্রধান ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে বিবাহের স্বীকার পত্র পাঠ করেন এবং সমাগত নরনারীগণ পাত্রপাত্রীর প্রতি সম্মুখপ্রদর্শন ও ঈশ্বরের নিকটে তাঁহাদিগের দীর্ঘজীবন ও কুশল প্রার্থনা করিতে থাকেন । তখন বালকবালিকাগণ হস্তহিত ঘটগুলিকে মৃত্তিকার নিকিষ্ট ও চূর্ণ করিয়া ফেলে । পুরোহিত একপাত্র সুরা লইয়া মন্ত্রপুত ও তাহার কিয়দংশ গলাধঃকরণ করিয়া, পাত্রপাত্রীকে পান করিতে দেন । প্রবেশপথে একব্যক্তি মস্তপাত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান থাকেন । উপস্থিত জনগণ যখন একে একে হানত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তিনি প্রত্যেককে এক এক গ্রাস মস্তপান করিতে দেন । এই অনুষ্ঠানের অবসানে পাত্রপাত্রী আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত অষ্টাহকাল গৃহমধ্যে অবরুদ্ধভাবে অবস্থিতি করেন । সেই সময়ে তাঁহাদিগের সঙ্গীসঙ্গিনীরা নানাপ্রকারে তাঁহাদিগের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন । বিবাহের একদিবসপূর্বে পাত্রীকে নিকটবর্তী জলাশয়ে লইয়া স্নান করান হয় । স্নানের সময়ে জীলোকরা উৎকৃষ্টরূপে তাঁহার গাত্রমার্জনা করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন ও গান করিতে থাকে । ইহার পরে পরিকর-বিভিন্ন নির্জাহিত হর অর্থাৎ পাত্রপাত্রী পরস্পর কোমরবন্ধ (Belt) পরিবর্তন করিয়া বিবাহের অপর অনুষ্ঠান সমাধা করেন । বিবাহ দিনে বরকত্তা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, বিবাহস্থলে—সাধারণ সভাগৃহে বা উজ্জানাদিতে উপস্থিত হয়েন । চারিজন যুবক একটি ক্ষুদ্র চম্ভাতপ, চারি কোণ ধরিয়া, তাঁহাদিগের সম্মুখপরি স্বেদিত করিয়া রাখে । সেই চম্ভাতপের নিম্নে, কত্তার দিকে কচ্ছাপক ও বরের দিকে বরপক্ষীয় লোকরা সমবেত হয় । কত্তা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন । বর তিনবার তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার বামহস্ত গ্রহণ করেন এবং কত্তা দক্ষিণ হস্তে তাঁহাকে ধরিয়া থাকেন । তখন উপস্থিত স্ত্রীপুরুষগণ বরকত্তার দীর্ঘ জীবন ও বংশবৃদ্ধির কাহনা করিয়া তাঁহাদিগের মস্তকে মৃষ্টিপূর্ণ শস্ত বা মৃত্তামিশ্রিত ঘব-গম্বাদি নিক্ষেপ করেন । ইহার পরে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বরকত্তার মঙ্গলার্থ পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন এবং একটি ক্ষুদ্রপাত্র সুরার পূর্ণ ও সেই সুরা কিঞ্চিৎ পান করিয়া, অবশিষ্ট উপস্থিত লোকদিগকে পান করিতে দেন । অন্তঃপর তিনি বরের অঙ্গুলি হইতে স্বর্ণাঙ্গুরী উন্মোচনপূর্বক কত্তার অঙ্গুলিতে পরাইয়া বরের হস্তে এক গ্রাস মস্ত অর্পণ করেন । বর মস্তপান করিয়া শূন্য আধারটি সভাকূটকে

বা ভিত্তিগাত্রে সবেল নিষ্কেপ করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলেন। অবশেষে ভোজন ব্যাপার ও তদবসানে নৃত্য আরম্ভ হয়। সমাগত নরনারীগণ পৃথকভাবে পরস্পর হস্তধারণপূর্বক ক্রমাগত নৃত্য করিতে থাকে। বহুক্ষেণেও সে নৃত্যের শেষ হয় না। সময়ে সময়ে আটদিন অবিরত নৃত্যকার্য চলিয়া থাকে। এই নৃত্যের সমাপ্তিতেই বিবাহের শেষ অঙ্কন সম্পূর্ণ হয়।

বিহার অঞ্চলের ‘মামা’ জাতি হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারা পাত্র পাত্রীর রানি মিলাইয়া বিবাহসম্বন্ধ স্থির করে এবং তৎসামগ্রী পাঠাইয়া সেই সম্বন্ধ দৃঢ়ীকৃত বা ‘পাকা’ করিয়া লয়। ইহাদের ‘পাত্র-ছাত্রী’ নাই—ছাত্রীর পরিবর্তে ইহারা বরকন্ডার পাত্রের তৈল মাগাইয়া দেয়, ইহাদের বর, বিবাহ দিবসে কন্ডার গ্রামে উপস্থিত হয় এবং কন্ডার বাটীতে না গিয়া, পাড়ার কোনও স্বজাতীয়ের গৃহে অবস্থিত করিতে থাকে। বরের আগমন-সংবাদ রাষ্ট্রে হইবামাত্রই গ্রামের নাপিত-বধু, কন্ডাকে সঙ্গে লইয়া বরের নিকটে আগমন করে এবং উভয়ের পরিহিত বস্ত্রে ‘গাইট ছড়া’ বাধিয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহারপর কন্ডা পাঁচ বার বরকে প্রদক্ষিণ করে এবং বর কন্ডার সীমস্ত্রে সিঙ্গুর লেপন করিয়া দেয়। ইহাতেই উদাহক্রিয়া শেষ হইয়া যায়। বিবাহান্তে বরবধু বাসরঘরে নীত হয়। তথায় বরকে পত্নী-তোষ পূর্বক ‘দই সন্দেশ’ ভোজন করান হয় এবং কৃগাদনারা নানারূপ হাত-কোতুকে তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে আরম্ভ করে। রাত্রি প্রভাত হইলে, বর পত্নী সমভিবাহারে স্বত্ববনে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তথায় গগাদেবীর পূজা ও কঙ্কণ-বিসর্জন বা হস্তস্থ সূত্রের জলসাংক্রিয়া সমাহিত হইলে সমস্ত উৎসব শেষ হইয়া যায়।

চীন দেশের উদাহ-বিধি সম্পূর্ণ অভিনব ও বিস্ময়জনক, এদেশের সব লোকই বিবাহ করে—বিবাহ করে না এমন লোক বিরল, নাই বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না; হিন্দু জাতির যেমন “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা” চীনদিগেরও সেইরূপ পুত্রের জন্য পত্নীপরিণয়ের প্রয়োজন। পুত্রই তাহাদিগের ঔর্ধ্বদেহিক ও পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রধান সাধন। এ জন্ত পুত্রের নিমিত্ত—পিতৃপুরুষের উচ্চারসাধনজন্য প্রত্যেক চীনাই বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের বিবাহে পাত্রপাত্রীর অভিমতের অপেক্ষা নাই, তাহাদিগের পিতামাতা বা অভিভাবকগণ বে সঙ্ক স্থির করেন তাহাই তাহাদিগকে নত মস্তকে মানিয়া লইতে হয়। বিবাহের পূর্বে পাত্রপাত্রীর পরস্পর আলাপ পরিচয়ের নিয়ম নাই—এমন কি কেহ কাহাকে দেখিতেও অধিকারী হয় না। চীনজাতির কোঙ্গি মিলাইয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়, অগ্রে

কস্তার পিতা এক খানি ছুন্ন কাপজে ঢুলির * দ্বারা কস্তার অষ্টাক্রী জন্মকোষ্ঠী-
লিপিবদ্ধ করিয়া বরের পিতার নিকটে পাঠাইয়া দেন। শেবে বরের পিতা
কোষ্ঠী প্রেরণ করেন। অন্তঃপর কোষ্ঠীবিচার ও সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয় এবং সৈবজ্ঞ
বা গ্রহাচার্যের সাহায্যে বিবাহের 'নির্কঙ্কপত্র' লিখিত বা দিনগণাদি নিরূপিত
হইয়া থাকে। বিবাহের এক মাস পূর্বে অধিবাস্ত দ্রব্যাদির আদান প্রদান নির্কী-
হিত হয়। কস্তার পিতাই প্রথমে অধিবাস্তের তত্ত্বদামণী পাঠাইয়া থাকেন।
তাহার পর বিবাহ আরম্ভ হয়। এই বিবাহে বিবাহার্থীর কোনও প্রাধান্ত নাই।
অর্থাৎ অপরাপর জাতীয় বরের স্তার চীনা বর কস্তাগৃহে গমন করিয়া বিবাহ করেন
না, অপিচ বিবাহ দিনে বধাশক্তি হৃদয় বেশভূষার সজ্জিত হইয়া নিম্ন গৃহে,
দুইম্বা কক্ষবিশেষে উপবিষ্ট থাকেন। কস্তা বধারীতি বস্ত্রালঙ্কার ধারণ ও
পাকী বা সোণার আরোহণ করিয়া, মহাসমারোহে বরের গৃহে আগমন করেন।
বরের গৃহধারে কতকগুলি জলন্ত অঙ্গার সজ্জিত থাকে, কস্তা সেই অগ্নি
উন্নত্বন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট করেন। তখন বাটীর সম্বাগণ উপস্থিত হইয়া
কস্তাকে বরণ করেন এবং সম্বন্ধনা সহকারে বিবাহকক্ষে বরের সমক্ষে লইয়া
যায়েন। তথায় বর একটি চক্রবাক ও একটি চক্রবাকী লইয়া উপবিষ্ট
থাকেন। কস্তা উপস্থিত হইলে, সেই চক্রবাকমিথুনের সম্মুখে তাঁহাদের 'গুত-
দৃষ্টি' সম্পন্ন হয়। চক্রবাকদম্পতীর স্তার পবিত্র দাম্পত্য প্রেম লাভ করাই
উহার উদ্দেশ্য। অন্তঃপর কস্তা তিনবার বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার
সহিত একাসনে উপবিষ্ট করেন। বর কস্তার এবং কস্তা বরের বস্ত্রের
উপরে বসিতে চেষ্টা করেন। চীনা লোকের সংস্কার বিবাহান্তে যিনি অন্তের বস্ত্রো-
পরি উপবেশন করিবেন তিনিই সংসারে প্রতিপত্তি অর্জনে সমর্থ হইবেন, ইহার
পর বরবধু একত্রে ঈশ্বরোপাসনা করেন এবং বধু অন্তঃপুরে চলিয়া যান। তখন
বহির্কোষ্ঠাতে বর ও তাঁহার আত্মীয়বন্ধগণ এবং অন্তঃপুরে বধু ও অন্তান্ত সম্বা
কুলকামিনীরা একত্র আহার ও আমোদ প্রমোদ করিয়া উৎসব শেষ করেন।
চীনা আতিথ্য বিবাহ প্রধানতঃ দিব্যভাগেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। চীনা কস্তা দিব্য
বিগ্রহের অগণ্য ধীপালোকে স্বাভাবিক স্পন্দিত ও নানাবিধ বাস্ত শব্দে দিব্যমণ্ডল
প্রতিধ্বনিত করিয়া বিবাহ করিতে গমন করেন। চীনা কস্তা চতুর্দশ বৎসর বয়স

* চীন দেশে লেখনী বা কলমের প্রচলন নাই। তথায় ঢুলির দ্বারাই সমস্ত লিখনকাণ্ড
নির্বাহিত হইয়া থাকে।

না হইলে বিবাহে অধিকারিনী হইবেন না। ইহাদিগের বিবাহে বিধবার বোগদান নিষিদ্ধ।

বঙ্গালায় হিন্দু 'ডোম' জাতির পুরোহিত নাই। ইহারা বৌদ্ধদিগের দ্বারা আপনাদিগকে পুরোহিতের কার্য্য করে। বিবাহকালে বরকর্ত্তা ও কস্তাকর্ত্তা বধাক্রমে বর ও কস্তাকে ক্রোড়ে লইয়া, পরস্পর সন্মুখীন ভাবে উপবেশন করে। বরকস্তা গঙ্গাজলপূর্ণ একটা ঘট স্পর্শ করিয়া থাকে। তখন মন্ত্র পাঠ হয়। বরকর্ত্তা, আপনায় পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের এবং কস্তাকর্ত্তা আপনায় উচ্ছিন্নত সপ্ত পুরুষের নামোদ্যে ও পরবেশ্বরকে সাক্ষ্যমান্ত করিয়া, পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবেন। বরকর্ত্তা কস্তাকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করেন,—“কেমন, তুমি ডোমার মেয়েকে ছাড়িয়া দিয়াছ ত ?” কস্তাকর্ত্তা উত্তর দেন,—“হাঁ, দিয়াছি।” তখন বর সিন্ধুয়ের কোটা দিয়া বধুর ললাটদেশ স্পর্শ করিয়া দেয় অথবা উভয়ে মালাবিনিময় করে—বর কস্তার ও কস্তা বরের কণ্ঠে ফুলের মালা পরাইয়া দেয়। এই সিন্ধুরদান বা মালাপরিবর্তনে বিবাহ সমাপ্ত হয় এবং উভয়ে স্বামীস্ত্রীরূপে জীবনযাপনের অধিকারী হয়। ডোম জাতির মধ্যে পণগ্রহণ প্রথা অ-প্রচলিত নহে, কিন্তু কেহই দশ টাকার অধিক কস্তাপণ লইতে কি দশ বর্ষের অধিক কস্তা অবিবাহিত রাখিতে সমর্থ হয় না।

অশ্বাণী দেশের বিবাহ প্রথা অভিনব। অশ্বাণী পাত্র প্রথমে পাত্রী মনোনীত করেন এবং পাত্রীর পিতার আদেশে লইয়া, তাঁহার বা অপর অভিভাবকের সম্বন্ধে ‘শ্রেম পরিচরে’ প্রবৃত্ত হইবেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, পাত্রপাত্রী বধন বৃত্তিতে পাবেন যে, ইহাদিগের মিলন উভয়ের গন্ধেই স্নেহের হইবে, তখন তাঁহারা পরস্পর বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইবেন এবং অঙ্গুরীপরিবর্তন করিয়া আপনাদিগের অভিমত সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া দেন। বিবাহের পূর্বদিনস্ব রাতিতে পাত্রীর গৃহে উৎসব হয়। পাত্রপাত্রীর আশ্রয়বন্ধুরা গীত, বাজ ও নৃত্যাদিতে আমন-সন্তোষ করেন এবং পাত্রীকে মানাধিষ বোতুক দিয়া থাকেন। পরদিনস্ব জটনক রাজকম্বারী উপস্থিত থাকিয়া উভয়কে উদ্বাহন্থে সঙ্গীত করিয়া দেন। অত্যা-পর নব সম্পত্তি ধন্যমানের ধন্যবাক্যের সম্বন্ধে আলোচ্যে বদ্ধ হইলে বিবাহ সমাধা হইয়া যায়। বিবাহ অন্তে বরবধু পৃথক্ বাড়ীতে অবস্থান পূর্বক স্নেহে সংসার-ধাড়া নিকাহ করিতে প্রস্তুত হইবেন।

বিহার ও ছোটনাগপুরের এক সম্প্রদায় কুবকের নাম ‘চেবো’; ইহারা হিন্দু। ইহাদের বিবাহ-রীতি বিশ্বেদোদ্ভূত। চেবো বর কস্তাভবনে গমনোত্তম হইলে,

তাঁহাৰ জননী একটি আশ্রপত্ন মুখে রাখিরা, তাঁরদ্বয়ে ক্রন্দন করিতে থাকেন আর তাঁহার মাতুল সেই পত্নোপরি সলিল-সেচন করিতে আরম্ভ করেন। বয় কস্তাগৃহে পহছিলে কস্তার মাতা ও মাতুলও পুৰোক্তরূপ অগ্রষ্ঠান করিতে থাকেন। অতঃপর বয়কস্তা, বিবাহস্থলে, বৃক্ষশাখাধারা রচিত আচ্ছাদননিরে সমবেত হর এবং উভয়ে মধ্যস্থলে রক্ষিত মৃদয় পাত্রবিশেষকে পরিক্রমণ করিতে থাকে। ইতোমধ্যে বয় অবনত হইয়া, হস্তের দ্বারা কস্তার পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করে এবং চিরদিন ইহাকে সদাচরণে পরিতৃপ্ত রাখিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ইহার পরে কস্তার সীমন্তে সিন্দূরলেপন করা হয়, এবং কস্তার জ্যেষ্ঠ সহোদর, মূল দিগা বয়ের চরণাব্দল ঘোত করিয়া অঙ্গলিযোগে ঘোতুক দান করেন। অবশেষে কস্তার মস্তকে 'মৌড়' পরাইয়া দিলেই বিবাহ সিদ্ধ হইল বুঝিতে হয়।

ঐজ্যোত্সনাথ বহু কবিশেষকর।

—:~:—

বুলবুলের প্রতি ।

হৃদিগে কুহুমকুল গ্রহ্ম কাননে,
ঢালিস্ উল্লাসে কোন্ সন্নীত-সহরী ?
রক্তিম উবার নব কনক কিরণে,
ভাসিস্ আনন্দে তুই শাখায় উপরি।
তুই প্রকৃতির কবি বিহঙ্গ হৃদয় !
বিমল সুখেতে ভরা তোর ও পরাগ ;
চির অনাস্তিত্য তাপ এ তবে প্রথর,
তুই না বুকিরা কিছু গাস্ শুধু পান।
তোর তরে শরতের জ্যোৎস্না সুশোভন,
তোর তরে ইন্দ্রধনু ফুটে বরিষার ;
তোর তরে বসন্তের ফুলভরা বন,
তোর তরে হেমন্তের বহে নৃহ ঝর।
তোর তরে বিশ্ববৃকে দৌন্দর্য্য মহান্,
পাখি রে, চাল্ এ প্রাণে চির মধুতান !

ঐনগেন্দ্রনাথ সোম ।

আর্য্যাবর্ত ।



সিষ্টার নিবেদিতা—(উদ্বোধন কাগজালয় হইতে প্রাপ্ত ১৮৮৫।)

ভগিনী নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতার অকাল মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন প্রকৃত শ্রদ্ধাবতী হিতৈষিনী হারাইয়াছে। তিনি ভারতে না শুধিয়াও বেরূপ ভাবে আপনাকে ভারতের অন্তরঙ্গরূপে পরিণত ও পরিচিত করিয়াছিলেন—তাহা প্রকৃতই বিশ্বসের বিষয়। তিনি যুগ্ম পথ্যবেক্ষণপ্রভাবে ভারতীয় সভ্যতার বহুদিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন—আন্তরিক শ্রদ্ধায় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যজ্ঞানবশে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যদিগের মধ্যে জাতীয়তাবাদীতাহার হৃদয়ে যেমন পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তেমন আর কাহারও হৃদয়ে হয় নাই। তাহার জাতিগত জাতীয় ভাব বেদান্তের আলোকে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তিনি সাহিত্যিক ও শিল্পসমালোচক ছিলেন। আমি তাহার সাহিত্যসেবার বিষয় কিছু বলিব না। আমি তাহাকে যে করুণাময়ী মূর্তিতে দেখিয়াছি, তাহারই কিছু পরিচয় দিব।

ভগিনী নিবেদিতার সহিত আমার প্রথম পরিচয় দ্বাদশবর্ষ পূর্বে। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রেগ কলিকাতার সংহারকরূপে দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গের তাহার আবির্ভাব-হুচনার বিধিব্যবস্থাবিভীষিকাভরে ভীত জনগণ সহর হইতে পলায়ন মুক্তিসম্ভত মনে করিয়াছিল। ফলে, ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। এই বৎসর ছোটগাট সারজন উডবার্ণ আশ্রাস দেন, কোন রোগকে বলপূর্বক গ্রহাভ্রমিত করা হইবে না। সরকারী হাসপাতালের পরিবর্তে প্রত্যেক ওয়ার্ডে দুঃস্থদিগের অন্তঃস্থ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছিল। কিন্তু চিকিৎসকের অভাবে সর্বত্র এ উদ্যোগ সকল হইতেছিল না। তখন বহু চিকিৎসক প্রেগচিকিৎসা হইতে বিরত। সেই সময় একদিন চৈত্রেয় মধ্যাহ্নে রোগিগরিদশনাতে গৃহে কিরিয়া দেখিলাম—দ্বারপথে ধূলধূসর কাষ্ঠাগনে একজন যুরোপীয় মহিলা উপবিষ্টা! তাহার পরিধানে গৈরিকবাল, গলদেশে রূপাক্ষমালা, আননে দিব্যদীপ্ত। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা; একটি সংবাদ জানিবার অন্তর আমার আগমনপ্রতীক্ষার বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সেই দিন প্রাতে বাগবাজারে কোন বস্তীতে আমি একটি প্রেগাক্রান্ত শিশুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। নিম্নর ব্যাধি পূর্বেই শিশুকে মাতৃহীন করিয়াছিল। রোগীর অবস্থা সবকিছু অশ্লক্ষান ও ব্যবস্থাগ্রহণের অন্তর্গত সিষ্টার নিবেদিতার আগমন। তাহার প্রতি কথার ব্যাকুল করুণা বেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

আমি বলিলাম, রোগীর অবস্থা লক্ষ্য কর। বাগ্‌দৌবতীতে কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্যা সম্ভব তাহার আলোচনা করি। আমি তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিলাম। অপরাহ্নে পুনরায় রোগী দেখিতে বাইরা দেখিলাম, সেই অস্বাভাবিক পল্লীতে—সেই আশ্রয় জীর্ণ কুঠীতে নিবেদিত। রোগগ্রস্ত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি—রাত্রির পর দিন তিনি স্বীয় আবাস ত্যাগ করিয়া সেই কুঠীতে রোগীর সেবায় নিযুক্ত্য রহিলেন। গৃহ পরিশোধিত করা প্রয়োজন—তিনি স্বয়ং একখানি ছুত্র মই লইয়া গৃহে “চূণকাম” করিতে লাগিলেন! ঔষধ পথ্য সবই তিনি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রোগীর মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও তাঁহার শুশ্রূষায় শৈথিল্য সকারিত হইল না। দুই দিন পরে নাহুদীন শিশু এই কল্পনামরীর বেহতপ অঙ্গে আশ্রয় নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

এই সঙ্কটসময়ে বাগবাজার পল্লীতে প্রতি বতীতে ভগিনী নিবেদিত্যর করুণাময়ী মূর্তি লক্ষিত হইত। আপনার আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াও তিনি অপরকে সাহায্য করিতেন। একবার একজন রোগীর ঔষধপথ্যাদির ব্যয়-নির্বাহার্থ তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য হুতপান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন হুত ও কলমুলই তাঁহার আহার ছিল।

কুমারী মার্গারেট নোবল বিলাতে সম্রাট সম্রাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার দীপ্ত প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া অনেকেই মনে করিয়াছিল—তিনি অল্পকাল-মধ্যেই স্বদেশে সম্মান ও বশ লাভ করিবেন। কিন্তু তিনি বদেশ ও স্বজন—স্বলম্বল ও স্বসম্পদ সবই ত্যাগ করিয়া আপনাকে ভারতের সেবায় নিবেদিত করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে এমনই ভাবে ভারতের করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার উত্তরকালে যে পল্লীতে তিনি বাস করিতেন সে পল্লীতে প্রবীণা জনমালা হস্তে লইয়া ও নবীন শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া সর্বদা তাঁহার আবাসে আসিতেন। তিনি যেন তাঁহাদেরই একজন। তিনি ভারতে হিতৈষী মূর্তিতে দেখা যেন নাই—সেবিকারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি স্বাভাবিক দয়াদানে ভারতকে হেয় ও লাহিত করেন নাই—আন্তরিক শ্রদ্ধা সমর্পণ করিয়া তাহাতে উন্নত ও পৌরবাহিত করিয়াছেন।

ত্রিবাধাসোবিন্দ কর।

বিদেশী গল্প।

অভিনয়।

(ইংরাজী হইতে)

“তবে শুধু বলি”—এই বলিয়া কালীচরণ বাবু চ’কার নলে একটা লম্বা টান দিয়া কিয়ৎকাল নিজ মুখোদ্যৌগ মণ্ডলাকার ধূম্রাশির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া যেন প্রতিশব্দ আলোকিত করিয়া লইলেন,—তাহার পর বলিলেন,—“থিয়েটারের অভিনয় নৈপুণ্যের কথা যখন তুলিলেন, তখন আমার একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল, শুধু বলি।

“অমরবাবুর নাম আপনারা সকলেই জানেন। করুণ, ক্রু, প্রভৃতি গভীর রসাত্মক নাটকের অভিনয়ে যে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই, একথা সকলেই স্বীকার করেন। বিশ বৎসর পূর্বে তিনি এক যাত্রার দলে ছিলেন। তাহার পর থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া তিনি এক নাটকের অভিনয়ে কিরূপে প্রথম প্রসিদ্ধিলাভ করেন তাহার গল্প শুধু।

“লোকটা অভিনয়ে নিপুণতা লাভ-করিবার জন্য যেকোন পরিশ্রম করিত, শুনিতে অস্বাভাবিক হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী যুবকগণ কোথায় লাগে! খবরের কাগজে সমালোচকেরা তাহার অসাধারণ প্রতিভার কথা অনেক লিখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার অধিক বাক্যবার নিম্নরোজন। লোকটা যে প্রতিভাবলে এত বড় হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে পরিশ্রমও অসাধারণ করিত: নাটকের যে অংশ অভিনয় করিতে হইবে, তাহা লইয়া রাজিদিন আলোচনা করিত। কোথায় কোন্ কথা কি ভাবে—কি সুরে বলিতে হইবে, কোথায় কিরূপ অঙ্গ ও মুখের ভঙ্গী ঠিক সাজিবে, কোথায় ক্রিয়গল কিরূপে কৃত্রিম করিলে ভাল হয়, কোথায় চিবুক সহসা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলে ভাব অধিকতর পরিষ্কৃত হইবে, চক্ষু ও ওষ্ঠাধরের ভঙ্গী ও ক্ষুদ্র কিরূপ হইলে ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, সে এই সকল এত পৃথকপৃথকরূপে আলোচনা ও অভ্যাস করিত যে, সাধারণ অভিনেতার পক্ষে তাহা অসম্ভব। সে যাত্রার দলে যখন ছিণ তখনও ঐরূপ করিত, আবাস যখন থিয়েটারে তাহার মাসিক ৩০০।৪০০ টাকা আর হইল, তখনও ঐরূপ করিত। লোকটার প্রকৃতিও বড় মধুর; অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই।

“সে যখন ‘সরস্বতী থিয়েটারে’ প্রবেশ করিল সে আজ প্রায় বিশ বৎসরের কথা, —তখন সে থিয়েটারের নামও সকলে জানিত না। কিন্তু বেদিন মুচ্ছকটিকের অভিনয়ে অমর আসিয়া চারুদত্ত সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইল, সেইদিন হইতে ‘সরস্বতী থিয়েটার’ রঙ্গভূমির শীর্ষস্থান অধিকার করিল ও অমরের নাম বেশব্যাপ্ত হইল।

“অমর যখন চারুদত্ত সাজিবে স্থির হইয়াছে, তখন আমি ও অমর এক বাসায় থাকি। আমিও তখন একজন অভিনেতা। অমর সাতদিন ধরিয়া আহাঃনিঃশ্রা ত্যাগ করিয়াছে, দিনরাত্রি নির্দিষ্ট ভূমিকার আলোচনা করিতেছে। আমি এত বুঝাই ‘ওহে কর কি? একেবারে পাগল হইলে না কি? অনাহারে বাহুখ কি বাড়ে?’ কিছুতেই তাহার কথা নাট। কখনও হুই গ্রাস মুখে উঠিল, কখন বা তাহাও নহে। অবশেষে একদিন রাত্রিতে সে আমার সম্মুখে একখানা চেয়ারের উপর হত্যাভায়ে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ‘আমি আর পারি না! এ পেন্সা ছাড়িয়া পলায়ন করিব।’

“আমি বলিলাম, ‘বাণারখানা কি? এত পরিশ্রম করিলে, এখন ছাড়িয়া পলাইবে, বল কি?’

“সে বলিল ‘পরিশ্রমে আর কল কি? আমি যখন বাতায় দলে হিলাম পাড়াগায়ে অভিনয় করিতাম, তখন আমার বুদ্ধি বোগাইত, আর এখানে সাতদিন ধরিয়া মাথা বকাইতেছি, হত্যাপরোধে গ্রেপ্তার হইবার সময় চারুদত্তের মুখের ভঙ্গী কিরূপ হইবে, কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না। এই দেখ’—বলিয়া উঠিয়া একখানা আরনার নিকট বাইরা সে বলিল ‘একজন নিরপরাধ ব্যক্তি সহসা স্ত্রীহত্যা অভিযোগে দণ্ড হইলে তাহার চেহারা কি এইরূপ হয়? হাঃ হাঃ হাঃ!’ এই বলিয়া কাঁঠ হাসি হাসিয়া সে আরনার দিকে বিকট দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম ‘কেন কি দোষ হইল?’ আমার মনে হইল, লোকটা হঠাৎ কেঁপিয়া গিয়াছে। অমর পুনরায় কাঁঠ হাসি হাসিয়া বলিল ‘কি দোষ হইয়াছে? কিছুই হয় নাই? একবারে কিছুই হয় নাই! একটা বানর হস্তচলিত কবলী খুঁজিয়া না পাইলে বেক্রপ মুগ্ধভঙ্গী করে, আমার মুগ্ধভঙ্গী সেইরূপ হইতেছে। এ কি হত্যাপরোধে অভিযুক্ত নির্দোষ ব্যক্তির মুগ্ধভঙ্গী? দূর কর ছাই! এ আমার কর্ম নহে। অধ্যাক্ষ আর কাহাকেও চারুদত্তের ভূমিকা অভিনয় করিতে দিলেন না কেন?’ এই বলিয়া কিছুক্ষণ আরদীর দিকে মুখ বিকৃত করিয়া সে আমার কাছে আসিয়া বসিল।

“আমি বলিলাম, ‘ওহে অনেক পরিভ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। বাতির দুই দিক আলিলে কতক্ষণ ঘাইবে? এক ডোজ উত্তেজক সেবন করিয়া শয়ন কর।’

“সে বলিল, ‘তাহাতে আর কি হইবে? নিশ্রা ত হইবে না।’

“আমি বলিলাম, ‘আমি যদি পারিতাম, তোমার সাহায্য করিতাম। তোমার জ্ঞান আমার ক্ষমতা নাই। তবু দেখ দেখি, একরূপ ভঙ্গী করিলে কিরূপ হয়!’

“এই বলিয়া আমি দাঁড়াইয়া একরূপ মুখভঙ্গী করিলাম।

“অমর হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘রস—রস, তুমি বেকরূপ মুখ চোখ করিতেছ, ওরূপ করিতে দেখিলে স্রোতুবর্গ মনে করিবে, পেটে বাথা ধরিয়াছে।’

“হুইজনে খুব খানিক হাসিয়া গইলাম; তাহার পর বলিয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। সহসা আমার মনে চকিতের দ্বার এক বুদ্ধি আসিল। আমি লক্ষ দিয়া উঠিয়া অমরের পৃষ্ঠে এক চাপড় দিয়া বলিলাম ‘ওঠ হে! পেরেছি!’

“অমর চমকিত হইয়া আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, ‘কি পাইয়াছ?’

“আমি বলিলাম, ‘তারি বুদ্ধি বাহির করিয়াছি, সহজেই তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে।’

“অমর বলিল, ‘গৌরচন্দ্রিকা ছাড়িয়া দু’কথার বল।’

“একটা ছুরহ বাপাধে অকস্মাৎ একটা সছপায় উদ্ভাবিত হইলে মনে যে আনন্দ হয় তাহা বমন করা সহজ নহে। বহুকষ্টে আমি আশ্বাসংবন করিয়া বলিলাম, ‘গুন! রাখাল ভড়ের কথা তোমাকে একবার বলিয়াছিলাম, মনে পড়ে?’

“হেদোর ধারে বাহাকে দেখিয়া তোমার মগ্ন হইয়াছিল?’

“হঁ। আমি তাহাকে আমার খুড়ার কাছে চাকরী জুটাইয়া দিয়াছিলাম। সে লোকটা এখন বোড়ারসাঁকোতে একখানা বস্ততাড়া করিয়া আছে। লোকটা দারুণ ভীত, একটুতেই কাঁপিয়া অস্থির হয়। আমরা হুইজনে পাহারাওয়াল সাঝিয়া তাহার কাছে গিয়া যদি বলি ‘তুই জীহত্যা করিয়াছিস!’

“‘বাহবা! বাহবা! এই বুদ্ধি ত?’

“আমি বলিলাম ‘হঁ।’

“‘বেশ বেশ!’ বলিয়া অমর লাকাইয়া উঠিল। ‘আর বিলম্ব সহ্য না। এখনই ঘাইতে হইবে।’

“আমি বলিলাম, ‘তাড়াতাড়ি কেন? কাল হইলে হয় না?’

“না, না, এখনই চল । যতক্ষণ না একটা হেস্তনেস্ত হয়, আমার ঘুম হইবে না । দেখ দেখি আমার দেহাজে একটা নীল কাগজ আছে কি না । একটা প্রেস্তারী পরওয়ারা দেখাইতে হইবে ত । শীঘ্র প্রস্তুত হও । এখনি একটা গাড়ী ডাকাই, ১৫ মিনিটের মধ্যে জোড়াসাঁকো পহুছিবে ।’

“আমি বলিলাম, ‘একটু ভাবিয়া দেখ । একটা মাহুকে হঠাৎ হত্যাকারী বলিয়া ধরা, ব্যাপারটা কিছু গুরুতর বোধ হইতেছে । তাহাকে তত্ত্বপ্রদর্শনের অস্ত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত ।’

‘ক্ষতিপূরণ ! এখনি ৫-৬ টাকা দিব, আর হুইথানা থিয়েটারের টিকিট দিব । আবার কি ?’

“এই বলিয়া সে তড়াতাড়ি সাজসজ্জা করিয়া লইল । কৃত্রিম দাড়ী গোফ প্রভৃতি লাগান হইল । আমার একটু কষ্ট হইতেছিল, কেন এ পরামর্শ দিলাম ? কিন্তু অমর আমাকে আর চিন্তা করিবার অবসর দিল না । আমিও দাড়ী গোফ পরচুলা পরিলাম ।

“অমর বলিল, ‘পুলিসের পোষাকের আবশ্যক নাই । ডিটেক্টিভরা সাধারণ পোষাকেই কায করিয়া থাকে । বিশেষতঃ পুলিসের পোষাক দেখিলে বাড়ীওয়ারা গোলমাল করিতে পারে ।’

“তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ীতে উঠিয়া উভয়ে জোড়াসাঁকোর দিকে চলিলাম । পথে স্থির হইল, আমি রাখালকে প্রেস্তার করিব ও অমর তাহার ভাবভঙ্গী উন্নয়নরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লইবে ও রক্ষমকে তাহার অবিকল অঙ্কুরণ করিবে । গাড়ী শীঘ্রই রাখালের খাসার নিকট উপস্থিত হইল । তখন রাজি দশটা । বাড়ীওয়ারা বলিল, রাখাল বেড়াইতে গিয়াছিল—কিছু পূর্বে ঘরে আসিয়াছে । সিঁড়ির উপর একটা ঘর দেখাইয়া দিয়! সে বলিল ‘শব্দ করিবেন না, অজ্ঞাত ভাড়াটেরা ঘুমাইতেছে, নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে ।’

“আমরা নিঃশব্দে উপরে উঠিলাম । আমি আবার অমরকে বলিলাম ‘ভাই কায নাই, এ বড় গুরুতর ব্যাপার ।’

“সে আমার হস্ত বস্ত্রমুটিতে ধরিয়া বলিল, ‘তাহা হইবে না । তুমি যদি পন্ডাৎ-পদ হও, আমি হইব না । হুই মিনিটের মধ্যে কার্য্য উদ্ধার হইবে ।’ আমি আর কি করিব ? বে ব্যক্তি নিজ প্রতিভাবলে অসংখ্য শ্রোতার মন জুলাইতে পারে, সে যে আমার ভ্রাতৃ ব্যক্তিকে শিশুর মত বশীভূত করিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি ? রাখালের ঘরের দ্বার বন্ধ । আমরা এক, দুই, তিনবার মুহু মুহু শা দিলাম । কোনও

উত্তর নাই। শেষে সবলে দ্বার খেলিলাম। তখন অহুত্বেঃস্বরে উত্তর হইল
'কে ? কি চাও ?'

"আমি বলিলাম 'দ্বার খোল, সরকারের লোক।'

"সে দ্বার খুলিয়া দিল। আমি সন্দেশে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। লোকটা
বিশ্ময়বিহ্বলিত নেত্রে আমাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। দেখিলাম, বিভাগ যেমন
সূর্যিকের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে, অমর তেমনই মনোযোগের সহিত রাখালের
ভাবতন্ত্রী দেখিতেছে। তাহার মুখে ভয় ও বিশ্বাসে যে তরঙ্গ খেলিতেছিল, অমর
তাহার প্রত্যেকটি নিদেয় মনে আঁকিয়া লইতেছিল। রাখাল পুনরায় বলিল
'কে তোমরা ? কি চাও ?'

"আমি হিরতাবে বলিলাম 'আমরা পুলিশের কর্মচারী'—এই বলিয়া কৃত্রিম
পরওয়ানাখানি বাহির করিয়া বলিলাম, 'রাখাল ভুড় ! তুমি তোমার প্রণয়িনীকে
হত্যা করিয়াছ, এই অপরাধের জন্য তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করিলাম।'

"এই কথা বলিবামাত্র তাহার পাণ্ডবর্ণ মুখে এক ভয়নক ভাব বিভ্রাষণে
প্রকটিত হইল। তাহার দৃষ্টি চকিতের স্তায় একবার দ্বারের দিকে একবার
বাতায়নের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল।
কোন ক্ষণে তাহার কানে পড়িলে বেরূপ হয়, তাহার ভাব সেইরূপ হইল। অমর
কিন্তু তখনও নির্ণয় নরনে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া আছে। যেন চিত্রকর
চিত্রে প্রতিফলিত করিবার জন্য একমনে আলোচ্য বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছে।

"রাখাল যখন আবার কথা কহিল তখন আমার শোণিতে বিশ্বাসের তড়িত-
প্রবাহ ছুটিল। সে বিকট চীৎকার করিয়া হস্তদ্বয় উর্ধ্বে নিক্ষেপ করিয়া কহিল
'খেলা সাজ হইল। ধরা পড়িয়াছি। আর গোপনে বল কি ? আমি দোষ স্বীকার
করিতেছি। আমিই হত্যা করিয়াছি।' এই বলিয়া, সে আপনার কৃত্রিম দাড়ি
গোঁক টানিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার চেহারা দেখিয়া চিনিলাম, রাস্তা ভট্ট নামক
এক ব্যক্তি তিন সপ্তাহ পূর্বে তাহার প্রণয়িনীকে হত্যা করিয়াছিল—তাহার ছবি
খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম এ সেই ব্যক্তি।

"সে আবার বলিল 'হাঁ আমিই রাস্তা ভট্ট। আমি কেন খুন করিয়াছি তোমরা
জান না। সে আমাকে প্রভাবিত করিয়াছিল : আমার সমস্ত অপহরণ করিয়া
অপর এক ব্যক্তির সহিত গলাইয়াছিল। একদিন রাত্রিতে দৈবাৎ দর্শন পাইয়া
কাল সপ্নিগীর উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছি। আমাকে লইয়া চল। খেলা সাজ হই-
য়াছে। আর কেন ? যত শীঘ্র চুকিয়া যার, ততই ভাল।'

“আমি অমরের দিকে চাছিলাম । সে তখনও একদৃষ্টে লোকটাকে দেখিতেছে ।
তখনও ছবি তুলিতেছে !

“এই ঘটনার পর মুচ্ছকটিকের অভিনয়ে অমর যে অতৃপ্ত নাট্যকৌশল
দেখাইয়াছিল তৎসম্বন্ধে সমালোচক মহলে একটা চলফুল পড়িয়া গিয়াছিল ।
সকলে প্রশংসার স্রোতে অমরকে ভাসাইয়া দিয়াছিল । সকলে একবাক্যে বলিয়া-
ছিল, হত্যাপরোধে অতিযুক্ত চারুদত্তের অভিনয় প্রকৃত ঘটনার প্রায় স্বাভাবিক
হইয়াছিল ।

“সেই দিন হইতে পাচশত রাজি উপৰ্য্যাপরি মুচ্ছকটিকের অভিনয় হয় ।
কিন্তু প্রথম অভিনয়ের পর এক মাসের মধ্যেই রাখাল ভড় ওরফে রাজ ভট্ট কার্য-
পারে আশ্চর্য্যতা করে ।

“এ গল্প আমি ও অমর ভিন্নজন্মের কেহ জানেন না ।”

ত্ৰিঅতুলচন্দ্র ঘোষ ।

—:—

বীর ও গুণী ।

সশস্ত্র দান্তিক বীর হহকার ছাড়ি
নিশ্চেষ্ট করিয়া দুর্কলে,
ছ’দিনের তরে করি অরাতি বিলয়
বৃথা কীৰ্ত্তি ঘোষে মহীতলে,
নিরস্ত্র বিনয় গুণী বৈদ্যুৎ-চিত
মুখে স্নিগ্ধ শ্রীতি পুণ্যভার,
প্রেমে দ্রবীভূত করি মানব অন্তর
করে চির ছদি অধিকার ।

ত্ৰিযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।



সমালোচনা।

ললিতবাবু ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার কৃতিত্ব।

সমালোচনা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। অথচ প্রতিদিন দেখিবেন, সাহিত্য পত্র-পত্রিকা, রাজনৈতিক ও সামাজিক খবরের কাগজে সমালোচনা নাম দিয়া কিছু-কিছুকার বিড়ম্বনা বাহির হইতেছে। পড়িলে সমালোচকের উপর কেবল অশ্রদ্ধা হয়, আর কিছুই হয় না। না, এস্থানি কিরূপ তাহা বুঝা যায়; না, সমালোচক কি বলিতেছেন, তাহা বুঝা যায়; যদি কখন বুঝা গেল, ত তিনিটি কথা বুঝা যায়। (১) লেখক এতদ্বারকে সার্টিকিফিকেট দিতেছেন, আর আশীর্বাদ করিতেছেন। আশীর্বাদ করিতেছেন বলিয়া সমালোচক লেখকের গুণ, আর ক্রীতদাসের মত তোষামোদ করিতেছেন বলিয়া তিনি দাস। সুতরাং, কেহ রাগ না করিলে, এই সকল সমালোচনাকে গুরুদাসী বলা বাইতে পারে। (২) আর একটা কথা বুঝা যায় যে, লেখকে ও সমালোচকে অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু কি কি বিষয়ে মতভেদ তাহা কিছুতেই জানা যায় না। মত-সামরস্ত ত পরের কথা। ইহাকে মতভেদীই বলা যাউক। (৩) আর এক প্রকার—কণাধারী; বিমান অর্থে আকাশ হইতে পারে না; বিষয় শব্দের শেষের অক্ষরটি দুইটি গণ নহে—একটি মূর্ধ্যা একটি মৃত্যু; পিতামাতা ভুল—পিতৃমাতা বলিতে হইবে। প্রধানত এই তিনরূপ—গুরুদাসী, মতভেদী ও কণাধারী—সমালোচনা ছাড়া অন্তরূপ সমালোচনা আর প্রায়ই দেখা যায় না।

তাঁহাতেই বলিতেছি, প্রকৃত সমালোচনা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। বখন বয়স ছিল, সময়-স্বযোগ ছিল, আগ্রহি ছিল, তখন, শাপমুখে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি, আমি প্রকৃত সমালোচনা করিবার বৎসিকিঃ চেষ্টা করিতাম। একখানি মাসিক, একখানি সাপ্তাহিক নিজের দুইখানি কাগজ ছিল; সেইজন্য কতকটা প্রচার দায়ে, আর মাতৃভাষা বর্ণাদপি ভালবাসি—সেই মাতৃ-অঙ্গে আবর্জনা না লাগে, এইরূপ একটা ছরাকাক্ষার বশে, নিরপেক্ষ, নির্ভীক, প্রকৃত সমালোচনা করিবার নিঃসিক্তরূপে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু, তেহি নো দিবস। গত। সে দিন আর নাই। সে ছরাকাক্ষা ও মাই-ই, অধিকন্তু এবিধ বিশ্বাস হইয়াছে, সমাজে হউক, সাহিত্যে হউক, চরিত্রে হউক, কেবল দোষদর্শন অভ্যাস করা একটা মহা

পাপ । পাপ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি, দুর্বল বলিয়া পারি না ।
কলি ছোড়তি নহী ।

সৌভাগ্যবলে, ২০১২ খনি পুস্তক উপহার পাইয়াছি । তাহার সকল-
গুলিই যে সমালোচন করিতে হইবে, গ্রন্থকারদিগের এমন অমুরোধ নাই, তবে
গ্রন্থকারদিগের আবার দালাল আছেন । কারণই সৌভাগ্যবলে বাহা পাইয়াছি,
দুর্ভাগ্যবশত তাহারই সমালোচনা করিতে হইবে । সুতরাং আমি বিপন্ন,—
আপনারা হাসিতেছেন না ত ? যদি হাসিয়া থাকেন, তবে মনে করিবেন,
সকলকেই সময়ে সময়ে বলিতে হয়,—“আমি স্বধাম সলিলে ডুবে মরি, ভ্রামা ।”

তবে ললিতবাবু এবং তাঁহার পুত্রের কথা স্বতন্ত্র । স্বচক্ষে * না দেখিলেও
ভালবাসা আছে । রূপে নয়, গুণে । ১৯০৫ সালে আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান
অন্নরত্ন “বঙ্গবাসী” কলেজে ললিতবাবুর পাদমূলে ইংরাজি পড়িত । তাহার
মিকট ললিতবাবুর পাঠনার, ছাত্রগণের সঙ্গে ব্যবহারের, ভূয়সী প্রশংসা
তনিতাম । ডোমরা হরত আবার হাসিবে,—আমি কিন্তু সেই অবধি লোকটিকে
ভালবাসিয়াছি । তিনি যে বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন, তাহা
আমি জানিতাম না । তাহার পর, তিনি লেখকরূপে ক্রমে প্রকাশিত হইতে
লাগিলেন । আমি সম্বর্পণে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকিলাম । ক্রমেই
বুঝিলাম, তিনি ‘রঙ্গ-রঙ্গ’ লিখিবার অল্প একটু অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন । আমার
হৃদয়ে বিবাদ উপস্থিত হইল । মনে হইল, একটি গুণবন্ত পুত্র * এইবার
বিপদবাসী হইতে লাগিলেন ।

সেই ভালবাসার সঙ্গে এই আপত্তি মিলিয়া আমাকে এই সমালোচনার প্রবৃত্ত
করিয়াছে ।

ললিতবাবু সকলরূপ লেখা লিখিতেই অগ্রসর । পত্র, পত্র, চটুকে, চটুকি,
কুকুকা, পত্রীতর, সমালোচনা, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকলরূপই তিনি লিখিতে-
ছেন । এক ‘কোরারা’ গ্রন্থ বরিলেই আর তাঁহার সকলরূপ রচনার নমুনা
পাওয়া যায় । আমরা সেই খানিকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার কৃতিত্বের
আলোচনা করিব ।

আমার মত পণ্ডিতের পক্ষে ‘প্রকৃতিবাদ’ই প্রধান সম্বল । ‘প্রকৃতিবাদে’

* সম্প্রদায়, আমার ক্রটি স্বীকার্য্য করিবেন,—আমি খচকুতে লিখিতে পারিব না ।
উৎসবপুস্তকও লিখিতে পারিব না । অ, ৫, ১ ।

ফোয়ারা শব্দ নাই, ফ্যারাও নাই। উৎস দেখিলাম—উৎস অর্থে ফোয়ারা। বড় বিভ্রমের পড়িলাম। এতকারের আশ্রয় লইলাম। “বালুকাময় মরুভূমিতেও স্থানে স্থানে ফোয়ারা আছে। শিক্ষকের শুষ্ক জীবনেও মাঝে মাঝে ভাবের ফোয়ারা খেলে।” শিক্ষকের শুষ্ক জীবন—স্বীকার করি না; তাহা হইলে শিক্ষককে না দেখিয়া তাঁহাকে ভালবাসিলাম কি করিয়া? শিক্ষকের মত সরল জীবন আর হইতেই পারে না। শিক্ষক সমাজ-বিধাতা। এই ভারতবর্ষ রাজার দ্বারা গঠিত কোন কালে হয় নাই। ভারত ব্রাহ্মণ-গঠিত, অর্থাৎ শিক্ষক-গঠিত। জগতের সেই শিক্ষকবংশে অন্তর্গত করিয়া, সেই শিক্ষাদানের অধিকারী হইয়া ললিত-বাবু আপনাকে কেন হীন মনে করেন, তাহা বুঝা যায় না। এটা তাঁহার একটা বিবম ভুল; মানসিক বল কেন্দ্রীভূত করিয়া মন হইতে এই ভুল তাঁহাকে দূর করিতে হইবে। যে নিজের শুষ্ক জীবন এই বিশ্বাসে লিখিতে আরম্ভ করে, সে বাহির হইতে যতই রস আহুক না কেন, সে সমস্ত রস শুকাইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত উৎসের রস ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে, তাহা ত কখন শুষ্ক হয় না।

সুংকার, সুংকারা, সুসার, ফোয়ারা। সুংকার নীরসও হয়, সরসও হয়। “সুংকারে করিয়া গুটি, পুনঃ কর বিশ্বস্থি”—সে জলভরা গুণ্ডের সুংকার। সুতরাং তাহাতে বিশ্ব আবার ফুটিয়া উঠে। আর শুষ্ক জীবনের সুংকার কেবল আবেগভরে বাহির হয়, একটু সুস্থ সুস্থ করে, আর কিঞ্চিৎ যেন অবহেলা এক অবজ্ঞা দেখায়।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ললিতবাবুর জীবন শুষ্ক জীবন নহে এবং দেখিতেছি তাঁহার এই ফোয়ারাও একটা সুংকারমাত্র নহে। তবে, কবি যে বলিয়াছেন,—

“না হলে রসিকে বয়োধিকে রস জানে না,

এ রস প্রবীণে বিনে নবীনে সম্ভবে না।”

—সে কথাটাও একেবারে ভুল করিবার মত নহে। ললিতবাবুর জীবনে যথেষ্ট রস আছে, কিন্তু সে রসের পরিপাক এখনও হয় নাই। রসে বড় বেশী তরলতা আছে। কাজেই চাকলা আছে, চাপলা আছে।

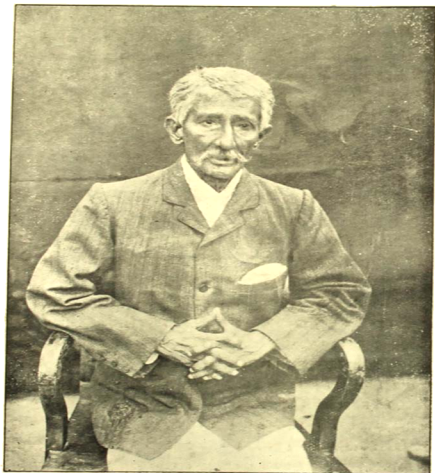
এই তারলা আছে বলিয়া অনেক সময় তাঁহার রচনার কেন্দ্র স্থির থাকে না। ফোয়ারার প্রথম প্রবন্ধ লইয়াই এই কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিব। গোকর পাড়ী ভাল? না রেলপাড়ী ভাল? তুমি যদি আপনার স্বপ্নভূমিকে কেন্দ্র করিয়া বল, হুই-ই কষ্টকর বা হুই-ই সুখকর, অথবা একটি সুখকর, অষ্টটি কষ্টকর, তাহা হইলে, সে লেখা বুঝা যায়। তাহা না লিখিয়া, তুমি লিখিলে,—“বিলাতী: সত্যভার-

হিড়িকে আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথাগুলি একে একে লয় পাইতেছে; বহু-বিবাহ উত্তরাহে, অবরোধ-প্রথা, জাতিভেদ-প্রথা, একত্ববত্তী পরিবার-প্রথা বার বার হইয়াছে, আমাদের সনাতন চকমকির স্থান ‘বিলাসী অগ্নি, দেশাশাই রুপী’ দখল করিয়াছে, নবাবী আমলের অধুনা খাখিরা ছাখিরা আজি তাহতবাহী মার্কিনের বডুসাই হুকিতেছে। আবার বুদ্ধি বিধিবিড়ম্বনার আমাদের সনাতন অবিধিগের উদ্ভাবিত অপূর্ণ বান গোকুর গাড়ীও বিলয় প্রাপ্ত হয়।” এ লেখা বুঝা যায় না। বুঝা যায় না—তুমি অজ্ঞ অথবা উকীল। অজ্ঞ বিচার করেন, তুমি তাহা করিতেছ না। উকীল একটি পক্ষ সমর্থন করেন—তুমি ত তাহাও করিতেছ না। তোমার অপক্ষপাতিও নাট, পক্ষপাতিও নাই—তোমার কেন্দ্র হির নাই; হুতরাং তোমার বুঝা যায় না। তুমি বলিবে, ‘আমি রস-রস লিখিতেছি, আমার আবার কেন্দ্র কেন?’ এ একটা বিষম ভুল কথা; একথা খ্যাকারে বলিলে বলিতে পারেন, কিন্তু ডিকেন্স কখনই বলিবেন না। বিনয়ে বলি, তোমরা কেহ বেন খ্যাকারের শিষ্য হইও না। ছুইদিকে চাবুক মারিতে চাও বেশ ত। নূতনকেও মার পুরাতনকেও মার—কিন্তু নিজের কেন্দ্র হির রাখিও। সকল বিষয়েই খোলসাঁড়ের আদর নাই—বিশেষ এই রস-রচনার। কেন্দ্র না থাকিলে এলোপাখাড়ি মার-ধর করিলে প্রশংসা নাই, উহাতে অহ-বিম্বরও হয় না। আর কেন্দ্র হির রাখিরা অন্তর্চালনা করিলে, হারিলেও ক্ষিত আছে; লেখা খুব উজ্জল না হইলেও কেন্দ্রাবলম্বী লেখার একটা নিজের হির প্রভা আছে।

পর প্রবন্ধ ‘তীর্থ-দর্শনে’ও কেন্দ্র হির নাই। একটি পৃষ্ঠায় (২৬) উপর দিকে কেন্দ্র বেষ্টিত, নিম্নে তাহার বিপরীত ভাবে। “বাটের উপরি ভাগ ও সোপানশ্রেণী মহাবান্ধের পক্ষে ও কুকুরবিঠার (ইহার মধ্যে মহাবান্ধ-কুকুরও আছে) অপ্রবন্ধ ও বিতুকা জন্মাইয়া দেয়। • • • ইহা হিন্দু সমাজের পক্ষে নিত্যান্ত লক্ষ্যের বিষয়।” নিম্নদিকে,—“পতিতপাবনী স্রবধুনীর স্তায় বিশ্বনাথের পুরীও পান্ডির সংস্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই, বরং পান্ডিদিগকে নিম্ন কোণে স্থান দিয়া তাহাদের গাপক্ষালনের পথ দেখাইতেছে।” এইরূপ কেন্দ্র-পরিবর্তন সর্বত্র। এই দোষে এমন অনেক লেখা অনেকটা কলহীন হইয়াছে। আমরা শুণ্ডালী লেখককে কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করিরা কেন্দ্র হির রাখিতে পরামর্শ দিই।

তাহার পরে ‘বারাণসীদর্শনে’ ক্ষুদ্র কবিতাটিতে বেশ কেন্দ্র হির আছে। একটু উজ্জ্বল করিয়া দিতেছি—

আর্য্যাবর্ত ।



শিলিরকুমার ঘোষ ।

“কাফীর বার

হুজিৎ নিশ্বল ; মানান্তে ছুড়ার দেহ,
আম্বার কলুব কাটে, ভরে বনঃ প্রাণ
শান্তির বিমল রসে। এতান্তে সঙ্কার
তীরে বসি পূজে ভক্ত নিজ ইষ্টদেবে ;
বসি সাধু দণ্ডি কাছে গুনে ধর্ম-কথা
কেহ শুদ্ধচিত্তে। বিরাজিত শান্তি সঁদা
এ পবিত্র ধামে, ভুলে নর শোক-তাপ ;
আম্বার পিপাসা নিটে শান্তি-সুধা পানে।
সুগে সুগে যোগী-ঋষি-সাধু-ভক্তগণ
পবিত্র করেছে পুরী চরণ-পরশে ;
পুণ্য রজঃ-স্পর্শে প্রতি ধূলিকণা
পূরিত অব্যাস্থ-বলে ; তাই বুঝি প্রাণ
শান্তিরসে অভিষিক্ত, বৈরাগ্য-মণ্ডিত
হয় প্রতিক্রমে ; ছেড়ে যেতে আঁধি তরে
অজ্ঞানীরে, সূত্র ঠেকে লবণ-পত্র—
বুঝি না অজ্ঞান যোরা কেন হেন ভাব ?”

উপসংহারে কবি লিখিতেছেন—

“ইসলাম মজিদ হোখা উচ্চ চূড়া তুলি,
বিরাজে তাহার পাশে খ্রীষ্টানুমাধব ;
আদি-বিবেশ্বর-স্থান হয়েছে মজিদ ;
খুষ্টান ভক্তনাগর, শিখের মন্দির
রহে পানাপানি, কি উদার ধর্মভাব।
বহু ধর্ম বহু সুগে উদ্ভিত ভারতে
সংঘর্ষণ-সময়র ব্যাপনসী ধামে।”

লক্ষ্য করিবেন, আরবীভের মজিদ দেখিয়াও কবির মনে, ধর্মবিষেবের কথা উঠিল না। এ স্থলে তিনি কেবল হির রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার মনে কেবল ধর্ম-সময়রের উদারতার কথা উঠিয়াছে। তাই ত চাই।

তাহার পর ললিতবাবু একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন ‘হুধের প্রবাস’। প্রবন্ধের সুখবন্ধে ললিতবাবু বলিতেছেন, “এবার আর শীতলা ঘাড়ে করিয়া বাহির

হই নাই। ‘একা আসি, একা যাওয়া, একের কর ভাবনা’ মহাশ্রম্মাণের এই সারভঙ্গ বৃষ্টি একাই বাহির হইয়া পড়িয়াছি।” কিন্তু শীতলা-বিরহিতা অবস্থাকে ‘হৃৎকের প্রবাস’ বলার শীতলা মহা রোদ্ভা হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। সেই ক্ষণ পর মাসের প্রবন্ধ ‘বিরহ’—তাহার উপসংহার—বৈষ্ণবের সার কথা—

“সঙ্গমবিরহবিকলে বরমণি বিরহো ন সঙ্গমস্তম্ভাঃ ।

সঙ্গে সৈব তথৈক্য জিতুবনমণি তন্ময়ং বিরহে ॥”

তাহার পর চুইকি সাহিত্য। তাহার একটি ভূমিকা আছে। ভূমিকার গ্রন্থকার লিখিতেছেন—“একটু রসিকতা থাকিবে, কিন্তু তাহা হাল্কা হইবে না, ভাবটি গভীর হইবে, অথচ তাহাতে বিকট গাভীর্ঘা থাকিবে না, চাই কি একটু বিদ্রুপের কটাক্ষ থাকিবে, অথচ কল্পনার অন্তঃসলিল প্রবাহ দীর্ঘে বহিয়া যাইবে। এইরূপ উজ্জল-মধুরে মিশিলেই এই প্রকারের সাহিত্য সার্থক হয়।” এই লক্ষণটি অতি সমীচীন। হৃৎকের বিষয় গ্রন্থকার স্বয়ং নিঃসন্দেহ লক্ষণ অনুসরণ করিতে পারেন নাই। আমরা নির্লক্ষ্যসহকারে নিবেদন করি, গ্রন্থকার বেন চুইকি সাহিত্যে আর কখন হস্তার্পণ না করেন।

দুই একটি চুইকির দৃষ্টান্ত দিব—

একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী বড় বাহুবের বাড়ী সামিয়ানা চাহিতে গেলেন। সামিয়ানার চারি কোণে চামড়া দিয়া সেলাই করা হইয়া মজবুত করা হয়। ব্রাহ্মণ অতি বিনীতভাবে বলিলেন, “আমার পিতার আশ্রয়প্রাপ্ত উপলক্ষে আপনার নূতন সামিয়ানাখানি দুইদিনের জন্য চাহিতেছি।” বড় বাহুব সচাস্য বদনে বলিলেন, “আপনাকে দিব কি, ঠাকুর! এখনও মুক্তির কর্তব্য হয় নাই।” ব্রাহ্মণ সেইরূপ সহাত্রে বলিলেন, “না দিলেই হইল।” দেখুন কেমন তীর শ্রেষ, অথচ বিকট গাভীর্ঘা নাই; কল্পনার অন্তঃসলিল প্রবাহের মধ্যে কেমন একটু বিদ্রুপ-কটাক্ষ। ললিতবাবুর লক্ষণের সঙ্গে কেমন অক্ষরে অক্ষরে মিল।

সেকালে আর একরূপ চুইকি ছিল; বাহার কথা একটু উলটিয়া বা বাড়াইয়া দিয়া তাহাকেই উত্তর দেওয়া। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় উলার মুক্তিরাম মুখ্য্যোকে বড় ভালবাসিতেন; বেহাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন; সেই সম্পর্কের দোহাই দিয়া, তাঁহাকে লইয়া নানা রঙ্গ-রঙ্গ করিতেন। উলার বহতর কুলীন ব্রাহ্মণের বাস, সেই উপলক্ষ করিয়া রাজা মুখ্য্যোকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “হাঁ হে বেহাই!

‘হ’ মূল ‘অথবা’ ছিল, আমি ‘অথচ’ লিখিলাম; কেন না কল্পনার অন্তঃসলিল সকল সঙ্কটই থাকি আবশ্যক। অ, চ, স।

তোমাদের গ্রামে নাকি বৌ বিক্রয় হয়!" এটা অবজ্ঞা গালি। সুক্টিরান কিন্তু গারে না মাথিরা বলিলেন, "আজ্ঞে মহারাজ! নিরে বাবা মাজই।" মহারাজ নিস্তব্ধ।

এইরূপ রস-ভাব বাঙ্গালার ভদ্র সমাজে সর্বদাই শুনা যাইত। আমরা বহুতর শুনিয়াছি। আমাদের সময়ে যে তিন জন রস-রচনার প্রসিদ্ধি লাভ করেন—শিশিরকুমার, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ইন্দ্রনাথ—তাহারা তিনজনই বিশেষ রুচরবান্ ব্যক্তি। একথা বলাতে এখন বলা হয় না যে, বাহ্যকে অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ, তিনি একজন হৃদয়চীন লোক; তাহা যদি বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে ভালবাসি বলিয়া এই প্রবন্ধের সূচনা করিতাম না। আমার বিশ্বাস, ললিতবাবুও সন্দেহ ব্যক্তি; তবে বোধ করি, শিক্ষা-বিভাগে, অথবা এখনকার কালের বিষয় উৎসাহ-বাত্যার হৃদয়ের ভাবের পরিপাক হয় নাই। চাঞ্চল্যবশে তাঁহার অপরিপক ভাব পাকাইয়া উঠে, আর বহুবাক্যবহির্গত উৎসাহ-মোহে তাহাই 'পরমা পোরা' বলিয়া বাজারে আনীত হয়। কাগজের সম্পাদকদিগকে আমি সেইরূপ বহুবাক্যব বলিয়া অহুমান করিতেছি। অহুমান সমস্তই অমূলক হইতে পারে, হইলে আমাকে মার্জনা করা বাতিলেরূপে আপনাদের আর কি গতি আছে?

বড়ই গুরুমহাশয়গিরি করিয়াছি, একটু অভ্যদিকে যাই।

ললিতবাবু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতেও হাত দেখাইয়াছেন। রবিবাবুর 'চিহ্নাদনা' কাব্য, তত্ত্ব সমালোচনা, তত্ত্বাঃ সমালোচনা এইগুলি পাঠ করিয়া তবে সেটি পড়িতে তিনি অহুরোধ করিয়াছেন। এরূপ দারুণ অহুরোধ এ বয়সে রক্ষা করা কঠিন, কিন্তু তাহাও করিয়াছি। কিন্তু কোন ফলই পাই নাই। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝিবার পক্ষে কোন ফলই পাই নাই। নতুবা রবিবাবুর কাব্যপাঠের ফল অবজ্ঞা পাইয়াছি। এই কাব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিশ্বেস্বরূপ রায় বলিয়াছেন, "ইহার সুন্দর তাহা ও মধুর ছন্দোবন্দ, ইহার উপমাছটা অতুলনীর। মাইকেলের পর এত মধুর অমিতাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দৃঢ় করা উচিত।" শেষের দৃঢ় করা কথাটি ছাড়া আর সকল কথাই আমার শিরোধার্য। আর একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বেস্বরূপ বলিয়াছেন—সেটিও শিরোধার্য; "যেন পৃথিবীতে মাতা নাই, তাতা নাই, বহু নাই। সব মারক আর নারিকা!" চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই কথাটি আমি বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু শুনিবার লোক নাই। বিদেশের Love লইয়াই আমরা ব্যস্ত। আমাদের তপোবনের সীতা, মহাভারতের কুন্তী, বৈকুণ্ঠের বশোদা ও শাক্তের

যেমনকি আমরা ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছি । ভুলিয়া পাঠিতেছি কি না ‘পাড়ারমুখী’ ভ্রমরা ও কলঙ্কিনী নৈবলিনী । মরি রে ! স্বদেশী ! তোরা বালাই লয়ে মরি ।

কাব্যে বাতা-কল্পা নাই বলিয়া বিজ্ঞানজ্ঞানের বে হুঃখ তাহা সহজ, স্বদেশ । তবে কাব্যে যে নৈতিক আক্রোশ—এটা সম্পূর্ণ বিদেশী বস্তু, কৃত্রিম কোপ । প্রথম বংসরের ‘বঙ্গদর্শনে’ লিখিয়াছিলাম, “প্রেম যে কখন কলুষিত হইতে পারে, কলুষিত প্রেমরূপ যে কোন পদার্থ আছে, বৈজ্ঞানিক কবিরা তাহা অগ্রহণ করিতে পারেন নাই ।” তবে বিজ্ঞানবাসু বলিয়াছেন, “স্ববিবাসুর কবিতার বৈজ্ঞানিক-কবিদিগের তত্ত্বটুকু নাই, লালসাতুকু বেশ আছে ।” তাহাই যদি হয়, সে কবিতা সদোষ হইল বটে, কিন্তু একেবারে নষ্ট করিবার উপযুক্ত কি ?

এ সকল কথা আমাদের প্রবন্ধের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কশূন্য, তবে ললিতবাসু যে বলেন, আমাদের সমাজে দাম্পত্যপ্রণয়ের পূর্ণ পরিণতি এই কাব্যে দেখান হই-
য়াছে, তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার তাহা কিছুই বুঝা যায় না । বুঝা যায়, লেখক টেনেবুনে কতকগুলি কথা লিখিয়াছেন, এইমাত্র । তাহাতে কাব্য বুঝিবার বা সমাজ বুঝিবার কোন সুবিধা হয় নাই এবং বিজ্ঞানবাসু যে নৈতিক ষট্কা ভুলিয়াছেন, তাহার কোন মীমাংসাও হয় নাই ।

পূর্বেই বলিয়াছি, ললিতবাসু বঙ্গসাহিত্যের অনেক বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়া-
ছেন । ‘ফোরাগা’ অবলম্বন করিয়া তাহারই কতক কতক আশোচনা করিলাম ।
এইবার তাহার কাব্য-সমালোচনার কথা বলিব ।

গত আশ্বিনের ‘প্রবাসীতে’ হই কলমের আটচলিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি
মাটক প্রকাশিত হইয়াছে । লেখক স্ববিবাসু নিজেই নামকরণ করিয়াছেন বলিয়া
মাটক বলিতেছি । ২য় আশ্বিনে সেই ‘অচলারতন’র সমালোচনা লিখিয়া ললিত
বাসু ‘আর্য্যাবর্তে’ ছাপিতে দিয়াছিলেন । এই ক্ষিপ্ৰকারিতা দ্বারাই ললিতবাসুর
উপর আমাদের আরোপিত চাপলা প্রমাণীকৃত হইল । দেখা যাইতেছে, ললিত
বাসু যেমন ‘অচলারতন’ পাঠ করিলেন, অমমই বিষয় চকল হইয়া সমালোচনা
লিখিতে বসিয়া গেলেন । পড়ার পরই লেখা, লেখার পরই ছাপাইতে দেওয়া—
ভিলাফি বিলম্ব করিতে পারিলেন না । বাহ্যিক পুরুষ বলিতে হয় । কিন্তু এই
বাহ্যিক নাকি কবাইলে রসের পরিপাক হয় না । যদি বা হয়, ত কেহ হির থাকে
না । আবার চাপলার নানা বিষয়র কল আছে । এই দেখুন, সমালোচনার
প্রথম পৃষ্ঠারই ছয়শতিকা পরে ললিতবাসু লিখিতেছেন, “তারতীয় আর্য্যাবর্ত
দ্ব্যোক্ত্যন্ত, বেদগান, বঙ্গ, হোম প্রভৃতি অষ্টানবাহল্যে সখিত্যব্রাহ্মণ-

আর্য্যাবর্ত



ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

আরগ্যাকাদি প্রসীড়িত।” কে প্রসীড়িত? ভারতীয় আর্বাধর্ম? না আরগ্যাকাদি? না উভয়ই? আগাতও আমরাই প্রসীড়িত—যিনি ব্যাকরণবিভবনার কথা লইয়া বঙ্গসাহিত্য কিছুদিন বাৎ আলোড়িত করিতেছেন, তিনি কি না নিজ ক্ষিপ্রকারিতাদোষে নিজেই বিভ্রান্ত হইলেন! এক্ষণ দেখিয়া কপালে বা মারিতে ইচ্ছা করে, আর বলিতে ইচ্ছা করে, ‘বল না তারা পাড়াই কোণা?’

এখন একবার সমালোচনাটি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

‘অচলারতনের’ মূল কথায় ললিতবাবু যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই। আমরা কণাধারী সাক্ষিব না।

‘অচলারতনের’ আসল জিনিষ পক্ষের মানগুলি। সেইগুলি সযত্নে ললিতবাবু বলিয়াছেন—ঐ গুলিতে “সাধকের প্রেমময় হৃদয়ের একটি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তাহা যেমন সরল, তেমনই মধুর। গানের নূতন হোজল হুন্দে বাহুল্য হৃদয়ের আকুল আহ্বান শুনিয়া পাঠকের মনঃপ্রাণ ভরিয়া যায়।” বাস্তবিক পক্ষকে বালক রবীন্দ্রনাথ বলিয়া মনে হয়।

এই কথালিখিতে গিয়া একটা কথা মনে পড়িল। অচলারতনের সমালোচনার একটি ফুটনোটে ললিতবাবু লিখিয়াছেন, আমার ‘সনাতনী’ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘অচলারতন’ একই সময়ে প্রকাশিত হইল ইহা, Significant নহে কি? আরও একটা Significant সমাবেশ পাইয়াছি, বলিতে দোষ কি?।

আমাদের ‘প্রবাসীতে’ ‘অচলারতনের’ পরেই রবিবাবুর ‘জীবনস্মৃতি’তে “তৃত্য-রাজকতন্ত্র” বাহির হইয়াছে। পক্ষকে বাণক রবীন্দ্রনাথ বলিতে গিয়াই আমার মনে হইল, এই তৃত্যরাজকতন্ত্রই কি তবে অচলারতন? তবে কি রবিবাবু আপনার জীবনস্মৃতি রূপকে ও স্বরূপে হই তাহেই লিখিতেছেন?

রূপকের অচলারতন অবশ্য একটি সুস্বহৃৎ চরিত্র, রবিবাবুর বালাজীবনের অচলারতন একটি বর,—সেই বরের ভিতরে একটি নির্দিষ্ট গভীর মধ্যে ঔহার বিচরণ-স্থান; * গুণের মধ্যে সেই বরের উত্তরদিকের জানালা খুলিলে প্রায়-শিত্তের বিধি ছিল না। সেই জানালাতে একাদিক্রমে ৬ ঘণ্টা ৮ ঘণ্টাকাল কেবল পাচ জনে কে কেমন করিয়া গা খুইতেছে, মাথা রপড়াইতেছে দেখা, ইহা

* “বাহির বাড়িতে সোড়লার বন্ধিণ-পূর্ণ কোণের ঘরে ঢাকরনের মহলে আমাদের বিধি কটিত। আমাদের এক ঢাকর ছিল। * = * = সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট ঘরনে বসাইয়া চারিদিকে বড়ি দিয়া গতি কটিয়া দিত। গভীর সুখ করিয়া তরুণী কুলিঙ্ক বলিয়া’ বাইত গভীর বাহিরে সেলোই বিষম বিপদ।” জীবন-স্মৃতি। এবাসী—ভাস, ১৩১৮।

পঞ্চকের 'ভট ভট ভোটের ভোটের' অপেক্ষা দশগুণ বেশী কষ্টকর, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন । বিশেষ রবিবাবু নিজেই ধরা দিয়াছেন :—তিনি অচলারতনকে ঘর বলিয়াছেন—

‘বেঞ্জে উঠে পঞ্চমে বর,
কেপে উঠে বন্ধ এ ঘর
বাহির হতে দুয়ারে কর,
কেউ ত হানে না !’

সুতরাং নিজের ঘরের কথাই রবিবাবু যে অচলারতনে লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । এত বর-প্রাচীরের কথা, তাহার পর শাসনের কথা শুনি । রবিবাবু স্বরূপ বর্ণনায় লিখিতেছেন,—

“ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজত্বকাল সুখের কাল ছিল না । আমাদের জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যদের শাসনকালটা যখন আলোচনা করিয়া দেখি, তখন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না । এই সকল রাজাদের পরিবর্তন বারম্বার ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সকল-ভাবেই নিষেধ ও প্রহারের ব্যবহার বৈলক্ষ্য্য ঘটে নাই ।” এ সকল কি অচলারতনের বর্ণনা নহে ? রবিবাবুর আশ্রিত মাসে প্রকাশিত জীবনস্মৃতির শেষ কথা—“আমরা যেমনই পড়া শ্রুত করিতাম, এমনই মাথা ঢুলিয়া পড়িত । চোখে অল-সেক করিয়া বারান্দার দৌড় করাইয়া কোন স্থায়ী ফল হইত না । এমন সময় বড়দাদা যদি দৈবাৎ স্থল-ঘরের বারান্দা দিয়া ঘাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন, তবে তখনই ছুটি দিরা দিতেন । ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব হইত না ।” জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—এই ‘বড়দাদা’ অচলারতনের ‘আচার্য্য’ নহেন কি ?

‘অচলারতন’ সম্পূর্ণ গ্রন্থ, ‘জীবনস্মৃতি’ ক্রমশ প্রকাশ । এই উভয়ের মধ্যে সমালোচনা এখন ভাল নয় । তবে ললিতবাবুর কুটনোটের Significance দেখিয়া এই Significance যেন উঠিল—তাই এত কথা বলিলাম ।

এখন আসল কথা পঞ্চকের গানগুলি যেমন সুন্দর, প্রাণম্পর্শী হইয়াছে, পাত্রগণের কথাবার্ত্তা তেমনই নীরস, একথেষে, ছড়ান—কোনরূপ কাব্যের অগ্রপশ্চাত্ত হইয়াছে ; ললিতবাবু যে তাহা একেবারে ধরিতে পারেন নাই তাহা নহে । তিনি বলিতেছেন, “আট হিসাবে মাটকথানির একটি দোষ দেখা যায়, রচনাটি যেন অত্যন্ত diffuse ; হিং টিং ছটের সে compactness ইহাতে নাই,

হেঁদালি নাটোর সে খোলা প্রাণের (wit) রসিকতা বেন দ্বৈত অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছে।” যদি মিটে দ্বৈত অন্ন থাকে, তাহা হইলে তাহা নিছনি লইয়া বরণ করিয়া ঘরে তুলিতাম। তা’ কোথায়? সেই দ্বৈতর স্তম্ভের কথা—

“এখনকার নাটক,

না-মিটে, না-টক।”

তাই কি ঝাল আছে গা? “বিষদিত্ত বিজ্ঞপণ?” কি এইরূপ? কথার বলে, হাস্তে হাস্তে মায়বে ঠোনা, লাগবে বেন বিছাৎ বন্ধনা।

তাহা কি অচলায়তনের কোথাও আছে? তাহা নাই—থাকিলে দ্বারে না রাখিতে পারি, মাথায় লইতাম। আছে কেবল—একরূপ বিকৃত হিন্দুমানির উপর নপুংসকের নৃত্য ও লাঞ্ছনা। গানগুলি ছাড়া সমস্ত পুস্তকখানি রবিবাবুর একেবারে অদৃশ্য।

ললিতবাবুকে ছাড়িয়া আমরা বেন অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বাস্তবিক তাহাই কি? আমার বোধ হয় ঠিক তাহা নহে। এখনকার দিনে গুরুমহাশয়গিরি করা বড় শক্ত; বাহ্যকে গাড়ি ফেলিতে শিখাইতে হইবে, তাহাকে বলিতে হইবে, “তাই রামকম! এই চণ্ডীস্বপ্নের জোড়া খুঁটি দুটা কি রকম—লেখ ত।” তবে সে পাত্তাড়িতে হাত দিবে। এখন সকল কথাই ঘুরাইয়া বলা চাই।

ললিতবাবুর মত শিক্ষিত লোককে উপদেশ দিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আমার নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, ভালবাসার সঙ্গে আশঙ্কা যদি না আসিত ত, আমি বাস্তব-নিষ্পত্তি করিতাম না; তবে বলিতেছি বলিয়া শুধু নীরসভাবে বলিব? একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতেছি।

‘কোরারা’ একখানি পুস্তক নহে যে, সেইখানি লইয়া হুঁচরি কথা বলিব! ছাপাকর বা দগুনি কতকগুলি প্রবন্ধ লইয়া যে ভাবে ছাপিয়াছে বা বাঁধিয়াছে, সেই ভাবেই একটা ভাবের তাড়া হইয়াছে। তাহার একটা কপ্ত সমালোচনা হইতে পারে না। কণাধারী না হউক, খণ্ডধারী হইতেই হইবে।

সমালোচনা সাহিত্যের একটা অঙ্গ। সমুখস্থ কার্তিকের আৰ্য্যাবর্তে দেখিলাম ললিতবাবু সমালোচকরূপে অবতীর্ণ; কাজেই সেই সমালোচনা জড়াইয়া লইয়া আমার এই সমালোচনার অন্তর্গত করিলাম। কিন্তু করিয়া ভাল করিলাম, কি মন্দ করিলাম, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি না। রবিবাবুর ‘অচলায়তন’ নাটক-

অংশে বা কাব্যংশে এমন কি রস্যাংশে কিছুই হয় নাই, এ কথা বলাতে রবিবাবু কিছুই আশিরা বাইবে না—কেন না গ্রন্থের কলক দ্বারা এরি প্রকৃতি বুঝা যায়, আকর্ষণের বা তেজের পূর্ণতা হয় না। কিন্তু যে সময়ে আমাকে এই কথাটা বলিতে হইল, এটা মিন্‌চরই অসমর। রবিবাবুকে লইয়া দ্বিতীয় একটি বিশেষ উৎসব হইবে। আমি সেই উৎসবে বোগ দিতে পারি, আর নাই পারি, আমার এই লেখা যেখিয়া যদি কেহ সমরগুণে মনে করেন যে, আমি রবিবাবুর গুণগ্রাহী নহি, তাহা হইলে আমার উপর নিতান্ত অস্ত্রায় করা হইবে। রবিবাবুর ‘টেনবেনা’ আমি মাথায় করিয়া লইয়া দেবী সন্তস্বতীর পাদপীঠ-সম্মুখে নৃত্য করিতে পারিলে, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি।

এখন ললিতবাবুর কথা—ললিতবাবুর অসামান্য ক্ষিপ্রকারিতা বা চপলতাই যদি ললিতবাবুকে বুঝাইয়া থাকে যে, অন্যটক—নাটক, অকাব্য—কাব্য, তাহা হইলে তিনি একটু ধীর স্থির হইয়া কার্য করিলেই চলিবে। আর কাহাকে বলে “বিবমিহ বিদ্রুপবাণ” কাহাকে বলে “দ্রোণ-বিব” তিনি যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আমরা সকলরূপ শ্রেয় রচনার হস্তক্ষেপ করিতে নির্বন্ধসহকারে নিষেধ করি। চুটুকি লিখিতে নিবারণ করিয়াছিলাম, এখন বলি—সকলরূপ বিদ্রুপাত্মক রচনার তিনি যেন হস্তক্ষেপ না করেন। ইন্দ্রনাথ কবুল জবাব দিয়াছেন যে, বিলাতী বিদ্রুপাত্মক লেখা বাক্সালার চালাইতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইয়াছেন। বিদেশী জিনিষ আমদানি করিতে না পারাই ভাল। ললিতবাবু করাসী সাহিত্যের দোহাই দিয়াছেন—‘সে রসে বঞ্চিত কবি দ্বারগুণাকর’, কাজেই সে বিষয়ে কোন কিছু বলিতে পারিব না। তবে মোটের উপর বলিতে পারি, রহস্য রচনার তাঁহার হাত না দেওয়াই ভাল। ইহাতে তিনি এখন মনে না করেন যে, সমগ্র রস-রচনা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিতেছি। না, তা’ কি হয়, সাহিত্যমাত্রেই রস-রচনা। সেই সাহিত্য হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলে আমরা আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিব যে।

তাহা একটা অজচ্ছদ; তবে শব্দকের শব্দের মত। শব্দ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে শব্দকও নষ্টপ্রাণ হয়। তবে অজচ্ছদের আবার অজচ্ছদ লইয়া ললিতবাবু বড় খুঁটিনাটি করেন। কোরাবার মতোও সেইরূপ আছে; সে গুলিতেও হস্তার্পণ করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। এই খুঁটিনাটিগুলি থাকিলে এবং টেনেবনে রক্তরস লিখিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিব, এ ভাবটি মন হইতে ললিতবাবু দূর করিতে পারিলে এবং বন্ধনীর দ্বারা কাটাইতে পারিলে ললিতবাবু একজন ভাল লেখক

হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস তিনি পণ্ডিত লোক, লেখাপড়া জানেন; আমার বিশ্বাস তাহার গ্রাণ আছে; আমার বিশ্বাস হুম্মের পারিপাট্যসাধনে তিনি সুপারগ; আমার বিশ্বাস অনেকের অপেক্ষা তিনি দেশের অবস্থা বা ছরবস্থা ভালরূপ জানেন; আমার বিশ্বাস তিনি কাঁদিতে জানেন—তবে তিনি সুপথে বাইতে লিখিলে ভাল হইবেন না কেন?

ললিতবাবুকে বিনয়ে বলি, তিনি সাময়িক সাহিত্যে খণ্ড লেখা লিখিয়া—সময়-প্রসঙ্গে যে কথাটা ভাসিয়া উঠে, সেই বিষয়ে ছ'চারিকথা ভালমন্দ লিখিয়া—তাঁহার সাহিত্য-জীবন বেন নষ্ট না করেন। কোন একটা বিষয়ে নিম্নের মন, প্রাণ, আত্মা চোরপূর করুন, করিয়া সেই বিষয়ে ক্রমশঃ লিখিতে আরম্ভ করুন। Out of the abundance of the heart the mouth speaketh. এটি বড় পাকা কথা। যে প্রাণ ভরিয়া কোন বিষয়ের চর্চা করিয়াছে, সে কখন না লিখিয়া থাকিতে পারে না। তবে কি যে কাঁদিতে পারে, সেই লিখিতে পারে, না তা' নয়; লেখার একটা অভ্যাস থাকা চাই। ললিতবাবুর সে অভ্যাস বেশ হুম্মের হইয়াছে; এখন কেবল স্থির হইয়া ভাবা চাই ও সংযত হইয়া ধীরে ধীরে লেখা চাই।

আর একটা কথা আবার বলি,—পেশাদারের মত রত্ন-রসের আড়ম্বর করিয়া দোকান সাজাইবেন না। আপনার বাড়ীতে গিয়া আপনার প্রাণের বস্তুকিৎ আয়োজনও আমরা প্রসাদ পাইয়া প্রসন্ন হইব। আপনি হালুইকরের দোকান খুলিলে তাহার ত্রিসীমায় বাইব না। আমাদের দেশের কোন ভবলোকই হোটেল বা দোকানে খাইতে ভালরূপে না—পেশাদারিকে আমরা এমনই ভয় করি!

আর রস টানিয়া বুনিয়া হয় না। দেকলে পাকা কথা আছে।—

কবিতা কোমলবিনিতা

আয়াতা সুখ-দারিকা,

বলাদানীরমানা সা

সরসা বিরসা ভবেৎ।

তবে এই মধুরেণ সমাপয়েৎ। সকলে আমার শত ক্রটি মার্জনা করিবেন। আমি ইচ্ছা করিয়া এ বয়সে কাহারও মনে কষ্ট দিবার জন্য লেখনী ধারণ করিতেছি না।

২৯শে কার্তিক,
কদম্বতলা, চুঁচুড়া।

}

শ্রীঅক্ষরচন্দ্র সরকার।

অচলায়তন ।*

ও

শান্তিনিকেতন,

বোলপুর ।

সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

নিম্নের লেখাসম্বন্ধে কোন প্রকার ওকালতি করিতে যাওয়া ভদ্ররীতি নহে । সে রীতি আমি সাধারণত মানিয়া থাকি । কিন্তু আপনার মত বিচারক যখন আমার কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করেন, তখন প্রথার খাতিরে উদাসীন্তের তান করা আমাচার্য্য হইয়া উঠে না ।

সাহিত্যের দিক্ দিয়া আপনি অচলায়তনের উপর যে রায় লিখিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আপনার নিকট আমি কোনো আপিল রুজু করিব না । আপনি যে ভিত্তি দিয়াছেন সে আমার যথেষ্ট হইয়াছে ।

কিন্তু ঐ যে একটা উদ্দেশ্যের কথা তুলিয়া আমার উপরে একটা মন্ত অপরাধ চাপাইয়াছেন সেটা আমি চূপচাপ করিয়া মানিয়া লইতে পারিব না । কেবল মাত্র ঐক দিয়া পড়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ দুই তিন রকম হইতে পারে । কোনো কাব্য বা নাটকের উদ্দেশ্যটা সাহিত্যিক বা অসাহিত্যিক তাহাও কোনো কোনো স্থলে ঐক্যের দ্বারা সংশয়াপন্ন হইতে পারে । পাখী পিঙ্গলের বাহিরে বাইবার লজ্জ ব্যাকুল হইতেছে ইহা কাব্যের কথা—কিন্তু পিঙ্গলের নিন্দা করিয়া খাঁচাওয়ালার প্রতি খাঁচা দেওয়া হইতেছে এমনভাবে সুর করিয়াও হয়ত পড়া হইতে পারে । মুক্তির জন্য পাখীর কাতরতাকে ব্যক্ত করিতে হইলে খাঁচার কথাটা একেবারেই বাত দিলে চলে না । পাখীর বেদনাকে সত্য করিয়া দেখাইতে হইলে খাঁচার বদ্ধতা ও কঠিনতাকে পরিশূট করিতেই হয় ।

জগতের যেখানেই ধর্ম্মকে অভিতূত করিয়া আচার আপনি বড় হইয়া উঠে, সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়—এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য । সেই রুদ্ধ চিত্তের যেদনাই কাব্যের বিষয় এবং আত্মবন্দিকভাবে শুধু আচারের কর্ম্মবীজ্য খতই সেই সঙ্গে ব্যক্ত হইতে থাকে ।

* মত কার্তিক মাসের 'আর্য্যাবর্ত্তে' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'অচলায়তনের' যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহার উত্তরে লেখক মহাশয় 'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রকাশের লজ্জ ললিতবায়ুকে এই পত্র লিখিয়াছেন।—সম্পাদক ।

ধর্মকে প্রকাশ করিবার চক্ৰ, গতি দিবার কলই আচারের সৃষ্টি—কিন্তু কালে কালে ধর্ম যখন সেই সমস্ত আচারকে, নিয়মসংঘমকে অতিক্রম করিয়া বড় হইয়া উঠে, অথবা ধর্ম যখন সচল নদীর মত আপনার ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তখন পূর্বতন নিয়মগুলি অচল হইয়া শুষ্ক নদীপথের মত পড়িয়া থাকে,—বস্তুত তখন তাহা শুষ্ক মরুভূমি, তবাহারা তাপনাশিনী শ্রোতবিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই শুষ্ক পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়া নদীর ধারার সম্মান যদি একবারে পরিত্যাগ করা যায়, তবে মানবাত্মাকে পিপাসিত করিয়া রাখা হয়। সেই পিপাসার্ত মানবাত্মার ক্রন্দন কি সাহিত্যে প্রকাশ করা হইবে না পাছে পুরাতন নদীপথের প্রতি অনানয় দেখানো হয়?

আগনি বাহা বলিয়াছেন সে কথা সত্য। সকল ধর্মসমাজেই এমন অনেক পুরাতন প্রথা সঞ্চিত হইতে থাকে, যাহার ভিত্তি হইতে প্রাণ সরিয়া গিয়াছে। অথচ চিরকালের অভ্যাসবশতঃ মানুষ তাহাকেই প্রাণের সামগ্রী বলিয়া আঁকড়িয়া থাকে, তাহাতে কেবলমাত্র তাহার অভ্যাস তৃপ্ত হয় কিন্তু তাহার প্রাণের উপবাস ঘুচে না—এমনি করিয়া অবশেষে এমন একদিন আসে যখন ধর্মের প্রতিই তাহার অশ্রদ্ধা জন্মে—একথা ভুলিয়া যার বাহাকে সে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা ধর্মই নহে, ধর্মের পরিত্যক্ত আবর্জনা মাত্র।

এমন অবস্থায় সকল দেশেই সকল কালেই মানুষকে কেহ না কেহ শুনাইয়াছে যে, আচারই ধর্ম নহে, বাহ্যিকতার অন্তরের সূচনা যেটে না এবং নিরর্থক অহুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে তাহা বন্ধন। অভ্যাসের প্রতি আসক্ত মানুষ কোনো দিন একথা গুলিয়া খুঁসি হয় নাই এবং যে এমন কথা বলে তাহাকে পূরিত্ব করে নাই—কিন্তু ভাল লাগুক আর না লাগুক একথা তাহাকে বারবার শুনিতেই হইবে।

প্রত্যেক মানুষের একটা অহং আছে—সেই অহংএর আবরণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধকমাত্রের একটা বাগতা আছে। তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই, মানুষের নিজের বিশেষত্ব যখন তাহার আপনাকেই ব্যস্ত করিতে থাকে—আপনার চেয়ে বড়কে নহে, তখন সে আপনার অস্তিত্বের উদ্বেগকেই বার্থ করে। আপনার অহঙ্কার, আপনার স্বার্থ, আপনার সমস্ত রাগদ্বৈষকে ভেদ করিয়া ভক্ত যখন আপনার সমস্ত চিন্তার ও কর্মের ভগবানের ইচ্ছাকে ও তাহার আনন্দকেই প্রকাশ করিতে থাকে তখনই তাহার মানবজীবন সার্থক হয়।

ধর্মশাস্ত্রেরও সেইরূপ একটা অংশ আছে। তাহার অনেক নীতিপদ্ধতি নিজেকেই চরমরূপে প্রকাশ করিতে থাকে। চিরন্তনকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের অহঙ্কারকেই সে জয়ী করে। তখন তাহাকে পরাজিত করিতে না পারিলে সত্যধর্ম পীড়িত হয়। সেই পীড়া যে সাধক অহুতব করিয়াছে সে এমন গুরুকে খোঁজে যিনি এই সমস্ত সামাজিক অহংকে অপসারিত করিয়া ধর্মের মুক্ত স্বরূপকে দেখাইয়া দিবেন। মানবসমাজে যখনই কোন গুরু আসিয়াছেন তিনি এই কাজই করিয়াছেন।

আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন উপায় কি? “ওধু আলো, ওধু শ্রীতি” লইয়াই কি মানুষের পেট ভরিবে? অর্থাৎ আচার মহুঠানের বাধা দূর করিলেই কি মানুষ কৃতার্ণ হইবে? তাই যদি হইবে তবে ইতিহাসে কোথাও তাহার কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না কেন?

কিন্তু এরূপ প্রশ্ন কি অচলায়তনের লেখককে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হইয়াছে? অচলায়তনের গুরু কি ভানিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন? গড়িবার কথা বলেন নাই? পুরুষ যখন ত্যাড়াভাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি কি বলেন নাই—না তা যাইতে পারিবে না—যেখানে ভাদ্রা হইল এইখানেই আবায় প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে? গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড় করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য, ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা। মানুষের হুল দেহ যখন মানুষের মনকে অতিভূত করে, তখন সেই দেহগত রিপুকে আমরা নিন্দা করি; কিন্তু তাহা হইতে কি প্রমাণ হয়, প্রেতশ্রুতাভই মানুষের পূর্ণতা? হুল বেহের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই দেহ মানুষের উচ্চতর সত্তার বিরোধী হইবে না, তাহার অঙ্গগত হইবে একথা বলার দ্বারা দেহকে নষ্ট করিতে বলা হয় না।

অচলায়তনে মন্ত্রনাত্মক প্রীতি তীব্র প্রেম প্রকাশ করা হইয়াছে, এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না—বেহেহু মন্ত্রের পার্থক্যতা সন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মনকে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনায় এই বে আশ্চর্য্য পছন্দ স্বেচ্ছা হইয়াছে ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ সাহায্যের পরিচয়।

কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিকশিত করা হয়—মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অতিভূত করিয়া নিজেকেই চরমপদ অধিকার করিতে চায়

তখন তাহার মত মননের বাধা আর কি হইতে পারে? কঠকল্পনি বিশেষ লক্ষ-
সমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে
পাইয়া বলে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উত্তেজিত চায় না—তখন মনন
বুড়িয়া গিয়া সে উদ্ধারণের কান্দেই লড়াইয়া পড়ে; তখন, চিত্তকে বাহ্য মুক্ত
করিবে বলিয়াই রচিত, তাহাই চিত্তকে বন্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মস্ত
পড়িয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা, মস্ত পড়িয়া শত্রুর করা ইত্যাদি নান। প্রকার
নিরর্থক ভ্রু-চেষ্টার মাতৃবের মূঢ় মন প্রসূক হইয়া ঘুরিতে থাকে। এইরূপে মস্তই
যখন মননের স্থান অধিকার করিয়া বলে তখন মানুষের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শুক
জিনিষ আর কি হইতে পারে? যেখানে মস্তের একরূপ ভ্রষ্টতা সেখানে মানুষের
দুর্গতি আছেই। সেই সবস্ত কৃত্রিম বন্ধনজাল হইতে মানুষ আপনাকে উদ্ধার
করিয়া তত্ত্বি সজীবতা ও সরসতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—ইতিহাসে
ব্যস্ততার ইহার প্রমাণ দেখা গিয়াছে। বাগবন্ত মস্ততত্ত্ব যখনই অভ্যস্ত প্রবল
হইয়া মানুষের মনকে চারিদিকে বেঁধেন করিয়া ধরে, তখনই ত মানবের গুরু
মানবের মনের দাবি মিটাইবার জন্য দেখা দেন—তিনি বলেন পাথরের টুকরা
দিয়া কুটির টুকরার কাজ চালানো যায় না, বাহ্য অগুষ্ঠানকে দিয়া অন্তরের সূক্ষ্মতা
পূর্ণ করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া একথা কেহই বলে না যে, মস্ত যেখানে
মননে সহায়, বাহিরের অগুষ্ঠান যেখানে অন্তরের ভাবসুখের অগ্রগত, সেখানে
তাহা নিন্দনীয়। ভার্য্য রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি তাবকে মারিয়া
একলা ব্রাহ্ম করিতে চায়—তবে বিধাতার দত্তবিধি অহুসারে তাহার কপালে
ধৃত্য আছেই। কেননা সে যতদিন বাঁচিবে ততদিনই কেবলই মানুষের মনকে
মারিতে থাকিবে। তাবের পক্ষে রূপের প্রয়োজন আছে বলিয়াই রূপের মধ্যে
লেশমাত্র অসতীশ এমন নিদারুণ। যেখানেই সে নিজেই প্রবল করিতে চাহিবে
সেই খানেই সে নির্লজ্জ, সে অকল্যাণের আকর। কেন না, তাব যে রূপকে
টানিয়া আনে সে যে প্রেমের টান—রূপ যখন সেই তাবকে চাপা দেয় তখন সে
সেই প্রেমকে আঘাত করে, আনন্দকে আচ্ছন্ন করে—সেইজন্য বাহ্য তাবের
তত্ত্ব তাহার রূপের এইরূপ ভ্রষ্টাচার একেবারে সহিতে পারে না। কিন্তু রূপে
তাহাদের পরমানন্দ যখন তাবের সঙ্গে তাহার পূর্ণ মিলন দেখে। কিন্তু শুধু রূপের
দাসত্ব মানুষের সকলের অধম দুর্গতি। বাহ্য মহাপুরুষ তাহার মানুষকে এই
দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়িতনে এই আশার কথাই
বলা হইয়াছে যে যিনি শুক তিনি সবস্ত আশ্রয় ভাঙ্গিয়া ছুরিয়া দিয়া একটা সূক্ষ্মতা

বিতার করিবার জন্ত আসিতেছেন না : তিনি রত্নাবকে জানাইবেন, অভাবকে বুটাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন—যেখানে অভাঙ্গমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্ত বাপুবিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন। একথা কেবল যে আশ্বমেধই দেশের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে—ইহা সকল দেশেই সকল মাতৃবের কথা। অবশ্য এই সার্বজনীন সত্য অচলারতনে ভারতবর্ষীয় রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহা যদি না করিত তবে ইহা অপাঠ্য হইত।

মনে করিয়াছিলাম সংক্ষেপে বলিব—কিন্তু “নিজের কথা পাচ কাহন” হইয়া পড়ে—বিশেষত শ্রোতা যদি সহৃদয় ও কল্পাপন্ন হন। ইতিপূর্বেও আপনার প্রতি জুগুপ করিয়া সাহস বাড়িয়া গেছে এবারেও প্রত্নধ পাইব এ ভরসা মনে আছে। ইতি শ্রী অগ্রহারণ, ১৩১৮।

ভবদীপ

ত্রিবিজ্ঞানাথ ঠাকুর।



গঙ্গার প্রতি হিমালয়।

“কৃষিত—বিগ্ধ ধরা”—উঠিছে ক্রন্দন ;
 তাই কি বিচ্ছিন্ন করি’ সহস্র বন্ধন
 মেহে-গড়া, অন্ধ ডাঙ্গি’ পড়িলি ধরা
 করুণার দ্রব হরে—আশীর্বাদ প্রাণ ?

তোরে কি পাবাগ-বক্ষে করিনি পালন
 হৃদিতার সন মেহে ? আমার মরন
 করেছে কি অস্তরাল যুহুর্ন্তের তরে
 কঙ্কার সপত্নী তোরে ? গাঢ় মেহতরে
 তোরে কি রাখিনি বক্ষে । উপলে উপলে
 ব্যথিত-চরণ হেরি’ মোর চুদি-তলে
 বেজে কি উঠেনি বাবা ? শিলায় শিলায়
 রাখিনি দৃঢ়ারে ফল—সহস্র শোভার
 ভোগ তরে ? প্রভাতের সূর্যিড় সমীরে
 বিটপীমর্দররবে বহি নাই শিরে
 তুল আশীর্বাদরাশি ? সঙ্কার গগনে
 ধরি নাই ইন্দ্রবহু বিচিত্র বরণে
 উর্দ্ধবাহু, তোর তরে ? রে স্বনে ব্যথিতা
 রুদ্ধ পথ হেরি’ যবে কিরিতে কুপিতা
 মোর মেহতপ্ত বক্ষে, আমি কি তখন
 তোর সাথে বেদনার করিনি বোদন ?
 বিশীর্ণা হেরিয়া তোরে শিলাবন্ধ হুটি’
 বহেনি কি মেহলোভঃ, উঠেনি কি দৃটি’
 আশীর্বাদ ?

অরি, কঙ্কার অধিক মোর,
 ধরা কি আমার চেয়ে আপনার তোর—
 শীর্ণ আর্ত রবে তা’র আবারে তুলিয়া
 তুল ফেন-হাত দুখে—চলিলি ছুটিয়া

ভবিত—কাতর—তপ্ত বক্ষোপরে তা'র,
আপন সর্ব্বের বিরা করিতে সফার
উষরে উর্ধ্বর শোভা ; স্নিগ্ধ শ্রীবসনে
শ্রাম লক্ষ আশ্রয়ে, কৃষ্ণ-ভূষণে ;
নয় শ্রীহীনতা তার করিতে শোভন ?
মুহুর্তে করিলি ছিন্ন মেহের বন্ধন
আম্রেশ্বর ?

ব্রাধি' তোরে মেহ-কাসাবরে
বন্দী মোর,—বুঝি নাই মোর বক্ষোপরে
উঠেছি বিকশিতা—কৃষ্ণের প্রায়
জননী লতার বক্ষে । মেহাক্ষ নয়ন
দেখেনি ধরার তুনি' কাতর ক্রন্দন
কি বাধাকৃত হয়ে উঠেছে অধর ।

আজ শূন্য বক্ষ মোর, ব্যথিত অন্তর—
দেখিতেছি, গুত্র আশীর্বাদ সেবতার
মোর শিলাবক্ষ হ'তে ঝরে অনিবার
বিগুহ ধরণী পরে । মুমূর্ষু জীবন
লভি'ছে চেতন তাহে, শ্রীহীন ভূবন
লভিতেছে স্নিগ্ধ শোভা, উঠিছে অধরে
করণার পূণ্য পাথা তোর কলসরে ।

সংগ্রহ।

বিবিধ।

প্রাচীন গ্রীসের ধর্মমত।

গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের “ইলুমিনাতিস্ট” পত্র মিঃ খালিক হুজাউখীন মহাশয় “প্রাচীন গ্রীসের ধর্মমত” শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সন্দর্ভে লেখক মহাশয়ের মৌলিকতার বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও ইহাতে প্রাচীন গ্রীসের ধর্মমত সম্বন্ধে এক প্রচুর চিত্তাশ্লিষ্ট লোকের মতামত জ্ঞানিতে পারা যায়। সকল প্রাচীন জাতির মধ্যেই অনেক কিম্বদন্তীমূলক গল্প প্রচলিত ছিল। তাহার মধ্যে কেবল কতকগুলি গল্প বিশ্বস্তির ফল হইতে রক্ষিত হইরাছে। উহার মধ্যে কতকগুলি গল্পে রূপকভাবে ধর্মেরই তত্ত্ব বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত, আর কতকগুলিতে তথ্যবিশিষ্ট মানবজাতি অতীন্দ্ৰি বাপারদ্বয়ে বাহ্য করণা করিত, তাহাই অতিব্যক্ত। প্রাচীন গ্রীকদিগের এই সকল করণামূলক গল্পগুলিতেই কেবল তাহাদের ধর্মমত প্রতিফলিত হইয়াছিল—ইহা ত্রিষ তাহাদের আর উচ্চতর কোনও ধর্মমত ছিল না, এরূপ অনুমান করা সম্ভব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। খ্রীষ্টীয় খালিক হুজাউখীন মহাশয় প্রাচীন গ্রীকদিগের পুরাতনী কিম্বদন্তীতেই তাহাদের ধর্মমত প্রতিফলিত, এই সিদ্ধান্তই অত্যন্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহারই উপর আপনার যুক্তিলাল বিস্তৃত করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাহার প্রবন্ধের মৰ্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম।

মিঃ হুজাউখীন মহাশয় বলেন, মানবই সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব এবং ব্যক্তিগত বিকাশই সামাজিক উন্নতির প্রতিচ্ছবি। পণ্ডিতসমূহ বলিয়া থাকেন যে, বংশোদ্ভূত উচ্চতর মানব-প্রবাহকে একটি অমর মানব বলা হইতে পারে; সেই অমর মানব চিরকালই শিক্ষা লাভ করিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে যেসকল ক্রম

অনুসারে নৈতিক ও আর্থিক শক্তি বিকাশের পারস্পর্য্য ঘুট হয়, জাতীয়, জীবনোৎকর্ষক সেইরূপ ক্রম অনুসারেই উহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশ হইয়া থাকে। আদিম ও অলভ্য অবস্থায় মানুষ মনে করিয়া থাকে যে, পরিবৃত্তমান সমস্ত বাপারই কোনও অদ্বিত্য, অতীন্দ্রি শক্তিশালী ব্যক্তি “বোদখোদা” অনুসারেই সংঘটিত হইয়া থাকে। বাহ্য কিছু অজ্ঞাত, দুর্বোধ্য বা মহত্তর শক্তিশালী, তাহাই আদিম মানবের মনে বিত্তীয়িকার সত্তার করিয়া দেয়। তাহার পর যখন বিচারবুদ্ধির উন্মেষ হয়, তখন পারিপার্শ্বিক বস্তু সম্বন্ধে তাহার সেই ধারণা জিরোহিত হয় সত্য, কিন্তু দুঃখ বস্তু ও গ্রহনক্ষত্রাদির গতি সম্বন্ধে তাহার সেই ধারণা থাকিয়া যায়, অর্থাৎ সে উহা অতিমানুষ কোনও জীবের কার্য্য বলিয়া মনে করে। ক্রমে বহুদর্পিতা বিচার-বুদ্ধির সহিত বোদখোদা করে। তখন এই উচ্চতর বোদখোদা মানব প্রেরণ উপাসনা ক্রমে পরিহার করে সত্য, কিন্তু তখনও সে পূর্বসংস্কার একেবারে পরিহার করিতে সক্ষম হয় না, জ্যোতিষতত্ত্ব জ্যোতির্বিদ্যে রূপান্তরিত হইতে বহুদর্পিতা সে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় তখনও সে এই সকল গ্রহনক্ষত্রকে সেবিতা প্রেতাচ্ছা প্রভৃতির

বাসস্থান মনে করিতে থাকে । অতঃপর যখন সেই মানব যথাক্রমে প্রেক্ষাক্ষা ও দেবতার ভয় হইতে নিস্তার পায়, তখন তাহার মনে একেবরভাবে মহামহিম মত সমুদিত হইয়া থাকে । যি: খালিকা হুন্ডাউদীনের মতে বর্ষাকালের অতিবাহতির ইহাই সাক্ষিত্ত তথ্য । বিশ্বজনীন ধর্মোপনিষদেরও ঠিক এইরূপ ধারণা ।

অন্যতঃ মানবের প্রাকৃতিক বস্তুত্বকে তথ্য জানিবার কৌতুহল বতঃই অবলম্বিত । তাহার কৌতুহল থাকে সত্য, কিন্তু মনোযোগবানের ক্ষমতা থাকে না । ঘটনাবলীরই একটা যে সে কারণ জানিলেই সে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে । কৌতুহল ও অতিমাত্র বিশ্বাসপ্রবণতাই অন্যতঃ মানবের দুইটি প্রধান বিশেষত্ব । কোনও প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটিলেই অন্যতঃ মানব তাহার কারণ জানিবার জন্য উৎসাহিত হয়, এবং তাহার মূহুর্ত্তে বৃত্তিতে বাহ্য মনে করে অথবা অন্তরে রচিত যে কোনও গল্প শুনে, তাহাই উহার কারণ বলিয়া বিশ্বাস করে । এই এককারে পুরাতন-কাহিনীর উৎপত্তি ।

অন্যতঃ সমাজে 'মাইথলজী' বা পুরাতনী কাহিনীর উদ্ভব হয় । মানবের মনে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিসার বীজ নিহিত আছে, অন্যতঃ মানবের মনে তাহা এই রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং সে এইরূপেই তাহার পরিতৃপ্তিসাধন করিয়া গয় । সেই রচা গল্প তাহাদের জ্ঞান বস্তুত্বজ্ঞানের অনুপ্রাণই হইয়া থাকে । প্রাচীন গ্রীকগণ সভ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের Mythology বা পুরাতনী কাহিনীতে অন্যতঃ অবস্থার অনেক আচার ব্যবহার প্রকৃতির প্রচুর অবশেষ দেখা যায় । ইহার কারণ যাক্সমুলার বলেন যে, "প্রাচীন যুগের মানবগণ আশ্রয় বৈজ্ঞানিক চিন্তা করি সেগুন চিন্তা করিত না ; কেবল ইহাই নহে,—পশুত্ব তাহাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা করা উচিত ছিল বলিয়া আশ্রয় মনে করি, তাহারা সেগুন চিন্তা করাও উচিত মনে করিত না ।" তাহাদের প্রাকৃতিক বস্তুর ধারণার পদ্ধতির সহিত আমাদের আধুনিক বস্তুর ধারণা-পদ্ধতির পার্থক্য এই যে, তাহাদের সকল বিষয়ে বস্তুত্ব ব্যতিরিক্ত আরোপের আধেয় অন্ততঃ অধিক ছিল । সেই জন্য নিত্য প্রাকৃতিক জড় ব্যাপারকেও তাহারা চিত্তবিন্দিত্য ও ব্যক্তিবিশেষত্ব বলিয়া মনে করিত । আদিম মানবের জড় পর্যবেক্ষণ এইরূপ চিত্তব ব্যক্তিব বস্তুত্বের প্রাধান্য, অনেকটা পুরাতনী কাহিনীর প্রত্যয়বস্তুত্ব । সেইজন্য তাহারা যেথাক যেথাক জীব মনে করিত, বটিকার সেবকের কল্পনা করিত, পশুত্বগণনে পুরাতন পৌরবল্লভা যেথাক ইটা পর্বতে হার্কিটলিসের পার্শ্ববর্ত্তে অস্বকরী ডিভালো পিণ্ডা ভাবিত, উদিত বাসত্যাক্ষিকরণে উদার রক্তিমাতার বিদ্যোপ কর্ণে তাহারা অর্কিমাস ও ইউরানিসের মনোহারিণী কাহিনী উদ্ভাবিত করিয়াছিল ।

ইহার পর যি: খালিকা হুন্ডাউদীনের মহাপ্রাণ শিকিরাছেন যে, এই এককারে গ্রীকবিশ্বের সমস্ত কাহিনীতে সীতিউপদেশ । পুরাতনী কাহিনী বুঝাইয়া দিতে পারা যায় না । বহু সময়ে যি:উনের ধারণার জ্ঞান গ্রীকবিশ্বের দেবতার বৃত্তি ও সমস্তত্ব আদোচনার আদি বিশ্বজগতের অবস্থা ও দৈবত্ব প্রত্যয়ে সেই বিশ্বজগতের কথা দেখিতে পাওয়া যায় ; দেবতাবিশ্বের সহিত টাইটান বা অনুরবিশ্বের যুদ্ধ এবং টাইটান পর্বতে অনুরবিশ্বের বন্দী করার কাহিনীতেই এই আদিম সম্বন্ধের কথা সপ্রকাশ । দেবতারা যুদ্ধে ব্যাস্ত হইলে, এই ধারণা অন্যতঃস্বাভাবিক রূপবিশিষ্ট নহে, কারণ উহা তাহাদেরই সমাজের প্রতিবিম্বনাম । আদিম অবস্থার মানব সমগ্রতাই যুদ্ধবিশেষে ব্যস্ত থাকিত । হস্তাং তাহারা

যতই মনে করিত যে, সেবতারও সর্বদা মুক্তবিগ্রহে রত। প্রকৃতপক্ষে অসহানিদের করিত সেব-
সমাজে তাহাদের আপনাদের সমাজের অবস্থাই প্রতিফলিত। রাজ্যশাসন বাণ্যেরও ঐক্য
জিউস কর্তৃক বর্গরাজ্য ও পণ্ডিতন কর্তৃক সমুদ্র পালন, হেডন্ কর্তৃক কসাতল পালন এবং
পুণিবীতে সকলের সাধারণ অবিকার প্রভৃতি ব্যবস্থাই উহার প্রমাণ। প্রোমিথিয়াস ও
এশিমিথিয়াস প্রভৃতির কাহিনীতে নৈতিক ও ডিউকেলিয়নের লগ্নপ্রাবনে ঐতিহাসিক ধারণার
আভাস পাওয়া যায়; নেট্যান্স, হানি, বর্গন ও সাইক্লোপদিগের কাহিনীতে অতিপ্রাকৃত কল্পনার
আভাস বিদ্যমান।

ইহার পর উক্ত লেখক মহানর গ্রাটিন গ্রীকদিগের পুরাতন কাহিনী হইতে তাহাদের
বর্ণ, বর্গ ও নরক।

বিবাসের কথা আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য সেবতার কল্পনা।

করিয়া গ্রীকগণ সেবতার বাসস্থান কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন।

সেকালের গ্রীকদিগের বিশ্বাস ছিল যে, নীলকান্দই স্বর্গের অধোভাগ, ভূগর্ভে নিগার আবাসস্থান,
মৃত্যুর পর জীবের প্রেরণা তথায় গমন করিয়া থাকে। ইহাই গ্রীকদিগের মত। হেডন্
বা ঘন তথায় আবাসের সুকূট মস্তকে পরিচা যবীভূত তমিগ্রাং সিংহাসনে আসীন; তিনি
ঘন: অশুভ। তবে তাহার করণ্ড নৈশ অপনির জীবন নির্ধোনে তাহার সত্তা জানিতে
পারা যায়। কালক্রমের সিংহবারে প্রকৃতি, হ্রস্ব, জরা, রোগ, অত্যা, প্রতিক, মুক্ত ও
মৃত্যু প্রভৃতি ভূতগণের অধিষ্ঠান। এই চারারাজ্যে আত্মা হ্র, ঠাইয় ও অচেতন
কোইকটাস (?) ও কেমন নবী প্রভৃতি স্বর্গের হাওয়ারবসুধিষ্ঠিত তরলিত অবলম্বনে বিদ্যুৎ।
নার্কেরাস নামের ত্রিষু শাসকের নরকের দ্বারে বৈশ্বিকরূপে বিরাজিত। চারণ নামক
নাবিক প্রেরণাদিগকে নৌকাবোনে ঠাইয় বা বৈতরণী পার করিয়া লইয়া যায়। কেউলুগ
পীতব্রাত পালের পরিচ্ছদ পরিচা তথায় উপস্থিত। প্রতিহিসোদরী ইরিগ্রাইস ও মিনো তথায়
প্রেরণার কৃতকর্মের বিচারকার্যে সীমাসক। পাপীরা তথায় বোর বহুগা অনুভব করিয়া অবস্থান
করিতেছে। তাহাদের বশা বেথিয়া আনিমবুদের মানব বাহাতে পালের পথ হইতে দূরে
থাকে, তাহার লজ তাহাদের বহুগার কথা বিষমভাবে বর্ণিত আছে। কেউলু নামক
ডেস্কাই সেবমন্দির-কলসকারী তথায় অবস্থিত, তাহার মস্তকোপরি একটি বিরাট ও বিশাল
পাখাণ বোহুল্যমান, সে প্রতিপলে অনুপলে তাহার পতনক্ষার অভিযাত্রাভিত। কিন্তু ঐ পাখাণ
কখনই পড়িতেছে না। আইসিওন অতিরিজ ইগ্রিয়ার লালসার লজ ঘন ঘন সূর্যমানচক্ষে বহু
সহিতাছে। মিসিকাস সেবরোবে পতিত হইয়া একটি মৃত্যু পর্কতোপরি এক উপলব্ধ
রাফিত চেষ্টা করিতেছে,—শিলাখণ্ড গড়াইয়া পর্কতের পাথরপে আসিয়া পড়িতেছে,—সে
আবার অবিলম্বে তাহা সেই পর্কতোপরি রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। দুবসুমানের বহিরাই
এইরূপ বৃথা চেষ্টা চলিতেছে। আগহারিগি শিপাসার কাতর পাশাপা টায়েটলান আকর্ষিত
দ্বারিতে নিমজ্জিত থাকিয়াও জল পান করিতে পারিতেছে না। সে বতই পানার্থ জলের
থিকে মুখ লইয়া বাইতেছে, ততই জল সরিয়া বাইতেছে। ইহাই গ্রাটিন গ্রীকদিগের
নরকের চিত্র।

গ্রাটিন গ্রীকদিগের নরকের চিত্র যেমন বিষমলম্বক তাহার ভূগর্ভস্থ মানবজাতির ক্রিয়াকলাপও

সেইরূপ বিষয়জনকভাবে বর্ণিত করিয়াছিল। লেখক উৎসাহময়রূপে হেলেনা হরণ ও টুয়েন্ট
পতন, আর্পে। তরীতে জেসনের কলুতিদগমন প্রভৃতির কাহিনীর
সেবতা ও মানব। উল্লেখ করিয়াছেন। পার্থক্যের অবস্থিতি জড় তাহা সমস্ত

উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে। তবে তিনি গ্রীকসেবতার কার্যকলাপ হইতে দেখাইয়াছেন যে,
পুরাকালে গ্রীকদের সমাজে যে সকল কাৰ্য্য অনুষ্ঠিত হইত, যে সকল পাপ এবং ছিল
তাহা তাহাদের দেবকার্য্যকরনাতেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। গ্রীকসেবসন অনেক গুণিত
পাপের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের বাহ্যিকভাবে আর
সে গুলির উল্লেখ করিলাম না।

অবশেষে এই লেখক বলিয়াছেন যে, ক্রমশঃ জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বর্ণবিবাস
নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। আদিম মানব সকল প্রাকৃতিক পদার্থকে চৈতন্যময় ব্যক্তি বলিয়া
বর্ণবিবাস লোপের কারণ। করণ্য করিতে চাহে। তাহার মনের সেই আবেশ তাহাদের

পুরাতনী কাহিনীতে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। তাহার পর চিত্রা-
শীল দার্শনিকসমূহ আবির্ভূত হইয়া গ্রীকসেবসন যে জড় প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহা প্রতিপন্ন
করিতে আরম্ভ করিলেন। জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতামূলক কাহিনীতে ধীরে
ধীরে লোকের বিশ্বাস লোপ পাইতে লাগিল। প্রথমে দীক্ষিত সমাজে অবিবাস আরম্ভ-
প্রকাশ করে। কিন্তু জনসাধারণ তখন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। পক্ষান্তরে লোকে মনে মনে
উদ্যানিধন বর্ণবর্ণতে অবিবাস করিলেও সুখে তাহা প্রকাশ করিত না। তাহার কারণে বর্ণের বাই
অনুষ্ঠান বাড়িয়া চলিত; সেবে যখন সেই অবিবাস সমাজের সর্বত্র প্রবীর্ণ হইল, তখন
ঐ বর্ণের অবসান ঘটয়াছিল।

আমাদের ধারণা এই যে, লেখক মহাশয় প্রাচীন গ্রীকদের বর্ণভেদ সমাকরণে দৃষ্টিতে
পারেন নাই। প্রাচীন জাতিমাত্রেই রূপকল্পে অনেক বর্ণভেদ সাধারণের নিকট প্রকাশ

সম্ভব

করিতেন। এই পদ্ধতি আমাদের মনের মত না হইতে পারে,
কিন্তু ইহাকে অসত্যতার পরিচায়ক বলিয়া নির্দিষ্ট করা

সম্ভব নহে।



আৰ্য্যাবৰ্ত্ত--



নবীন চন্দ্র সেন ।

অল্বেকুণীর ভারতভ্রমণ।

গজনির এসিদ্ধ মানুষের ভারতভ্রমণের সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান পরিব্রাজক অল্বেকুণী ভারতবর্ষে আগমন করেন। হিন্দুস্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, একখানি পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অল্বেকুণীর মতে ভারতবর্ষ একসময়ে সমুদ্রমগ্ন ছিল, কালে নদীসমূহের স্রুতিকায় গঠিত হইয়াছে।

কণৌজের চতুর্পাশ্বে দিগে দেশই ভারতবর্ষের মধ্যস্থান। ইহাকে হিন্দুরা মধ্যদেশ কহে। ভৌগোলিক হিসাবে ইহা মধ্য বা কেন্দ্রস্থল, যেহেতু ইহা সমুদ্র ও পর্বতসমূহের, গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশসমূহের এবং ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা রাজনৈতিক কেন্দ্রও বটে, কারণ পুরাকালে ইহাই হিন্দুদিগের এসিদ্ধ বীর ও রাজত্ববর্গের আবাসভূমি ছিল।

সিদ্ধদেশ কণৌজের পশ্চিমে অবস্থিত। অল্বেকুণী বলেন যে, তাঁহাদিগের দেশ হইতে সিদ্ধদেশে যাইতে হইলে তাঁহাদিগকে নিম্নরোজ অর্থাৎ সিদ্ধস্থান হইতে যাত্রা করিতে হয়; কিন্তু হিন্দু বা প্রকৃত ভারতবর্ষে গমন করিতে হইলে কাবুলের পথে যাইতে হয়। ইহাই ভারতগমনের একমাত্র পথ নহে। সকল দিক হইতেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারা যায়; তবে পথ বাধাবিশিষ্ট-বহুল। ভারতের পশ্চিম সীমান্তের পর্বতসমূহে হিন্দুদিগের একটি শাখা জাতি বাস করে। ইহারা অনেকাংশে হিন্দুদিগের ভ্রাতৃ; কিন্তু অত্যন্ত বিদ্রোহ-পরায়ণ ও অসভ্য।

কণৌজ গজনির পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা বৃহৎ নগর। ইহার রাজধানী এই স্থান হইতে গজনি পূর্বদিকের বর্তী বায়ীনগরে স্থানান্তরিত হইবার পর হইতে এই নগরের অধিকাংশই পরিত্যক্ত এবং ভয়ঙ্করূপে পরিপত্ন হইয়াছে। এই ছই নগরীর ব্যবধান তিন কি চারি দিনের পথ।

বেমন কণৌজ (কাণ্যকুজ) পাণ্ডুর সম্ভানগণের জন্ম এসিদ্ধ হইয়াছে, তেমনই মহরা (মধুরা) নগরীও বাসুদেবের জন্ম এসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা জোন (যমুনা) নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত। মহরা ও কণৌজের ব্যবধান ২৮ কারশাখ *।

* এক কারশাখ ৫ মাইলের সমান।

টানেখর (স্থানেখর) কণৌজ এবং মহরার উত্তরে উত্তর নদীর (গঙ্গা ও যমুনা) মধ্যে, কণৌজ হইতে ৮০ কারশাখ এবং মথুরা হইতে ৫০ কারশাখ দূরে অবস্থিত ।

কণৌজের দক্ষিণে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ বর্ত্তমান আছে ;—বজ্জমৌ, কণৌজ হইতে ১২ কারশাখ ; অভাপুরী (অভরা পুরী) ৮ কারশাখ ; কুরাহা, ১২ কারশাখ ; বস্কমশিল, ৮ কারশাখ ; প্রাগ ১২ কারশাখ । এই প্রাঙ্গণে জোন গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং এই স্থানে হিন্দুগণ ধর্ম্মপুস্তকে বর্ণিত নানাপ্রকার শাস্তিধারা আপনাদিগকে নিপীড়িত করে । যে স্থানে গঙ্গা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থানের দূরত্ব প্রাগ হইতে প্রায় ১২ কারশাখ ।

নিম্নলিখিত প্রদেশ প্রাগ হইতে দক্ষিণদিকে সমুদ্রতীরভিত্তিতে অবস্থিত :—অরকুতীর্থ, প্রাগ হইতে ১২ কারশাখ ; উবখ্যাহার, ৪০ কারশাখ ; উর্জবিষ (তীরস্থিত), ৫০ কারশাখ ।

এই স্থান হইতে পূর্বাভিত্তিতে জলকূলে জৌরের শাসনাধীনে এই সমস্ত দেশ আছে :—দারোর, উর্জবিষ হইতে ৪০ কারশাখ ; কাব্রী, ৩০ কারশাখ ; বলর, ৪০ কারশাখ ; কুনকু, ৩০ কারশাখ, এই দিকে ইহাই জৌরের অধিকৃত শেষ স্থান ।

বাত্রী হইতে গঙ্গার পূর্বপারে উপকূল বাহিরা গমন করিলে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পাওয়া যাইবে :—অবোধ্যা, বাত্রী হইতে ২৫ কারশাখ ; প্রসিদ্ধ বারাগলী, ২০ কারশাখ ।

তথা হইতে গতিপরিবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ দিকের পন্থিবার্ত্তে পূর্বদিকে গমন করিলে নিম্নলিখিত স্থানে উপনীত হওয়া যায় ;—শারণবার, বারাগলী হইতে ৩৫ কারশাখ, পাটলিপুত্র, ২০ কারশাখ ; সুদ্রি (সুজের) ১৫ কারশাখ ; জনপ, ৩০ কারশাখ ; দুগমপুর (দুর্গমপুর), ৫০ কারশাখ ; গঙ্গা-সাগর, যেস্থানে গঙ্গা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, ৩০ কারশাখ ।

কণৌজ হইতে পূর্বাভিত্তিতে নিম্নলিখিত স্থানগুলি অবস্থিত :—বাত্রী, ১০ কারশাখ ; দুগম, ৪৫ কারশাখ ; শিলাহাট সাম্রাজ্য, ১০ কারশাখ ; বিহার নগর, ১২ কারশাখ । আরও দূরে দক্ষিণ দিকে তিলবটদেশ অবস্থিত । ইহার অধিবাসীদিগকে তরু কহে । ইহারা অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহাদের নাসিকা তুর্কাভিগের নাসিকার ত্রায় অধুন্নত । এই স্থান হইতে কামরূপ পর্যন্ত উপস্থিত হওয়া যায় । এই পর্যন্ত সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ।

বামপার্শ্বে তিলবটের বিপরীত মুখে নরপাল রাজ্য (নেপাল) অবস্থিত। নরপাল সম্বন্ধে অলবেঙ্গী একজন ভ্রমণকারীর নিকট হইতে যে বিবরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল। সেই ভ্রমণকারী তানবটে পূর্বমুখীন গতি ত্যাগ করিয়া বামদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি নরপালে গমন করিয়াছিলেন। ইহার দূরত্ব ২০ ফারসাখ। ইহার অধিকাংশই উন্নতভূমি। নরপাল হইতে তিনি ৩০ দিনে ভোটেখরে আসিয়াছিলেন; ইহা প্রায় ৮০ ফারসাখ পথ। এই স্থানে নত ভূমি অপেক্ষা উন্নত ভূমিই অধিক। এই স্থানে জলাভূমি বহুবার সেতুদ্বারা উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই সেতুগুলি পরস্পর রজ্জ্বদ্বারা সংযুক্ত কাঠকলকে নির্মিত হইয়া পৰ্ব্বত হইতে পৰ্ব্বতান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং উভয় পার্শ্বস্থিত মাইল ঠোনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ রাখিয়াছে। লোকসমূহ এই সেতুর উপর দিয়া পৃষ্ঠে ভার বহন করিয়া গমন করে; সেতুর অপর পারে ভারগুলি ছাগের পৃষ্ঠে স্থানান্তরিত করা হয়। অলবেঙ্গীকে ইহার সংবাদদাতা বলিয়াছিলেন যে, তিনি চারি চকুবিমিষ্ট হংস দেখিয়াছিলেন। ইহা আকস্মিক প্রাকৃতিক ব্যতিক্রম নহে; এই প্রেশীর সকল হংসই এই প্রকার।

ভোটেখর তিব্বতের প্রথম সীমান্ত। সেই স্থানে অধিবাসিবর্গের ভাষা, পরিচ্ছদ এবং আচারব্যবহার পরিবর্তিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে সর্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা ২০ ফারসাখ। পৰ্ব্বতের এই উচ্চ স্থান হইতে ভারতবর্ষ কুরাসাঙ্গর ক্রক্কাবর্ণ প্রান্তরের দ্বারা প্রতীতমান হয় এবং তিব্বত ও চীন ক্রক্কাবর্ণ বলিয়া মনে হয়। তিব্বত ও চীনের দিকে অবতরণ করিতে ১ ফারসাখেরও কম পথ অতিক্রম করিতে হয়।

কগোজ হইতে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে গমন করিলে গঙ্গার পশ্চিমপার্শ্বস্থিত নিম্নলিখিত স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় :—জাহাতিরাঙ্গা, কগোজ হইতে ৩০ ফারসাখ। এই রাজ্যের রাজধানীর নাম কজুরাহা। এই নগরী ও কগোজের মধ্যে ভারতের অতি প্রসিদ্ধ দুইটি দুর্গ অবস্থিত; একটি পোরালির অপরটি কালনজর। দাহল প্রদেশের রাজধানী চীম্বোয়ী। এই প্রদেশের বর্তমান শাসনকর্তার নাম গাদেয়। কলকর রাজ্য ২০ ফারসাখ; অপসহর, বনবাস এই দুইটি সমুদ্রোপকূলস্থিত।

নিম্নলিখিত স্থানসমূহ কগোজ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থিত :—জাবী, কগোজ হইতে ১৮ ফারসাখ; বহন্যা, ১৭ ফারসাখ; চম্বা, ১৮ ফারসাখ; রাজোয়ী,

১৫ কারশাখ ; বাজনা, গুজরাতির রাজধানী, ২০ কারশাখ । শেষোক্ত নগরীকে লোকে নারায়ণ কহে । ইহার ধ্বংস হইলে নাগরিকগণ জহরা নামক অস্ত্র একটি স্থানে গমন করে ।

কণৌজ মথুরা হইতে ষড় দূরে বাজনা ও কণৌজ হইতে তত দূরে অর্থাৎ ২৮ কারশাখ দূরে অবস্থিত । যদি কোন ব্যক্তি মথুরা হইতে উজ্জয়িনী গমন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে ৫ কারশাখ দূরে দূরে অবস্থিত কয়েকটি গ্রাম অতিক্রম করিতে হইবে । ৩৫ কারশাখ অতিক্রম করিলে দৃদাহী নামক একটি প্রকাণ্ড গ্রামে উপনীত হওয়া যায় । তথা হইতে বামহর, দৃদাহী হইতে ১৭ কারশাখ ; ও ভাইলদান ৫ কারশাখ । এই স্থানটি হিন্দুদিগের নিকট অতি প্রসিদ্ধ । এইস্থানে যে মূর্তির পূজা হয় সেই মূর্তির নাম হইতে এই নগরীর নামের উৎপত্তি হইরাছে । মূর্তির নাম মহাকাল । তথা হইতে অরদীন ৯ কারশাখ ও ধার ৭ কারশাখ ।

বাজনা হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিলে মৈষভরারে উপনীত হওয়া যায় । ইহা বাজনা হইতে ২৫ কারশাখ । এই রাজ্যের রাজধানী জটোরোর । এই নগর হইতে মালব ও তাহার রাজধানী ধার ২০ কারশাখ । উজ্জয়িনী নগরী ধার হইতে ৭ কারশাখ পূর্বে অবস্থিত । উজ্জয়িনী হইতে ভাইলদান ১০ কারশাখ । ইহাও মালবের অন্তর্গত ।

ধারের দক্ষিণ দিকে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বর্তমান আছে :—ভূমিহার, ধার হইতে ২০ কারশাখ ; কন্দ, ২০ কারশাখ ; নমাব্র, ১০ কারশাখ (ইহা নর্মদার তীরস্থিত) ; গোদাবরীতীরবর্তী মন্ডগিরি, ৬০ কারশাখ ; নমিবা উপত্যকা, ৭ কারশাখ ; মারহাট্টাদেশ, ১৮ কারশাখ ; কঙ্কণপ্রদেশ এবং ইহার সমুদ্রোপ-কূলস্থিত রাজধানী ঠানা, ২৫ কারশাখ ।

বাজনা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে উপনীত হওয়া যায় :—অনুহিলবার, বাজনা হইতে ৬০ কারশাখ ; সমুদ্রতীর-বর্তী সোমনাথ, ৫০ কারশাখ ।

অনুহিলবারের ৪২ কারশাখ দক্ষিণে লারদেশ অবস্থিত । ইহার দুই রাজধানী—বিহরোজ এবং বিহনজুর । উত্তর নগরীই ঠানার পূর্বদিকে সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত ।

বাজনা হইতে পশ্চিমদিকে গমন করিলে মুটান ও ভাটীতে উপস্থিত হওয়া যায় । ইহারা বাজনা হইতে যথাক্রমে ৫০ এবং ১৫ কারশাখ দূরবর্তী ।

ভাটী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে গমন করিলে নিম্নলিখিত স্থানে পৌছান যায় :—
আরোর, ভাটী হইতে ১৫ ফারসাখ ; এই নগর সিদ্ধ নদের দুইটি শাখার মধ্যস্থলে
অবস্থিত। বম্‌হা অলমনহর, ২০ ফারসাখ ও লোহারানী (সিদ্ধর মোহানার
অবস্থিত) ৩০ ফারসাখ।

কণোজ হইতে উত্তর-পশ্চিমদিকে নিম্নলিখিত স্থানগুলি অবস্থিত :—শির্বাংহ,
কণোজ হইতে ৫০ ফারসাখ ; শিক্তোর, ১৮ ফারসাখ ; ইহা পূর্বতোপরি অবস্থিত
(ইহার বিপরীত দিকের ভূমিখণ্ডে স্থানের নগর বর্তমান) ; জালকরের রাজধানী
মহম্মাল, ১৮ ফারসাখ, ইহা পূর্বত পাদমূলে অবস্থিত ; বজাবর, ১০ ফারসাখ।
এইস্থান হইতে পশ্চিম দিকে লদনা, ১৩ ফারসাখ ; রাজগিরি হুর্গ, ৮ ফারসাখ ;
তথা হইতে উত্তরাভিমুখে কান্দীর, ২৫ ফারসাখ।

কণোজ হইতে পশ্চিমে :—দিরামো, কণোজ হইতে ১০ ফারসাখ ; কুটী, ১০
ফারসাখ ; পানিপত, ১০ ফারসাখ (উল্লিখিত স্থানবহুর মধ্য দিয়া জোন—বসুনা
নদী—প্রবাহিত) ; কবিটল, ১০ ফারসাখ ; হুন্সাম, ১০ ফারসাখ।

তথা হইতে উত্তর পশ্চিমে আদিভায়াহোর, ২ ফারসাখ ; জজ্ঞনী, ৬ ফারসাখ ;
মলহকুর লোহাওয়ারের রাজধানী—ইহা ইরাব নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত—৮
ফারসাখ ; চম্পাহনদী, ১২ ফারসাখ ; কৈলাম (শিলামবিরাভা) নদীর পশ্চিমে
৮ ফারসাখ ; সিদ্ধনদের পশ্চিমতীরবর্তী ঐহিন্দ, গাঙ্কারের রাজধানী, ২০ ফারসাখ ;
পূর্বাভরার, ১৪ ফারসাখ ; হুনপুর, ১৫ ফারসাখ ; কাবুল, ১২ ফারসাখ ; গজনা
(গজনী) ১৭ ফারসাখ।

অলবেঙ্গী কান্দীরের একটি বিস্তৃত বিবরণ দিরাছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ
হইল :—

হুর্গম পূর্বতরাজবিবেষ্টিত উপত্যকাধ কান্দীর অবস্থিত। এই দেশের দক্ষিণ
ও পূর্বাংশ হিন্দুদিগের অধিকৃত। পশ্চিমাংশ অস্ত্রান্ত রাজত্ববর্গের অধীন। উত্তর
এবং পূর্বের কিয়দংশ খোটান ও তিব্বতের তুরকগণের অধীন। ভোটেবরের
গিরিন্দ্র হইতে তিব্বতের মধ্য দিয়া কান্দীর ৩০০ ফারসাখ দূরে অবস্থিত।

কান্দীরের অধিবাসিগণ পাদচারী, তাহাদের আরোহণের অস্ত্র হস্তী বা অস্ত্র
কোন পণ্ড ব্যবহৃত হয় না। তাহাদের মতো বাহারা ভক্ত তাহারা যত্নবান্ধব-
বাহিত কষ্ট নামক পাখীতে আরোহণ করে। দেশবাসিগণ দেশের স্বাভাবিক
শক্তি রক্ষার অস্ত্র বিশেষ ব্যগ্র, সেইজন্য তাহারা কান্দীরের পথ ঘাট সুরক্ষিত
রাখে। এই সকল কারণে তাহাদের সহিত কোন প্রকার বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন

করা অত্যন্ত কঠিন । পূর্বে দুই একজন বিদেশীকে বিশেষতঃ ব্রিটিশদিগকে জাহাঙ্গীর দেশের প্রবেশাধীনতা প্রদত্ত হইত ; কিন্তু এক্ষণে কোন অপরিচিত হিন্দুও প্রবেশলাভ করিতে পারে না, অস্ত্র লোকের ত কথাই নাই ।

কাশ্মীরপ্রবেশের সুপরিচিত পথ সিদ্ধ ও জৈলাম (জিলাম) নদীর মধ্যবর্তী বরহান নগর হইতে আরম্ভ হইয়াছে । তথা হইতে যে স্থানে কৃশনাতী ও মহরী মিলিত হইয়াছে (এই উভয় নদীই শামীলান পর্ত হইতে বহির্গত হইয়া জৈলামে পতিত হইয়াছে) সেই স্থানে মিলিত জলরাশির উপরিস্থিত সেতুর নিকট গমন করিতে হইবে—দূরত্ব ৮ ফারশাখ । সে স্থান হইতে পাঁচ দিনে গিরিশঙ্করের মুখে উপনীত হওয়া যায় । (এই গিরিশঙ্করের মধ্য দিয়া জৈলাম বহির্গত হইয়াছে) । এই শঙ্করের অপর প্রান্তে জৈলাম নদীর উত্তর তীরেই ঘাটী (ঘার) আছে । গিরিশঙ্কট পরিত্যাগ করিলে সমতলভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায় । আরও দুই দিনের পথে অবিভ্যাকার উত্তর পার্শ্বস্থ উপকারা গ্রাম অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরের রাজধানী আদিহানে (?) উপস্থিত হওয়া যায় ।

কাশ্মীর নগরী জৈলামের উত্তরতীরে নিম্নিত হইয়া চারি ফারশাখ বিস্তৃত ভূমির উপর দণ্ডায়মান । উত্তর তীর সেতু ও খেয়া নৌকার দ্বারা সংযুক্ত । শীতল, দুর্গম, কুমারবল হরমকোট পর্তত্রেণী হইতে জৈলাম নদীর উৎপত্তি হইয়াছে । (গঙ্গার উৎপত্তিও এইস্থানে) ! এই পর্তত্রেণীর পশ্চাতে মহাচীন । জৈলাম নদী পর্তত তাগ করিয়া দুই দিনের পথ প্রবাহিত হওয়ার পর আদিহান অতিক্রম করিয়া গমন করে । চারি ফারশাখ দূরে ইহা একটি ১ ফারশাখ—সমতলভূমি জলাভূমিতে প্রবেশ করে । এই জলাভূমির কূলে লোক কৃষিকার্য্য করে । জলাভূমি পরিত্যাগ করিয়া জৈলাম উপকারা নগরী অতিক্রম করতঃ পূর্বোন্নিখিত গিরিশঙ্কটে উপনীত হয় ।

সিদ্ধনত তুরকদিগের দেশের উনাং পর্তত হইতে বহির্গত হইয়াছে; নিম্নলিখিত উপারে তথায় উপস্থিত হওয়া যায় :—কাশ্মীরে গণবেশপথের গিরিশঙ্কট পরিত্যাগ করতঃ অবিভ্যাকার প্রবেশ করিয়া বামপার্শ্বে বোলর ও শামীলানদিগের (তুরকদিগের শাখাজাতি—ইহারা ভট্টবর্য়ান নামে অভিহিত) পর্তভাতিমুখে আরও দুই দিন গমন করিতে হইবে । এই জাতিদিগের রাজ্য উপাধি ভট্ট-নাহ । ইহাদের সিলসিট অবির ও শিলটাস নামে নগরদ্বয় আছে এবং ইহাদের ভাষা তুরক । ইহারা প্রায়ই কাশ্মীর আক্রমণ করে । নদীর বামতীরে গমন করিলে ক্ষেত্র-সমূহের মধ্য দিয়া রাজধানীতে উপনীত হওয়া যায় ; দক্ষিণ তীর বাহিয়া গমন

করিলে রাজধানীর দক্ষিণস্থিত পরম্পরসংলগ্ন গ্রামসমূহের মধ্যে দিয়া কুলারজক পূর্বতে পৌছান যায়। এই স্থানে বহুক কদাপি গলিত হয় না। এইস্থান সর্ব সময়েই টাকেশ্বর ও লোহাওয়ার (লাহোর) হইতে দৃষ্ট হয়। এই পূর্বতচূড়া ও কাশ্মীরের অধিত্যকার মধ্যস্থিত বাবধান ২ ফারসাখ। রাজাগিরি দুর্গ ইহার দক্ষিণে এবং লাহর দুর্গ ইহার পশ্চিমে অবস্থিত। অলবেঙ্গলী বলেন যে, তিনি যতগুলি দুর্গ দেখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এই দুইটিই সর্বাপেক্ষা দৃঢ়। গিরিপুখ হইতে রাজাওয়ারী নগর ৩ ফারসাখ দূরে অবস্থিত। ইহা অপেক্ষা দূরবর্তী পেডথানে অলবেঙ্গলীর স্বদেশীয় বণিকগণ বাবসাবাগিলা করিত। ইহা ছাড়াইয়া তাহারা কখনও গমন করিত না। ইহা ভারতবর্ষের উত্তর দিকের সীমান্ত।

ভারতের পশ্চিম সীমান্তপূর্বতে আফগানদিগের বিভিন্ন শাখাভাতি বাস করে।

ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে সমুদ্র। ভারতবর্ষের উপকূল মকরাণের রাজধানী, টীজ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পূর্বমুখে আল-দৈবালের রাজ্য পর্যন্ত ৪০ ফারসাখ ব্যাপিরা বিস্তৃত। এই দুই স্থানের মধ্যে তুরান উপসাগর।

পূর্বোক্তস্থিত উপসাগরের পরেই ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ বুনহা (বোহানা?)। তৎপরেই কচ্ছ ও সোমনাথের ত্রেওয়ারজ নামক জলমহাদিগের আবাসভূমি। ইহাদিগের এই নামে অভিহিত হইবার কারণ—ইহার। বীরা নামক জাহাজে সমুদ্রে ডাকাইতি করিয়া থাকে।

সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থান সমূহের নাম :—তওজালেখর, দৈবাল হইতে ৫০ ফারসাখ; লোহারানী, ১২ ফারসাখ; কচ্ছ ও বারোই, ৬ ফারসাখ; সোমনাথ, ১৪ ফারসাখ; কনবারট, ৩০ ফারসাখ; অনরিল, ২ দিনের পথ; বিহরোজ, ৩০ ফারসাখ; সন্মন, ৫০ ফারসাখ; সুবার, ৬ ফারসাখ; টানা (ঠানা) ৫ ফারসাখ।

তথা হইতে সমুদ্রতীর বাহিরা লারান দেশে—বখার জীমুর নগর আছে— উপস্থিত হওয়া যায়। তাহার পর বলত, কাজী, দরবদ। ইহার পর একটি প্রকাণ্ড উপসাগর আছে। ইহাতে সিংহলদীপ অর্থাৎ শরনদীপ অবস্থিত। উপসাগরের তীরে পঞ্জাবের নগর বর্তমান। এই নগরের ধ্বংসের পর রাজা জৌর ইহার পরিসর্বত্ত পশ্চিমদিকে সমুদ্রতীরে পদনার নামে নূতন নগর নির্মাণ করেন।

তৎপরবর্তী স্থান উল্লনার; তৎপরে শরণদীপের বিপরীত দিকে রামেশ্বর (রামেশ্বর); এষ্ট উত্তর স্থানের মধ্যবর্তী সমুদ্রের পরিসর ১২ ফারসাখ। পঞ্জাব

হইতে রাবৈশ্বর ৪০ কারশাখ দূরে অবস্থিত । রাবৈশ্বর ও সেতুবন্ধের ব্যবধান ২ কারশাখ । সেতুবন্ধের অর্থ সমুদ্রের সেতু । ইহা মনরথের পুত্র রামকর্তৃক নির্মিত । তিনি মহাদেশ (ভারতবর্ষ) হইতে লঙ্কার ভ্রম পর্য্যন্ত ইহা নির্মিত করিয়াছিলেন । এই সেতু এক্ষণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পর্য্যন্তের সমষ্টিমাত্র । এই পর্য্যন্তগুলির মধ্য দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত । সেতুবন্ধ হইতে ১৬ কারশাখ পূর্বে বানরগণের পর্য্যন্ত কিঙ্কিন (কিঙ্কিয়া) । প্রতিদিন বানরদিগের রাজা অশুচরবর্গ সমস্তিবাচ্যারে কানন হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদের অন্ন নির্মিত নির্দিষ্ট আগুনসমূহে উপবেশন করে । সেই গবেশের অধিवासিগণ তাহাদের নির্মিত অন্ন প্রস্তুত করে এবং বৃক্ষপত্রের উপর স্থাপিত করিয়া তাহাদের নিকট আনয়ন করে । ভোজন সমাপ্ত হইলে তাহারা বনে প্রত্যাসন্ন করে । কিন্তু যদি কখন তাহারা উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে দেশের সর্বনাশ । বেহেতু, বানরগুলি যে কেবল সংখ্যার অধিক তাহা নহে, পরন্তু অত্যন্ত অসভ্য ও আক্রমণপটু । সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ইহারা পূর্বে বহুবা ছিল ; কিন্তু রাক্ষসদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রামের সহায়তা করার বানরে পরিণত হইয়াছে । ইহারা এই গ্রামগুলি রামের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে ইহাই সাধারণ লোকের বিশ্বাস । ইহাদিগের কবলে পতিত কোন ব্যক্তি যদি রামস্বাক্ষর কবিতার আশ্রিত এবং রামচন্দ্র উদ্ধারণ করে তাহা হইলে ইহারা শান্তভাবে তাহা শ্রবণ করে, এমন কি সময়ে সময়ে পথলষ্টকে প্রকৃত পথে লইয়া যার এবং তাহাকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করে । সাধারণের বিশ্বাস এইরূপ । যদি ইহাতে সত্যের লেশ থাকে তাহা হইলে সুললিত তানেই এই সুকল কলিয়া থাকে ।

ত্রিপুরিভামোহন সাক্তাল ।



বাঁশী-চোর।

“হা, গোপাল, একি হ’ল ? হার, মহাপ্রভু, এ কি করিলে ?”

বৃদ্ধ পুরোহিত দেউলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাথা ঝুঁকিয়া গোপালের দিকে কাতর ভাবে চাহিয়া কেবল বলিতেছেন, “হার, গোপাল, এ কি করিলে প্রভু ?”

অজ্ঞাত সেবকরা মশাল ধরাইয়া, মন্দিরের বাহিরের প্রাঙ্গণে ব্যস্ত ভাবে ঘুরিতেছে, মন্দিরের মধ্যে দণ্ডটির স্থানে আজ শত বৃত্তপ্রদীপ জলিতেছে ; সকলে চিত্তাকুল ভাবে একই স্থান শতবার অবেশন করিতেছে এবং তাহার পরক্ষণেই মনে করিতেছে, সেই স্থানটিই ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। কাহারও মুখে কথা নাই। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ঠাকুরের নটবরবেশ, রাজালবেশ, রাজবেশ, প্রভৃতি নানা বেশ রচনা করিয়া দেয়—সে বেদীর সম্মুখে দণ্ডবৎ পড়িয়া রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে কাতরস্বরে বলিতেছে “আ-হে মহাপ্রভু !”

রজনী প্রভাতকর। প্রভাতের তারা দিবাকে স্বাগত জানাইবার ক্ষণে শুভ্র পূতবেশে পূর্ব গগনে প্রতীক্ষা করিতেছে। পূর্বদিক্ পাণ্ডুর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু দেউলে আজ ‘মঙ্গল-ধূপের’ আরতি বাজিয়া উঠিল না। পরীবাণী কাসর ঘণ্টা না শুনিতে পাইয়া অজ্ঞাত সংস্কারবশে মনে করিল, এখনও প্রভাত হইতে বিলম্ব আছে। প্রতিদিন যে মঙ্গল-ধূপের ব্যস্ত শুনিয়া তাহাদের নিত্রা বিদায় গ্রহণ করে।

প্রভাত হইবার পূর্বেই গৃহে গৃহে ছঃসংবাদ প্রচারিত হইল, “গোপালের বাঁশী চুরি গিয়াছে!” বৃদ্ধগণ কর্ণে হস্ত প্রদান করিলেন, অবস্রাশঙ্কায় জননীপন সন্তানকে বন্ধে টানিয়া লইলেন, অত্র সকলে বিস্ময়িত-বদনে শুধু চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে মন্দির জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। নিকটস্থ বহুলবন লোকের কোলাহলে তাহার বিজনশাস্তি পরিহার করিল। অগণিত ভক্ত দেউলের অভ্যন্তরে, চত্বরে, সোপানোপরি করজোড়ে দাঁড়াইয়া দেবতার নিকট আকুল ভাবে প্রার্থনা করিতেছে। সে জনতা কখনও যৌনভাবে দেবতার দিকে চাহিয়া বিনতি করিতেছে, কখনও বা শত শত কর্ণে “হা গোপাল, তা মহাপ্রভু, হা কেশব” শব্দে মন্দিরের গম্বুজে প্রতিধ্বনিকে জাগাইয়া তুলিয়া এক ভুমূল কোলাহলের সৃষ্টি করিতেছে। আবার তখনই সব নিস্তরু হইয়া ধীরে ধীরে।

বৃদ্ধ পুরোহিত তখনও গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে দেবমূর্তির দিকে

চাহিয়া আছেন। দীর্ঘ দিবসের অনশনক্ৰোধ উপেক্ষা করিয়া তিনি সেবতার করুণা ভিক্ষা করিতেছেন। তাহার কণ্ঠের বিলুপ্ত হইয়াছে, লগাটে রক্তচিহ্ন কুটিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সেবতার রূপা হইতেছে না। সে পাষাণবৃত্তি তেমনই স্থির, তেমনই নিষ্ঠল! সেই বিক্ষারিত চক্ষুর তেমনই উদাসীন; অথরোষ্ঠ তেমনই অশ্রুকম্পিত!

বিহ্বল জনমণ্ডলী ক্রমে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মন্দির ভাগ করিবার সময় তাহার নানা জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। তাহার সারাংশ এই যে, মন্দিরের সেবকদিগের বাড়ীতে অহুসন্ধান করিলে বাণী নিশ্চরই পাওয়া যাইবে। বাণী যে সোণার!

শ্রীমতী ব্রাহ্মণবালা; মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কন্যা। এই কন্যা বাতীত সংসারে বৃদ্ধের আর কেহ ছিল না। কন্যাটি মাতৃহীনা বলিয়া পিতার সমস্ত দ্বন্দ্বের দেহ মনন করিয়া লইয়াছিল। মাতৃহীনা হইলেও শ্রীমতী সুখে লাগিতা। গোপালের রূপার পুরোহিতের কিছুই অভাব ছিল না। ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে অতি বস্ত্রে লালনপালন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী তাহার অবসর-সঙ্গিনী ছিল। তিনি ভাগবত পাঠ করিতেন, শ্রীমতী তাহা একাগ্রমনে শুনিত। শুনিতে শুনিতে তাহার রোমাঞ্চ হইত, চক্ষুতে দ্রববিপলিত ধারে অশ্রু বহিত, আর সর্দীয়গতাড়িত লতিকার মত তাহার দেহবস্তু কম্পিত হইয়া উঠিত। বৃদ্ধ পুরোহিত সর্বদা কন্যাকে ধরিয়া পালকে শয়ন করাইয়া দিতেন, আর তাহিতেন “ভগবান, এ কি লীলা তোমার!”

শ্রীমতী শকদশবর্ষে পঞ্চার্ঘ্য করিলেও তাহার বিবাহ হয় নাই। ব্রাহ্মণ মনে করিতেন, “ব্যস্ততা কি? বিবাহ দিলেই ত মা আমার পরগৃহে যাইবে, আমার গৃহ যে অশ্রয় হইয়া যাইবে। তখন থাকিব কি লইয়া?” শাড়ীর লোক মনে করিত, “সেয়েটির যে দুর্গীরোগ, হঠাৎ কখন কি হয়, বলা যায় না। বিবাহ হইয়া ফল কি?” বস্তত: শ্রীমতীর অদ্বুত ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত হইত। সে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে; দূরে গগননীলিমার দিকে বিক্ষারিত নয়নে চাহিয়া থাকে, সময়ে সময়ে কানহারা হইয়া পাষাণপ্রতিমার মত নিষ্ঠল হইয়া যায়। প্রতিবেশীরা মনে করে, “এ আবার কি?”

শ্রীমতী রূপলী। তাহার রূপ ব্রাহ্মণের গৃহ আলো করিয়া থাকে। বহুলের মালা গাঁথিয়া যে দিন সন্ধ্যা আগতির সময় শ্রীমতী দেউলে আসিয়া গোপালের

গণে পরাইয়া দিয়া বাইত, সে দিন বাজীর দল অবাধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহাদের মনে হইত যেন সে নগ্নপদে অসংখ্য নুপুর রুণু রুণু করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, যেন সে গতির হ্রস্বে অসংখ্য কাব্য মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে! তখন কুলগন্ধে মন্দির আবেশিত হইত। আর দেবতার সহজ প্রকৃষ্টমুখ যেন আরও মধুর হাস্য বিকীরণ করিত। ভক্ত বিশ্বণ প্রেমে মত্ত হইয়া অরুণি করিয়া উঠিত। বৃদ্ধ পুরোহিত গদগদভাবে বৃত্ত-করে কস্তার মত দেবতার কবলা তিকা করিতেন।

ব্রাহ্মণবালা সন্তোষিত্র যৌবনকুহুমের মদিরার বিভোর হইয়া থাকিত। পিতৃ-গৃহের নির্জনতার মধ্যেও তাহার রমণীমূলভ অশিক্ষিতপটুতা আত্মবিকার করিতে ছাড়ে নাই। পুষ্পধবা তাহার চাকচাপ এই বালিকার দিকে ঈষৎ সাক্ষাইতে ফুলেন নাই। স্তব্ধতা তাহার যৌবননদী প্রেমের চক্ষুরিণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছিল। সে সন্নিহিত বকুলবনে বাইরা অপরাজে ফুল ফুড়াইয়া আনিত; মালা গাধিয়া গাধিয়া কুন্তলে পরিত, কর্ণে পরিত, নীধিতে সোলাইত, আর তাহার পালকে উপাধানের উপর রাখিয়া দিত। সন্ধ্যার দ্বান করিয়া শুচিগির্জা হইয়া সে নীলবাসধানি সযত্নে বাঘরার মত করিয়া পরিত, দীপ আলিত এবং শব্দার নিকটে গিয়া সেই দীপে কাহার আগ্রতি করিত। চন্দনের কোঁটা পরিয়া, বন্ধে কণ্ঠে চন্দনামূলেপন করিয়া সে দেবতাকে প্রণাম করিত। তাহার পর বালিকা পিতার আগমনের প্রতীক্ষার বলিয়া থাকিত। ব্রাহ্মণ আসিয়া কস্তাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিতেন, তাহার পর তাহার কেশে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিতেন, মনে করিতেন, “বালিকার অবসরবিনোদনের ত আর কিছুই নাই, তাই সে বেশবিভাল করিয়া সদর কাটাইয়া দেয়।” বৃদ্ধের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিত।

ঐশ্বর্য আর একটি কাব্য ছিল—শব্দা রচনা। তাহার কক্ষটি সর্বদাই পরিষ্কৃত এবং কুহুম ও চন্দনের গন্ধে দেব-মন্দিরের স্তার আবেশিত থাকিত। ঐশ্বর্যের শব্দা বহুমূল্য ন্য হইলেও পরিণাটী। প্রতিদিন অতি বয়ে সে তাহার শব্দা-রচনা করিত, যেন প্রেমমুগ্ধা বালিকা পতির আগমনোদ্দেশে সমস্ত শক্তি ও কল্পনা দিয়া তাহার বাসরসজ্জা সাজাইয়া রাখিতেছে। তাহার মনোচোর আসিবে কি? নিশ্চিথে যখন পরী নিমুগ্ধ, তখনও ঐশ্বর্য আগিয়া থাকিত, বকুলফুলের মালা, শেকাণির মালা, রজনীগন্ধার মালা হাতে লইয়া সাক্ষনরূপে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিত। আগরণে যখন তাহার চক্ষু অলস হইয়া আসিত, অবীর প্রতীক্ষায় দেহ অবসর হইয়া আসিত, তখন তাহার শরীর শব্দার ব্যুত্থিত

হইত । দিবাক্ষে তখন তাহার ঘর পরিপূর্ণ হইয়া বাইত । দূর হইতে বাণী মোহন
 স্বরে বাজিয়া বাজিয়া নিকটে আসিত । বমুন্যর উচ্ছলিত কলগীতি সমীরণের
 অলস পক্ষে ভাসিয়া আসিত । নৃপুনের মধুরধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া
 তাহার কর্ণে অমৃতের ধারা বর্ষণ করিত । আর তাহার বাহনতানিবন্ধ ক্লৃষ্ণমুর্তি
 দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়িত । এমনই মধুর স্বপ্নে তাহার রজনী পোহাইত ।
 প্রভাতে সে দেখিত, লবণপার্শ্বে অলস্তকচিহ্ন, আর তাহার বক্ষ কুছুমরাগরঞ্চিত !

গোপালের বাণী চুরি হইবার পরে দুই একদিনের মধ্যেই রাজ্যের লোক
 এবান পুরোহিতের দ্বারদেশে আসিয়া দেখা দিল । প্রকৃষে ব্রাহ্মণ মঙ্গল ধ্বনি
 আরতি সমাপন করিয়া গৃহে আসিয়া দেখেন, তাঁহার প্রাক্ষণে সমস্ত রাজভূত্যগণ
 কোলাহল করিতেছে । তাঁহার গৃহ অহুসন্ধান করিবে । শ্রীমতী তখনও স্বপ্নের
 স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া নিবিড় নিদ্রার নিমগ্ন ছিল । প্রতিবেশীরা ক্রমে আসিয়া
 উপস্থিত হইল । ব্রাহ্মণ অবিচলিত, বীর কিন্তু গৃহাহুসন্ধানের মানি-নিবন্ধন
 স্রিয়মান ।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী উঠিয়া আসিয়া গবাক্ষে দর্শন দিল, প্রাক্ষণের কোলাহল
 অকস্মাৎ ধামিরা গেল । সত রজনীর বর্গীর শ্রবণশ্রুতি তাহার মুখকমলে এমন
 একটি দ্বিগু উচ্ছলতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে যে, তাহার নিকট সমস্ত সংশয়
 সন্দেহ তর্কজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ।

কিছুক্ষণ বিষয়ে নির্ঝাঁক থাকিয়া কর্মচারী প্রহরীগণকে গৃহে প্রবেশ করিবার
 অহুমতি দিলেন । ব্রাহ্মণ কস্তাকে বক্ষে লইয়া প্রাক্ষণপার্শ্বে ভদ্রালের নিয়ে
 আসিয়া দাঁড়াইলেন । শ্রীমতী পিতাকে সব্বদে ধরিয়া বসাইয়া দিল । তাঁহার
 দেহবটি অভিমানভরে কাঁপিতেছিল । অকস্মাৎ শ্রীমতীর শরন-কক্ষে
 প্রহরীরা জরধ্বনি করিয়া উঠিল । ব্রাহ্মণ ৩ কুচিত করিয়া একবার শ্রীমতীর
 দিকে চাহিলেন ও পরক্ষণেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন । রাজকর্মচারী ব্রাহ্মণকে সংবাদ
 দিলেন যে, তাঁহার কস্তার উপাধানের নিয়ে বাণী পাওয়া গিয়াছে । তাঁহার অহু-
 চররা বাণী লইয়া আসিল । গোপালের বাণী পাওয়া গিয়াছে, এই উল্লাসে
 ব্রাহ্মণ বাণী লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন ; তিনি তুলিয়া গিয়াছিলেন যে,
 এই বাণী অব্যক্ত স্বরে তাঁহারই কলক ঘোষণা করিতেছে । কর্মচারী কঠোর
 হস্তে প্রহরীর নিকট হইতে বাণী লইলেন এবং কর্ণন স্বরে পুরোহিতকে
 বলিলেন, “আপনি বৃদ্ধ আপনাকে বন্ধন করিব না, আশাসের সঙ্গে চলুন ।”

ভাঁহার ইন্দ্ৰিতে দুইজন প্রহরী ব্রাহ্মণের দুই হস্ত গ্রহণ করিল। এইবার ব্রাহ্মণের চক্ষুতে জল আগিল। তিনি বলিলেন “হা, এ কি এ?”

ঐশ্বতী গগনের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার মুখমণ্ডলে, অলকদামে প্রসাত রবির কিরণ প্রতিকলিত হইয়াছিল। তাহার সে প্রশান্ত স্থির মূর্তির দিকে জনতা নিতক্ৰবিশ্বরে চাহিয়া ছিল। আনন্দে তাহার চক্ষুতে জল আসিয়াছিল। প্রতিদিন সে ত শস্যারচনা করে, বাণী ত কখনও দেখে নাই! মুখ্য পিতার বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। পিনীলিকার সারির মত জনতা বখন আসিনা হইতে অদৃশ্য হইয়া সেল, তখন বালিকা শস্যার পার্শ্বে ধূল্যবলুষ্ঠিতা হইয়া কানিতে লাগিল।

বৃদ্ধ পুরোহিত নির্জ্বল কারাগৃহে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, “হে আমায় গোপাল, এ কি করিলে, প্রভু? কল্পাত আমার অপাপবিদ্ধা। তবে তাহার এ কলঙ্ক করিলে কেন? রমণীর কলঙ্ক করিয়াই কি তোমার আনন্দ, প্রভু? হায় হায়, এমন করিয়া কি আমার ননীর পুতুলের সর্বনাশ করিতে হয়? সে কি এখনও বাচিয়া আছে?”

ঠাঁং ঝন ঝন শব্দে কারাগাঠের অর্গল মুক্ত হইল। অদ্রুতগতির উভার বায়ু ব্রাহ্মণের শরীরে স্পর্শ কর ব্লাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ বিশ্বরে চাহিয়া দেখিলেন, রাজা স্বয়ং ভাঁহার পদতলে লুষ্ঠিত। পুরোহিত দক্ষিণ হস্তে ভাঁহার শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করিলেন। প্রহরীর সপন্ননে সরিয়া দাঁড়াইল।

রাজা ব্রাহ্মণকে লইয়া ভাঁহার পুষ্পবাটিকায় আসিলেন এবং তথায় ভাঁহার গৃহদেবতার মন্দিরের শ্বেতমর্দরনির্মিত অগ্নিদে উপবেশন করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, স্বপ্নে ভাঁহার প্রতি আদেশ হইয়াছে ভাঁহার কল্পা ঐশ্বতী লক্ষ্মীরূপিনী। ভাঁহার শরনকক্ষে যে বাণী পাওয়া গিয়াছে, তাহার অস্ত্র তিনি বা ভাঁহার কল্পা কেহই দায়ী নহেন। গোপালই স্বয়ং দায়ী।

ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন, ভাঁহার অস্ত্রে শীতল বেদবিলু দেখা দিতে লাগিল। তিনি অপগত-চেতন হইয়া মর্দরহর্দ্যাতলে বিলুষ্ঠিত হইলেন। রাজার আদেশে অগ্রচরবৃন্দ ভাঁহার চৈতন্ত সম্পাদন করাইল। তখন তিনি অক্ষুট-স্বরে বলিতে লাগিলেন “হে মহাপ্রভু, তুমি ধন্য; হে গোপাল, তোমার অস্ত্র হউক; হা আমার, বাহা তাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল।”

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও দৃঢ়স্বরে বলিলেন “আমাকে তবে গৃহে বাইবার অহমতি হউক ।”

রাজা বলিলেন, “আপনি স্বাধীন, আপনার জন্ত ঘান প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়াছি । কিন্তু একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, যত্নে আমার প্রতি ভগবান যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা পালন করিবার জন্ত আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে । আমি আপনার নিকট সেই অবলম্বিত্ত্বা করিতেছি । আমি রাজোচিত উৎসবে লক্ষ্মীদেবীকে গোপালের পার্শ্বে রাখিয়া আসিব, ইহাই আমার প্রতি আদেশ ।”

সুগণ্য হর্ষ ও বিবাদের বিপরীত আকর্ষণে বৃদ্ধের হৃদয় তাজিরা বাইবার উপক্রম করিল, তিনি সমস্ত শক্তি দিয়া রাজাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিলেন । তাহা না হইলে, তিনি ভূতলে পতিত হইতেন ।

বিপুল সাজ-সজ্জা করিতে রাজার অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল । বৃদ্ধ পুরোহিত গৃহে কিরিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । তাঁহার আগ্রহাতিশয়ো বাধ্য হইয়া রাজা তাঁহাকে সম্বাদে পূর্বেই রওনা করিয়া দিলেন । রাজা স্বয়ং অগণিত অহুতর সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে শোভা-যাত্রা করিলেন । শ্লথজিত হস্তিপৃষ্ঠে রাজা স্বয়ং আসীন হইলেন । তাঁহার পুরোহিতগণে বিচিত্র কারুকার্যশোভিত স্বর্ণ চকুধোলা দ্বানপূত বাহকগণ কর্তৃক বাহিত হইল, তাহার উপরিভাগে স্রোণাঙ্ক-বিলম্ব স্বর্ণখচিত চম্রাতপ আবৃত ছিল । বস্ত্রতঃ সেই বহুদ্রবিশূভ শোভাযাত্রার রাজপ্রাসাদের প্রেষ্ঠে দিগ্বিদিক সকল আহরিত হইয়াছিল । আজ যে ত্রিরাধিকার বিবাহোৎসব !

এদোষে যখন গোপালের আরতির বাস্য বাজিয়া উঠিল, তখন সেই বিপুল দ্বানসনাথ শোভাযাত্রা মল্লিধ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল । জন-মণ্ডলী বাহিরের প্রাঙ্গণে অরুণস্তম্ভ বেষ্টিত করিয়া ও রাজপথে বহুদ্র ব্যাপিয়া একাণ্ড অঙ্গগতের স্তার রহিল । বাদকমল বাতোত্তমে সে পন্নীকে বহির করিয়া তুলিল । রাজা হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া পার্শ্বরক্ষীগণসহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । সশস্ত্র প্রহরীরা জনতার প্রবাহ প্রতিহত করিয়া দ্বার ঘেঁষে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইল ।

রাজা বাটোঙ্গে দেবতার সম্মুখে প্রণত হইলেন । বেদী হইতে পুরোহিত দামিরা আসিয়া রাজাকে চন্দ্রম তুলনী ও মিশ্রাণা দিয়া আশীর্বাদ করিলেন ।

রাজা যখন মন্দির হইতে নিগ্রাস্ত হইলেন, তখন বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত অগ্রসর হইয়া আসিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, “আপনি ধর্ম, আপনার কুল পবিত্র হইল।”

পুরোহিত আনন্দে গদগদস্বরে বলিলেন “মহারাজ, যা আমার আজ পূজকে অধীরা হইয়াছেন। আজ সে শ্রমের মুখে স্বর্গের জ্যোতিঃ ছুটিয়া উঠিয়াছে। এমন কখনও দেখি নাই। বাহুবের চক্ষুতে বাহা দেখা যায় না, আমি আজ তাহাই দেখিয়াছি। মহারাজ, আমার ভঁব-বন্ধন ছুটিয়া গিয়াছে।” বৃদ্ধ আনন্দে কাঁদিয়া কেলিলেন।

বৃদ্ধপুরোহিতকে পুরোভাগে লইয়া, চতুর্দোলা সঙ্গে করিয়া রাজা বকুল-কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজার ইন্দ্রিতে জনসংখ্য প্রতিক্রম হইল। বাদকদল কেবল অমুবর্তী হইল।

রাগপূর্ণিমার রজনী। দেবদুর্জ নীল গগনে শারদজ্যোৎস্না রজত বজ্রা বহাইতেছে। বহুলক্লম কুম্ভগন্ধে বিভোর। বেন আনন্দের এক মহাসাঁবন দিগদিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। উল্লাসদৃশ্ত রাজার কর্ণে গোরুরে ব্রহ্মুতি নিনাদিত হইতেছিল। আর ভববন্ধনযুক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আত্মা বেন উল্লাসের গীত গাহিয়া গাহিয়া শিথিলগায়ে পথের অবেষণ করিতেছিল।

ব্রাহ্মণের আকিনা শুভ চন্দ্রকিরণে প্রাবিত। চন্দ্রন শুগুণ-ধূপ গন্ধে সে স্থানের পবন স্রবস্তিত, পবিত্র, মিষ্ট। ব্রাহ্মণ অতিথির সংকার ভুলিয়া গেলেন, তিনি একবারে তাঁহার কলার শরন-কক্ষে বাইরা উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন কক্ষ শূন্য—দীপাধারে বৃতপ্রদীপ জলিতেছে। ব্রাহ্মণ অস্তব্যস্ত ভাবে ডাকিলেন, “ঐশ্বতী।”

তমাল-তল হইতে উত্তর আসিল “বাই, বাবা।”

ব্রাহ্মণ আবার ডাকিলেন “ঐশ্বতী এস, যা, রাজা তোমাকে লইতে আসিয়াছেন। আজ যে তোমার বিবাহ।”

কীর্ণকণ্ঠে উত্তর আসিল, “স্বরং গোপাল আমাকে লইতে আসিয়াছেন, বাবা বা—ই।”

ঠিক সেই সময় বিনা আদেশে অসংখ্য বাজবস্ত্র ধ্বনিত হইল। সানাইএর মধুর তান দিগদিগন্তে এই চিরশ্রেষ-মিলন প্রচারিত করিল। অগুরু-

গন্ধে বেশ ভরিয়া গেল । ঘোংরা শতগুণ উজ্জ্বল ও মিষ্ট হইয়া উঠিল । বকুলকুন্ডের অপর দিক হইতে অসংখ্য কণ্ঠে যুগপৎ জয়ধ্বনি উঠিয়া গগনে বিশাইয়া গেল ।

রাজা যুক্তকরে তমালতলে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, অপার্ণিব রূপ-রাশি ধরার বক্ষ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে । শ্রীমতীর প্রাপশূল দেহের উপর তমালপত্রের ছায়া ঘোংরার সঙ্গে মিশিয়া অপূর্ণ আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে । তাহার বিস্তৃত কক্ষ কেনরাশিতে অজস্র শুভ কল্প ফুটিয়া রহিয়াছে । আর তাহার অধরে চিরমধুর হাস্য মুদ্রিত হইয়া আছে । *

ঐখগেন্দ্রনাথ মিত্র ।

—:—

কবি ।

বিপুল ধরণীতল ব্যাপি' কত কোলাহল
কলরব দিবসযামিনী,
তুধু তা'র চিত্রমাঝে মোহিনী বীণায় বাজে
অবিচ্ছেদে মধুর রাগিণী,
কিরে সে মলিন সাজে, তবুও হৃদয়ে সাজে
অপার্ণিব সৌন্দর্যের ছবি ।
সে যে এক কবি ।

* সাক্ষিপোপালের আখ্যায়িকা অবলম্বনে এই পদ্যটি লিখিত । ঐহারা সাক্ষিপোপালের বিগ্রহ দেখিয়াছেন, তাহারাই জানেন যে, পোপালের রাধিকা উৎকল-রমণী । এতদ্বারা এই যে, কৃষ্ণপ্রিয়নী উৎকল-বাসিনীর বেহত্যাগের পর রাজা দৈববাণীর নির্দেশানুসারে তাহার অষ্ট-ধাতুনির্মিত প্রতিকৃতি পোপালের বামে স্থাপিত করেন ।

২

লোকালয়ে এক কোণে সে থাকে আপন মনে
 উপেক্ষিত মানবসভায়।
 ছুটে আসি' সমীরণ করে তা'রে আলিঙ্গন,
 যেঘ আসি' মুখে তা'র চায়,
 লভিকা সোহাগভরে নুয়ে পড়ে দেহপরে
 ছড়াইয়া কুসুম সুরভি
 সে বে এক কবি।

৩

কা'র এত লাগে ভাল উবার সোণার আলো
 জননীর শ্বেহের মতন ;
 দুৰ্ঘাতের বর্ণিতরে কে নিত্য সৃজন করে,
 স্বপ্নময় বিচিত্র ভুবন।
 শান্ত সন্ধ্যা বধুবেনে কাছে আসে ভালবেসে,
 সখা তা'র নশি তারা রবি
 সে বে এক কবি।

হিসেব বেব কপটতা প্রাণে বড় দেহ ব্যথা
 করুণার আকুল অন্তর,
 হৃদয়ে তা'র নাহি ভর সে গাহে প্রেমের অর,
 প্রেমপরে অটল নির্ভর।
 চাহে না ঐশ্বর্য্যপানে উচ্চপদ তুচ্ছ মানে,
 ভাব-মুগ্ধ, দারিদ্র্য-গরবী
 সে বে এক কবি।

ঐরমসীমোহন বোৰ।

রামায়ণ ও মহাভারত ।

রামায়ণ ও মহাভারতের কালনির্ণয় সম্বন্ধে আমি ইতঃপূর্বে বাহা বলিয়াছি সে সম্বন্ধে আরও ছুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিয়াছি ।

প্রথম কথা, আমি লিখিয়াছিলাম, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ৮৪ বৎসর হইয়াছিল । এখানে আমার একটু ভুল হইয়াছিল । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দ্রোণাচার্য্যের বয়স ৮৫ বৎসর, ইহা মহাভারতেই লিখিত আছে । শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সমবয়স্ক ছিলেন । অর্জুন দ্রোণাচার্য্য অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট ছিলেন ইহা কখনই বিবাস করা যায় না । পণ্ডিতশ্রমের সাধারণ গণণা দেখিলে মহাশয় আমাদের এই ভুলটি দেখাইয়া দিয়াছিলেন । দীননাথ জ্যোতিষী শাস্ত্রাভিলাষী শ্রীকৃষ্ণের কৌশলবিচার করিয়া পণ্ডিতজ্যোতিষের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ খৃঃ পূঃ ৩১৮৫ অব্দে তাম্র যাসের কুকাটমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে কলিযুগ প্রবর্তিত হয় । শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সঙ্গে কলির আবির্ভাব হয় । সুতরাং ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন । ইহার বার অথবা চৌদ্দ বৎসর পূর্বেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল । সুতরাং সে সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম সত্তর বাহাত্তর বৎসর হইবে । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরও শ্রীকৃষ্ণ কিছু দিন জীবিত ছিলেন ।

দ্বিতীয় কথা, পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী মহাশয় আমার প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমি আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়াছি । বনবী জিবেদী মহাশয় খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । জ্যোতিষশাস্ত্রে ও বৈদিক সাহিত্যে পূজ্যপাদ জিবেদী মহাশয়ের অসাধারণ জ্ঞান । সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার মতের বখেট মূল্য আছে । তাঁহার প্রধান বুক্তি এই—“এখন বেদের ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৈদিক কালে সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে বিবৃৎসংক্রমণ বা বৎসর আরম্ভ হইত । এখন গণনা করিলে দেখা বাইবে যে খৃঃ পূঃ আড়াই হাজার বৎসর বা তাহার কিছু পূর্বে কৃত্তিকার বিবৃৎসংক্রমণ ঘটিত । কাবেই ঐ সময়কে আমরা বেদের ব্রাহ্মণ-যুগের সময় বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিতে

পাঠি। বেদের মন্ত্রবৃগ তখন প্রায় শেষ হইয়াছে, একরূপ অসুস্থান করা হাইতে পারে।” (আর্য্যাবর্ত, ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ৫৩২ পৃষ্ঠা)

ত্রিবেদী মহাশয় এই প্রবন্ধে দুইটি কথা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ বৈদিক কালে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিবুধন ছিল। ঐ নক্ষত্রেই বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হয়। দ্বিতীয়তঃ বেদের মন্ত্রবৃগ ও ব্রাহ্মণবৃগ স্বতন্ত্র। মন্ত্রবৃগের অবসানে বা শেষভাগে ব্রাহ্মণবৃগ আরম্ভ হইয়াছে।

এখানে জিজ্ঞাস্য, বৈদিক যুগে কি সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে মহাবিবুধ সংক্রান্তি হইত? ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন, বেদের ব্রাহ্মণে তাহার প্রমাণ আছে। ঐযুক্ত বাণসদ্বাধর তিলক মহাশয় তাহার প্রণীত Orion নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, অগ্নেদের কয়েকটি ঋকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐ মন্ত্রগুলি যখন দৃষ্ট হইয়াছিল, তখন পুনর্বার নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সে আশ ৭ হাজার ৬ শত বর্ষের কথা। তাহার পর আত্মা, যুগশিরা, রোহিণী ও কৃত্তিকার মহাবিবুধ সংক্রান্তি হইয়াছে। অয়ন চলনের (precession of the Equinoxes) কালে বিবুধন পরবর্তী নক্ষত্রে সরিয়া গিয়াছে। যখন বিবুধন কৃত্তিকানক্ষত্রে সরিয়া গিয়াছিল, তখন ব্যক্তিক ঋষিরা কৃত্তিকাকেই প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণনা করিতে আরম্ভ করেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ও শতপথব্রাহ্মণে কৃত্তিকাই আদি নক্ষত্র বলিয়া গণিত। এখন উত্তরভাগপ্রপদে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হয়। সাত্বে চারি হাজার বৎসর পূর্বে কৃত্তিকাতে বিবুধন ছিল। সুতরাং বৈদিক যুগের পরিমাণ প্রায় তিন হাজার বৎসর।

মন্ত্রবৃগ হইতে ব্রাহ্মণযুগের স্বাতন্ত্র্য করণা পান্ডিত্য পণ্ডিতগণেরই যত্নিক-প্রসূত। উহার কোন নিঃসন্দেহ প্রমাণ নাই। আমাদের বিশ্বাস কর্ণকাক্সসম্পর্কিত বেদের দুইটি ভাগ। একটির নাম সংহিতা; অপরটির নাম ব্রাহ্মণ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়াই কর্ণকাক্স। বজ্রই কর্ণকাক্সের প্রথম ও প্রধান সাধন। সংহিতা ভাগে কেবল বৈদিক মন্ত্র-গুলি আছে। উহা বজ্রই প্রযুক্ত হয়। কিন্তু কি প্রণালীতে বজ্র করিতে হইবে, কি ভাবে মন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হইবে, বজ্রের পদ্ধতি কি, বজ্রের উপকরণই বা কি, তাহা পক্ষে ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। বজ্র করিতে হইলে উজ্জয়েরই প্রয়োজন। একের অভাবে বজ্র সম্পন্ন হইতে পারে না, সুতরাং অজ্ঞাতিও নিষ্ফল হয়। অতএব সংহিতা ও ব্রাহ্মণ তিন যুগের হইতেই পারে না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, বৈদিক যন্ত্রগুলি প্রকৃতির অনন্ত-গৌরবশক্তিতে চাচার গান। গানগুলি যখন পুরাতন হইয়া আসিল, জনসাধারণ সেই লাদলধারী মূৰ্খ চাষাদের কথা ভুলিয়া গেল, তখন জনকয়েক বিট্লে বায়ুন জুটিয়া বেদী গড়িয়া, আশ্রয় জালাইয়া, সেই যন্ত্রগুলি নানাক্রম স্বরে উচ্চারণ করিয়া বজ্র নামক ব্যাপারের সৃষ্টি করিল এবং সাধারণ লোকের মনে ভক্তির উদ্ভেক করিয়া দক্ষিণা আদায় করিবার অস্ত্র সেই যন্ত্রের জটিল পদ্ধতি ও প্রণালী এবং নানা উপকরণের তালিকা উদ্ভাবিত করিল। যে সময়ে এই ব্যাপার ঘটে তাহাই ব্রাহ্মণ-যুগ। স্মৃত্তরাং সংহিতা প্রাচীন, ব্রাহ্মণ অর্কাচীন। বাহ্যিক মূৰ্খা কোন্ নক্ষত্রে বাইলে মহাবিশুব সংক্রান্তি ঘটিবে, অন্নন-চলনের কলে কতদিন পরে বিশ্ববন পরবর্তী নক্ষত্রে সংক্রমিত হইবে, পৃথিবীর গতিপ্রভাবে দিব্যরাত্রি কিরূপে ঘটে, ইত্যাদি তথ্য আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহারা যে একদিন আচাৰিতে উদীরমান মূৰ্খা দেখিয়া অকস্মাৎ দৃষ্টিশক্তিপ্রাপ্ত অন্ধের উহা দর্শনের ভ্রাস বিষয়ে আশ্রুত হইয়াছিলেন এবং ‘ও তু হু’ব’মঃ’ বলিয়া ধেই ধেই নাচিয়া উঠিয়াছিলেন ইহা আমাদের ধারণার মধ্যেই আইসে না। কিন্তু একরূপ একটা theory খাড়া না করিলেও বেদের ব্রাহ্মণভাগকে অর্কাচীন বলা যায় না। বিশ্বব্রহ্মের বিবরণ এই যে, প্রজ্ঞান্দ্র জীবেরী মহানরের ভ্রাস অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিও এই খিওরীটাকে অনায়াসে গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

বাহ্য হউক, যদি তর্কের অগ্রগোষেও স্বীকার করা যায় যে, ব্রাহ্মণযুগ স্বতন্ত্র ও পরবর্তী, তাহা হইলেও জীবেরী মহানর যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে বা তাহার কিছুকাল পূর্বেই যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেবাগি অথেন্দ্রসংহিতায় একটি যন্ত্রের স্মৃতি। যুধিষ্ঠিরের প্রপিতামহ শান্তনুর এক নাত্যর নাম ছিল দেবাগি। তিনি বালাকালেই বনে গমন করিয়াছিলেন, মহাভারতে এইটুকুই উক্ত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ২২শ অধ্যায়েই কেবল শান্তনুর রাজত্বকালে দ্বাদশ বার্ষিকী অনায়াগির ও দেবাগি কর্তৃক বজ্রাঘাতানের উল্লেখ আছে। মহাভারতে নাই। মহাভারতে বরং শান্তনুর রাজত্বকালে কোন-রূপ ইতি ভর ছিল না এইরূপই ইঙ্গিত আছে। ভাগবত মহাভারতের ভ্রাস প্রাচীন গ্রন্থ নহে, অন্ততঃ উত্তরকালে এই গ্রন্থে অনেক বিবরণ পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। স্মৃত্তরাং অথেন্দ্রের যন্ত্রদ্রষ্টা দেবাগি

ও শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে। আর যদি শান্তনুভ্রাতা দেবাপি ও ঐ অক্ষুণ্ণ দেবাপি এক ব্যক্তিই হইলেন, তাহা হইলে তিনি খৃঃ পূঃ ৫৬০০ অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ ২৫০০ পর্যন্ত এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই সপ্রমাণ হয়। খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এ কথা বলিলে কোনও সন্দেহই হইতে পারে না। ঐরূপ বশিষ্ঠ * ও তাঁহার পুত্র শক্তি, কথোপসংহিতায় বহু মন্তব্যের পরি হইলেও তাঁহারা যে তথাকথিত ব্রাহ্মণ যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা সপ্রমাণ হয় না; বরং মন্তব্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহাই সপ্রমাণ হয়।

যে শতপথব্রাহ্মণে কৃত্তিকানক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাতের কথা আছে সেই শতপথ ব্রাহ্মণে বৃষিষ্টির প্রাতঃ অর্ক্ণুনের প্রপৌত্র জনমেজয় ভীমসেন, উগ্রসেন ও ক্রতসেনের কথাও আছে। যে ভাবে তাঁহাদের কথা তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে তাঁহারা তখন সকলেই ইহুদ্য হইতে বিদায় লইয়াছেন। সুতরাং যে শতপথ ব্রাহ্মণ খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের কিছু পূর্ববর্তী বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে, তাহা অন্ততঃ বৃষিষ্টির বৃদ্ধ প্রপৌত্রের আমলের, বরং তাহারও পরবর্তী হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে পরীক্ষিত, জনমেজয়, বৈশম্পায়ন প্রভৃতি বৃষিষ্টির পরবর্তী ব্যক্তিগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উহা যে বৃষিষ্টির সমসাময়িক ইহা অসম্ভবমান করা যায় না।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, যজ্ঞের প্রণালী প্রভৃতির নিরূপাদি ব্রাহ্মণে লিখিত আছে। যে সময় বিদ্বান কৃত্তিকার ছিল, সে সময়েই ঐ গ্রন্থে যজ্ঞসম্পাদন-সৌকর্যার্থ স্থানে স্থানে ঐ নক্ষত্রের কথা লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল মন্তব্যের বিস্তৃতি ও যজ্ঞপদ্ধতি যে তাহার পূর্বেও ছিল, ইহা নিশ্চয়। ইহার দ্বারা এইটুকুমান সপ্রমাণ হয় যে, খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে বা তাহার কিছু পূর্বেও ভারতে বৈদিক যজ্ঞের অস্তিত্ব হইত। সেই সজ্ঞ ম্যাক্সমুলার † বলিয়াছেন, “বাক্যবাক্য বাসসেনের সংহিতা ও শতপথব্রাহ্মণের রচয়িতা নহেন।

* মহাভারতাদিগ্রন্থে একাধিক বশিষ্ঠের উল্লেখ দেখা যায়। একজন ব্রাহ্মণ বাসদপুত্র, আর একজন বরগনপন। ইহা তিন অল্প বশিষ্ঠেরও কথা আছে।

† History of Ancient Sanscrit Literature.

তিনি প্রাচীন মন্ত্র ও ব্রাহ্মণগুলিকে বর্তমান আকারে সংগৃহীত করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।” সুতরাং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণগুলিকে সংগ্রহ ও বর্তমান আকারে পরিণত করিবার সময় তিনি উহা তৎকালের উপযুক্ত করিবার জন্যই উহাতে রোহিণী বা মৃগশিরায স্থানে কৃত্তিকা বসাইয়াছিলেন, তাহা মনে করাই সম্ভব ।

আমার শেষ কথা, সমস্ত ইতিহাসে ও পুরাণে ত্রীকুকের তিরোধানের পরই কলির আবির্ভাব হইয়াছিল, এই কথাই স্পষ্টাক্ষরে উক্ত আছে । যে বিষ্ণু-পুরাণে ও ভাগবতে পরীক্ষিতের জন্মসময় হইতে নন্দের অতিবেতকাল সহস্র বৎসরের কিক্রিয়াত্র অধিক কাল ব্যবহিত বলিয়া উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতেও বহু স্থানে স্পষ্টই লিখিত আছে, ত্রীকুকে যে দিন স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিনই কলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ কর্তৃক উক্ত । সে মত পরিচয় করিবার উপযুক্ত কোনও হেতু দেখা যায় না । সুতরাং ষাণ্ময় ও কলির সন্ধি-কালেই বৃষ্ণষ্টিরের আবির্ভাব হইয়াছিল আমি এই মতই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি ।

ত্রীমলিত্বূষণ সুখোপাধায় ।

—:—

প্রতিভা ।

(১)

যেখ বৃষ্ণি বিজলীরে চাহে বন্ধে আবদ্ধ রাখিতে,

সৌদামিনী না মানে বারণ ;—

আলোকে উজলি' ধরা, জ্যোতির্ঘরী আপনা' প্রকাশে,

ঘন-বন্ধ করি' বিদারণ ।

(২)

হামব প্রতিভাশালী চাটিলেও লুকাতে আপনা,

প্রতিভা সে বাধা নাহি মানে ;—

মস্তক তালিয়া তা'র বাহিরিয়া উদ্ভাসে অবনী

সুবিমল জানালোকদানে ।

ত্রীবিভূতিভূষণ যজ্ঞবদার ।

—:—

অদৃষ্টচক্র ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

গৃহে ।

সরোজাকে সঙ্গে লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা গৃহে ফিরিলেন । গৃহখানি নাকিসুস্থ—
অসংস্কৃত । গৃহের ভিতরদিকে কলস্করর বাহন্যে গৃহে আলোকের গমনপথ বিস্ত-
সমুদ্র হইয়াছে । গৃহের কতক অংশ ঘিটল—কতক অংশ একতল । গৃহের
পশ্চাৎভাগে রত্ননগর, ভাণ্ডারঘর প্রভৃতি । সে অংশ একতল । সেই দিকে
গৃহের “খিড়কীঘর” ও “খিড়কীর বাগান” । সেই বাগানে একটি সরোবর ।
সুবত্তী গৃহে ফিরিয়া সরোবরে গাজখোত করিবেন, স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন ।

তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া বখন পুনরায় উজানে আসিবার জন্য অগ্রসর
হইলেন তখন হারার মা—দাসী তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, “ওকি, দিদিমণি!
ঘাটে গিয়াছিলে কাপড় ভিজে নাই !”

হারার মা’র কণ্ঠস্বর কখন বৃদ্ধ হইত না ; সে বখনই কথা বলিত, তখনই
পাড়া আনাইয়া বলিত । সে বিষয়ে কেহ কিছু বলিলে সে আরও উচ্চ স্বরে
বলিত, “বলি, আমি কি কাহারও দার করিয়া খাইয়াছি যে, চোয়ের মত কথা
কহিব ?” আজ বিরজার প্রতি তাহার প্রশ্নে ভাণ্ডার ঘর হইতে ও অস্বস্ত কক্ষ
হইতে বিরজার শিতাব্যপত্তী ও তিন ভ্রাতৃবধূ আসিয়া রোয়াকে উপনীত হইলেন ।
প্রথমেই শিতাব্যপত্তী প্রশ্ন করিলেন, “কি রে, বিরজা ?”

সুবত্তী বলিলেন, “বাগানের পুকুরিগীতে বাইতেছি ।”

সুবত্তীর উত্তর শেষ হইতে না হইতে তিনি বিপুল বেহতায় লইয়া কক্ষমধ্যে
প্রবেশ করিলেন । কিছুদিন হইতে তিনি বাবুরোগে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন ।
আবার দীর্ঘকালব্যাপী পীড়ার সময় রোগের সজ্জপাত । এখন রোগ আরও
বাড়িয়াছে । সময় সময় রোগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না, আবার সময়
সময় রোগিণীর বুদ্ধির বিকার দেখা যায় । এই সময় সেইরূপ বিকার দেখা
বাইতেছিল ।

কাকীমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে বধূরা নমন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞপবাণ
বর্ষণ করিতে লাগিলেন । জ্যেষ্ঠা বলিলেন, “কি ঠাকুরঝি, বয়ের কথা ভাবিতে
ভাবিতে কি জলে নাথিতে ভুলিয়া গিয়াছিলে ?”

মধ্যমা বলিলেন, “তাহাতে আর বিষয় কি আছে ? ঠাকুর জামাই তিন মাস এদিকে আইসেন নাই ; ঠাকুরবিকেও পরীক্ষা দেব না হইলে লইয়া বাইবেন না । আর কেহ কি পরীক্ষা দেয় না ?”

সুবতী বলিলেন, “যেহ বোধিদি, তোমার যে মাস দিন সব সুখই দেখিতেছি । তিথি নক্সা ঠিক আছে ত ?”

মধ্যমা উত্তর করিলেন, “তিথির লক্ষ্য ভাবনা কি ? ঠাকুর জামাই যে দিন আসিবেন, সেই দিনই ত তোমার পূর্ণিমা । চন্দ্রের উদয় না হইলে ত কেবলই অসাব্যসা । কি হইয়াছে, ঠাকুরঝি ?”

সুবতী বলিলেন, “এখন তোমরা—অসাব্যসার চাঁদরা একটু অপেক্ষা কর—আমি আসিয়া সব বলিতেছি ।”

তৃতীয়া এতক্ষণ কিছু বলে নাই, সে বলিল,—“ঠাকুরঝি, তুমি শুক বসে ঘাট হইতে ফিরিলে, ব্যাপারটা কি ?”

সুবতী বলিলেন, “তোমাদের আর বিষয় সহিবে না, তবে তন ।”—সুবতী ঘাটের ঘটনা বিবৃত করিলেন ।

শুনিয়া প্রথমা বলিলেন, “কি লজ্জা !”

দ্বিতীয়া বলিলেন, “তাহারা কি ভদ্রলোক ?”

সুবতী বলিলেন, “এখন ত ধোপ কাপড় হইলেই ভদ্রলোক । আবার তাহাদের মধ্যে যে সকলের অপেক্ষা বড় সে দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিতেছিল—সেই, সেবার কলিকাতার থিয়েটারে করজান সুবককে বেদন বস্ত্র দিয়া দেখিতে দেখিয়াছিলাম ।”

প্রথমা মননে ঈষৎ প্রসারিত জিহ্বা ধংসন করিলেন ।

সুবতী বলিলেন, “এখন আমাকে ছুটি বাও ; আমি পুফরিণীতে বাই ।”

দ্বিতীয়া বলিলেন, “তুমি বাও । আমিও বাইতেছি । বেলা সেল—আবার আবার লাজাইতে হইবে ।”

সুবতী চলিয়া বাইলেন ।

সেই সময় একজন সুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল । দেখিয়া বোধ হয়, সুবক কিছু পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে । তাহার ললাটে বেদবিষ্ম, কৃতার ধূলি । তাহাকে দেখিয়া প্রথমার ও দ্বিতীয়ার মধ্যে অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হইয়া গেল । তাহার পর প্রথমা তৃতীয়াকে দেখাইয়া বলিলেন, “এই যে, ঠাকুরপো, তোমার সাত রাজার ধন—এক বাণিক ।”

সুবক ও তৃতীয়া উভয়েই কিছু লজ্জা বোধ করিল ।

তৃতীয়র কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল; সে মাথার কাপড় টানিয়া দিল। যুবক বিজ্ঞপবাণে বিজ্ঞপবাণ বার্থ করিবার প্রয়াসে বলিল, “তোমাদের অধিকারে আসিলে আর নিস্তার নাই। স্বয়ং অর্জুন বখন নারীরাণ্যো আসিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন, তখন অস্ত্রের কথা ত হার।”

প্রথমা বলিলেন, “আচ্ছা, ঠাকুরপো, সত্য সত্য বল দেখি—সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এ কয়দিন তুমি কেমন করিয়া কলিকাতায় থাক? শনিবারে না হয় দড়ি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া আস।”

যুবক বলিল, “আমিই দড়ি ছিঁড়ি বটে; দাদাও সব ভাল মাহুষ! মেজদাদাও আমার সঙ্গে এক গাড়ীতেই আসিয়াছেন। বড়দাদাও বোধ হয় সন্ধ্যার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।”

যুবক চলিয়া গেল।

তৃতীয়াও কক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহার পর প্রথমা ও দ্বিতীয়া পুষ্করিনীতে চলিলেন। পথে প্রথমা দ্বিতীয়াকে বলিলেন, “বাহাই বল, ভাই, সেজ ঠাকুরপোর মত বেহার। আর দ্বিতীয় নাই। বাড়ী আসিয়াছে; কাপড় ছাড়। নাই, বুধে জল দেওয়া নাই—ছুটিয়া জীকে দেখিতে আসিয়াছে! আমাদের না হয় লজ্জা না করিলে,—কাকীমা, পাগল হউন আর বাহাই হউন, তিনি ত রহিয়াছেন। সুন্দরী জী কি আর কাহারও হয় না?”

দ্বিতীয়া বলিলেন, “বাহাই বল, ভাই সেজ বোনের খুব জোর কপাল।”

“লোকে বাহাতে নিন্দা করে, সে কপালে লাভ?”

“লাভ বাহার তাহার। লোকের কথার তাহার কি আইসে যায়?”

“লোকের কথার জন্তই সব।”

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে উভয়ে পুষ্করিনীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন। যুবতী তখন আকর্ণ জলমগ্ন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি, বড় বৌদিদি, কাহার কথা লইয়া আলোচনা করিতেছ?”

বড় বৌ বলিলেন, “তোমারই ভ্রাতার গুণের কথা বলিতেছি।”

যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন ভ্রাতার—দেওঠের না মধ্যমের?”

“বাহাদুরের তিন কাল বাইরা এক কালে ঠেকিয়াছে, তাহাদের কথা কেই বা বলে, আর কেই বা শুনে? এখন বাহার! নিত্য নূতন দেখাইতেছে, তাহাদের কথাই বলিতেছি।”

“কে নিত্য নূতন দেখাইতেছে?”

“কেন, তোমার সেজদাদা ।”

“সেজদাদা আসিয়াছে ?”

“তোমার সেজ বৌদিদির আঁচল খুঁজিয়া দেখ । সপ্তাহ পরে বাড়ী আসিলেন ; কাহারও সঙ্গে ছুঁইটা কথা বলা নাই, মুখে হস্তে জল দিবার বিলম্বও সঙ্গ নাই, একেবারে গৃহিণীর কুঠ্রে আসিয়া উপস্থিত ! এমন ত কখনও দেখি নাই !”

সুবতী হাসিয়া বলিলেন, “বাহা দেখ নাই, তাহা কি কখন দেখিবে না । জানইত, বাবং বাচি তাবং শিখি ।”

প্রথমা বলিলেন, “তোমরা অনেকই দেখাইলে, অনেকই শিখাইলে ।”

“তোমাকে শিখাই এমন সাধা কি আমাদের আছে ? বরং তুমিই আমাদের কত শিখাইতে পার ।”

“তোমার শিখাইবার লোকের অভাব কি ? তবে ঠাকুর জামাই পড়া লইয়া কিছু অতিরিক্ত বাস্ত । তা, ঠাকুরবি সবুরে যেওয়া ফলে ।”

“সেজদাদা একটু ‘বৌ পাগলা’ বটে ।”

“একটু ! আপনার ভাই বলিয়া কি রাজিকে দিন করা চলে ?”

“ও সব থাকিবে না ।”

“তাহা কি বলা যায় ? মুড়কীর রস মরে বটে, কিন্তু আবার মোরাও ত পাকায় ! আর একটা কথা বলি, ঠাকুরবি, তোমার ও ভাইটির লিখাপড়া কিছুই হইবে না ।”

“কেন ?”

“সেজ ঠাকুরপো বে করদিন কলিকাতার থাকে, সে করদিন উহার মন সেজবৌএর খাটের সুরার বাধা থাকে । ঠাকুরপো বইএর পাতার বৌএর ছবি দেখে । বরং এবার সেজবৌকে কলিকাতার পাঠাইবার ব্যবস্থা কর ।”

এই সময় একটি সপ্তম বা অষ্টমবর্ষ বয়স্কা বালিকা ঘাটে আসিল, সুবতীকে বলিল, “মিদি বড়দাদা আসিয়াছেন—আর ঠাকুর সঙ্গে মেজ-জামাই বাবু ।”

মধ্যমা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সত্য ?”

বালিকা বলিল, “হ্যাঁ ।”

তখন প্রথমা একটু ছুঁই হাসি হাসিয়া ননন্দাকে বলিলেন “চল, ঠাকুরবি, বাড়ী বাই—

‘সইলো—সই

তোমার মদনমোহন এল অই।’

কি ভাগ্য বে, ঠাকুরজাৰাই আসিরাছেন!”

মধ্যমা বলিলেন, “চল, দিদি, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।”

তখন সূৰ্য্য পশ্চিম দিক্চক্ৰবালসমীপস্থ। দিনান্তের গোহিতাত কিয়দ উত্তানের বৃক্ষদৃড়ায় পড়িয়াছে। আকাশে ধও ধও মেঘে নানা বর্ণের বিকাশ। সরোবরতীরে বিকশিত কুঞ্জমসৌরভে স্তম্ভিত কেতকীকুলে ডাহক ডাকিয়া সন্ধ্যায় নুচনা সৃষ্টিত করিতেছে।

সকলে সোপানশ্রেণী অভিক্রম করিয়া উপরে উঠিলেন। পৰনে কেতকী কুঞ্জমের সৌরভ। মধ্যমা প্রথমাকে বলিলেন, “দিদি, কেতকীকুল ফুটিয়াছে। এই সময় খদিরে মিশাইয়া লইলে হয়। ঠাকুর বড় ভালবাসেন।”

বড় বৌ বলিলেন, “ভালকথা মনে করিয়াছ। গতবৎসর কলিকাতা হইতে ফুল আনাইতে হইয়াছিল। চল, বাড়ী বাইরা শিবুক পাঠাইয়া দিব—ভুলিয়া লইয়া বাইবে।”

সকলে গৃহান্তিমুখপামী হইলেন। পথে বড় বৌ ননন্দাকে বিজ্ঞপ করিয়া বলিলেন, “চল ঠাকুরঝি, স্রুত চল। মন চলে ত চরণ চলে না।”

সুবতী বলিলেন, “কেন বড় বৌদিদি, একা কি আমারই স্রুত বাইবার কথা? তোমার পতিওত বড় মহর দেখিতেছি না।”

“আজ ঠাকুরঝির মুখ ফুটিয়াছে।”

“কেন—ইটটি মারিবে আর পাটকেলাট সহিবে না? এ কেমন বিচার?”

সকলে গৃহে উপীত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জামাতা।

মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে জামাতার আগমন সভা সভাই কিছু অনাধারণ ঘটনা। কারণ, জামাতা ব্রজেন্দ্র প্রায়ই বস্তুরালয়ে আসিত না, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও জামাতাকে আনিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না,। তাঁহার পত্নী জীবিতা থাকিতে তিনি সময় সময় পতির ও বৈবাহিকার মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, “তোমাদের সবই সৃষ্টিছাড়া। বেয়েও

বগুরবাড়ী বাইবে না, জামাতাও বগুরালরে আসিবে না। কেন আর কাহারও ছেলে কি জামাতা কি লিখাপড়া করে না?” দুইবৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; আব সেই সময় হইতে ব্রজেশ্বর বগুরালরে আগমন আরও বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের টোলখিভাগে কাব্য ও স্মৃতি অধ্যয়নের পর পিতার মৃত্যুতে কুলকিষ্কার মনোনিবেশ করেন। তাঁহার পিতা বহু ধনী পরিবারের কুলগুরু ছিলেন। তিনি সেই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। সে মাজ বিংশ বর্ষের কথা। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বয়স ত্রিশ বৎসরমাত্র। তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা তখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোন শিষ্যের চেষ্টায় তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। কিন্তু পর পর করটি অবস্থাকর স্থানে বাইরা ও শরীয়তের প্রতি অথবা অত্যাচার করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। শেষে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন ও দীর্ঘ সপ্তবর্ষকাল জীবন্ত অবস্থায় থাকিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীর জীবদ্দশার—পীড়ার সময় হইতে তাঁহার পত্নীর বায়ুরোগের সূচনা হয়। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র বামাচরণ কলিকাতার থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। পুত্রপীঠে বুঝতীরা তাহারই দ্বার্য্য প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। কন্যা শৈলজা স্বামীর ঘর করিতেছে; মধ্যে মধ্যে পিতৃগৃহে আসিয়া থাকে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুত্রকন্যাদিগের অপেক্ষা ব্রাহ্মপুত্র ও ব্রাহ্মপুত্রীকে অধিক প্রেহ করেন। ইহাতে তাঁহার কোষ্ঠ পুত্র কিছু অসম্ভব। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই কোষ্ঠ পুত্র কলিকাতার থাকেন।

পুত্রদিগের জন্ম ও ব্রাহ্মপুত্রের শিক্ষার জন্ম তিনি কলিকাতার একটি বাসা রাখিয়াছেন। তথায় তাঁহার বিধবা ভগিনীর কর্তৃত্ব। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেও আরই কলিকাতার বাইতে হয়; কারণ, তাঁহার অধিকাংশ শিষ্যের বাস কলিকাতায়। তাঁহার কোষ্ঠ পুত্র কলিকাতার একখানি দোকান খুলিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বহু ধনী শিষ্যের কুপার দোকান ভালই চলিতেছে। কোষ্ঠ পুত্র বামাচরণ কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না; শুধু—পাছে তাঁহাকে সংসারে কিছু দিতে হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাতে মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে বিরক্তি প্রকাশ করেন না। বামাচরণের উপার্জিত অর্থ তাঁহারই থাকিতেছে। বামাচরণের ব্যবহারে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে মনে সন্তুষ্ট। তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসার ত্যাগিয়া যাইবে।

তিনি তাহার জন্ত গোপনে আবশ্যক বাবদাও করিয়াছেন। মধ্যম পুত্র পার্শ্বতী-
চরণ সংক্ৰান্ত কলেজে কিছুদিন অধ্যয়নের পর এখন পিতার কার্যে তাঁহার
সাহায্য করিতেছেন। কনিষ্ঠ দেবীচরণ ও ব্রাহ্মপুত্র রাধাচরণ অধ্যয়ন করি-
তেছে। পুত্রবৃদ্ধিগণের মধ্যে মধ্যমা বাড়ীতেই অবস্থান করেন। জ্যেষ্ঠা
মধ্যে মধ্যে কলিকাতার আসিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভায়াচরণ
পিতামহের অত্যন্ত আদরের, পিতামহ তাহাকে ছাড়িয়া অধিক দিন থাকিতে
পারেন না। সেই জন্ত তাঁহাকে সময় সময় বাড়ীতেও থাকিতে হয়।
মধ্যমার সন্তান জন্মে নাই। দুই বৎসর হইল রাধাচরণের বিবাহ হইয়াছে।
ভট্টাচার্য মহাশয় অধিক বয়সে বিবাহের বিরোধী। তিনি দেবীচরণেরও
বিবাহ দিবেন, স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূৰ্বে কস্তা সন্তোষার
বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে করিতে
কস্তা ষাণ্মাস বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ভট্টাচার্য মহাশয় তাহার বিবাহের জন্ত
কিছু ব্যয় হইয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, অগ্রহায়ণ মাসে কস্তার বিবাহ
দিবেন; তাহার পর মাঘ বা কাৰ্ত্তিক মাসে দেবীচরণেরও বিবাহ দিবেন। এখন
পাত্রপাত্রীর সন্ধান চলিতেছে। ব্রাহ্মপুত্রী শৈলজা ও পুত্রী বিরজা উভয়েরই
বিবাহে ভট্টাচার্য মহাশয় অনেক পাত্র বাছিয়াছিলেন। শৈলজার স্বামী মধুরা-
নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কোন শিষ্যের সূপারিসে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট
হইয়াছেন। বিরজার স্বামী ব্রজেন্দ্র প্রবেশিকা হইতে স্নাতক করিয়া এম. এ.
পৰ্য্যন্ত বিখ্যাতশালার সকল পরীক্ষার সন্তোষ স্থান অধিকার করিয়া এবার
স্নাতক প্রেমচাঁদ ব্রহ্ম লাভের জন্ত পরীক্ষা দিবে। ব্রজেন্দ্রের পিতা ভট্টাচার্য
মহাশয়ের বালাবদ্ধ ছিলেন। দুই পরিবারে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপনের জন্ত
উভয়েই লালারিত ছিলেন। স্থির ছিল ব্রজেন্দ্রের সহিত বিরজার বিবাহ হইবে।
কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হইবার পূৰ্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার মৃত্যুতে
ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত সে পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বেন আরও বৰ্দ্ধিত
হইল; তিনি সৰ্ব্বদাই বন্ধুপুত্রের ও বন্ধুপত্নীর সংবাদ লইতেন। ব্রজেন্দ্রের
জন্মও বৈবাহিক ব্যাপারে তাঁহারই পরামর্শ লইতেন। বন্ধুর মৃত্যুর পর
কিছুদিন ভট্টাচার্য মহাশয় আর বিবাহের কথা উত্থাপিত করিলেন না,
পাছে এমন সন্দেহের অবকাশ হয় যে, তিনি ব্রজেন্দ্রের সহিত কস্তার বিবাহের
চেষ্টাতেই বন্ধুপরিবারের শুদ্ধাধান করিয়াছেন। ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল।
বিরজা একাদশ বর্ষে ষাণ্মাস বর্ষে পদার্পণ করিল। ভট্টাচার্য মহাশয় অল্প

পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন । এই সময় একদিন কথার কথার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রজেনের জননীকে বলিলেন, তিনি বিরজার বিবাহের মন্ত্র চিন্তিত হইয়াছেন ; কল্যা বড় হইয়াছে, আর বিলম্ব করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে । গুনিয়া ব্রজেনের জননী বলিলেন, “কর্তার বড় ইচ্ছা ছিল, বিরজাকে পুত্রবধূ করেন । আমার অদৃষ্ট মন্দ । আমি আর সে কথা কেমন করিয়া বলিব ?” ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, ‘আমি সেই আশার নিশ্চিন্ত ছিলাম । কিন্তু এখন আর তাহা বলিতে সাহস করি নাই । আজ আপনি সে কথা তুলিয়াছেন, তাই আমি আমার সেই প্রস্তাব করিতে সাহস করিতেছি । আমরা দুইজন বহুদিন হইতেই এ সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলাম ।’ বন্ধুর কথা শ্রবণ করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল । ব্রজেনের সহিত বিরজার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল ।

ব্রজেন এ কথা শুনিয়া । শিতামাতার কথার প্রতিবাদ করা ব্রজেনের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল । সে কেবল বলিল, “না, তুমি এখন এ ব্যবস্থা করিলে কেন ?”

মা বলিলেন, “ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত হিতাৰ্থী আমাদের আর নাই । এ বিবাহ হইলে তিনি তোমার ইষ্ট চেষ্টা করিবেন । আমি নিশ্চিন্ত হইব ।”

“না, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বথার্থই আমাদের হিতাৰ্থী । তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের সকল সাধন করেন ও করিবেন ।”

“কর্তা বহুদিন পূর্বে এ বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন । তাই—
তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার মন্ত্র আমিই উজোগী হইয়া এ কথা বলিয়াছি ।”

ব্রজেন আর কোন আপত্তি করিল না ।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিবাহে তোমার আপত্তি কেন ?”

ব্রজেন বলিল, “আমার ইচ্ছা ছিল, পাঠ শেষ করিয়া তবে সংসারে প্রবেশ করিব ।”

“বাবা, তদবধি যে ইহারই মধ্যে তোমার ক্ষেত্রে সংসারের ভার দিয়াছেন ! বক্ত দিন তোমার পাঠ শেষ না হয়, আমি বধূকে আনিব না ।”

ব্রজেন আর কিছু বলিল না ; বরং মনে করিল, বাহ্যতে পিতার ইচ্ছা ছিল, মাতার আশ্রয় আছে—তাহাতে আপত্তি জামাইয়া অজ্ঞার কাণ্ড করিয়াছেন ।

তৃত্ত দিনে বিরজার সহিত ব্রজেনের বিবাহ হইয়া গেল । এ বিবাহে ব্রজেনের জননীও বেমন স্ত্রী হইলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তেমনই স্ত্রী হইলেন ।

বিবাহের ঐক্যবাক্যে বধূকে আনিবার সময়ে ব্রজেন্দ্রের জননী যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রায় রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই; চার বৎসরে বিরজা মধ্যে মধ্যে পতি গৃহে গিয়াছে,—ব্রজেন্দ্রও করবার যত্নহীন হয়ে আসিয়াছে।

তবে হুই-ই দীর্ঘ দিনের বাবধানে—অল্প দিনের অন্ত। এখন পতি পত্নী—স্ববক স্ববতী। ইহার জন্ম স্বতঃই উহার জন্ত ব্যাকুল হইত। বাস্তবিক নিকটে পাইবার বাসনা যৌবনে স্বাভাবিক; যৌবনে জন্ম যখন প্রেমপুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে—আপনার প্রেম দিবার অন্ত ও অপরের প্রেম পাইবার অন্ত জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠে—তখন—সেই অনাবিল সুখের সময় বাস্তবিক বন্ধে রাখিয়াও তৃপ্তি হয় না—যেন ভবও বাবধান রহিল—যেন হয়। যৌবনে—স্বার্থের আবর্জনার জন্ম কলুষিত হইবার পূর্বে—বিধববৃদ্ধি এতল হইবার পূর্বে প্রেমকৃষ্ণা যেমন প্রবল থাকে, প্রেমপুলক উপভোগ করিবার শক্তিও তেমনই প্রবল থাকে। তখন জন্ম প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ আসন দেয়। যে যৌবনে প্রেমপুলকে জন্ম পূর্ণ করিতে পারিল না, সে হুর্ভাগা। এই যৌবনে ব্রজেন্দ্রের ও বিরজার জন্ম স্বভাবতঃই পরস্পরকে নিকটে চাহিত। ব্রজেন্দ্র সে বাসনা সংযত করিত; সে ভাবিত, অধারন শেষ করিয়া প্রেমসুখে জন্ম পূর্ণ ও প্রফুল্ল করিবে। সে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকের আশার ছাদশীর চক্করোচ্ছল রজনীর সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ হইতে বেচ্ছার আপনাকে বঞ্চিত করিত। বিরজার সেক্ষপ আশা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না; তাই সে মধ্যে মধ্যে স্বামীর উপর অভিমান করিত। কিন্তু তাহার সে অভিমান স্থায়ী হইত না। সে যখন সকলের সুখে, বিশেষ তাহার পিতার সুখে, স্বামীর অধারন-সুহার প্রশংসা শুনিত—তখন সেই প্রশংসার রবিকরে তাহার জন্মে সঞ্চিত অভিমানের ভাবরাশি বিগলিত হইয়া বাইত—আনন্দে তাহার জন্ম উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। বিশেষ স্বামীর সহিত যখন তাহার সাক্ষাৎ হইত তখন তাহার পিপাসিত দৃষ্টি স্বামীকে দেখিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত না। সে মুগ্ধ মেয়ে স্বামীকে দেখিত—স্বামীকে সৰ্ব্ব সুখের নিলয় বলিয়া মনে করিত; তাহার অভিমান কোথায় মিলাইয়া বাইত।

আজ প্রায় তিন মাস পরে বিরজার সহিত ব্রজেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। আজও বিরজার জন্মের এক কোণে—সূর্য্যকরোচ্ছল শারদঅম্বরের দূর পাশ্বে স্বচ্ছ—ভব মেঘধণ্ডের স্তায় একটু অভিমান লাগিয়া ছিল। সে অভিমান তাহার সুখে ও নরনে সঙ্গকণ জ্ঞানস্বকিরণ নির্মাপিত করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাহা

ব্রজেন্দ্রের প্রেমতীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতেও পারে নাই । বিরজাকে দেখিয়াই ব্রজেন্দ্র বলিল, “বিরজা, আমার পরীক্ষার আর ছয় মাসমাত্র বিলম্ব আছে ।”

বিরজা বৃথিল, যে মিলনতৃষ্ণা তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল—তাহা স্বামীর হৃদয়ও জুড়িয়া রহিয়াছে । রবিকরে কৃষ্ণকটিকার মত তাহার অভিমান দূর হইয়া গেল—মিলনানন্দে যুবতী-হৃদয়পূর্ণ হইয়া গেল ।

তাহার পর স্বামীত্বীতে কত কথা হইতে লাগিল । প্রায় তিন মাস পরে স্বামী ত্বীতে সাক্ষাৎ । মিলনব্যাকুল যুবকযুবতীর কথা কি সূত্রায় ? যখন কথা কহিতেই আনন্দ—কথা কহাইতেই আনন্দ, তখন কথা প্রত্যক্ষআগত প্রায় আপনি আইসে । তখন কথার স্রোতে ভরা সূত্রায়, তাহাতে ভাঁটা পড়ে না । যখন নিমেষালসপগ্ন-পংক্তি পত্নী পতির মুখে চাহিয়া আর সব ভুলিয়া যাতেন,—যখন পতির পিপাসিত নরন প্রিয়ার আননে সৰ্ব্বসুখমাসম্বদর দেখিয়া বিপুল পুলকে আকুল হইয়া উঠেন, তখন দীর্ঘযামা বামিনী যেন স্বপ্নমাত্রে অতিবাহিত হইয়া যায় । কিন্তু যখন মিলনে কথা বুঝিয়া পাওয়া যায় না, যখন নরনের তৃষ্ণা মিটিয়া যায় তখন জানিবে প্রেমের পূর্ণ প্রবাহ মনোভূতবেগ হইয়াছে, সুখলতা এ জীবনে আর সুমনস-সুস্বাদ্য শোভাময়ী হইবে না । তখন জীবন যুদ্ধার নামান্তরমাত্র ।

বিরজা ও ব্রজেন্দ্র কত কথা কহিতে লাগিল, উত্তরে সেই কথায়—মিলন-নন্দে এমনই তন্ময় যে বাতায়নপার্শ্বে তাহাদের প্রেমমালাপত্রবগলোলুপা প্রথমা ও দ্বিতীয়া বধুর অলঙ্কার শিজিত বা মুহূষরে কথোপকথন কাহারও কর্ণগোচর হইল না ।

কথায় কথায় ব্রজেন্দ্র বলিল, “মা আজ কাল আমার উপর প্রায়ই রাগ করেন ।”

বিরজা বিস্মিতা হইল, জিজ্ঞাসা করিল, “কেন ?” সে তাহার বাগুড়ীকে বাহা জানিত তাহাতে তাহার পক্ষে পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া সে অসম্ভব বলিয়াই বিবেচনা করিত ।

ব্রজেন্দ্র হাসিয়া বলিল, “তোমাকে লইয়া বাইতে পারিতেছেন না বলিয়া ।”

বিরজার মনে হইল বলে, “সে মোষ কাহার ?” কিন্তু সে কথা বলিতে তাহার লজ্জা হইল । সে নীরব রহিল ।

ব্রজেন্দ্র বলিল, “মা বলেন, ‘আমি আর কত দিন একাকী থাকিব ?’ আমি যদি উত্তরে বলি, ‘মা এত দিন ত আমাকে লইয়া বসন্তে ছিলে’—

তবে না বলেন, ‘এতদিন আমার একটি ভিন্ন সন্তান ছিল না—এখন বে ছুইটি।’

বিরজা বখনই বাহিগৃহে গিয়াছে, তখনই বাণ্ডীর বে বয়ের ও মেহের পরিচয় পাইরাছে তাহাতে সে আপনাকে সোভাগ্যবতী মনে করিয়াছে। আজ এই কথাই তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সে তাহার বাহি-সোভাগ্যের কথা শ্রবণ করিল, বাণ্ডীর মেহের কথা মনে করিল :— তাহার মনে হইল, তাহার মত সোভাগ্য কর জনের আছে ? তাহার পক্ষে অগৎ মধুময়। মাহবের মনের এই হ্রস্ব অবস্থা যদি স্থায়ী হইত, তবে সংসার সত্য সত্যই নন্দনে পরিণত হইত।

এদিকে বাহিগৃহের পরিচালিত কথোপকথন শ্রবণের আশায় হতশ হইরা মধুময় বে বাহার কক্ষে চলিলেন। মধ্যমা জ্যোষ্ঠাকে বলিলেন, “দ্বিদি তোমার চুড়ীর শব্দ শুনিয়াই ঠাকুরঝি সাবধান হইরাছিল।” জ্যোষ্ঠা বলিলেন,— “কখনই নহে। ঠাকুরঝি কি কম ঢালাক ! ঠাকুরঝি সন্দেহ করিয়াছিল, আমরা ‘আড়ি পাতিব’, ঠাকুর জামাইও কব্ব নহেন ; দেখিতে ভাল মাহবটি, বেন তাজা মাছটি উল্টাইয়া থাইতে জানেন না। ও যেমন হাঁড়ি তেমনই সত্তা।”

উদ্ভিলা ।

এঁকেছিল। দক্ষ শিল্পী তব চিত্রখানি
কোন্ উপাদান দিয়া কেমনে না জানি !
ভূতলে অপূর্ণ স্রষ্টি ! ঘোন তাবা তব
মণ্ডিত করিয়া, দেবি, সুবসার নব
করিয়াছে বিকশিত হৃদয় তোমার
অমল কমল সম । সৌরভে তাহার
বিশুদ্ধ অগংবাসী । তব প্রেম-মেহ
ফন্তর ঘোড়ের মত ; দেখে নাই কেহ
সে নির্মল তটিনীতে উজ্জ্বল উদ্যম ।
বীরশ্রেষ্ঠ পতি তব ত্যাগ মুর্খিমান,
তুমি বৃষ্টি মুর্খিমতী তাহার মহিমা,
বৃষ্টি তা’র কমলীয় দ্বিধা মধুরিমা ।

শ্রীসরোজবাসিনী শুভা ।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ ।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সার জন সোর লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রধানতঃ নাচ, অখারোহণ ও শীকার লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। আফিসের নকল প্রভৃতি কার্যাদি প্রায়ই ভারত-বর্ষীয় কেরানীদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। মোটামাহিনার ইংরাজ কর্মচারীরা প্রায় নাম লিখিয়া খালাস হইতেন।

সেকালে ভারতীয় ইংরাজ সমাজে জুয়াখেলায় যথেষ্ট চলন ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস ইহার দমন করেন। বোড়দোড় তখনও প্রচলন ছিল এবং ধনীরা ও সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাহাতে যোগ দিতেন। প্রথমে চৌরঙ্গীসংলগ্ন ধান্তক্ষেত্রে ও পরে সুচীখেলার নিকটস্থ আখড়ায় বোড়দোড় হইত।

সে কালে ভারতপ্রবাসী ইংরাজগণ ফরসীতে ধূমপান করিতেন। ভোজের পর অমুরী তামাকের ধূমে গরুগুহব জমট বাধিত। বড় বড় ভোজে নিমন্ত্রিত-পণের হকাবরদারগণ তাঁহাদিগের হকা লইয়া ঘাইত। তখন ইংরাজগণ বাইনাচের আসরে বসিতেন ও হোলিখেলার যোগ দিতেন। এখন ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীরাও এসব আবাদে যোগ দিতে লজ্জা বোধ করেন! ব্যারিষ্টার হুজি ও সেদিনও হাইকোর্টের খাসকামরার হকাব তামাক টানিতেন।

সেকালে ইংরাজ রাজকর্মচারীদিগের বেতন অতি সামান্য ছিল। সারজন সোর (পরে লর্ড টেননটউথ) যখন প্রথম কার্যে ব্রতী হইলেন, তখন তাঁহার মাসিক বেতন ৮ টাকা! পরে যখন তাঁহার বেতন বর্ধিত হইয়া ৯৬ টাকা হয়, তখন তিনি মাসিক ১২৫ টাকা বাড়ীভাড়া দিতেন! মাদ্রাজের পূর্ববর্ত সার টমাস মন্রো লিখিয়াছেন, প্রথমে তাঁহার মাসিক বেতন সরকারী বাসা লইলে ৫ প্যাগোডা ও সে বাসা না লইলে ১০ প্যাগোডা ছিল। এখনকার হিসাবে ১ প্যাগোডা প্রায় ৩৭০ টাকা। এই ৫ প্যাগোডার মধ্যে তিনি দোভারীকে ২টি ও বাসার ভূতাকে ১টি দিতেন। ধোপানাপিত্তের ব্যয়ে ১টি বাইত। অবশিষ্ট ১টিতে আহার্য হইতে বেশ পূর্ণাঙ্গ সব চালাইতে হইত! তবে মন্রোর অভিন্নবন্ধনপ্রিয়তা প্রসিদ্ধ। স্ত্রীরাং তাহার কথায় ছুট বাদ দিতে হয়। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, ভারতে আসিবার পূর্বে স্ত্রীকে তৃপ্তা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না; ভারতে প্রথম তিন বৎসর স্ত্রীকে বালিস দিতে

পারেন নাই, একখানি পুস্তক বা টোটোর খলি মাথার দিরা কাটাইয়াছেন ; কয়েক খানি চটার উপর চট বিছাইয়া লম্বা করিতে হইয়াছিল, শীতে গায়ে দিবার কিছু না থাকায় বড় কোটের হাতার পা দিরা কাটাইয়াছিলেন ; পা ঢাকিতে মাথার কুলাইত না—মাথা ঢাকিতে পার কুলাইত না ; বহুকষ্টে একটি ওয়েষ্টকোট পাইয়া তাহা পরিবার জন্ত কোটে খুলিতে কোটের হাতা প্রায় খসিয়া পড়ে। বলা বাতুল্য কর্মচারীদিগকে ব্যবসা করিরা আবশ্যক ব্যয়-নির্বাহ করিতে হইত।

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষীদিগের আদেশ ছিল, কর্মচারীরা বিদেশী বা রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতাবলম্বী মহিলার সহিত বিবাহে বদ্ধ হইতে পারিবেন না। কিন্তু এ আদেশ পালিত হইত কি না সন্দেহ। ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বিতীয় পক্ষে একজন অর্ধাণ মহিলাকে ও এ্যাণ্ড চন্দননগরনিবাসী একজন কন্নড়ী কস্তাকে বিবাহ করেন। এই এ্যাণ্ডপত্নীকে বিপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিরা কিলিপ ফ্রান্সিস জরিমানা দেন। এই মাদাম এ্যাণ্ডই পরিত্যক্ত হইয়া প্রসিদ্ধ কন্নড়ী রাজনৈতিক তালোরান্দেয় প্রণয়িনী ও পরে পত্নী হইলেন।

সেকালে নিরপদস্থ স্বর বেতনভোগী ইংরাজ কর্মচারিগণের ব্যয়বাহুল্য নিবারণোদ্দেশ্যে আদেশ হয় যে, তাঁহারা ছাতাবরদার বা পাকী রাখিতে পারিবেন না। ছাতা গোলাকার বলিরা তখন ছাতার নাম Roundel ও ছাতাবরদারের নাম Roundel Boy ছিল। একজন কর্মচারী চতুর্কোণ ছাতা প্রস্তুত করাইয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন—বলিলেন—তাহা Roundel নহে Square-del, তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। তখন জরী দেওয়া পোশাক ব্যবহার রেওয়াজ ছিল। ব্যয়সঙ্কোচমানসে তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলে একজন জরী দিরা পোশাক শেলাই করাইয়া বলেন—Though lace is prohibited the order is not binding.

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বিলাতীপণ্যবর্জন চেষ্টার ফলে বঙ্গদেশে ‘বয়কট’ কথাটা পরিচিত ও চলিত হইয়াছে। আর্যল্যাণ্ডে ল্যাণ্ড লীগ আন্দোলনের সময় এক জন ইংরাজ ভূস্বামী কর্মচারী ক্যাপ্টেন বয়কটকে প্রজাবর্গ “একঘরে” করিয়াছিল। সেই হইতে কথাটার প্রচলন। এদেশে ইংরাজসমাজে সেকালে এক ব্যয় বয়কট হইয়াছিল। গভর্ণর হইয়া ক্লাইভ শাসনসংস্কারের চেষ্টা

কম্বার তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীরা আরসম্বোচহেতু তাঁহাকে “একঘরে” করিয়াছিলেন। কর্ণেল চ্যাম্পিয়ন ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন তারিখে লিথিয়াছিলেন যে, ক্রাইস্ত কর্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহারা বর্তমান বেলভে-ভিয়ার গৃহে সমবেত হইয়া স্থির করেন যে, সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা হইবে।

—

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, বর্তমান এক সময় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। বর্তমানে ম্যালেরিয়াপ্রদীপ্ত কৃষ্ণনগরও এক সময় স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহের নিকটে সার উইলিয়ম জোন্সের গৃহের চিহ্ন অঙ্কপি বর্তমান। সম্ভবতঃ সংস্কৃতচর্চানিরত সার উইলিয়ম বাকালার সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের সহিত সংস্কৃত আলোচনার সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগরে বাইতেন। কলিকাতার নিকটে বারাসত এক্ষণে ম্যালেরিয়ার উৎস্র প্রায়, প্রধানতঃ ম্যালেরিয়ার লজ্জাই চকিৎস পরগণা জিলার সদর বারাসত হইতে আলিপুরে স্থানান্তরিত হয়। পূর্বে এই বারাসত বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল বলিয়াই অনেক ইংরাজ বারাসতে উদ্ভানগৃহে অবকাশকালে বিজ্ঞান-ভোগ করিতেন। তখন সুখচর, সুখসাগর, গরুটী প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্তী স্থানে যুরোপীয়দিগের উদ্যানবাটিকা ছিল। তখনও দার্জিলিং অনাবিষ্কৃত। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যুরোপীয়দিগকে এই সকল স্থানেই বাইতে হইত। এখন এ সকল স্থান ম্যালেরিয়ার বিশ্বস্তপ্রায়। তখন কলিকাতার ব্যাধির প্রকোপ প্রবল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ড্যালেন্সিয়া বলিয়াছিলেন, ডোবা বুঝাইয়া, লঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ও মস্তপান কমাইয়া কলিকাতার ইংরাজ অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল।

—

তখন ইংরাজ মহিলারা বড়, এ দেশে আসিতেন না। ইংরাজগণ প্রায় ভারতবর্ষীয় রমণী লইয়া থরকরা করিতেন। কেহ কেহ আবার মুসলমানদিগের স্ত্রীর একাধিক পত্নীতে অগ্রহরক্ত হইতেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লং বলিয়াছিলেন, তখনও ‘মকঃ’ বলে কোন কোন ইংরাজ হারেম বা বহুপত্নীপূর্ণ গৃহান্ত রাখিতেন। এই সকল পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ অনেক স্থলেই বৈধ সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রসিদ্ধ কর্ণেল স্কিনার এইরূপ বিবাহের সন্তান। তাঁহার ভগিনীদ্বয়কে কোম্পানীর দুইজন সম্রাট কর্মচারী বিবাহ করেন। কর্ণেল গাড-

নাৰ ক্যাষেৰ নবাবের কজাকে বিবাহ কৰিছিলে। তাঁহাৰই এক বংশধৰ এখন লৰ্ড পাৰ্ডনায়।* ওৱাৰেন হেষ্টিংসেৰ অনৈক বহু তাঁহাৰ টোকচাৰ লিখিছিল যে, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট তাৰিখে তাঁহাৰ পুত্ৰ জৰ্জ আলেক-জাণ্ডাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰে। পৰবৰ্ত্তমান তাঁহাৰ নামকৰণকালে সূপ্ৰিম কোৰ্টেৰ জজ হাইডেৰ পত্নী তাঁহাৰ Godmother হ'লেন। এই বংশৰ তাঁহাৰ কজা ম্যাটিল্ডাৰ জন্ম হয়। তিনি ব'লেন, ইহাৰা উত্তৰেই সাহেবজান নানী স্মৰণী ও স্মৰণী যোগলানীৰ গৰ্ভজাত। একুপ বিবাহ সমাজে বৈধ বলিয়া পৰিগণিত নাই হইলে হাইডপত্নী কখনই জৰ্জৰ Godmother হইতেন নাই। এই সকল প্ৰণয়িনী গইৱা বৈৰথ বৃদ্ধও বড়িত।

সেকালে ইংৰাজ সমাজে বৈৰথবৃদ্ধেৰ বখেটে প্ৰচলন ছিল। হেষ্টিংসেৰ সহিত ফ্ৰান্সিসেৰ বৃদ্ধ ইতিহাসে প্ৰসিদ্ধ ঘটনা। সূপ্ৰিম কাউন্সিলেৰ সদস্য ফ্ৰেডাৰিং সহযোগী বাৰওয়েলকে অসাধু ব'লেন। তিনি তত্বত্বে ফ্ৰেডাৰিংকে মিথ্যাবাদী ব'লেন। ফলে বৈৰথ বৃদ্ধ ষটে। তবে কেহ আহত হয়েন নাই। ক্ৰাইভও বৈৰথ বৃদ্ধ কৰিয়াছিলে। প্ৰধান কৰ্মচাৰীদিগেৰ এইৰূপ দৃষ্টান্তেৰ ফলে নিম্ন কৰ্মচাৰী মহলে কি হইত তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্ৰীঅৰুণেন্দ্ৰপ্ৰসাদ ঘোষ।

অজ্ঞাত।

(Browningএৰ অনুকরণে।)

বেবতা কৰেৰ বাস আকাশেৰ পৰে,
তনেছি সকলে বলে। চাহি' নীলাধৰে
তুমি কিহু বোকা তাঁৰ পাৰে নাই কখন,
কেন যে এমল হয় কে জানে কাৰণ ?
খনিৰ অভলতলে পনিয়া বিলম্ব
বেধিতে পাৰে নাই তাঁৰে স্তন-কিৰণে,
তবু স্নেহো মনে শুধু তাঁহাৰই আলোকে
নিখিল উজলি উঠে আশাৰেৰে জোখে।
কৰুণানিধান তিনি, কল্যাণ আনিয়া
কয়েহেন অন্তৰাল রচনা কৰিয়া,

অন্তৰ বাৰতা যথা বহলকাৰণ
শুকায়ে হাৰিয়া সেৱ আশনাৰ ধন।
শূলক উৰলি তবু উঠে হিৰাতলে
আন্ধিৰ তাঁহাৰ ববে নিতি শত ছলে
স্বপ্ন পৰল কৰে মলয়-বীজনে
শেফালি-পোৱতে আৰ বিহগ-কুঞ্জে।
মহা বেন আধৰ কৰে দুমস্ত অধৰে
সোহাগ কৰেন বীৰে গাঢ় গ্ৰেহভৰে
আবজাৰা কাণে বেন শুধান বতনে
বলু বেধি কে চুমুহে বৃদ্ধ মনে মনে ?

শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্ৰ ঘোষ।

প্লিনির ভারতবর্ষ ।

(ভূগিকা)

অতি প্রাচীন কালে যে সকল প্রসিদ্ধ লেখক ও তথ্যগুরুজ্ঞান ব্যক্তি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন প্লিনি (Caius Plinius Secundus) তাঁহাদের অন্যতম । প্লিনির কথা মনে করিলে বেদব্যাস ও গণেশের কথা আমাদের মনে উপস্থিত হয় । মহাভারতের কথক বেদব্যাস ও লেখক গণপতি এইরূপ প্রবাদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে । কিন্তু প্লিনি একাধারে বেদব্যাস ও গণপতি ছিলেন । প্লিনির জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ; তিনি অসী ও মসী এতদূতরের ব্যবহারেই পটু ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর ইতিহাস অত্যন্ত শোকাবহ ও বিষয়কর । তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক কালে তৎপ্রণীত একখানিমাত্র পুস্তক আমাদের অধিগম্য । তাঁহার অত্যন্ত সমস্ত গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে । তাঁহার যে গ্রন্থখানি আমরা দেখিতে পাই সেখানির নাম *Naturalis Historia* ।

প্লিনি ২৩ খ্রিষ্টাব্দে কনুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন । পম্পোনিয়াস নামে তাঁহার পিতার একজন বন্ধু একাধারে কবি ও সৈনিক ছিলেন । তিনিই প্লিনির প্রাথমিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকটেই প্লিনির মনে জ্ঞানলাভস্পৃহার বীজ সর্বপ্রথমে অঙ্কুরিত হয় । তিনি ভাষা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, উদ্ভিদবিজ্ঞা, দর্শন ও অলঙ্কার পাঠ সমাপন করিয়া প্রথমতঃ ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় আরম্ভ করেন । এই সময়ে রোমকদিগের সহিত দক্ষিণ জর্জানদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয় । প্লিনি সৈনিকরূপে এই যুদ্ধে যোগদান করেন ও জর্জানদিগের সহিত যুদ্ধাবসানে রোমকদিগের এই যুদ্ধের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন । এই ইতিহাস ২০ ভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছিল । প্লিনি অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধেও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন । রাজকার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে কিছুদিন স্পেনে বাস করিতে হয় ও সেই সময়ে তিনি কৃষিবিজ্ঞা ও বনিজবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেন । স্পেনে অবস্থানকালে স্পেন হইতে তিনি একবার আফ্রিকা মহাদেশে স্রমণ করিতে গিয়াছিলেন । স্পেন হইতে ইতালিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি সম্রাট্ ভেসপেসিয়ানের (Vespasian) অধীনে কাৰ্য্য গ্রহণ করেন । তিনি সম্রাট্ অতি প্রত্যাশে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন ও

সম্রাটের নির্দিষ্ট কার্যাবলি শেষ করিয়া দিবসের অবশিষ্ট কাল অধ্যয়নে ব্যাপ্ত থাকিতেন।

এই সময়ে তিনি সমসাময়িক কালের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই ইতিহাস ২১ ভাগে সম্পূর্ণ হইয়াছিল ও ইহাতে নিবো (Nero) হইতে আরম্ভ করিয়া ভেসপেসিয়ানের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার সমাবেশ ছিল। এই সময়েই প্লিনি তাহার Naturalis Historia নামক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। সম্রাট নিরোর সময় এই গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ হইয়াছিল ও ৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্লিনি ভেসপেসিয়ানের পুত্র সম্রাট টাইটাসের নামে এই পুস্তক উৎসর্গ করেন। এই পুস্তক উৎসর্গের অল্পদিন পরেই প্লিনি মিসেমুমে (Misenum) অবস্থিত অর্গবোপোতে অধাশ্রিত্য গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন। তাহার এইস্থানে অবস্থানের সময় ৭৯ খ্রীষ্টাব্দের বিজুবিয়াসের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। অগ্ন্যুৎপাত দেখিতে ও অগ্ন্যুৎপাতে ভীত নরনারীর জীবন রক্ষা করিতে বাইরা প্লিনির জীবনান্ত হয়। এই দুর্ঘটনার সময় তাহার ভাগিনের তাহার সহিত বাস করিতেন। মাতুল ভাগিনেরকে অপতানির্কিষেবে পালন করিতেন ও তাঁহাকে আপনা উত্তরাধিকারী করিয়া বায়েন।* এই ভাগিনের (Gaius Plinius Cocilius Secundus) পরিচেষে মাতুলের জায় বশী হইয়াছিলেন।

ভাগিনেয়ের প্রকাশিত পত্রাবলি হইতে আমরা মাতুলের জীবনকথা ও মৃত্যুর বিষয় অতি বিশদরূপে জানিতে পারি। বিনা অধ্যয়নে সময় অতিবাহিত হইলে প্লিনি তাহা অপব্যয় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন যে, প্রায় সমস্ত পুস্তক হইতেই আমরা অল্প বিস্তর জ্ঞান লাভ করিতে পারি। তিনি যখনই যে কোনও পুস্তক পাঠ করিতেন তখনই সেই পুস্তক হইতে জ্ঞাতব্য নূতন তথ্যাদি খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।

প্লিনির Naturalis Historia পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

Philemon Holland ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থের পুস্তকের একখানি অহুবাদ প্রকাশ করেন। এই অহুবাদ লওনে মুদ্রিত হয় ও অহুবাদক Right Honourable Sir Robert Cecil Knightএর নামে এই অহুবাদ উৎসর্গ করেন। এই অহুবাদখানি অতি বৃহদায়তন ও দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগের একত্র পত্রসংখ্যা ৬২০ ও প্রত্যেক পত্রের আকার ডবল অক্টোভো

* Letters of the younger Pliny.

অপেক্ষাও কিছু বড় । এই সুবৃহৎ গ্রন্থ ৩৭ খণ্ডে ও প্রথম খণ্ড ব্যতীত আর সকল খণ্ড বহু অধ্যায়ে বিভক্ত । মোট অধ্যায়ের সংখ্যা ১০৭৪ । এই ৩৭ খণ্ডের প্রথম খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া হইয়াছে । দ্বিতীয় খণ্ডে (১০২ অধ্যায়) পৃথিবী, আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ুমণ্ডল, দিবা, রাত্রি, রূটি, বাতাস, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, প্রতিধ্বনি, বটিকা, শিলা-বৃষ্টি, রামধনু, হিমপাত, তুষারপাত, সমুদ্র, নদী, ভূকম্প, হীপাত্বাদয় প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে । তৃতীয় খণ্ডে (২৬ অধ্যায়) যুরোপ, স্পেন, ইটালি, কসিকা, সার্ডিনিয়ান, সিসিলি, লেপারি, আলস পর্ব্বতমালা প্রভৃতির ও চতুর্থ খণ্ডে (২৩ অধ্যায়) যুরোপের কতিপয় স্থানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে । পঞ্চম খণ্ডে (৩২ অধ্যায়) আফ্রিকা ও এশিয়ার কথা সাধারণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ও ষষ্ঠ খণ্ডে (৩৪ অধ্যায়) ১২৫টি নগর, ৫৬৬টি বিভিন্ন জাতি, ১৮০টি বিখ্যাত নদী ও নদ, ৩৮টি পর্ব্বত, ১০৮টি বীণ ও ১২৫টি লুপ্ত নগর ও জাতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । সপ্তম খণ্ডে (৬০ অধ্যায়) বিভিন্ন দেশীয় নানা প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মানবের জন্ম ও বর্ণনা, মাহুষের নৈতিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়, মাহুষের যুক্তা, প্রেতাত্মা, সম্মন্যনিরূপক যন্ত্রের আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে । অষ্টম খণ্ডে (৫২ অধ্যায়) হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, উষ্ট্র, গজাঘ, সর্প, কুম্ভীর, কচ্ছপ, সম্মার, তেজ, মৃগ, সুবিক, কুকুর, পর্দিত, বানর, খরগোল প্রভৃতির এবং নবম খণ্ডে (৬২ অধ্যায়) নানা প্রকার মৎস্য ও জলজন্তুর বর্ণনা আছে । দশম খণ্ডে (৭৫ অধ্যায়) নানা প্রকার পক্ষীর, একাদশ খণ্ডে (৫৪ অধ্যায়) নানা প্রকার পতঙ্গের, ও দ্বাদশ খণ্ডে (২৮ অধ্যায়) নানা প্রকার বৃক্ষের বর্ণনা আছে । ত্রয়োদশ খণ্ডে (২৫ অধ্যায়) প্রলেপ সমুদ্রতীরস্থিত নানা প্রকার বৃক্ষের, চতুর্দশ খণ্ডে (২২ অধ্যায়) প্রাক্কাল ও মত্তপ্রস্বত করণ প্রণালীর, পঞ্চদশ খণ্ডে (৩০ অধ্যায়) নানা প্রকার ফলের বর্ণনা ও ষোড়শ খণ্ডে (৪৪ অধ্যায়) নানা প্রকার বস্ত্রবৃক্ষের বিষয় কথিত হইয়াছে । সপ্তদশ খণ্ডে (২৮ অধ্যায়) বৃক্ষের ব্যাধি ও পরিচর্যা সম্বন্ধে, অষ্টাদশ খণ্ডে (৩৫ অধ্যায়) কৃষিকার্য্য ও শস্তাদি সম্বন্ধে এবং ঊনবিংশ খণ্ডে (২২ অধ্যায়) তুলা, গম্মিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে । উদ্যানজাত বৃক্ষাদির ভৈবজ্যাণ্ডণ বিংশ খণ্ডে (২৪ অধ্যায়) ও একবিংশ খণ্ডে (৩৪ অধ্যায়) নানা প্রকার পুষ্প, লবঙ্গ, মধু প্রভৃতির বিষয়ের বর্ণনা আছে । দ্বাবিংশ খণ্ডে (২৫ অধ্যায়) ভৈবজ্যাণ্ডণবিশিষ্ট ও খাদ্যোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের, ত্রয়োবিংশ খণ্ডে (৩২ অধ্যায়) কৃষিজাত বৃক্ষাদির ভৈবজ্যাণ্ডণ ও চতুর্বিংশ খণ্ডে

(১২ অধ্যায়) বনজাত বৃক্ষাদির ভৈষজ্যগুণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পঞ্চবিংশ খণ্ডে (১৩ অধ্যায়) ষষ্ঠবিংশ খণ্ডে (১৪ অধ্যায়) ও সপ্তবিংশ খণ্ডে (১৫ অধ্যায়) উদ্ভিদাদির সম্বন্ধে নানা বিষয়ের উল্লেখ আছে। অষ্টবিংশ খণ্ডে (২০ অধ্যায়) ঊনত্রিংশ খণ্ডে (৬ অধ্যায়) ও ত্রিংশখণ্ডে (১৬ অধ্যায়) ভৈষজ্যগুণবিশিষ্ট নানা প্রকার লঙ্ঘন উল্লেখ আছে। একত্রিংশ খণ্ডে (১১ অধ্যায়) ও দ্বাত্রিংশ খণ্ডে (১১ অধ্যায়) ভৈষজ্যগুণবিশিষ্ট নানা প্রকার মন্ত্রের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রয়ত্রিংশ খণ্ডে (১৩ অধ্যায়) স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং চতুত্রিংশ খণ্ডে (১৮ অধ্যায়) পিত্তল, তাম্র, নৌহ, সীস, রত্ন, হরিতাল সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত সকলিত আছে। পঞ্চত্রিংশ খণ্ডে (১৯ অধ্যায়) চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে, ষষ্ঠ ত্রিংশ খণ্ডে (২৭ অধ্যায়) নানা প্রকার প্রস্তর সম্বন্ধে ও সপ্তত্রিংশ খণ্ডে (১০ অধ্যায়) হীরক, পদ্মরাগ, স্নেহকত প্রভৃতি মণির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবরণ সকলিত হইয়াছে। আর দুই সহস্র বৎসর পূর্বে শ্রীমদভারতবর্ষ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্মৃত্যন্তর তদানীন্তন অনেক মত যে আজকাল ত্রাস্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন ও পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্যবিত্ত হইবার কোনও কারণ নাই। এই বিরাট গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্যও সকলিত আছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যুরোপীয়গণ কি প্রকার সংবাদ রাখিতেন আমরা এই সূত্রহং পুস্তকে তাহার আভাস পাই এবং সাধারণ পাঠকের সমক্ষে সেই সমস্ত বিষয়ের অবতারণার কৃমিকা স্বরূপ বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

পাষাণের কথা ।

(১০)

দলগুপ্ত যখন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর সিংহাসন স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন ধীরে ধীরে আমাদিগের ধ্বংসাবশেষের উপর নবীন তৃণরাশি অধিকার-বিস্তার করিতেছিল। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে নব তুর্কাদল আমাদিগের ধ্বংসাবশেষের উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, স্থানে স্থানে অথথ বট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিতেছে, দেখিতে পাইলাম; কারণ, অসুস্থত্ব শূণ্য ধ্বংস হইলেও আমি তখনও উচ্চশ্রদ্ধা ছিলাম। বর্ষা অতীত হইলে দেখিলাম, শূণ্য ও বেটনী নব-তুর্কাদলে আচ্ছাদিত হইয়াছে; বিশাল শূণ্যের অস্তিত্বের সামান্য চিহ্নমাত্র বর্তমান, স্থানে স্থানে কেবল মাংসবিহীন কঙ্কালের ভায়ে বেটনীর স্তম্ভগুলি দণ্ডায়মান। যত দূর দৃষ্ট হয়, তত দূর ভ্রামণ তৃণক্ষেত্র বাতীত আর কিছুই নয়নগোচর হইতেছিল না; বোধ হইল, আটবিক প্রদেশ পুনরায় জনশূন্য হইয়াছে। দূরে উচ্চ মৃৎপিণ্ড লক্ষিত হইতেছিল; অহুমানো বৃক্ষিলাম, তাহাই অগরাজুর নগর। নগরের সম্মুখে মৃৎপিণ্ডের উপর ছোট ক্ষুদ্রতর মৃৎপিণ্ড প্রাচীন নগর-তোরণের অবস্থানের পরিচয় দিতেছিল। হেমন্তের মধ্যভাগে একদিন প্রভাতে আমাদিগের উত্তরে মহাব্যাপদব্দ শ্রুত হইল, যেন কে ধীরে ধীরে শূণ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। শূণ্যের দিকেই বলিলাম; তুমি হয়ত বলিবে, শূণ্যের অস্তিত্বলোপ হইয়াছে, কিন্তু সে কথা স্বীকার করিতে আমি অত্যন্ত বেদনা অশ্রুভব করি; আমি বলি, শূণ্য এখনও বর্তমান আছে—অন্যোক্তের ভায়ে বা কণিকের ভায়ে সতর্কাত্মরাগী কোন সত্রাট আসিয়া ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে প্রাচীন শূণ্যের সংস্কার করিবেন। সহস্র বৎসর আমি সেই ভরসার দণ্ডায়মান ছিলাম। আমি দেখিতাম, ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে নূতন শূণ্য উথিত হইয়াছে, পুরাতন সংস্কৃত হইয়াছে, জীর্ণ পাষাণের পরিবর্তে নূতন পাষাণ আনীত হইয়াছে, পত্রপুষ্পমালাচন্দনে শূণ্য আবার অশোভিত হইয়াছে। স্বর্ধ্যাস্ত হইতে স্বর্ধ্যোদয় পর্য্যন্ত দেখিতাম, সারংকালীন ঘান ও প্রসাধন সম্পন্ন করিয়া প্রজ্জ্বলিত মধুজবর্তিকাহন্তে নাগরিক ও নাগরিকা-গণ তোরণপথে বেটনীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, দলে দলে ভিক্ষুগণ শূণ্য প্রদক্ষিণ করিয়া তথাগতের পূজা করিতেছেন, সশব্দে গর্ভগৃহের পাষাণময় দ্বার উদঘাটিত হইতেছে, দিলানির্ধৃত আধারে রক্ষিত তথাগতের শরীরী দণ্ডালোকে

অঙ্কিত হইতেছে, গন্ধ ও পুষ্প গর্ভগৃহের পথ আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। উষাকালে পক্ষিগণের লগ্নে সে সমস্ত চিত্তা দূর হইয়া বাইত, অন্ধকণ পরেই নিষ্ঠুর আলোক আসিয়া আমাদিগের বর্তমান অবস্থার কথা শ্রবণ করাইয়া দিত; দেখিলাম, তূপের পরিবর্তে শিশিরসিক্ত তৃণদল বহুর মৃৎপিণ্ডকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। কেবল বৃদ্ধক্ষেত্রে নাংসবিহীন নরনেহপঙ্কজের ফায় করেকখণ্ড পাষাণ মস্তক উন্মিত করিয়া আছে।

মনে হইল, দূরে কে বেন বহুকাঠে পাদচারণা করিতেছে, তাহার চরণস্বর আর বেন তাহাকে বহন করিতে অক্ষম;—দেহভারক্লিষ্ট হইয়া সে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিতেছে, ও পরক্ষণেই আবার বেন কোন আশার অশুপ্রাপিত হইয়া পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে নিকটে আসিলে দেখিলাম, জীর্ণবালশরিরিত দশনহীন, শুক্লকেশ, লোলচর্মা জনৈক মহুবা স্ত্রীপাতিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তূপের মৃৎপিণ্ডের সন্নিধানে আসিয়া সে সর্বাগ্রথমেই আমাকে দেখিতে পাইল, কারণ, আমার মস্তক সর্বাগ্রেক্ষা উচ্চ ছিল। আমার নিকটে আসিয়া বৃদ্ধ বেম বস্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইল, সে পাষাণে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বহুকণ বিশ্রাম করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তূপ ও বেটনীর পরিক্রমণের পথ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিল ও আমার নিকট প্রভাগমন করিয়া উপবেশন করিল। সমস্ত দিন বৃদ্ধ ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করিল। কোন স্থানে হানচ্যুত শুস্ত অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থার দৃষ্ট হইতেছে, কোন স্থানে ভগ্ন হুটীর আশ্রয়ে মণ্ডুককুল আশ্রয়লাভ করিয়াছে, ভগ্নশীর্ণভোরণশৃঙ্গের শীর্ণদেশে বিহঙ্গম নীড় রচনা করিয়াছে, যে তন্তুগুলি দণ্ডারমান আছে তাহাদিগের বিকল অঙ্গ অঙ্গির প্রচণ্ড উত্তাপ ও দাহিকালক্তির পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে, হুটীতে ও তন্তুে ক্ষোদিত চিত্রগুলি হুণের অস্ত্র ও অঙ্গির আক্রমণে বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে; আলোধ্যতুলিতে ভগ্নশির বা ছিন্ননাঙ্গ মহুবাশৃঙ্গিনিচয় তূপের ও বেটনীর বর্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। অর্দ্ধভগ্ন কোন তন্তুধরের শীর্ণদেশে বৃক্ষশাখা স্থাপিত করিয়া, ইতস্ততঃ বিক্লিষ্ট পাষাণখণ্ডের সাহায্যে ও বন হইতে কৃশ সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার প্রাকালে বৃদ্ধ এক অপূর্ণ হুটীর রচনা করিল এবং সূর্যালোক বিলুপ্ত হইবার পূর্বে তদ্ব্যবস্থা শুক মর্ডের শব্দায়চনা করিয়া বিশ্রামলাভ করিল। তদবধি বৃদ্ধ আমাদিগের নিত্যসংস্রব হইল। সে প্রত্যন্তে উঠিয়া প্রাচীন নগরের প্রাক্তস্থিত কুপ্ত নদীতে স্নান করিয়া আসিত ও বস্ত্রপূর্ণ সংগ্রহ করিয়া মৃৎপিণ্ডের অর্জনা করিত, তাহার পর দিবা বিশ্রমের অবধি আমার ছায়ায় বসিয়া আপন মনে কি বলিত, প্রতিনিবিশ্রাম-কীর্তি তট্টারিকানিশ্পাদিকা”

এই কথা বলিয়া মৃৎপিণ্ডকে নমস্কার করিত, এতদ্ব্যতীত তাহার আর কোন কথাই বৃথিতাম না । অপরাহ্নে বৃদ্ধ আচার্য্যসংগ্রহের চেষ্টায় বনমধ্যে প্রবেশ করিত, বনজাত কলৌই তাহার আহার নিম্পন্ন হইত, কিন্তু কখনও কখনও সে পত্রনির্মিত আধারে হৃদ্যবৎ খেতবর্ণ পদার্থ সংগ্রহ করিয়া আনিত । বোধ হয়, হৃদ্যসংগ্রহের অল্প সে বনপথ অতিক্রম করিয়া দূরবর্তী গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিত । এইরূপে শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা অতীত হইয়া গেল, ক্রমে ক্ষুদ্র বট ও পিপ্পল বৃক্ষগুলি নাতিবৃহৎ ছায়াপ্রদ তরু হইয়া উঠিল । বৃদ্ধ আশ্রমিণের সহিত শান্তিতে কালাতিপাত করিতে লাগিল ।

তোয়গাণের পুত্র মিহিরকুলের অধীনে হুণগণ দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইতেছিল । গঙ্গাপ্রবাহের স্তায় অবিরাম গতিতে হুণগণ আর্য্যাবর্তে প্রবেশ করিতেছিল, তোয়গাণের মৃত্যুর পর হইতে হুণ জউলগুলি উপযুক্ত নেতার অভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল । মিহিরকুলের চেষ্টায় তাহার অধিকাংশ পুনরায় একত্রিত হইল । হুণবাহিনী মগধাভিমুখে অগ্রসর হইল । দ্বিতীয় বাহিনী মিহিরকুলের কনিষ্ঠ ষড়্ভিলের অধীনে জনহীন মরু অতিক্রম করিয়া সৌরাষ্ট্রাভিমুখে খাণ্ডিত হইল ; বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের স্তায় নগরশীর্ষের গরুড়ধ্বজ ধরাশায়ী হইল । কালিন্দী অতিক্রম করিয়া মিহিরকুল ব্রহ্মাবর্তে শিবির স্থাপিত করিলেন । বৃদ্ধ সম্রাট্ ক্রতবেগে অগ্রসর হইয়াও বারাণসী অতিক্রম করিতে পারেন নাই । ব্রহ্মাবর্তে তদুদত্ত ও প্রতীষ্ঠানে নাগদত্ত সোমাস্তরক্ষার ব্যাপৃত ছিলেন । সিংহবিক্রম স্বাগুদত্তের পুত্র ভাগীরথীর তীর্থরক্ষা করিতেছিলেন, অলখিতুল্য হুণ সৈন্তের পরগারে পদার্পণ করিবার সাহস হইতেছিল না । আর প্রতীষ্ঠানে নাগদত্ত নৌবাটক লইয়া বেণীতর রক্ষা করিতেছিলেন । সম্রাট্ চরণাঙ্গিহুর্গে সৌরাষ্ট্রের পতনসংবাদ শ্রোণ্ত হইলেন ; আরও শুনিলেন, আনন্দের সহিত মালবও সাম্রাজ্যের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । গুনিয়া বৃদ্ধের শির নত হইল । চরণাঙ্গিনিধির দণ্ডায়মান হইয়া জাহ্নবীকে সাক্ষী করিয়া তরবারি স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ শপথ করিলেন, মালব ও আনন্ড, মন্ত্র ও মরু পুনরধিকার না করিয়া পাটালিপুত্রে প্রত্যাগমন করিবেন না । শপথ শ্রবণে বিজ্ঞ সেনানীগণেরও হৃদয় কম্পিত হইল । কলকুণ্ড আর একবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন । চরণাঙ্গিহুর্গে ধূলভাত সোবিলকুণ্ডের মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ সম্রাট্ শপথ করিয়াছিলেন যে, তাহার বংশে কেহ কখনও মগধের সিংহাসন রক্তার অল্প বিবাদ করিবে না । শাস্ত্রপুত্রের স্তায় ভীষণ প্রতিজ্ঞা রক্ষার অল্প সম্রাট্ দারপরিগ্রহ করেন নাই ।

উদুপুয়দুর্গে অবরুদ্ধ হুতসিংহাসন পুরগুপ্ত মগধসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। চরণাতি হইতে সোরাট্র বহুদিনের পথ, মগধে বাহারা স্রীপুত্র রাখিয়া আসিয়াছিল তাহার প্রত্যাবর্তনের আশা পরিত্যাগ করিল। সম্রাট চরণাতি হইতে প্রতিষ্ঠানভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

মিহিরকুলের আশ্রানে প্রতিদিন শত শত হুণ আর্ঘ্যাবর্তে প্রবেশ করিতেছিল। তাহাদিগের আক্রমণে গান্ধারে শতশত বর্ষব্যাপী কুশানাধিকার লুপ্ত হইল, কণিকের সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নও আর্ঘ্যাবর্ত হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। গঙ্গাভীরে প্রতিদিন হুণগণের বল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সৈন্তসংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া মিহিরকুল পুনরায় নদী পার হইবার আদেশ দিলেন; - বহু চেষ্টা সবেও তদুদত্ত সে ভীষণ আক্রমণ রোধ করিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইয়া ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাবর্তের বিতীর্ণ যুদ্ধে তদুদত্তের পরাভববার্তা জ্ঞাত হইলেন। প্রতিষ্ঠানের ভীষণ দুর্গ ভূমি বোধ হয় দেখিয়াছ, সেক্ষণ অদৃঢ় দুর্গ তৎকালে মধ্যমধ্যে আর ছিল না বলিলেও অত্যাক্তি হয় না; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে দুর্গটি অবস্থিত ছিল ও উহা অধিকার না করিয়া পূর্বে বারাগনী বা পশ্চিমে অন্তর্কেন্দ্রী অধিকার করা অসম্ভব ছিল। গুপ্তসাম্রাজ্য অতীত হইবার শত শত বর্ষ পরেও প্রতিষ্ঠান আর্ঘ্যাবর্তে রাজশক্তির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল; বহুশতাব্দী পরে প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট সৈনিকগণ আমার ছায়ায় বসিয়া প্রতিষ্ঠানের ভীষণ দুর্গের বর্ণনা করিত। ধীরে ধীরে স্বাহুদত্তের পুত্র মিহিরকুলকে সমুখে রাখিয়া বেণীতীরে উপস্থিত হইলেন। তখন তদুদত্ত ও নাগদত্ত দুর্গরক্ষার চেষ্টার ব্যাপৃত হইলেন; দেখিতে দেখিতে পবিত্র প্রতিষ্ঠানপুর অস্পৃক্ত হুণগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল। বৃক্ষ সম্রাট দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া সাম্রাজ্যের কার্যনির্বাহ করিতেছিলেন, সোরাট্রৈ পূর্ণদত্ত তখনও গুপ্তাধিকার পুনঃপ্রবর্তন করিবার চেষ্টার ব্যাপৃত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানদুর্গ অবরোধকালেও মিহিরকুলের বলবৃদ্ধি হইতেছিল; স্মৃতরাং শীর বলবৃদ্ধির ক্ষমতা গুপ্তকেও বিশেষ চেষ্টিত হইতে হইয়াছিল। অবসর পাইলেই সম্রাট দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া মিকটবর্তী নগরগুলি হইতে সৈন্তদল পুট করিবার চেষ্টা করিতেন; এইরূপে প্রতিষ্ঠান অবরোধে হুণরাজের বর্ষত্রয় অভিযান্ত্রিত হইল। উত্তর পক্ষেই সৈন্তসংগ্রহ হওয়ার কোন পক্ষেই আশা করা যাইত না। তৎপন্থায় মিহিরকুল বিলম্বে বিচলিত হইলেন ও সে সংবাদ কন্দগুপ্তের কর্ণগোচর হইল। প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্যের তখন অস্তিত্ব দশা, কন্দগুপ্তের বহু

চেটা সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ হইল না, অথচ সৈন্ত অবরুদ্ধ দুর্গের পরিখাপার্শ্বে রাখিয়া মিহিরকুল অবশিষ্ট সৈন্ত লইয়া লুণ্ঠনে বাণীত হইতেন ও বর্ষাসমাপ্তিতে পুনরায় পরিখাপার্শ্বে উপস্থিত হইতেন। এইরূপে বারানসী হইতে কান্তকূজ পর্য্যন্ত গঙ্গার উত্তর তীরস্থিত ভূখণ্ড জনমানবশূন্য হইল। ক্রমে প্রতিষ্ঠানদুর্গে আহাৰ্য্যের অভাব অশূন্য হইল। সম্রাট বুঝিলেন, আর অধিকদিন দুর্গরক্ষা সম্ভব হইবে না।

সেই সময় হইতে সম্রাট প্রতিদিন বখাসাধ্য নাগরিকগণকে নগর হইতে দূরে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি হুহু, সবলকার, অগ্রধারনক্ষম ব্যক্তিগণকে নগর হইতে দুর্গমধ্যে আনয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ নগর জনশূন্য হইল ও ঐয়ের প্রারম্ভে দুর্গবাসিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শত্রুসৈন্তের অধিকারে আসিল। নোক বলিষ্ঠ, অধিষ্ঠান অবরোধের শেষবর্ষের স্তায় ঐশ্বাধিক্য বহুকালব্যবং আর্য্যাবর্তে অশূন্য হইয়া নাই। বহু কষ্টে, বহু অর্থব্যয়ে বুদ্ধিমান পাষণ্ডগণের মধ্যে রচিত প্রতিষ্ঠানদুর্গের কুপঙলিতে অধিক জল থাকিত না ও ঐশ্বকাল অভীত হইবার পূর্বেই শেগুণি প্রায় শুষ্ক হইয়া যাইত। দ্বিতীয় চক্রান্ত বহুঅর্থব্যয়ে গঙ্গাজল আনয়ন করিবার অভ্যাসে পরঃপ্রণালী ঘনন করাইয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠানদুর্গের প্রারম্ভে তাহা হুণগণ কর্তৃক রুদ্ধ হইয়াছিল। পূর্বে ঐশ্বকালে দুর্গমধ্যে নদীর জলই ব্যবহৃত হইত, কিন্তু অবরোধের প্রারম্ভে পরঃপ্রণালী বন্ধ হওয়ার উদ্ভবাহনে বহুনা-সঙ্গম হইতে জল আসিত ও বখাসম্ভব কূপোদক ব্যবহৃত হইত। নগর হুণসৈন্ত কর্তৃক অধিকৃত হইলে জল আনয়নের পথ রুদ্ধ হইল। তখন কূপোদকই অবরুদ্ধ সৈনিকমণ্ডলীর একমাত্র ভরসা হইল। নগর পরিত্যাগকালে সম্রাট অহুমান করিয়াছিলেন যে, দুর্গ নগর অপেক্ষাও সামান্য লোকবলে রক্ষিত হইতে পারে; হুতরাং, নগর পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করিলে আহাৰ্য্যপ্রব্য অল্পলোকে অধিক দিন ব্যবহার করিতে পারিবে। তিনি জানিতেন যে, নগর পরিত্যাগ করিলে দুর্গমধ্যে জলের অভাব হইবে; কিন্তু তিনি অহুমান করিয়াছিলেন যে, অল্পসংখ্যক সৈন্ত কূপোদকপানে জীবন রক্ষা করিয়া বর্ষাগম পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিবে এবং গুহার ভরসা ছিল যে, ততদিন কেমনও না কোন প্রদোষ হইতে সাহায্য আসিবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পতনসময় সে বৎসর যে ঐশ্বাধিক্যহেতু বৈশাখের প্রারম্ভে দুর্গমধ্যে জলাভাব হইবে তাহা তিনি কখনও অহুমান করেন নাই।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন প্রভাতে সন্ধ্যাট্ট সংবাদ পাইলেন যে, কৃষ্ণগুপ্তিতে হুই দিনের অধিক সময়ের উপযোগী পানীর জল নাই। তখন তিনি দুর্গ-প্রাকারে আয়োজন করিয়া যমুনা-সকলের শুক বাসুকরাশির উপর শত্রু-শিবির পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দিন দ্বিপ্রহরে যমুনাগৃহে সন্নাজোর প্রধান অমাতা ও সেনাপতিগণ স্থির করিলেন যে, তৃতীয়াদিবসের পর দুর্গরক্ষা সম্ভবপর নহে। অর্দ্ধাহারে বা অনশনে সৈনিকগণ বৃদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু অলাভ্য হইলে অবরুদ্ধ সেনাদলকে শান্ত করা কঠিন। যমুনার স্থির হইল, রাজিকালে সন্ধ্যাট্ট স্বয়ং কালিন্দী হইতে জল-সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন; কিন্তু যে দিন জল সংগৃহীত না হইবে তাহার পরদিন দুর্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দুর্গপরিত্যাগের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ সন্ধ্যাট্ট ঈষৎ হাত করিলেন। বাহারা প্রথম দুর্গবৃদ্ধে বন্দগুপ্তকে দেখিয়াছিল তাহারা সে হস্তের অর্থবোধ করিয়া নিহরিল। রাজিকালে চন্দ্রালোকে যমুনাসৈক্য উভয় পক্ষীয় সৈন্তের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। অলাভ্য উট্টগম্ভ কালিন্দীতীর হইতে দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমনকালে দুর্গগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইল, বহু চেষ্টাসত্ত্বেও সন্ধ্যাট্টের সৈনিকগণ উট্টগুপ্তির উদ্ধার করিতে পারিল না। সন্ধ্যাট্ট স্বয়ং বৃদ্ধ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। দুর্গগণ তখন দুর্গ ও কালিন্দীতীরে মধ্যভাগে প্রবেশবদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ করিতেছে। সন্ধ্যাট্ট কিছুতেই শত্রুদল ভেদ করিতে পারিলেন না। বহুপ্রমে ও অনাহারে ক্রিষ্ট সৈনিকগণ বৃথাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। অবশেষে ততাল হইয়া বৃদ্ধ সন্ধ্যাট্ট দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে স্বয়ং মিহিরকূল দুর্গ প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাম গুপ্ত কর্তৃক নির্মিত লৌহদ্বার অনায়াসে তাঁহার পতিবোধ করিল। সন্ধ্যাট্টের সেনাদল নির্ঝিয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। বৈশাখী কৃষ্ণ প্রতিপদের প্রত্যাবে বৃদ্ধ সন্ধ্যাট্ট দুর্গপ্রাঙ্গণে অবশিষ্ট সেনা সমবেত করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন যে, অলাভ্যে দুর্গরক্ষা অসম্ভব, কিন্তু তিনিও প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিয়া পশ্চাদ্-পদ হইতে অসম্মত, প্রতিষ্ঠান হস্তচ্যুত হইলে রেবা হইতে জাহ্নবী পর্যন্ত ও জাহ্নবী হইতে হিমবান পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড দুর্গগণের করতলগত হইবে, পূণ্যক্ষেত্র বারানসী লুপ্তিত হইবে ও পাটলিপুত্র ব্যতীত সংরক্ষণের দ্বিতীয় স্থান থাকিবে না। বৃদ্ধ কহিলেন, পঞ্চবিংশত্বর্ষ পূর্বে আটবিক প্রদেশে বনদুর্গ অব-রোধকারী দুর্গমণ্ডল ভেদ করিয়া পঞ্চমত সৈনিক প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত আসিতে পারিয়াছিল; হুইয়াং, পঞ্চসহস্রের পক্ষে শত্রুবাহ ভেদ করিয়া চরণাঙ্গিহুর্গে

আশ্রয় গ্রহণ করা আশ্চর্য্য বাপাতি নহে । কিন্তু যদি প্রত্যাগমন করিতে হয় তাহা হইলে কালিন্দীর মলিন জল পান করিয়া বাইতে হইবে, নতুবা আর্য্যাবর্তের বিশাল বক্ষে তাহাদিগের আর স্থান হইবে না । সেনাপতি ও সৈন্তগণ নীরবে এ কথা শ্রবণ করিলেন । অবশিষ্ট কৃপোদক স্থানে ও পানে ব্যরিত হইল । সন্ধ্যার প্রাকালে দুর্গের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হইল, বিস্তরভিত্তিনেত্রে হৃগগণ দেখিল, উৎসবসজ্জার সজ্জিত হইয়া মুষ্টিমের সৈন্ত কালিন্দী-সৈকতে আশ্রয়বিসর্জন করিতে চলিতেছে । ধীরে ধীরে গুমান ও মিহিরকূলের অধীনে লক্ষ লক্ষ হৃগসৈন্ত পক্ষ সহস্রের সহিত বৃদ্ধ করিবার ক্ষমতা অগ্রসর হইল । হস্তিপৃষ্ঠ হইতে তোরমান দেখিলেন, শুভ্রকেশ শুভ্রবসনপরিহিত বৃদ্ধ সম্রাট, স্বহস্তে হৈম পরডুধ্বজ ধারণ করিয়া স্বেতাখারোহণে তির্ধাকবাহের পুরো-সেপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন । হৃগসৈন্তের অধিকাংশ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গে মনোযোগ দিয়াছে, কেহ কেহ শত্রুসৈন্তের সহিত বৃদ্ধ করিতেছে । কন্দলপুত্র রণকৌশলের কথা তিনি বহুদিন হইতে শ্রবণ করিয়া আসিতেছিলেন । শত শত হৃগ প্রজ্ঞাবর্তের প্রথম বৃদ্ধের বিবরণ দেশে দেশে প্রচারিত করিয়াছিল । তরুণ হৃগরাজ ভাবিলেন, ভয়ে বৃদ্ধের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে । সমুখে বনুনা, উত্তর পার্শ্বে অপরিসীম শত্রুসৈন্ত, পশ্চাতে শত্রুহস্তগত ভীষণ দুর্গ, এইরূপ বৃদ্ধকে হইতে পৃথিবীতে করজান সৈনিক প্রত্যাগমনের আশা করিয়া থাকে ? ধীরে ধীরে হৃগসৈন্ত মুষ্টিমের বিপক্ষদলকে পেছন করিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু দেখিল, সংখ্যার হীন হইলেও সে তির্ধাকবাহ ঘেন বহুনির্মিত । বাহের পূর্বকোণে কন্দলপুত্র স্বয়ং সৈন্ত পরিচালনা করিতেছেন ; ক্রমে ক্রমে বাহের পূর্বকোণে কালিন্দীর দিকে অগ্রসর হইতেছে । মিহিরকূল ভাবিলেন, শত্রু বেছার কালিন্দীর জলে আশ্রয়বিসর্জন করিতে বাইতেছে । তখন তিনি হৃগসৈন্তের গতিপরিবর্তন করিলেন । নদীতীর পরিভাগ করিয়া হৃগগণ শত্রু-বাহের উত্তরপার্শ্বে ও দুর্গের সমুখে আক্রমণ করিল, বাহ ক্রতবেগে নদীর জল স্পর্শ করিতে ধাবিত হইল । সর্বাগ্রে রক্তাক্ত অথৈ রক্তর্দ্রপরিচ্ছন্ন বৃদ্ধ কন্দলপুত্র । বনুনাপর্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অন্নসংখ্যক সৈন্ত হৃগগণকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু দ্বিসহস্রের অধিক সৈন্ত অবলীলাক্রমে সম্মুখে নদীপার হইয়া গেল । মিহিরকূল ভাবেন নাই যে, অবশিষ্ট শত্রুসৈন্ত ভীহার গ্রাস অতিক্রম করিবে । রোষে উন্মত্ত হইয়া তিনি স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্তগণের প্রতি সৈন্ত চালনা করিতে লাগিলেন । তখন মরণোন্মুখ অথ পরিভ্যাগ করিয়া পরিত

হস্তে কনকশস্ত্র ঘনুনার আশ্রয়সকলে হুগুজের সম্মুখীন হইলেন। হুগুজার হইতে ত্রিহস্ত পরিমিত শর আগিয়া বৃদ্ধের দক্ষিণ চক্ষু ভেদ করিয়া মস্তক স্পর্শ করিল। তাহার দক্ষিণ হস্তে উন্মোচিত দীর্ঘ পহু সেই সময়ে হুগুজার অস্ত্রের মস্তক ছেদন করিল। অপরীণ মিহিরকুল ও সম্রাট কনকশস্ত্রের প্রাণহীন দেহ একত্র বাসুকামর ভূমিতে লুপ্তি হইল। সম্রাটের অবশিষ্ট সৈনিকগণ তট্টা-রকের দেহরক্ষা একত্রিত হইল, তখন অবশিষ্ট সেনাদল পরপারে উপস্থিত হইয়াছে। হুগুগণ প্রচণ্ড বিরুদ্ধে মিহিরকুলকে উদ্ধার করিবার অস্ত্র শক্রসেনা আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড সৈন্যদল সম্রাটের দেহ আচ্ছন্ন করিয়া ভূপতিত হইল, দূরে গাঁড়াইয়া শুকনোরে তোরনানের পুত্র প্রতিষ্ঠানের শেষ বৃদ্ধ অবলোকন করিলেন। সম্রাটের একজনমাত্র সৈনিক অবশেষে মৃত সম্রাটের হস্ত হইতে স্বর্ণ নির্মিত গরুড়ধ্বজ গ্রহণ করিয়া জলে স্নান-প্রদান করিল। হস্তোত্তোলন করিয়া হুগুজার তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে নিবেদন করিলেন। আর্ঘ্যাবর্ষের ইতিহাসে তাহার নাম সুপরিচিত। সেই ব্যক্তি আর্ঘ্যাবর্ষের জ্ঞানকর্তা—বশোধর্মদেব।

বৃদ্ধ প্রভাতে বনমধ্যে পুষ্করন করিতে গিয়াছিলেন; দেখিলেন, ক্ষত-বিক্ষত দেহে মলিনবেশপরিহিত দীর্ঘাকার এক বোদ্ধা বৃক্ষতলে অচেতন অবস্থায় পতিত। তাহার পার্শ্বে বৃহৎ দৌহনির্মিত শূল কিন্তু তাহার দক্ষিণহস্তে গরুড়দীর্ঘ স্বর্ণধ্বজ দৃঢ়মুষ্টিনিবদ্ধ রহিয়াছে, চেতনা অপহৃত হইলেও বোদ্ধার দণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই। জলগেচনে বৃদ্ধ সৈনিকের মুচ্ছা অপনোদনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না, তখন ধীরে ধীরে বিচক্ষণ চিকিৎসকের জ্ঞান বৃদ্ধ অঙ্গকতগুলি ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পত্নীকা-কালে বৃদ্ধ দেখিলেন যে, বোদ্ধার বকোদেশে গভীর ক্ষত হইতে তখনও সামান্য শোণিতস্রাব হইতেছে। জলগেচনেও রক্তনির্গম স্থগিত হইল না। বৃদ্ধ ঔষধলংগ্রহার্থ নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও অল্পক্ষণ পরেই চর্কিত-পত্রের সাহায্যে রক্তস্রাব স্থগিত করিলেন। বৃদ্ধের পুষ্করন স্থগিত রহিল। বিমলাকৃতি স্ত্রী বিম্বত হইয়া বৃদ্ধ নবাগতের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। সন্ধ্যার বর্ষই এইরূপ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবীন-প্রসঙ্গ ।

কবির নবীনচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় রাণাঘাটে ; সে আশ্রয় গ্রহণে বিশ বৎসর পূর্বের কথা । তখন তিনি রাজ-কার্য্যে রাণাঘাট মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়া তথায় নূতন আসিয়াছেন ।

আমি তখন কলেজের ছাত্র । কবিতা-লিখা রোগ ছেড়াবেলা হইতেই আমাকে ধরিয়াছিল । মাঝে মাঝে কোন সাময়িক পত্রের এক আশ্রয় লিখিতাম । আমি বরাবর নবীনচন্দ্রের ভক্ত । ‘পলাসীর যুদ্ধ’ আত্মোপাত্ত প্রায় আমার কণ্ঠস্থ ছিল । আমি তখনও সে মোহ কাটাইতে পারি নাই । সুতরাং নবীনচন্দ্র রাণাঘাটে আমাদেরই কাছে আসিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল । সঙ্গে সঙ্গে দেখা করিবার এবং ‘পলাসীর যুদ্ধের’ কবির সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছাও মনে প্রবল হইয়া উঠিল ।

গ্রীষ্মাবকাশে কলেজের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছি । কবি-সন্তোষে ঘাইবার পূর্বে একটা কবিতা লিখিয়া বাড়ীর প্রেসে স্থান করিয়া ৫০ খানি ছাপাইলাম । পূজাপাদ পিতৃদেবকে মনের অভিশ্রাব নিবেদন করিলাম । তিনি বলিলেন, “আমি আগামী কল্য প্রাতঃকালের গাড়ীতে রাণাঘাটে যাইব । এক সঙ্গে যাওয়া যাইবে ।” তাঁহার অসুস্থতি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম ।

নবীনচন্দ্রের মত মহাকবিকে উপহার দিবার মত কবিতা লিখিবার বোধ্যতা আমার নাই বলিয়া মনে মনে একটা দুর্ভাবনাও না হইয়াছিল, এমন নহে । যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার শেষ শ্লোক এই—

ধর হীন উপহার

নির্গন্ধ কুসুম-হার

কদম্বের পাত্রে ।

স্নেহের নরনে, কবি,

অসুস্থরও লাগে ভাল,

দিহু এ বিখ্যাসে ।

মনে মনে একটু ভরসা রাখিয়া লইলাম । তিনি মহৎ আমি ক্ষুদ্র । তথাপি তিনি কবি, ক্ষুদ্রের হৃদসাহস তিনি ক্ষমা করিবেন, এইরূপ একটা আশ্বাসও মনে মনে পাইলাম । যাহা হউক, পরদিন সকালের ট্রেনে পিতৃদেবের সঙ্গে রাণাঘাট ট্রেনে উপস্থিত হইলাম । আমাদের গাড়ী ট্রেনে থামিবার একটু পক্ষেই কলিকাতাগামী

বঙ্গলা লোকাল ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল। আমরা তখন প্রাটফর্থে নামিয়াছি ; ওভার ব্রীজ পার হইবার উদ্যোগ করিতেছি। সে দিন শনিবার।

ট্রেনে জানিলাম, নবীন বাবু এই ট্রেনে কলিকাতার বাইতেছেন। তিনিই একটু নিয়াম হইলাম। তবে ত আশা পূর্ণ হইল না—যেহা ঘাটে আসিয়া শেষে গড়াগড়িই সার হইল! ততক্ষণ বঙ্গলা লোকাল ট্রেনে আসিয়া পাঁড়াইল। এমন সময়ে পরপারের প্রাটফর্থে হইতে কোটপ্যান্টপরা প্রৌঢ়বয়স্ক একজন পুরুষকে ওভার ব্রীজের সিঁড়ি ক্রওপদে আরোহণ করিতে দেখিলাম। সাধারণ লোক হইতে তাঁহার বেন একটু বিশেষত্বও লক্ষ্য করিলাম। পার্শ্ববর্তী একজন ভ্রমলোককে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, তিনিই ‘পলাশীর ঘুঙ্ঘের’ কবি নবীন-চন্দ্র সেন।

নবীনচন্দ্র এ পারে আসিয়া দ্রুতপদে একখানি বিতীর শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। আমি অগ্রসর হইয়া নতকক্ষেরে হস্তাহত কবিতাজলি তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি আগ্রহপূর্বক একখানি কবিতার কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি পাঠসঙ্গ করিয়া সহাত্তে আমার সুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“এ কবিতা আপনি লিখিয়াছেন? বড় সুন্দর হইয়াছে। কলিকাতায় বহুবাক্ষকে দিবার লজ্জা আরও কতকগুলি দয়কার। আমাকে আর দিতে পারিবেন কি?” আমি অবনত মস্তকে উত্তর করিলাম, “উপস্থিত সঙ্গে আর নাই। যদি প্রয়োজন বোধ করেন, আমি আর কতকগুলি আপনাকে পাঠাইয়া দিব।” গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। তিনি করপ্রসারণ করিয়া শায়েছে আমার হাত ধরিয়া সেক্ষেত্রে করিলেন; বলিলেন, “আমি রাণাঘাটে ফিরিয়া আসিয়া আপনাকে পত্র লিখিব।” গাড়ী ছাড়িল। আমি সঙ্কল্প নরনে কবিত্রকে আর একবার দেখিয়া গইলাম। গাড়ী দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

কবিকে দেখিলাম। সে কেবল দেখা মাত্র। কবির হৃদয়ের পরিচয় পাইবার অবসরও হইল না। দুইদিন পরে কবিত্রের লিখিত ইংরাজি পত্র পাইলাম। আমার অকিকিৎসক কবিতা পড়িয়া কবিত্রের লিখিয়াছেন I have had many such presents in my life, but none so good, so sweet and so poetical.” বড় আশ্বাস হইল। আপনার কবিত্রস্বপ্নিত সৎকে এমন অকটা certificate পাইয়া একটু অহঙ্কারও হইল। পত্রে রাণাঘাটে দাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশ্রয়ও ছিল। কবিকে ভাল করিয়া দেখিবার— ভাল করিয়া বুঝিবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

বধাসময়ে রাণাঘাট রাজবাগানে তাঁহার কুঠিতে উপস্থিত হইলাম। তখন নবীনবাবু বাসার ছিলেন। বোধ হয় সেদিন রবিবার বা কোন ছুটির দিন। তিনি সাদর-সম্ভাষণে আমাকে তাঁহার কবিত্বনোচিত সুসজ্জিত গৃহে কেদারার বসাইলেন। গৃহের সাজসজ্জা সুন্দর—গৃহের দেওয়ালে অনেকগুলি চিত্র; সেগুলি সূক্ষ্ণচিত্র-সম্মত—অধিকাংশই নদ নদী পর্ব্বত প্রভৃতির চিত্র। অনেকক্ষণ ধরিয়া চিত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ সহকারে দেখিলাম।

তাঁহার পর নবীনচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের পরিচয় পাইয়া তিনি বলিলেন,—“খাত্তী-শিক্ষা’ লিখিয়া আপনার পিতা অমর হইরাছেন। তিনি আমার প্রণয়। আপনি দেশবিখ্যাত ব্যক্তির পুত্র। আপনার কবিতা লিখার বেশ স্বাভাবিকতা আছে। আপনি কবিতা-লিখার অভ্যাস ছাড়িবেন না।” আমি সজ্জভাবে বলিলাম, “আমি বাহা লিখি, তাহা কোন অংশে সুখ্যাতির বোধ্য বলিয়া মনে করি না। তবে আপনার মুখে সুখ্যাতি শুনিয়া নিজে কৃতার্থ মনে করিতেছি।” নবীনবাবু বলিলেন, “আপনার কবিতাটি পড়িয়া মনে হইল আপনি বর্তমান সাহিত্যের প্রভাব হইতে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র আছেন। You belong to my school of poetry আপনার কবিতার আমার কবিতার মূর আছে।” মনে মনে ভাবিলাম, থাকিবারই কথা। আমি যে হেম-নবীনেরই শিষ্য। হেম-নবীনের কাব্যই যে আমার কৈশোরের এবং যৌবনের পাঠ্য ছিল। প্রকান্তে বলিলাম, “হঁা আপনার এবং হেমবাবুর কবিতাই আমি পাঠ করিয়াছি। রবিবাবুর ছই একটি কবিতা পড়িয়াছি মাত্র।” বাস্তবিক তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-রবি চক্রবালের বহু উর্দ্ধে উঠে নাই। প্রশ্ন হইল, “আপনি রবিবাবুর কবিতা পড়িয়াছেন? আপনার কেমন লাগে?”

আমি বলিলাম, “রবিবাবুর কবিতা নূতন ধরণের। একটু বেশী মোলায়েম এবং মধুর। আপনার বা হেমবাবুর লিখার উদ্দীপনা রবিবাবুর লিখার নাই।” নবীনবাবু হাসিয়া বলিলেন “হঁা, রবির কবিতা মেক্সডুইন। রবিবাবুর কবিতা দিরাই তাঁহার কবিতার পরিচয় দিতেছি :—

ও সে ছুঁয়ে গেল, মূরে গেল না।

ও সে ব’য়ে গেল, করে গেল না।

কেমন ঠিক কি না?” আমি কোন প্রতিবাদ করিলাম না। নবীনবাবু খুব হাসিলেন।

এমন সময়ে তাঁহার পুত্র নির্মলচন্দ্র—তখন বয়স ১২।১৩ বৎসর হইবে—
বিনীত ভাবে আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল। নবীনবাবু তাহাকে আমার সহিত
পরিচিত করিয়া দিয়া বলিলেন—“এইটি আমার পুত্র।” তিনি তাহাকে বলিলেন,
“নির্মল তোমার কাকাকে প্রণাম কর।” সে অভিবাদন করিল। আমি তাহাকে
সঙ্গেহে কাছে ডাকিলাম। এখন নির্মল রেঙ্গুনে ব্যারিষ্টার।

নির্মলের সঙ্গে পরিচিত হইয়া বথাসময়ে তিনজনে একত্র আহারে বসিলাম।
আহারান্তে আমি পার্শ্বের ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলাম।

অপরাত্নে বিদায় লইবার ক্ষণ প্রস্তুত হইলে নবীনবাবু বলিলেন “সন্ধ্যার সময়
নির্মলের হার্মোনিয়ম বাজান ও গান শুনিবেন না?—কাল ভোরের ট্রেনে না হয়
বাড়ী বাইবেন।” অহরোধে ঠেলিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার সময় নবীনবাবু
আবার আমাকে লইয়া বসিলেন। সেদিন সাহিত্যসংক্ষেপ বিশেষ আর কোনও
কথা হইল না। নবীন বাবু হার্মোনিয়ম লইয়া বাজাইতে বসিলেন, পুত্র নির্মল
গান করিতে লাগিল। গান কয়টি রবি বাবুর। বালকের কোমল কণ্ঠে গানগুলি
বড়ই মিষ্ট লাগিল। গান শেষ হইলে নবীনবাবু বলিলেন, “দেখুন রবির কবিতা
আমার ভাল লাগে না। কিন্তু তাঁহার গানগুলি বড় মধুর। বাঙ্গালা সাহিত্যে
রবির আর কিছু দ্বারী হউক বা না হউক তাঁহার গানগুলি survive করিবে।”
সে দিন ঐ পর্য্যন্ত। ভোরের ট্রেনে বাড়ী করিলাম।

ঐগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

নিরবচ্ছিন্নতা।

যে ধহুতে থাকে সদা গুণ আরোপিত,
সে ধহু হারায়ে কেলে আপনার বল;
যে মন সত্যত থাকে চিন্তা নিয়োজিত,
সে মন হইয়া পড়ে একান্ত দুঃখল।

ঐযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আয়ুর্বেদের ইতিহাস । *

অনেক দেশ ঘুরিয়া, অনেক ঘরে লাহনা সহিয়া, উদাসীন, অহতপ্ত হতভাগ্য ভারত-সন্তান—স্নানমুখে শ্রান্তদেহে আজ আবার মাতৃমন্দিরের সিংহ-ঘারে ফিরিয়া আসিয়াছে । কিন্তু আজ আর তাহাদের জন্ত পুরস্কারে তুর্ধ্যধ্বনি হইবে না, আজ আর বিচির-বেশধারিণী পুরবধূগণ “জলের কারি” দিয়া তাহা-বিগকে বরণ করিতে আসিবেন না । যে ভারত ‘অনন্তকোটি জীবের বিচরণ-স্থল—বিশ্বেশক্তি কোটি মানবের আবাসভূমি’—সেই ভারতের কক্ষে কক্ষে আজ অন্ধকার ও বিজনতা উত্তরে দিলিয়া মরণের ধ্যান করিতেছে ।—কিন্তু ঋষি-ঐতিহ্যের আশ্রয়ে আমরা সেই পথভ্রান্ত ভ্রাতৃগণ দেখিবেন, যে মা’র কোণ ছাড়িয়া এতদিন তাঁহারা নামহীন নির্দেশহীন নত নত প্রলোভনের আত্মানে অনির্দিষ্ট পথে দূরদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই মা—জরাজীর্ণ অবসর-দেহে বুকতরা মাতৃস্নেহ লইয়া এখনও তাঁহাদেরই প্রতীকার বসিয়া রহিয়াছেন ! তাঁহারা দেখিবেন,—তাঁহাদের সমাত্রত ভাঙারে তাঁহাদের সেই রক্তাগারে এখনও

* আয়ুর্বেদের ইতিহাস ‘পূর্ণিমা’ নামী মাসিকপত্রিকার আরম্ভ করিয়াছিলেন । পূর্ণিমার অকাল-তিরোথানে এবড় সেব হয় মাই, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ যুগের কিয়দশে মাত্র একাধিত হইয়াছিল । সে সময় আশাশ্রুত অসুসন্ধানও করিতে পারি নাই । আচার্য্যদ্বয়, বৌদ্ধযুগ ও তান্ত্রিক যুগে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের চরনোন্নতি হইয়াছিল । এই তিন যুগের আর ২০০ নত হস্তলিখিত কীটনষ্ট পুঁথি আমার কাছে আছে । শরীর পিতৃদেব কৈলাসচক্রে রায় মহাশয় পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারপত্রে—পুঁথিগুলি প্রাপ্ত করেন । কতকগুলি তিনি স্বয়ং নানাদেশ হইতে সংগ্রহ করেন । এই সকল সংহিতার অধিকাংশই এখনও মুদ্রিত হয় নাই । সংহিতা-গুলি পাঠ করিলে আর্য্য ঋষির অসামান্য ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ; যেন হয়, বিশেষ নতাকীর এই ঐতিহ্য সত্যতার যুগে এই জীর্ণ গলিতপত্র প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি লইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সম্মুখে পাড়াইয়া এখনও আমরা আত্মশ্রীর একাধিত করিতে পারি ।

আর্য্য ঋষিগণের অতুলনীয় মহাকাণ্ডিত ধর্ম্মোপদেশ—কথাকিৎ রক্ষা করিবার জন্ত, সেই সকল কীটনষ্ট পুঁথি অবলম্বনে আয়ুর্বেদের ইতিহাস সঙ্কলিত হইল ।

আর্য্য ঋগ্বেদকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যুগযুগান্ত রামজয়ের শেষ সময় পর্য্যন্ত, আয়ুর্বেদের ক্রমবিকাশ, উন্নতি ও অবনতির কথা—এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে ।—লেখক ।

বহুৱাজি ৱহিৱাছে। এখনও শত শত কীটনষ্ট অতিদীৰ্ঘ তালপত্ৰেৰ পুখি “বকেৰ” মত তাঁহাদেৱ অমূল্য সম্পদ ৱক্ষা কৰিতেছে। এখনও সমস্ত ঔষধাই অৱিকৃত, কেবল অনেক দিনেৰ অনাদেৱে ৱিশৃঙ্খল। এখনও সকল ত্ৰাতাৰ মিলিয়া পৱিত্ৰাকৃত কত্ৰাসনেৰ পুৱাতন ৱৰকাত্ৰা আৱাৰ আমৱা শুছাইয়া লইতে পাৰি। তাহা হইলে আমাদেৱ “ৱত্ৰমালিনী ৱাজপুত্ৰী”—আমাদেৱই আনন্দ উৎসেবে “অহলা পাৰাণী”ৰ মত আৱাৰ প্ৰাণৱতী হইয়া উঠিবে।

ৱদেৱীকে পূৰ্বতন মহত্বেৰ কথা বুজাইতে গেলে, আয়ুৰ্বেদের কথা পাড়িতে হয়। কেন না, আয়ুৰ্বেদের ইতিহাস আমাদেৱ উৱতি ও সত্যতাৰ ইতিহাস। আয়ুৰ্বেদ শুধু চিকিৎসা শাস্ত্ৰ নহে, পৱন্ত আয়ুৰ্বেদে জড় ও জীৱ-শক্তিৰ সামঞ্জস্য। জীৱন-মৱণেৰ ৱনিষ্ঠ কুটুম্বিতাৰ নামই আয়ুৰ্বেদ। জীৱন ৱজ্ঞ। ৱিসৰ্জনে সে ৱজ্ঞেৰ প্ৰতিষ্ঠা, ৱলিদানে তাহাৰ সাধনা, মৱণে তাহাৰ পূৰ্ণাহতি। এ ৱলিদানে প্ৰাণ-ৱলি নাই, প্ৰাণ-ৱক্ষা আছে। আমৱা সে ৱজ্ঞ, সে মত্ৰ, সে ছন্দ, তুলিয়া গিৱাহি। আমাদেৱ ঐষ্টা নাই, ত্ৰাঙ্কণ নাই, ত্ৰঙ্কজ্ঞান নাই। দেৱতাৰ আৱাহনী ৱক্ আৱ আমৱা উচ্চাৱণ কৰিতে পৱি না।

আমাদেৱ ৱেদেৰ ধৰ্ম্মেৰ নামই গাৰ্হস্থ্যধৰ্ম্ম। হালী চুলী লইয়া তাৱতে প্ৰথম ধৰ্ম্ম হাপিত হয়। তাৱতেৰ গৃহ—দেৱমন্দিৰ; ৱাৱী হোতা, ত্ৰী ঐৱিক। গৃহধৰ্ম্ম পালন কৰিতে হইলে আয়ুৰ্বেদকে উপেক্ষা কৰা চলে না। আৰ্ত্ত-পীড়িতৰ সেৱা—ভগৱানেৰ সেৱা। তাৱতে পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদ প্ৰতিষ্ঠিত না হইলে, আমাদেৱ পূৰ্ণ স্বথ, পূৰ্ণ স্বাস্থ্য, পূৰ্ণ জ্ঞান, পূৰ্ণ ৱিজ্ঞান আৱ আমৱা কিৱিয়া পাইব না। জীৱন অৰ্থে চিন্তা, তাই “মিশিত্তপুৱ” ৱলিলে মানৱেৰ মহাসৱাধিক্ৰেৱ ৱমালৱেৰ কথাই আমাদেৱ মনে পড়ে। জীৱন মৱণেৰ সহাৱ; মৱণ জীৱনেৰ ঐষ্টা। দুইটি সীমাস্ত মৱণেৰ ৱ্যৱধানই জীৱন। এই ৱ্যৱধান লইয়াই মহাৱ্যজ্ঞ। আয়ুৰ্বেদ—জন্ম মৃত্যুৰ “ৱৰ্ণপৱিচৰ,” এ শাস্ত্ৰেৰ প্ৰণেতা স্বয়ং ঐশৱ ৱিভাসাগৰ। তাৱতে যে এত ৱোগ-শোক এ কেবল আয়ুৰ্বেদের উপাসনা ছাড়িৱা। আয়ুৰ্বেদ আমাদেৱ ৱেদ। আয়ুৰ্বেদের ৱৈদিক ৱজ্ঞে পৱৰ্ত্তীকালে ৱাঁহাৱা ত্ৰতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদেৱ দক্ষিণালালসাৱ ৱজ্ঞ সম্পূৰ্ণ হয় নাই। ৱজ্ঞমানেৰ অদৃষ্টদোষে ৱজ্ঞোৎপন্ন নিৰ্ম্মালা—আজ পৱেৰ হাতে গিৱাছে। নহিলে ৱ্যৱসাৱৱাণিজ্যে, জ্ঞানে শিল্পে, ৱক্তি বুদ্ধিতে যে জাতি এক

সময় সম্মানিত হইয়াছিল সেই জাতির গৃহকোণে এখনও ১৫৩ খানি আয়ুর্কোষ সংহিতা বর্তমান থাকিতেও বিদেশীয় ঔষধ ও পথ্য আসিবে কেন ?

যে দিন হিমালয়ের আশ্রমনির্জন্যায় কল্লোলমুখরা সরস্বতীর কূলে দূর্ধ্ব-করোজ্বল পুষ্পপ্রভাতে জীবনের প্রেম ও পূর্ণতার জন্ত বামিন্দ্রী মিলিয়া হোমামির পবিত্র লিখার “হৈরদ্বীন” হবির প্রথম আহতি দিয়াছিলেন, সেই দিন ভারতে আয়ুর্কোষের জন্মের দিন। সে দিন ও এ দিনে অনেক প্রভেদ। রোগের কঠোর বহুগার যখন অস্ত্রান্ত দেশের নিরুপায় অধিবাসিগণ পৃথিবীর বৃকে শেব নিদ্রাস ফেলিয়া শমনের আতিথ্য স্বীকার করিত, সেই অরণ্যভীত কালেও—ভারতের আয়ুর্কোষ সংসারের দৈন্ত হাহাকারের মধ্যে, বিধাতার মঙ্গলময় আশীর্বাদ বহিরা আনিত।

বৈদিক, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক, আয়ুর্কোষের এই পাঁচটি যুগ। আমরা একে একে তাহার আলোচনা করিব; কোন্ যুগে কোন্ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহারও পরিচয় দিব। বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে আয়ুর্কোষীয় সংহিতায় যে দুইটি বিভাগ আছে, এখনও সেই উভয় বিভাগের কতগুলি সংহিতার অস্তিত্ব আছে, প্রচলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতগুলি গ্রন্থ সুদূরপ্রসার সাহায্যে অতীতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে—আমরা তাহারও উল্লেখ করিব; সাধ্যমত প্রত্যেক গ্রন্থের সমালোচনা করিব।

বৈদিক যুগ।

যুরোপীয় পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদকে জগতের প্রথম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। এই ঋগ্বেদের সময়কে আমরা বৈদিক যুগ বলিব। তাহা মিশ্রের ‘ভাবপ্রকাশ’ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—জগতের ব্যাধি-ব্যাপন্ন অবস্থার স্বরূপ স্মৃতিকর্তা ব্রহ্মা ‘ব্রহ্মসংহিতা’ নামে এক খানি সংহিতায় রচনা করিয়াছিলেন। আয়ুর্কোষজ্ঞ প্রাচীন ঋষির মতে লোক-পিতামহ ব্রহ্মাই আয়ুর্কোষ শাস্ত্রের উদ্ভাবক। প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার নিকট আয়ুর্কোষ শিক্ষা করেন। দক্ষ আবার “স্বর্গ-বৈজ্ঞানিক” অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্কোষ শিক্ষা দেন।

দক্ষও একখানি সংহিতায় রচনা করেন, তাহার নাম ‘দক্ষ দীপ্তি’। অদ্বৈতশরচিত ‘অন্নন’-নিদানের টীকাকার মিশ্রকেশ স্বকৃত টীকার দক্ষদীপ্তির ২৪ টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই মিশ্রকেশ পৌরাণিক ঋষি নহেন। রানারণ-মহাভারতে, কোনও পুরাণে বা কোনও কাব্যে “মিশ্রকেশের” নাম

পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইনি ঐতিহাসিক। ‘ব্রহ্মসংহিতার’ কেবল মাত্র নাম এবং ‘দক্ষনীধিত্তির’ ২৪টি শ্লোক ব্যতীত বৈদিকযুগের আর কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রন্থের পাঠে বৈদিকযুগের চিকিৎসা-প্রণালী অনেকটা বৃত্তিতে পারা যায়। গ্রন্থেই আমরা “কুস্তোগ”, “হরিমাণরোগ” “রাজবন্দা” ও “শ্বেতিরোগের” পরিচয় পাই। স্মৃত্তাং গ্রন্থেদের সময়ে অথবা তাঁহার পূর্বে—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সূচনা হইয়াছিল।

আমরা সকলেই শুনিয়াছি, ৪৫ হাজার বৎসর পূর্বে আর্ঘ্যজ্ঞাতির একটি শাখা মধ্যাশিয়া হইতে আসিয়া হিমালয়ের সাহুদেশে ও পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশস্থাপন করেন। তাঁহারা অত্যন্ত দোষাশালী বলিয়া “সূর” বা “দেব” নামে অভিহিত হইতেন। ভারতের আদিম অধিবাসিগণ এই দেবগণকে আপনাদের বাসস্থানের দখলীসত্ত্ব ছাড়িয়া দেয় নাই। এই ঘটনা লইয়া উভয় দলে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের নাম “দেবাসুরের যুদ্ধ।” এই যুদ্ধ বহুদিনব্যাপী হইয়াছিল। “আর্য্যাসুহ্মার” বিরোধে, গৌর ও স্বচন্দ্রকম পক্ষীয় বহু সৈন্যই হতাহত হয়। আহতগণের রক্ষাকল্পে, এই সময়েই “শল্যতন্ত্রের” (Surgery) প্রথম উৎপত্তি। মহর্ষি স্মৃত্তত বলেন, “দেবাসুরের যুদ্ধে অশ্বিনী কুমারদ্বয় অস্ত্রচিকিৎসা-প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন।”

এক সময় ভগবান্ শূলপানি, ক্রোধবশে ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করেন। অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের কোশলে সেই ছিন্ন মস্তক পুনঃ সংযোজিত হয়। এই অসাধারণ চিকিৎসানৈপুণ্য দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চিকিৎসানৈপুণ্যের অনেক গল্প আছে। সেই সকল গল্প পাঠ করিলে আমরা তিনটি বিষয় বৃত্তিতে পারি। প্রথম—ব্রহ্মা আয়ুর্বেদের প্রবর্তক স্মৃত্তাং আয়ুর্বেদ অত্যন্ত প্রাচীন। দ্বিতীয়—শাস্ত্রিকর্তার উৎকর্ষে শাস্ত্রেরও উৎকর্ষ, অতএব আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নিত্য পরিবর্তনশীল মানব মস্তিষ্কের অসার কল্পনা নহে। তৃতীয়—সংকালে রাজা বা দেবতারও প্রজা-গণের মঙ্গলের জন্ত আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিতেন।

বৈদিক যুগের বৈজ্ঞান্য অশ্বরী (পাধুরী) কাটিয়া বাহির করিতেন; এক দেহের শিরা হইতে অঙ্গদেহের শিরায় রক্ত চালনা করিতে পারিতেন; অকর্ষণ্য ভয়গদ কাটিয়া ফেলিয়া রোগীকে “লোহমরী জন্মা” (লোহার পা) পরাইয়া দিতেন; কাহারও চক্ষু নষ্ট হইয়া বাইলে তাঁহারা সেই বিনষ্ট চক্ষু নির্ঝিঁয়ে উৎপাটিত করিতেন; মাথার খর্ব্ব খুলিয়া মস্তিষ্ক-পীড়ার নিদান হির করিতেন;

জগদীশ্বর শরীরে নববোধনের শক্তি আনিয়া দিছেন। অথমে ইহার কুঁড়ি কুঁড়ি প্রকাশ আছে।

শারীর বিজ্ঞান—পণ্যতত্ত্ব জানিতে হইলে, শারীর বিজ্ঞানে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। শরীরস্থ বস্তুদিগের গঠন বুঝিতে না পারিলে রোগীর দেহে আক্রমণেরোগ করা যায় না। বৈদিক যুগের বৈজ্ঞানিক শারীর তত্ত্ব (Physiology) কৃতবিদ্য ছিলেন। বজ্র-বহন বৈদিক যুগে পণ্ডবলি হইত, সেই সকল হস্ত পণ্ডর অদ্ভুত করিয়া তাঁহারা শারীর যন্ত্রের আকৃতি বুঝিতেন। অথেষে—জুবক, মস্তিষ্ক, অস্ত্র, কীকনা, বকুং, হৃদয়, কুক্ষি, উদর, অঁঠর (অন্ননালি) প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রের উল্লেখ আছে। অথেষে “রাজবন্দার” একটি বস্ত্র স্বক্ আছে। যে হৃদপিণ্ডের গঠন দেখে নাই সে কখনও উক্ত স্বক্ রচনা করিতে পারিত না। জীবদেহ পাকভৌতিক উপাদানে নিৰ্ম্মিত। বৈদিক আৰ্ধ্য বহু পূর্বেই ইহা জানিতেন। = অহি, মাংস, মায়ু, পেনী প্রভৃতির কার্য, ধমনীর স্পন্দনই জীবনী-শক্তি, তাঁহারা এসকল তত্ত্বও বুঝিতেন।

রোগ ও চিকিৎসা।—ক্রমে আর্থ ও অনার্থ্য বিবাদ বিসম্বাদ কমিয়া যায়। তখন “শলাভ্রের” কার্যও অনেকটা কমিয়া যায়; আর্থীগণ কতকটা বিলাসী হইয়া পড়েন। বিলাসীর শরীর রোগের আশ্রয়স্থান। এই সময়ে আরও অনেকগুলি নূতন রোগ (অর, অজীর্ণ, ধাতুদোষল্যা) দেখা দেয়। কালেই তখন “কার চিকিৎসকের” প্রয়োজন হইল, রোগনাশক “তিব্বৎ অধর্মণের” আদরও বর্দ্ধিত হইল।

বৈদিক যুগে দুই শ্রেণীর চিকিৎসক ছিলেন। এক শ্রেণীর নাম “শল্য বৈজ্ঞানিক” ইহারা অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন। আর এক শ্রেণীর নাম “ভিষক-অধ্যক্ষণ” অরাদি কারয়োগের চিকিৎসা করাই ইহাদের কার্য ছিল। বেদ লইয়া “বৈজ্ঞানিক”। বৈদিক যুগে বৈদ্যই ছিলেন, ভিজিটসংগ্রহকারী, “কবিত্তা” ছিল না। তাঁহারা পথে পথে ডাকিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের গৃহপার্শ্বে ঔষধের উদ্ভাদন থাকিত। শাস্ত্রীজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহারা তুল্য পদার্থ ভাবিতেন।

নিদান।—রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, রোগের নিদান (কারণ) জানিতে হইবে। বৈদিক যুগের বৈজ্ঞান্য। নিদান আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ক. স্বকসাহিত্য ১০ম ১৬শ ৩৪।৫।৫।৭ শব্দবাহের মত দেখুন।

† ইত্যং কিংক—ক যে ৯ম ২১৫।

ঐহারা বহির্জগতের সহিত মানবদেহের সম্বন্ধ বুঝিতেন ; সূর্য্যোদয় হইলে উত্তাপে ও আলোকে পৃথিবী হাসিয়া উঠে ; বায়ুর সাহায্যে সেই উত্তাপ ছড়াইরা পড়ে ; জলের শৈত্যগুণে আবায় তাহা শীতল হইয়া যায় ; এই প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিয়া, ঐহারা স্থির করিয়াছিলেন—জীবদেহেও তাপের অস্তিত্ব আছে, সেই তাপে খাদ্য পরিপাক হয়। শরীরে এমন একটি শক্তি আছে—যে তাহার সাহায্যে রস রক্ত শিরার শিরার প্রবাহিত হইয়া থাকে। বৈদিক আৰ্য্য বুঝিয়াছিলেন—ত্রিধাতু শব্দং বহতং। যে শক্তি বহির্জগতে বায়ু, তাপ, জল,—শারীরক্ষেত্রে তাহাই বাত, পিত্ত, কফ। এই ত্রিধাতু প্রকৃতিস্থ থাকিলে দেহ সুস্থ থাকে, ইহাদের বিকৃতির নাম—ব্যাধি। এইরূপে পৃথিবীতে যোগের নিদান প্রথম আবিষ্কৃত হইল। যথেন বত দিনের, এ নিদানও তত দিনের।

ঐশ্বর্য্য।—ঋগ্বেদের সময় আৰ্য্য ঋষিগণ এক সহস্র একশত ঐশ্বর্য্য আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। পুত্রা বিবাক্ত প্রযো প্রায়ই সুখ দেয় না। বৈদিক আৰ্য্য পণ্ডিগের অতি খাতির্কীচনের ভায় দিয়াছিলেন। বৈদিকযুগের সোম-প্রস্তুত-প্রণালী—রসারন শাস্ত্রের সূতিকাগৃহ।

ক্রণতত্ত্ব।—জীবন যে কি পদার্থ বৈদিক ঋষি তাহা বুঝিয়াছিলেন ও জীবনের প্রথম অবস্থা জানিবার জন্য ক্রণতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের সেই—বিজুর্ধোনিং কল্পয়তু লোকটি পড়িলেই আপনারা বৈদিক যুগের গর্ততত্ত্ব যে কতদূর অহুসঙ্কানের ফল—তাহা বুঝিতে পারিবেন। আধুনিক Embryologyতে তদপেক্ষা নূতন কথা অধিক নাই।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব।—বৈদিক আৰ্য্য স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও যথেষ্ট অহুসঙ্কান করিয়াছিলেন। আমকাল ডাক্তারদিগের মুখে শুনিতে পাই, বিগুচ্ছ বায়ু, বিগুচ্ছ জল ও আলোক—স্বাস্থ্যের প্রধান উপাদান। পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্বে বৈদিক আৰ্য্যও ইহা জানিতেন। “অবাতবাহি ভেবজম্, ঋংহি বিধে ভেবজা” “আপো বাচামি ভেবজম্” প্রভৃতি পড়িলে বুঝা যায়, ঐহারা বায়ু, জল ও আলোককে অমৃতের সহোদর বলিয়া গুণ্য করিতেন। এখনও যে “আপোহিষ্টেতি” মন্ত্র ভাগীরথীর কূলে কূলে ধর্মিত হয়—সে পবিত্র মন্ত্র আর কিছুই নহে—কেবল সূর্য্যরশ্মি ও বিগুচ্ছ সলিলের আবাহন। যে সকল বৃক্ষের বাতাস ভাল, ঐহাদের মিকট সে সকল বৃক্ষ দেবসদৃশ পূজ্য ছিল।

ধাত্মী-বিদ্যা।—বৈদিক বৈজ্ঞানিকগণ্ডে প্রহতির কুন্জিতেন করিয়া, বস্ত্রের সাহায্যে সন্তান আহরণ করিতেন।

বৈদিকযুগে “শল্যতন্ত্র” বথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু শল্য-বৈজ্ঞানিক (অস্ত্র চিকিৎসক) ততটা আদর ছিল না। তাঁহারা ভগ্নসমাজে পতিত ছিলেন।* অশ্বিনীকুমারঋষি—ইন্দ্রাদি দেবতার গুরু হইয়াও—বহুদিন যজ্ঞভাগে বঞ্চিত ছিলেন; বহুকাল পরে, যজ্ঞের হির মন্তক সন্ধান করিয়া দিয়া যজ্ঞাংশভাগী হইয়া তাঁহারা সম্মানিত হইয়াছিলেন।†

বৈদিক যুগে “দৈবব্যাপাশ্রয়” চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। মন্ত্র, মণি, মন্ডল, বলি, উপহার, হোম, উপবাস, প্রারম্ভিত প্রভৃতি—এ চিকিৎসার অঙ্গ। কোন ঔষধই রোগীকে সেবন করান হইত না। ঔষধের কেবল বাহ্যিক প্রয়োগ হইত। মন্ত্রবলেই অধিকাংশ রোগের চিকিৎসা হইত। বৈদিক ঋষিদিগের বিশ্বাস ছিল, কৃত, প্রেত, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির কোপেই লোকের রোগ হয়। ঋগ্বেদের মিথ্যতা—পাপদেবতা। এই পাপদেবতার অহুচর্যগণ, অশুক, বশা ও রক্তমাংসাদির লোভে—জীবদেহে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। বোধ হয়, এই জন্তই রোগনিবারণের জন্ত বৈদিক যুগের মন্ত্রাবলী হুচিত হইয়া থাকিবে। বৈদিক যুগের চিকিৎসা মন্ত্রপ্রধান হইবার আরও একটি কারণ—তৎকালীন চিকিৎসকগণ সকলেই ঋষি। “ঋষি” শব্দের অর্থ মন্ত্রদেউ। মন্ত্রতন্ত্রের মধ্য দিয়াই চিকিৎসা-বিজ্ঞান অগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। মন্ত্রই রোগের শাস্ত্রের জন্মদাতা, এ কথা তান্ত্রিকযুগে বিশেষ করিয়া বুঝাইব।

বৈদিক আর্য্য জ্যোতিষ জ্ঞানিতেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বুঝিতেন, তাঁহারা পাকভৌতিক তত্ত্বও অবগত ছিলেন। কোন জ্ঞানই তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। সমগ্র মানব সমাজের হারী কল্যাণকল্পে—পঞ্চমহুস বৎসর পূর্বে তাঁহারা অজগগৎ ও জীবজগৎ ভিন্ন তর করিয়া অহুসন্ধান করিয়াছিলেন।

ঐতর্য্যব্রজ রায় ।

* অস্ত্রচিকিৎসককে শব-ব্যবচ্ছেদ করিতে হর, এই জন্তই লোক অস্ত্রচিকিৎসককে অন্ততি মনে করে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র ৮ মধুহুদন গুলু শবচ্ছেদ করিলে, তৎকালে সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়।

† । ব্রহ্মত, হুয় ১ অ, তৈত্তিরীয় সং।

ইউৰোপ-ভ্ৰমণ।

ইংলণ্ড

(পূৰ্বাহ্নিক)

ইংলণ্ড-প্ৰবাসী ভাৰতবৰ্ষীয়েৰ পক্ষে পাৰ্লামেণ্ট গৃহ দেখিবার ইচ্ছা স্বভাৱতঃই প্ৰবল হয়। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি যে সময়ে ইংলণ্ডে হিলাম সে সময় মহাসভাৰ অধিবেশন বন্ধ ছিল, তাই আমাৰ সভা দেখিবার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু আমি দুই দিন ভিতৰে বাইৰা সভাগৃহ দেখিবা আসিবাছিলাম। সেই কথা কিছু লিখিতেছি।

পূৰ্বে বলিয়াছি, চেম্বাৰিং ক্ৰশ টেম্পে ট্ৰেণ ঢুকিবার পূৰ্বেই সেতুৰ উপৰ হইতে নদীতীৰস্থ পাৰ্লামেণ্ট গৃহ দৃষ্টিগোচৰ হয়। নদীৰ তীৰেই পাৰ্লামেণ্টেৰ প্ৰকাণ্ড বাৰাণ্ডা বা Terrace, প্ৰায় ৪০০ গজ লম্বা। ইহাই সভাদিগেৰ এবং Season-এৰ সময়ে Fashionable মহিলাদিগেৰ বৈকালিক মিলনস্থান। আনি অবশ্য সে দৃষ্ট দেখি নাই। ৰাজা যখন মহাসভাৰ আইসেন, তখন তাহাৰ অন্তৰ যে প্ৰবেশদ্বাৰ আছে, সাধাৰণেৰ প্ৰবেশদ্বাৰ তাহাৰ পাৰ্শ্বেই। এই দ্বাৰ দিয়া ঢুকিয়া Royal Gallery, Prince's Chamber, হাউস অব লৰ্ডস্, লবি, সেনেট্ৰাল হল, হাউস অব কমন্স্, সেন্ট ষ্টিকেন্স্ হল ও গ্ৰেটমিনষ্টাৰ হল, মাত্ৰ এই কয়টি ঘৰ সাধাৰণে দেখিতে পায়। হাউস অব লৰ্ডস্ ও হাউস অব কমন্স্ ভিন্ন প্ৰত্যেক ঘৰেই দেওৱালে ও ছাতে অতি সুন্দৰ স্তম্ভৰ ছবি আছে। অনেকগুলি মৰ্ম্মৰ স্মৃতিও এই সব-ঘৰেৰ শোভাবৰ্দ্ধন কৰিতেছে।

Royal Galleryতে প্ৰকাণ্ড দুইখানি ছবি—নেলসনেৰ যুদ্ধ ও ওয়াটাৰ্ণ-যুদ্ধেৰ পৰ ওয়েলিংটন ও ব্ৰুচাৰেৰ সাক্ষাৎ। এই দুইখানিই খুব প্ৰসিদ্ধ চিত্ৰ। য়ুম্বু' নেলসনেৰ যুদ্ধেৰ ভাব অতি নিপুণতাসহকাৰে চিত্ৰিত। ইহাৰ পৰে Prince's Chamber। তাৰাৰ মহাৰাণী ভিক্টোৰিয়াৰ একটা মৰ্ম্মৰ স্মৃতি। তাহাৰ পৰেই হাউস অব লৰ্ডস্, প্ৰথমে দুই খানি ৰাজসিংহাসন—সমুখে সুপ্ৰসিদ্ধ Woolsack এবং তাহাৰ পৰ আভিজাতদিগেৰ আসন। সমস্ত আসন লাল মৰ্কো-চৰ্ম্মে আবৃত, সেখিতে বাস্তবিকই খুব মহিমামণ্ডিত। উলঙ্গকটিতে বসিলে আৰামেৰ অত্যন্ত অভাব হয় বলিয়া মনে হইল। একটা উচ্চ বৃহৎ জলচৌকিৰ স্তাৰ আসন, তাহাৰ ঠিক মধ্যস্থলে একটা চতুৰ্ভুজ তাকিৰাৰ স্তাৰ

টিবি । ইহার উপর বসিলে কিছুমাত্র আশ্রয় পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না । চৌকিটা দেখিলে মনে হয় যে, উহাতে বসিলে পা মাটিতে ঠেকে না, বুলিয়া থাকে ।

রাজসিংহাসন দুইটি রৌপ্যনির্মিত এবং চম্পাতপশুত । শুটিকতক ধাপের উপর সিংহাসন স্থাপিত, এই সব ধাপে সভাবিবেশনের সময় যে সব Privy Coun-
cillor লর্ড নহেন, তাঁহারা বসিতে পান ।

লর্ডসিংগের আসনের পর একটা ছোট খোঁরাড়ের বা আলমীর কাঠগড়ার মত রেলিং দেওয়া হইল । কমনস্ সভার বক্তা (Speaker) এবং সভ্যরা এই স্থানে দাঁড়াইয়া রাজাদেশ এবং রাজার বক্তৃতা শুনেন । স্থানটি অতি সজীর্ণ ; বোধ হয় কটে ৮১২০ জনের স্থান হয় । কাবেই বিশেষ বিশেষ আবশ্যক অধিবেশনের সময় ভ্রমণলোকের নিগ্রহের দীঘা থাকে না । হাউস অব লর্ডসের পরেই Peers' lobby বা antechamber তথায় লর্ডরা তাঁহাদের ওস্তার কোট এবং টুপি রাখেন, এতোকের কার্ডসংযুক্ত একটি করিয়া খোঁটা আছে । তাহার পর সড় পথকক্ষ । ইহার দুই পার্শ্বে কয়েকটি স্থল্লর স্থল্লর ছবি । তাহার পরে মধ্যস্থ হল অতি স্থল্লর ও শুভ্র । এই হলে ম্যাড্রোন, সার উইলিয়ম হারকোর্ট, লর্ড জন রাসেল প্রভৃতির প্রতিমূর্তি স্থাপিত । কয়েকটি স্থান এখনও অনধিকৃত ; ভবিষ্যতে বোধ হয় অ্যাসকুইথ, ব্যালফোর প্রভৃতির মূর্তি স্থাপিত হইবে । ইহার পর আর একটি সড় পথকক্ষ ; এই স্থানেও খানকতক স্থল্লর ছবি আছে, তাহার মধ্যে 'The Last Sleep Argyll' মূর্তিসিদ্ধ । অতঃপর Commons লবি এবং তৎপরেই House of Commons ; প্রথম দেখিলে মনে একটা একাত্ত হতাশার ভাব আইসে । এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মালোকিত কক্ষ এত বড় সাম্রাজ্যের প্রধানতম শাসন ও অধিবেশনের স্থান ! ষাণ্মাসিকই ঘরটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন । এক ঘরে ও মধ্যে স্পিকারের চম্পাতপশুত আসন, সম্মুখে কেরাণীদিগের টেবল, এবং দুইপার্শ্বে চারিখানি করিয়া বেঞ্চ । বেঞ্চগুলি অবশ্য সবুলবর্ণ চামড়ার মণ্ডিত ; Green benches of Westminster সকলেই জানেন । বেঞ্চগুলি ঘরে লম্বা লম্বা সাজান, মধ্যে একটা রাস্তা, তাহারই নাম gangway ঘরে আশ্রয় ৪০ জন সভ্যের অতি কটে স্থান হয়, অথচ সভ্যের সংখ্যা ৬৭০ । উপরে গ্যালারি, পুরুষ ও স্ত্রীলোক দর্শকদিগের স্থান । স্ত্রীদর্শকের নির্দিষ্ট স্থানের সম্মুখে অতি অবহেল্য আবরণ । ঘুরোপের মধ্যে এই একস্থানে মাত্র পর্দা আছে বলিয়াই

বোধ হয় এই স্থানে পর্দার এত বেশী কড়াকড়ি। যেরূপ ঢুকবার দরজার উপরেই একটি ঘড়ি এবং এই ঘড়ির উপরে সুব্রাহ্মণ্যের আনন। ছাত্তে প্রকাণ্ড আলোকধার—ফটিকনির্মিত। রক্ষীর নিকট তুলিলাম, এই আলোক প্রজ্জ্বলিত হইলে ঘরের খোঁজা খুব মনোরম হয়।

St. Stephen's Hall অতি সুন্দর—প্রশস্ত—শুভ্রমণ্ডরনির্মিত দীর্ঘ কক্ষ। দুইধারে অনেক রাজ্য রাণী ও ফ্রান্সডেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জনগণের মৰ্ম্মরমূর্তি। তৎপরে শুটকতক সিঁড়ি দিয়া মণ্ডক ওয়েষ্টমিন্‌স্টার হল পৌছিবেন—হলটি অতি প্রকাণ্ড এবং শুভ্রশুভ্র। পৃথিবীতে এত বড় শুভ্রবিহীন হল আর আছে কি না সন্দেহ। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫০ ফুট এবং উচ্চে ৯০ ফুট। ছাত্তের খিলান ওককাঠমণ্ডিত। হলের এক পার্শ্ব বেদীর জায় একটু উচ্চ। হলে ঢুকিলেই একটা গাভীরা অমুকৃত হয় এবং মেকলের সেই প্রসিদ্ধ বিবরণ ঘন পড়ে। কত প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ঘটনা এই হলে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম চার্লস, স্যার টমাস মুর, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রভৃতি কত সম্ভ্রান্ত লোকের বিচার এই স্থানে হইয়াছে। হলের দুই পার্শ্বে ইংলণ্ডের জনকতক রাজা রাণীর মৰ্ম্মরমূর্তি। হলের মধ্যভাগে পশ্চিম খানকতক ক্ষোদিত ফলক; যে স্থানে বিচারের সময় রাজা প্রথম চার্লস দাঁড়াইয়াছিলেন, গ্যাভেলটোনের এবং রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের শব্দেহ যে যে স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল এবং আলফ্রা ট্রাফোর্ডের বিচারের সময় তিনি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সকল স্থানে এই সকল ফলক প্রোথিত। হল হইতে বাহির হইয়া প্রকাণ্ড উঠান New Palace Yard এবং সম্মুখে উত্তরের কোণে প্রসিদ্ধ Clock Tower এবং Big ben নামক ঘণ্টা। ঘড়িটি অতি উচ্চে বসান; শুভ্রটি বোধ হয় ৩০০ ফুট উচ্চ। একদিন দেখিলাম, কতকগুলি মিশ্রি শুভ্রগায়ে ভারা বাঁধিয়া বেগামত করিতেছে। নিয় হইতে লোকগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকাও প্রতীক্ষমান হইতেছিল।

বলিতে তুলিয়াছি, Westminster Hall এর সম্মুখেই অলিম্‌বার ক্রমওয়ারেলের প্রস্তরমূর্তি দণ্ডায়মান।

New Palace Yard এর পার্শ্বেই সুবিখ্যাত ওয়েষ্টমিন্‌স্টারের সেতু এবং এই স্থান হইতে Victoria Embankment নামক সুবিশাল নতুন রাস্তা টেম্‌স নদীর ধার দিয়া প্রায় ১১ মাইল চলিয়া গিয়াছে। এখমেই ইংলণ্ডের কাহিনী-প্রসিদ্ধ রাণী বোডিসিয়া'র রথ দণ্ডায়মান প্রতিমূর্তি।

পার্লামেন্টের পরেই ওয়েষ্টমিন্স্টার আবিবির কথা মনে হয়। অনেকের ধারণা আছে—অন্ততঃ আমার ছিল—যে, আমাদের দেশে যেমন পিঙ্কটার সন্নিকটস্থ ভূমিতে মুক্ত আকাশতলে মৃতের কবর থাকে আবিবিতো বৃষ্টি সেইরূপ। কিন্তু দেখিলাম, তাহা নহে। এই আবিবিতো এবং মুরোপের সমস্ত প্রধান ভজনালয়ে—যেইর ভিতর হৃদয়ভলে মৃতের সমাধি; দর্শক ও জনসাধারণ সেই সব সমাধির উপর দিয়া ইতস্ততঃ পদচারণ করেন। প্রধান প্রধান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকের সমাধির উপর দিয়া পদক্ষেপ করিতে কাহাকেও কুপ্তিত হইতে দেখি নাই। কিন্তু আমার বাস্তবিকই অত্যন্ত বিধা বোধ হইত। আবিবির স্তম্ভের ও দেওয়ালের গায়ে প্রসিদ্ধ লোকদিগের স্মৃতিফলক, কাহারও কাহারও প্রতিমূর্তি। সমবাসসারীলোকদিগের স্মৃতিফলক বধাসম্ভব একই স্থানে সংরক্ষিত এবং সেই অস্থানে আবিবির অংশবিশেষের নাম Poets' Corner, Little Poets' Corner, Statesmens' Aisle প্রভৃতি। হয় ত মৃতদেহ বেহানে সমাহিত আছে, স্মৃতিফলক তথা হইতে দূরে স্থাপিত।

আবিবির অংশবিশেষ, যথায় রাজা রাণীদিগের শব সমাহিত, তাহার নাম Chapel of Henry vii (সপ্তম হেনরীর চ্যাপেল)। এই অংশ দেখিতে সৌম ও মঙ্গলবার ভিন্ন প্রত্যহ ৬ পেনি দর্শনী দিতে হয় ও একজন পাত্রী দর্শকদিগকে লইয়া সমস্ত অংশ বেধ করিয়া দেখাইয়া ও তাহার ইতিহাস বুঝাইয়া দেন। ইহার এক পার্শ্বে প্রসিদ্ধ অভিব্যেকের আসন; একটি অতি সামান্ত ভয়প্রায় জরাজীর্ণ কাঠাসন, তাহার নিম্নে একখানা প্রকাণ্ড ময়লা পাতর। এই চেয়ারে প্রথম এডওয়ার্ড হইতে পঞ্চম জর্জ পর্যন্ত ইংলণ্ডের সমস্ত রাজারাজীর অভিব্যেক হইয়াছে। চেয়ারখানি পূর্বে ধোলা থাকিত কিন্তু অনেকে তাহার গায়ে নাম ফোঁসিত করার একপে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, সাধারণে তাহা স্পর্শ করিতে পার না।

ওয়েষ্টমিন্স্টার আবিবিতো কত প্রসিদ্ধ লোকের সমাধি! এই স্থানে কিছুকণ থাকিলে মনে এক অননুভূতপূর্ব ভাবের উদয় হয়। রাজা রাণীর কথা ছাড়িয়া দিলেও এইস্থানে চম্পার, নিউটন, বেন্জনসন, সেকস্পীয়ার, ডিকেন্স, থ্যাকার, মেকলে, স্কট, টেনিসন, বার্নস, ব্রাউনিং, বার্নস, প্রভৃতি সাহিত্যিক; টিকেন্সন, ক্রেনেল, কেলভিন, নিউটন, হার্নেল, ডারউইন, প্রভৃতি বিজ্ঞানচাৰ্য্য; পিট, পীল, কবডেন, বার্ক, ম্যাডক্সটন, ডিসরেলি প্রভৃতি রাজনীতিবিদগণ ও ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ওয়ারেন হেস্টিংস, আউটরাম, লরেন্স প্রভৃতির মৃতদেহ

সমাহিত বা স্মৃতিফলক স্থাপিত। বাস্তবিকই ইহা ঐতিহাসিক ছাত্রের পক্ষে এক মহাপীঠস্থান।

লণ্ডনের অত্যন্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিশদ বর্ণনা দেওয়া নিম্নপ্রয়োজন। ব্রিটিশ মুজিয়াম, বা জাতশালা গ্যালারি বা টেট গ্যালারির বর্ণনা করিয়া তাহাদের চিত্র পাঠকের সম্মুখে স্থাপিত করা আবার পক্ষে সম্ভব নহে। বিশেষ চিত্রশালাগুলির বর্ণনা লিখিয়া কোনও লাভ নাই। যদি চিত্রের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বরং পাঠকের দৈর্ঘ্য থাকিত। তবে মুজিয়ামগুলির মধ্যে South Kensington মুজিয়ামের কথা কিছু বলিতে হয়। তাহার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশের খনিজ কৃত্তিক প্রভৃতি উৎপন্ন প্রকার নমুনা সংরক্ষিত। ভারতবর্ষীয় বিভাগে ভারতের ব্যবহারী খনিজ পদার্থের নমুনা আছে। বঙ্গদেশের পাটের গাছ হইতে দাড়ী পর্যন্ত আছে। কলকাতার মাটির পুতুল আছে। আর আছে, আমাদের রাজা ও তাঁহার পিতা যখন ভারতবর্ষে আইসেন তখন যে সকল অভিনন্দনপত্র পাইয়াছিলেন সেই সমস্ত অভিনন্দনপত্র। এতদ্বিধ কতকগুলি সিংহাসন প্রভৃতি বাহা তাঁহার উপহার পাইয়াছিলেন, তাহাও এই স্থানে সংরক্ষিত। এখানে বলা উচিত যে, ব্রিটিশ মুজিয়ামে একখানি প্রকাণ্ড রথ আছে।

লণ্ডনের প্রধান রাজ্যবাস বকিংহাম প্রাসাদে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। তবে রাজা বংসরের অধিকাংশ সময় যে স্থানে থাকেন সেই উইন্ডসর প্রাসাদ রাজা অধুপস্থিত থাকিলে সাধারণে দেখিতে পার, দর্শনী সাধারণতঃ এক শিলিং, বৃথবারে দর্শনী লাগে না। আমি অবশ্য একটা বৃথবারেই গিয়াছিলাম।

লণ্ডন হইতে রেল বাইন মাইল বাইরা প্রাসাদের -অতি নিকটেই ষ্টেশনে নামিতে হয়। প্রবেশদ্বার দিয়া ঢুকিয়া প্রথমেই St. George's Chapel দেখা যায়। ইহার স্তিতর বশ Knights of the Garterএর পতাকা মোড়লামান এবং চতুর্দিকে অ্যানবার্ট ভিটর প্রভৃতির সমাধি। চ্যাপেল হইতে বহির্গত হইয়া লর্ড চেম্বারলেনের আপিশে টিকিট লইতে হয়। তাহার পর দ্বারদেশে টিকিট দেখাইলে জন কুড়িক দর্শককে লইয়া এক এক জন রাজভৃত্য ঘরগুলি দেখায়। ঘরগুলি অবশ্য মহামূল্য আসবাবে ও চিত্রে পরিপূর্ণ। দেখিলে মনে হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতির যোগা আবাস ঘটে। একটা ঘর ওরেলিংটন ও তাঁহার সমসাময়িক লোকের ও ঘটনার চিত্র সঞ্চলিত; আর এক ঘরে যুদ্ধে জিত অনেক পতাকা লম্বমান, তাহার মধ্যে সিপাহিবিস্ত্রোহে জিত কতকগুলি

পতাকাও আছে । ভারতবর্ষ হইতে নীত অনেক মহামূল্য দ্রব্যসামগ্রী এই প্রাসাদে স্থান পাইয়াছে ।

প্রাসাদের পার্শ্বে প্রকাণ্ড পার্ক, প্রায় পাঁচ মাইল লম্বা । দূরে চতীর অর্ধেকের প্রতিমূর্ত্তি । এক কোণে ফ্রগমোর স্ততিমন্দির । তথায় মহারানী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামীর মৃতদেহ সমাহিত । আমি যে দিন গিয়াছিলাম সে দিন তথায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ ।

উইণ্ডসরের নিকটে টেম্‌স নদীর অপর পারে ইটন কলেজ । বলিয়া রাখা উচিত যে, এইখানে টেম্‌স সাম্রাজ্য খালের মত । এই ইটন বিভাগে ইংলণ্ডের অভিজাত বংশীর অনেকেই পাঠাভ্যাস করেন । বিভাগের ছাত্রসংখ্যা নির্দিষ্ট ; কাবেই বহুদিন পূর্ব্ব হইতে প্রবেশের আবেদন পাঠাইতে হয় । শুনিলাম, দশ বার বৎসর পরে যে সকল বালক বিভাগের ভর্ত্তি হইবে তাহাদের নামেও এখন হইতে আবেদন করা হইতেছে । একটি ঘরে ছাত্রেরা নিজ নিজ নাম ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকের নাম দেখা যায় ; ২১টি ভারতবর্ষীয় রাজপুত্রের নামও আছে ।

বিভাগের সম্মুখেই একটি নূতন খেত বর্ণের বাটী । এইট এই বিভাগের যে সকল কৃতপূর্ব্ব ছাত্র বোয়ার বৃদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন তাহাদের স্ততিচিহ্ন ।

লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে Hampton Court অন্ততম । এই প্রাসাদে অবশ্য রাজা অধুনা বাস করেন না ; কিন্তু রাজকীয় কক্ষগুলি অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত । অনেকগুলি বহুমূল্য চিত্রে এই প্রাসাদ সুশোভিত । প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে একটি দেড়শত বৎসরের পুরাতন ব্রাঞ্চ লতা আছে । আমি যে দিন দেখিয়াছিলাম সে দিনও তাহাতে শুষ্ক শুষ্ক আঙ্গুর কলিয়াছিল । সমস্ত গাছটি একটি কাচের ঘরে স্থাপিত । উদ্যানে আর একটি কৌতুকজনক ব্যাপার আছে—সেটি গোলক ধাঁধা । অনেকে বর্ধমানের গোলাপ বাগে গোলক ধাঁধা দেখিয়া থাকিবেন । ইহাও সেই জাতীয় । প্রবেশ অতি সহজ, নিগম বড় কঠিন । আমি প্রায় অর্ধঘণ্টা ঘূর্ণশাক খাইয়াছিলাম । কিন্তু পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, নাকালের একশেষ । একজন রক্ষী ঘরের নিকট দিকে ধাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে খুব নিকটেই দেখিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু তাহার নিকট পৌছিতে পারিতেছিলাম না ; বড় মজা । প্রাসাদের একটি গেটের উপর একটি প্রকাণ্ড জ্যোতিষিক ক্রকযড়ি আছে ।

আর একটি বর্ণনীয় স্থান Crystal Palace বা দৃষ্টক'প্রাসাদ । সকলেই

জানেন ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম লণ্ডন প্রদর্শনী হয় তখন ইহা নির্মিত হয়। প্রকাণ্ড লম্বা একটি হল (প্রায় ১৬০০ ফুট) ছাৎ ও দেওয়াল সমস্তই কাচনির্মিত। ধূমে ও লণ্ডনের কৃষ্ণাটিকায় কাচ খুব মলিন হইয়াছে কিন্তু এখনও ইহার শোভা অতুলনীয়। হলের ভিতর অনেকরূপ জীড়াকৌতুকের স্থান আছে। একটি প্রকাণ্ড রত্নমঞ্চ আছে, আর আছে একটি অতি রহৎ অগ্নান বাত্মবয়— তাহাতে প্রায় ৪২০০ পাইপ। হলের বাহিরে দুইটি বড় বড় মিনার। কুটোপ শ্যাণেলের প্রাঙ্গণ বড় সুশোভন। প্রকাণ্ড দ্বিতল বাগান, কোথাও ক্রীকেট কুটবল খেলার স্থান, কোথায়ও উড়িবার কল বেলাুন প্রভৃতি উড়িবার স্থান, কোথাও সস্তরণাগার; সবই রহৎ ও সুসজ্জিত। একটি রেলওয়ে স্টেশন নিম্নতলের নিকটে এবং আর একটি হলের সমতল; তাহাদের নাম বথাক্রমে Lowlevel ও Highlevel স্টেশন।

একদিন লণ্ডনের হাইকোর্ট দেখিতে গিয়াছিলাম। বাটীটি খুব প্রকাণ্ড বটে; কিন্তু আদালতকক্ষগুলি আমাদের কলিকাতা হাইকোর্টের কক্ষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বোধ হইল। তন্ত্রির আলোকও কম বোধ হইল। সুবিধার মধ্যে দেখিলাম, সাধারণ দর্শকের স্থান উচ্চে গ্যালারিতে; কাষেই ব্যবহার্য্যী বসিগের গতিবিধির অসুবিধা তত হয় না। কিন্তু বিম্মরকর দেখিলাম, কোন্সুলিদিগের আসন। চেয়ার নাই, সফ্র সফ্র বেঞ্চ ও সফ্র সফ্র টেবল, ইকুলের Forms এর স্তায়। সম্মুখের সারি K. C. দিগের সজ্জা নিম্নিষ্ট। পশ্চাতে আর সব ব্যারিষ্টারদিগের বসিবার ব্যবস্থা। নথিপত্র ও নথিরের পুস্তকাদি রাখার অত্যন্ত অসুবিধা। আমি যে দিন গিয়াছিলাম তিনটি আদালতে বিয়য় ঘটিত একটি মোকদ্দমা চলিতেছিল।

লণ্ডন টাওয়ার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া লণ্ডনের প্রসঙ্গ শেষ করিব। সকলেই জানেন, টাওয়ার একটি দুর্গ এবং পুরাকালে রাজনৈতিক অপরাধীদিগকে এই স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখা হইত। তৎকালিণ্ড গোধানক—Beefeater নামক টাওয়াররক্ষীদের এবং তাহাদের বিচিত্র পোষাকের কথাও অনেকে শুনিয়াছেন। এই দুর্গের দক্ষিণে টেম্‌স নদী ও অন্ত তিন দিকে পরিখা। টেম্‌সের দিকে একটি সুড়ঙ্গ ও সুড়ঙ্গের লোহময় কবাট আছে, এই দরজার নাম 'Traitors' Gate বা রাজদ্রোহীর কবাট। এই দ্বার দিয়া জলপথে অপরাধীদিগকে টাওয়ারে আনয়ন করিত। সম্মুখেই Bloody Tower ইহার এক কক্ষে তৃতীয় রিচার্ড তাহার প্রাতুপুত্রদ্বয়ের প্রাণসংহার করেন। সেই সজ্জ ইহার এই নামকরণ।

দুর্গের মধ্যে অনেকগুলি বাটী আছে; কিন্তু বিশেষ সঠক্য তিনটি—হোয়াইট

টাওয়ার, ওয়েকফিল্ড টাওয়ার ও বিচাম টাওয়ার । প্রথমোক্তটির মধ্যে অস্ত্রাগার স্থাপিত । এই স্থানে বহুপুস্তকালীন হইতে আধুনিক পর্য্যন্ত সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও বর্মাদি রক্ষিত, তত্ত্বিন্ন সশস্ত্র এডওয়ার্ড ও তাঁহার মহাবীর অভিযোদ্ধ-সম্রাট আছে । ওয়েকফিল্ড টাওয়ারের সম্মুখে মহারানী ভিক্টোরিয়ার শবাধারবাহী কামানের গাড়ীখানি দেখা যায় । ভিতরে রাজার মণিমুকুতাদি আছে । কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা দেখা হয় নাই । সংস্কার উপলক্ষে সে গৃহ তখন বন্ধ ।

বিচাম টাওয়ারের সন্নিকটে অল্প একটু স্থান বাধান রহিয়াছে । সেই ভীষণ স্থানে পূর্বে অপরাধীদিগের মৃত্যুক্ষেত্র হইত । এলিজাবেথের মাতা এন বোলিনের মৃত্যু এই স্থলেই স্বকচুত হইয়াছিল । এই টাওয়ারের ঘরেই অপরাধীদিগের কারাকক্ষ ছিল । অনেক হস্তভাগার হস্তলিপি প্রাচীরগাত্রে বিস্তারিত । তর ওয়া-টার র্যাগে—বৃষশত্রুদের *partou saint*—তরুণো একজন । লিখা প্রায়ই খুব অস্পষ্ট ; তবে পুস্তকবিদ্যা অনেক পাঠ উদ্ধার (বা আবিস্কার) করিয়াছেন ।

লণ্ডনে অবস্থান কালে দুই দিন আপন ব্রিটিশ প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম । অতি প্রকাণ্ড প্রদর্শনী ; করেক ঘণ্টার তাহার কিছুই দেখা হয় না । এক স্থানে কতকগুলি (বোধ হয় ১৩টি) ঘোম নিশ্চিত পুস্তলিকার দ্বারা অতি পুরাকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত জাপানের বেশভূষা ও হাব ভাব চিত্রিত ছিল । আর এক স্থলে কিছুদূর পর্য্যন্ত জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অঙ্কিত । রজনীতে একরূপ ভাবে সেই স্থান আলোকিত থাকিত যে, দেখিলে ভ্রম হইত বেন বাস্তবিকই জাপানে আছি । এই দুইটি চিত্র আমার নিকট বড় ভাল লাগিয়াছিল । আর এক ঘরে কি করিয়া কাচ প্রস্তুত হয় এবং এক দল গলান কাচ হইতে কিরূপে স্বন্দর বোতল, মাস, কলদানি প্রভৃতি হয় প্রত্যক্ষ দেখাইতেছিল, সে গৃহও বড় কোতুহলোদ্দীপক ।

এক দিন ট্রেণে গুটিকতক জুরাচোর উদ্রিয়া ভেতাস বেলিতে আরম্ভ করে এবং আমাদিগকেও যোগ দিতে বলে । আমার সঙ্গী একটি যুৎক তাহাদের প্রবক্তার মুখে হইয়া বেলিতে চাহেন, কিন্তু আমি কিছুতেই তাহাকে বেলিতে দিলাম না । ইহা দেখিয়া জুরাচোররা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল । ব্যাপার কত দূর গড়াইত জানি না, ট্রেণ ঠেঁশনে আসিয়া পড়িতে তাহারা পলায়ন করিল ।

ম্যাডাম টুসো (Tussaud's)র প্রদর্শনী একটি উল্লেখযোগ্য স্থান । এই স্থানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মরনারীর বোম্বে গঠিত মূর্তি আছে । অমেরু পাণী ও মরহত্য-

কারীর মূর্তিও আছে। তদ্বির আছে ছাড়াইর দৃশ্য, আশ্রমাতীর দৃশ্য, জাল মূর্তা
প্রণেতার কৰ্ম্মস্থলের দৃশ্য, ফ্রান্সের গিলোটিনের দৃশ্য ও একটি টুকরা, ফ্রান্সের
রাষ্ট্রবিপ্লবে হত রাজা রানীও কাটা মুণ্ডের দ্যে প্রভৃতি অনেক বীভৎস জিনিষ।

আমি যখন ইংলেণ্ডে ছিলাম তখন অনেকগুলি ভারতবাসী অন্নদিনের অল্প
বিলাতে গিয়াছিলেন। তাই বিজয়ার দিন লণ্ডনপ্রবাসী ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের
সম্মানার্থ এক ভোজের আয়োজন করেন। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে আমিও ছিলাম।
স্বর হেনরি কটন সভাপতি ছিলেন, কারণ, তাঁহার সে দিনকার উক্তিতে,
তিনি ভারতবর্ষের দত্তক পুত্র।

এই ভোজের পরদিন আমি লণ্ডন ত্যাগ করি।

শ্রীমতেন্দ্রকুমার বসু

পুরস্কার।

(হারেন)

যেখানে ঝরিয়া পড়ে মোর আঁখি জল,
সেখানে বিকশি' উঠে ফুল শত শত ;
তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস উঠে ভেদি' হৃদিতল,
কোকিলের কাকিলিতে হয় পরিণত।

আমারে শাসিলে ভাল হ'বে লো তোমার
মধুর—মধুরতম কুটে বত ফুল ;
বাভাষনপথে তব গা'বে অমিবার
মধুর কলকঠ কোকিলের ফুল।

সমালোচনা ।

গোধূলি ।*

ইহা একখানি কাব্যগ্রন্থ । বর্তমান সময়ে বঙ্গভাষার কবিতা-লেখকের সংখ্যা, পাঠকের সংখ্যা অতিক্রম করিয়াছে বলিলে সম্ভবতঃ অতুক্তি হইবে না । কিন্তু, হৃৎকের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, কবিতার এই অতি-সামান্যের দিনেও, পাঠযোগ্য, উপভোগযোগ্য, সমাদরযোগ্য কবিতা অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়া থাকে । বাঙ্গালা কবিতার এই শোচনীয় দুর্দিনে ‘গোধূলি’ কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি । কাব্য-মোদী পাঠকবৃন্দের নিকট এই নব-প্রকাশিত কাব্যখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব ।

জুজস্বধর বাবু ইতঃপূর্বে বঙ্গভারতীয় চরণে ‘মল্লী’ উপহার দিয়া কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন । ‘গোধূলি’ তাঁহার পরিশ্রুত বয়সের রচনা । ইহার অধিকাংশ কবিতাই আধ্যাত্মিক ভাবে অঙ্গপ্রাণিত । ইহাতে প্রথম যৌবনের উদ্যম চাকলা ও বাসনার তীব্র আলা নাহি । সেই হিসাবে ইহার নামকরণ সার্থক হইয়াছে ।

‘গোধূলি’ বলিলেই, একটি শাব্দিক, সংঘম ও বিরামের ভাব মনে উদ্ভিত হয় । গোধূলিচিত্রের বিশেষত্ব—কর্মক্ষেত্র হইতে জীবগণের গৃহাভিমুখিতা । গোধূলি-বেলায়, শান্ত—ক্রান্ত মানব দিবসের কর্ম সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আইসে, বেঙ্গল গোট হইতে লোকালয়ে ফিরিয়া আইসে, বিহঙ্গকুল বিশ্রামের আশায় ক্লায়ে ফিরিয়া যায় । ‘গোধূলি’-কাব্যের বিশেষত্বও ইহার অন্তর্মুখিতা । ইহাতে বৈচিত্র্যময় বহির্জগৎ হইতে ধ্যানপরায়ণ কবির নিগূঢ় অন্তর্জগতে প্রবেশ লাভের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে । কাব্য ও কবিত্বের সর্ববাদি-সম্মত সংজ্ঞা নির্দেশের নিফল প্রয়াস না করিয়া আমরা একেবারে ‘গোধূলি’ কাব্যখানি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি । আরম্ভেই গোধূলি ছায়ার জুজস্ব দেখিয়া, আশা করি, কেহ ভীত হইবেন না ।

* শ্রীজুজস্বধর রায়চৌধুরী এন্. এ. বি. এল. এণ্ডেড । শ্রীমল্লভূষণ চৌধুরী বি. এল. কর্তৃক প্রকাশিত । দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ।

‘গোধূলি’র কবিতাগুলি ‘চিন্ময়ী’ ‘সিদ্ধ-সংবাদ’ ‘অত্মমঙ্গল’ ‘ঐকতান’ ও ‘অন্নপিত্ত’ এই পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কবিতাগুলির শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে আমরা সৰ্ব্বত্র কবির সহিত একমত হইতে পারি নাই। ভাবের স্বচ্ছতা ও ভাবের প্রবাহে ‘চিন্ময়ী’ অধ্যায়ের কবিতা কয়টিই আমাদের সৰ্ব্বাপেক্ষ ভাল লাগিয়াছে। একলি রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত মুক্ত পয়ার ছন্দে রচিত। ‘অত্ম-সঙ্গীত’ পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে রবীন্দ্র বাবু ‘মানস-স্বন্দরী’ শীৰ্ষক বিখ্যাত কবিতা মনে পড়ে। ভূমিকায় প্রকাশক লিখিয়াছেন, “চিন্ময়ী অধ্যায়ে আত্মশক্তি-রূপিণী প্রকৃতি মানবী মূৰ্ত্তিতে কবির চিত্র আকৃষ্ট করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার জননরাজ্যে নিজের বিধৰূপ বিস্তার করিতেছেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁহার মৰ্ম্মকন্দরে চিদ-বহিনীৰূপে প্রবাহিত হইয়া আপ-নার স্ফুৰ্ত্তিপূৰ্ণ বিজ্ঞামূৰ্ত্তি প্রকটিত করিতেছেন।”—লেখকের ভাষা, বক্তব্য বিষয়টিকে পরিষ্কৃত করিতে পারে নাই।—‘কে ভূমি’ এবং ‘বিধৰূপা’ এই কবিতা দুইটি অন্তর্গত বিরোধ-বাধায় করুণ ও মৰ্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। ‘বিধৰূপা’—আত্মশক্তিরূপিণী প্রকৃতি সন্দেহ নাই। কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল, “সঙ্গমে সৈব তথৈকা, ত্রিভুবনমপি তদ্বয়ং বিব্রজে।” এই কবিতাটির শেষাংশে যে “বটচক্রভেদ” বর্ণিত হইয়াছে পাদটীকা সত্ত্বেও তাহা তাত্ত্বিক সাধক বাতীত সাধারণ পাঠকের বোধ-গম্য নহে।

‘সিদ্ধ-সংবাদ’ অধ্যায়ের কবিতাগুলি পুরীতে সমুদ্রতীরে রচিত। ‘সিদ্ধ’ কবিতায় কবি অনন্ত আকাশতলে অনন্ত অধুনিধির সম্মুখে দাঁড়াইয়াও ক্ষুদ্র মানবের মহত্ত্ব এবং সনাতনত্ব উপলব্ধি করিতেছেন—

ওহে নীল পারাবার যবি ও এ বেহ চার
অতি ক্ষুদ্রতম,
ওখাপি এ ডু-কূলে যে অকূল হৃদি ছলে
সে যে সিদ্ধ সম !

তব ভঙ্গ, বহা কর ! নহে জ্ঞান-অগোচর,
জ্ঞানে ইতিহাস
কিন্তু কেহ নাহি জানে কোথা কবে কোন্‌খানে
আমার বিকাশ ।

হরত আসিবে কাল তুমি বাবে অন্তঃকাল
তুকাইবে নীর,
আমি কিন্তু কতবার ধরিব বাসনাগার
কাবনা পরীর ।

সিদ্ধুর উপরিভাগে তরঙ্গভঙ্গ, নিত্য চাকলা ও বিকৃত গর্জ্জন, কিন্তু তল-
দেশে কোন আলোড়ন নাই, তথায় কেবল শান্তি ও নিরবতা । কবি
বলিতেছেন :—

এ চিত-পয়োহি ঘোর তেমনি পরমে ঘোর
বাহিরে কেবল
মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার ইন্দ্রিয় তরঙ্গ তার
করে কোলাহল ।
কিন্তু সে সবার ভুলে হৃদুপ্তির স্থির মলে
শান্তি অচকল
যুগ্ম আনন্দ-কল্ম নির্ঝিকার নিরবল
আত্মা নিরমল ।

উপনিষদের একটি মন্ত্রেও এই তবেরই আভাস আছে,—

বৃক্ষ ইব শুক্লো দিবি তিষ্ঠত্যোকঃ ।

সংসারের অধঃস্থঃখ, জন্মমৃত্যু বৈচিত্র্যচাকলা প্রবাহের অন্তরালে এক
অর্থাৎ আত্মা বৃক্ষের স্তার শুক হইয়া আছেন ।—

কবি বলিতেছেন :—

পাইলে সন্ধান তার আসা বাওয়া অনিবার
খেমে বাবে ঘোর ।
না রহিবে তুমি আমি না হবে দিবস-রাত্রী
কেটে বাবে ঘোর ।

সিদ্ধুসংবাদ অধ্যায়ের ‘সিদ্ধু ও শঙ্কু’ কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য । কবি
সিদ্ধুকে সতীহারা ভোলানাথ কল্পনা করিয়া বলিতেছেন :—

ভোলায়ে ভুলায়ে সতীর লুকায়ে
কোথায় রেখেছ হরি ?
তাই তব দ্বারে বাচে সে তাহারে
কিবা দিবা বিতাবরী ।
হাঁকিছে ঈশান ডাকিছে বিদান
“বেহ, বেহ জগন্নাথ ।”—

‘অত্মমঙ্গল’ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি ভিন্ন সমস্ত কবিতাই কালিদাসের অতুলংহার ও মেঘদূত হইতে রূপান্তরিত। প্রকাশক লিখিয়াছেন, এগুলি কবির বহু পূর্বের রচনা; এবং “এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাবস্বভ্বে এখনোযোগ্য নহে।” তাহা না হউক, এই কবিতা করটি ছন্দের বৈচিত্র্যে এবং গীতি কবিতার স্বভাৱে অতুল্য হইয়াছে। এই অহুবাদে পাঠক কালিদাসের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-দৃষ্টির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে অহুবাদকের স্বীয় সৌন্দর্য্যগ্রাহিনী শক্তির পরিচয়ও প্রাপ্ত হইবেন। মেঘদূতে যেখানে বিরহী যক্ষ মেঘের নিকট বিরহ-শয়নে সন্নিবদ্ধা এবলক্ষিতোজ্জ্বলনেত্রা সৌন্দর্য্যের আদিসৃষ্টি প্রাণস্বরূপিনী প্রিয়তমার বর্ণনা করিতেছেন, সেই মনোজ্ঞ শ্লোক করটিই ভূমঙ্গ বাবু অহুবাদের বিষয়ীকৃত। অহুবাদ-নৈপুণ্যের নিদর্শন স্বরূপ অপরিসীম প্রথম শ্লোকটি এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

তদ্বী ভ্রামা শিখরিন্দ্রশনা পকবিধাধরোজী
মধ্যেক্ষীণা চকিতহরিনীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ
জ্যোতীভারাদলসগমমা স্তোকনন্য স্তন্যভ্যাং
যা তত্র তাদৃশুর্ভাববিবরে সৃষ্টিরাগ্বেষ ধাতুঃ ॥

অহুবাদ :—

“বেরিবে সে পূহযাবে রমণ-রতন রাগে
পক-বিবাহরা স্তন্য শিখরি-দশনা ;
বহিষা নিতমতার মধুর গমন তা’র
ক্ষীণ কটি, নিম্ননাভি, সুরঙ্গ-নয়না ।
গীৰ পয়োধর ধরি’ তম্ব মন্থ নভ, যরি,
এখন যুবতী করি’ লিঙ্গ রচনার
বিরলে গড়িলা বিধি গেরসী আবার ।”

অতুলংহার অবলম্বনে বড়-বড় বর্ণনার কবি আধুনিক কবির অহুরোধে সর্বত্র মূলের অহুসরণ করেন নাই। আমাদের মতে ইহা ভালই হইয়াছে। এই কবিতাগুলি সংস্কৃত কাব্য-কল্পের সৌরভে সুরভিত।

‘অত্মমঙ্গল’ অধ্যায়ের কবিতাগুলি বৈষ্ণব সংস্কৃত কাব্যের, ‘ঐকতান’ অধ্যায়ের কবিতাগুলি সেইরূপ ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের ছায়াবলম্বনে রচিত। ‘পাপিয়ার প্রতি’ কীটসের ‘নাইটিঙ্গেল পাখীর প্রতি’ অবলম্বনে, এবং ‘আকবরের স্বপ্ন’ টেনিসের উক্ত নামা খণ্ড-কাব্যের ভাব অবলম্বনে রচিত। ‘কোকিলের প্রতি’ কবিতাটি কোন বিশেষ ইংরাজী কবিতা অবলম্বনে

লিখিত বলিয়া উল্লিখিত না হইলেও, উহার মধ্য স্পষ্টতঃই ইংরাজী কাব্য হইতে গৃহীত । শেলীর ‘বাই লার্কের প্রতি’ কবিতার ভাবে এই কবিতাটি অস্বপ্রাপিত । “সফারিংগী শরীরিণী গীত” ওয়াড’স ওয়ার্থের “A wandering voice.”

“কম্পিত তৃণের মুখে বরষার প্রথম চুষন

কিংবা নব বারি পাতে কুহবের মৃদু আগরণ”

শেলী লিখিয়াছেন :—

Sound of vernal showers

On the twinkling grass,

Rain-awakened flowers ;

“হরিৎপল্লবে ঢাকা গোলাপের সিন্ধুপরিবল” শেলীর “Like a rose embowered in its own green leaves.” ইত্যাদি ।

অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ অনাবশ্যক ।

“প্রকাশকের নিবেদনে” লিখিত হইয়াছে, “ঐক্যতান অধ্যায়ে এই বিশ্ব ও বিশ্বাচার একতানতা বহুতার বহুরূপ ও বহব্যথার মধ্যে এক ধর্ম—এক ধর্ম—এক কর্ম—এক মমতা প্রতিপাদিত হইতেছে।”—কবির উদ্দেশ্য ও সহনশীলতা প্রশংসনীয় ; তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়—মহান ; কিন্তু এই কবিতা কয়টিতে সেই একত্ব কতদূর প্রতিপাদিত হইয়াছে, সম্বন্ধ-স্থল ।

কবি কোকিলের উদ্দেশে বলিতেছেন :—

তুনি ও সঙ্গীত তব মনে হয় অতীতের মত

আবার এ অবনীতে সত্যলোক হবে সমাগত,

দেব হিংসা পাইবে বিলয় ;—

ধরাতলে একদা খ্রীতির রাজ্য স্থাপিত হইবে, Millenium অথবা সত্য-যুগের পুনরাবির্ভাব হইবে, অনেক কবিরূপি এই আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন । টেনিসন লিখিয়াছেন—

One God, one law, one element,

And one far-off divine event,

To which the whole creation moves.

কচ্ কবি বার্মস্ গাহিয়াছেন :—

For a' that, and a' that,

It's coming yet, for a' that ;

That man to man, the world o'er,
Shall brothers be for a' that.

কিন্তু মানব একদিন

এক ধর্ম, এক মর্ম, এক কর্ম, এক মন্ত্র ধরি'
বহুতার বহুরূপ বহু বাখা বাবে সে পাশরি
বিষাঘ্যারে করিবে আরতি।—

এই কবিজনোচিত স্বপ্ন, আশা অথবা কামনা কি বর্তমানে মানবের একধর্মিতা একপ্রাণতা সপ্রমাণ করে? আমরা তত্ত্বজ্ঞান-আলোচনার অধিকারী নহি। আমাদের ক্ষুদ্র বৃত্তিতে মনে হয়, বহুতার বহুরূপ সেই লীলাময়েরই লীলার পরিচয়। সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়ী। বহু কর্ম বহু ধর্ম বহুরূপ বহু শক্তির অন্তরে, তিনিই পরম ঐক্য।

য একোহবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ
বর্ণাননেকা গ্রিহিতার্থোদধাতি।

যিনি বহুধা শক্তি দ্বারা নানা জাতির নানা প্রয়োজন সাধন করিতেছেন, সেই পরম দেবতা। 'পাশিয়ার প্রতি' কবিতাটির শেষ ভাগে সহসা "এক জাতি, এক ধর্ম" প্রচার করিতে বাওয়ার কীটসের 'নাইটিংগেল' কবিতার ভাব-সৌন্দর্য রক্ষিত হয় নাই। এই কবিতার ৭ম ও ৮ম স্লোকে, শেলীর কবিতা হইতে কয়েকটি পদ ঞ্জিয়া দেওয়া হইয়াছে মনে হয়।

'আক্বরের স্বপ্ন'—টেনিসনের রচিত শেষ কাব্য। ইহা তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের স্বর্গীয় রাজকবি এই একটিমাত্র খণ্ড কাব্যের উপাদান ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে গৃহীত। উদারমতি মোগল-সম্রাট আক্বর, সর্কারী ধর্মবিধেবের প্রভাব মর্শনে বাধিত হইরা, এক সার্বভৌমিক প্রেমের ধর্ম স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাই এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। বহুকাল পূর্বে ৮বেলেক্সনাথ ঠাকুর রচিত 'আক্বরের স্বপ্ন'ের মর্ম্মাহ্বান দার্শনিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে ভূমধ্যস্রাবু কবিতার ইহার ভাষাহুবান করিয়া টেনিসনের রচনার সহিত বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয়ের পথ সুগমন করিয়া দিলেন। স্থানাত্যবে আমরা এই আলোচনাযোগ্য কবিতাটির বিস্তারিত আলোচনা করিতে পারিলাম না।

'সোথুলি'র শেষ অধ্যায় 'অরপি'। এই অধ্যায়ের কবিতাগুলি আনন্দজান-বিষয়ক—কবির অন্তঃকৃষ্টির পরিচায়ক। বড়-রিপুর মূর্তি ও প্রকৃতি, রিপুসমনের

উপায়, ভক্তি ও জ্ঞানের প্রকার ভেদ, মারা, লয়, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় এক একটি চতুর্দশপদী কবিতাতে বর্ণিত হইয়াছে । তৎসমুদায় পাঠক এইগুলি পাঠ করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তির অস্তমুখিতা সাধন করিতে পারিবেন । কিন্তু আমাদের মনে হয়, চতুর্দশপদীর কৃত্ত পরিমণ্ডরে নিগূঢ় আশ্রয়তম্ব সমাক্রমণে পরিপূর্ণ হইতে পারে না । এই অধ্যায়ের প্রথম কবিতা (অথবা গান ?) ‘শূন্ত’ বর্জন করিলেই ভাল হইত । ‘এই পথ দিয়ে’ কবিতাটিতে ব্রাউনিংএর One Way of Love কবিতার ভাবাহরণে কবি অক্ষরকুমার বড়াল রচিত ‘এই পথ দিয়ে গেছে’ কবিতার ছায়া দৃষ্ট হইল । ভূজঙ্গবাবু লিখিয়াছেন :—

তোমাতে মাধার করি' পাগল শব্দর
আমারি এ মনোপথে গিয়াছিল চ'লে' ।

তাই তোর গুহুগন্ধে মোদিত সোপান ।
ওখানে আফোটা মোর কতগুলি ফুল
অকস্মাৎ ফুটিয়াছে পদ-পরশনে,
ওখানে জড়ারে গেছে এক গাছি ফুল
রাঙা পা'র মোছা দাগ ওই দীঘি কোণে ।

বড়াল কবি লিখিয়াছেন—

“এই পথ দিয়া গেছে, এখনো বেতেছে বেথা

শত গুহু ভূগ-ফুলে চরণ-অলক্ত-রেখা

এই পথ দিয়ে গেছে, বসে গেছে নদীফুলে

গেঁথে গেছে ফুলমালা পরে বেতে গেছে তুলে ।”—ইত্যাদি ।

মনে হয়, ভূজঙ্গ বাবু কেবল ‘অরুণি’-পর্যায় ভুক্ত করিবার জন্যই এই কবিতার শব্দর ও সত্যীন্দ্রের অবতারণা করিয়াছেন । ইহাতে কাব্য হিসাবে কবিতাটি বার্থ হইয়াছে । সত্যী বধন ‘শিবশিবে’ নিদ্রিতা ছিলেন, তখন তাঁহার পদস্পর্শে ফুল কোটা ও দীঘিকোণে রাঙা পা'র মোছা দাগ থাকি কিরূপে ঘটিতে পারে, নৃপুত্রের রোলই বা কিরূপে সম্ভবে ? ‘তা'ও'ব' কবিতাটির ভাষা ও ছন্দঃ বিষয়ের গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই ।

পুস্তকের ভাষা মার্জ্জিত । ছন্দঃ ও মিল সম্বন্ধে দুই এক স্থলে যে অনবধানভাৱে চিহ্ন দৃষ্ট হইল, তাহা উল্লেখ-যোগ্য নহে । উপসংহারে, আমরা সর্কাস্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে, ভূজঙ্গধর বাবুর কবিলীখনের গোদুলি স্ফূর্তবর্তী হউক ।

ঈশ্বরদীমোহন ঘোষ ।

বিদায়।

আজ মনে হয় যেন স্বপন অসার
 জীবন দৌহার ;
 পরানের শত আশা,
 জনদের ভালবাসা
 সকলি অসার যেন স্বপন নিশার,
 জীবনের শত সুখ,
 বিদায়-কাতর মুখ,
 সকলি স্বপন যেন তোমার আগার !
 সকলি অসার !

আজি এ প্রেমের ভাবা অসার কাহিনী,
 অরি, সুহাসিনী !
 শুধু প্রান্ত আখি'পরে
 বেদনা পড়িছে বরে'
 মরমে হতাশ আগে দুঃস্বপ্ন অগ্নিনী,
 নিরাশা পরল দিরা
 ভরিয়াছে প্রান্ত দিরা
 প্রাণের বেদনা স্রোত উজান-বাহিনী—
 অরি, সুহাসিনী !

আজি এই বাহ-পাশ প্রেমের ছলনা,
 অরি স্ননরনা !
 অধরে হাসির পালে,
 বেদনা লুকায়ে আসে,
 চুষনে কাঁপে না আর প্রাণের বাসনা ;
 আর সে নয়নভারা
 চাছে না নিমেষহারা
 ওই মুখ-শলী পানে আলোক-বসনা—
 অরি, স্ননরনা

হুলের সৌরভ গেছে, আছে রান দল,
 গৌরবের ছল ।
 বসন্ত সে নাহি আর
 শুধু এক এক বার
 পরণে আগিছে তালি' কোকিলের কল,

সঙ্গীহার কোন্ পাখী
ডাকিতেছে থাকি' থাকি'
ফেলিয়া বিজন বনে নয়নের জল—
বিরহ-স্বল !

সুজ্জ্বল প্রেম-নিশা দিবসের ধারে,
কিরাও না তা'রে ।
যেতেছে জ্যোছনা-রাতি,
নিবিছে তারক-ভাতি,
নিবিছে সুখের আলো ছুৎসিদ্ধপারে,
নবীন-জীবন-ভরা
এখনি হাসিবে ধরা
এ নিশি লুকাবে কোথা দিবার আগারে
কিরাও না তা'রে ।

যেতেছে যে কেন মিছে তা'র অবেশণ !
সে আজ স্বপন ।
নয়নে সরস টুটি'
প্রেমালোক উঠে ফুটি ;
অধরে কাঁপিয়া উঠে সরস চুখন,
লাজ প্রেম বেলা করে
ব্যাকুল মরন'পরে
আনন্দহিরোলভরা সুখের জীবন—
সকলি স্বপন ।

প্রেম নিশি মেঘে আজ লইব বিদায় ;
রজনী পোহায়—
এ ক্ষণের মূর্তি বা'র
পূজিয়াছি অনিবার
কেমনে দেখিব তা'রে লুটিতে ধূলার
নিবিলে প্রেমের আলো
কিছুই র'বেনা ভাল
তা চেয়ে বিরহজ্বালা তবু সহ্য ধার—
বিদায়,—বিদায় ।

সংগ্রহ।

ইতিহাস।

দিল্লী।

পত কাষ্টিক মাসে 'মার্চ'বর্ষে' এখন দিল্লীর কথা লিখিত হইয়াছিল, তখন দিল্লী ভারতের প্রাচীন রাজধানী—হিন্দু ও মুসলমান শাসনের স্মৃতিক্ষেত্র, ঐতিহাসিক উপাধানের আকর, ভারতের ভাগ্যবিপর্যয়ের সাক্ষ্য। আর আর ইংরাজাধিকৃত ভারতের রাজধানী আবার দিল্লীতে স্থানান্তরিত। জলা ভূমিতে দৃত্তিকা তুলিয়া লব চার্ক যে কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সার্বভৌমতার চেষ্টায় বে কলিকাতা এখন এটা নগরীর শীর্ষস্থান অধিকৃত করিয়াছে, ভারতে ইংরাজের কীর্তিস্মৃতি যে কলিকাতার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত ভারতের রাজধানী আজ সেই কলিকাতা হইতে আবার প্রাচীন ভারতের পরিচিত রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত। রাজ্য-ক্ষেপে এই পরিবর্তন। ইহাতে স্মৃতিপটে খতাই দিল্লীর বিভিন্ন ইতিহাসের চিত্রাবলী স্ফুটিল উঠে। স্মৃতি 'ম্যাকাডেমী' পক্ষে দিল্লীর ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে: নিয়ে তাহার সারাংশ প্রসঙ্গ হইল।

লর্ড কার্জন বলিয়াছেন, দিল্লী পরিত্যক্ত নগরীর ও ধ্বংসাবশিষ্ট সমাধির সমষ্টি। কথায় বলে, দিল্লীর সিংহাসনে না বসিলে কোন রাজাকে ভারতের রাজা বলিয়া গণ্য করা হইত না। দিল্লীর পুরাতন কথা

দক্ষিণে ৫৫ বর্গ মাইল ব্যাপ্তি ধ্বংসাবশেষ—সে সকল দুর্গের ও নগরের সংস্থাপকদিগের নামও আজ বিস্মৃতিগর্ভগত। হিন্দু-শাসন কালের সৌধাবির মধ্যে লালকোট বা লোহিতদুর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেহ বলেন ইহা তামর বংশীয় দ্বিতীয় অনঙ্গপালের কীর্তি—আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা চৌহান বংশীয় পুণ্ডীরাজ কর্তৃক সংস্থাপিত। এই দুর্গ ও কুতবখানারের সন্নিকটে মসজিদের প্রাঙ্গণে অবস্থিত বিহুবেবতাকে উৎখত লৌহস্তম্ভই হিন্দু প্রাধান্তের নিদর্শন। স্তম্ভগায়ে লিখিত লিপির অক্ষর বিচার করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্থির করিয়াছেন, ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর। কাওর্গন বলেন, ইহা ৪০০ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত। ক্যানন বলেন, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কনৌজ হইতে লোক আসিয়া দিল্লীতে উপনিবেশ স্থাপন করে। লৌহস্তম্ভ সেই সময়ের। প্রথম অনঙ্গ-পাল ১০০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন ও দ্বিতীয় অনঙ্গপাল ১০৫২খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে পুনরায় বসতি করান। ভিনসেন্ট গ্রিথ বলেন, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ইতিহাসে দিল্লীর পরিচয়। তাঁহার মতে ১০৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অনঙ্গপাল সম্ভবতঃ মথুরা হইতে এই আয়তনভূত আনয়ন করিয়া শহিরমালায়ণ্ডে সংস্থাপিত করেন। এই সকল শহির ভাঙ্গিয়া মুসলমানগণ মসজিদ নির্মিত করে। স্তম্ভগায়ে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের গুণ কীর্তিত।

এই আয়তনভূত ভয়বস্ত। অনঙ্গপাল ও তদীয় বংশধরগণ সম্রাটতন রাজ্য শাসন করিতেন।

রাজপুত বীর।

১১৫১ খৃষ্টাব্দে আঙ্গলীরের চৌহান বংশীয় বিশালদেব অনঙ্গ-পালের বংশধরদিগের নিকট হইতে দিল্লী জয় করেন। পুণ্ডীরাজ



বিশাল ঘেবের আত্মীয় । পৃথ্বীরাজ ক্ষত্রিয় বীরের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত ও পুরীকীৰ্ত্তিত । সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত দুর্গ ও মুসলমানকর্তৃক আক্রান্ত দিল্লী ও তাহারই প্রতিষ্ঠিত । কুতব মিনারের নিকটে তাহার প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আজও লক্ষিত হয় । তাহার সময় পর্য্যন্ত বিজয়োন্মোদী মুসলমানগণ দিল্লীতে আসিতে পারে নাই । ১১১ খৃষ্টাব্দে হইতে ১২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহার প্রথম ভারতে আসিলে । কিন্তু কামেন সিদ্ধেশ্বর বিজয় করিয়াই নিবৃত্ত হইলেন । গজবীর মূলতান মাহমুদের আগমনের পূর্বে মুসলমানগণ ভারতে কোনরূপ স্বাধীন প্রভাব সংস্থাপিত করিতে পারে নাই । তিনি ১১১১ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ারে রাজপুতদিগকে পরাজিত করেন ও সোমনাথ মন্দিরের দ্বার গজবীরে লইয়া যান । তিনি দ্বারগজবীর ভারত আক্রমণ করেন । তিনি লাহোর জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দিল্লীতে আসিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না । তাহার পর মহম্মদ খোরা ভারত আক্রমণ করিলে ১১৯১ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ তাহাকে পরাজিত করেন । পরাজিত মহম্মদ সিদ্ধপারে পলায়ন করেন ও পরবৎসর বঙ্গদেশসংগ্রহ করিয়া পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও বিহত করেন । পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে হিন্দু আধিপত্যের অবসান । তখন দিল্লীতে ২৭টি মন্দির ছিল ।

মহম্মদ খোরা দিল্লীর প্রথম মুসলমান রাজা । মহম্মদের সেনাপতি হুতবুদ্দিন ১১৯০ খৃষ্টাব্দে

খোরা ।

হইতে প্রভুর পক্ষ হইতে দিল্লী দাসন করিতে থাকেন ও ১২০৬

খৃষ্টাব্দে আততায়ীর অস্ত্রে মহম্মদ নিহত হইলে স্বয়ং দিল্লীতে রাজ্য

হইয়া বসেন ও ১২১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । কুতব মিনার তাহারই কীর্ত্তি । তিনি ১১৯০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর খানম-এসিদ্ধ বসন্তের নিধ্বিত করাইতে আরম্ভ করেন । তিন বৎসরে বসন্তের নিধ্বাণ শেষ হয় । পরে তাহার দাস ও জামাতা আলুতামাস তাহার বিস্তার বৃদ্ধি করান । আলুতামাস ১২১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । বসন্তের উপাধান হিন্দু মন্দির হইতে সংস্কারিত হইয়াছিল । পূর্বে জমাত বিরা এতদে হিন্দু শিল্পনিদর্শন আবৃত ছিল । এক্ষণে জমাত বলিয়া বাঙাল্য নিপুণ হিন্দু শিল্পীর ক্ষোভিত চিত্রাদি একাশিত হইয়াছে ; ইহা বাঙাল্য এই বসন্তের বিশেষ প্রকাশ্য করিয়াছেন । কুতব মিনার ক্রমে সর্বাঙ্গ হইয়া ২০৬ ফিট উচ্চে উঠিয়াছে ; ইহা পঞ্চতলবিশিষ্ট । ইহার শিরোভাগ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পনে বহানুত হইয়াছে । ইহা মুসলিমের গুরুত্বপূর্ণ—প্রভাতে ও সন্ধ্যার উপাসনার সময়জাপক আজানের জন্যই নির্মিত হইয়াছিল । আলুতামাস এই গুরু সম্পূর্ণ করেন । গুরুত্ব চারিদিকে ভয়ত প ; ভয়ত আলু-মাসের সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

দাসবংশে আলুতামাসের দুহিতা রেজিগা বেগমের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি ব্যতীত

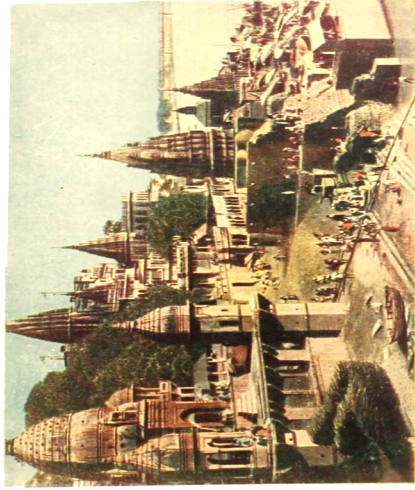
দাসবংশ ।

আর কোন মহিলা দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত করেন নাই ।

রেজিগা বেগম দ্বন্দ্ববীরী ও দ্বন্দ্বশিক্ষিতা ছিলেন । তিনি পুরুষের

বেশে স্বয়ং বিচারকার্য্য নির্বাহ করিতেন । তুর্ক আলতুনিয়া তাহাকে বন্দী করিলে তিনি তাহার জয় জয় করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন । কিন্তু পার্শ্বদর্শন তাহাদিগকে বিহত করে ।

ইহার পর বিলিজিবংশের ও তৎপরে তোপলকবংশের হতে দিল্লীর ভাগ্যপরিবর্তন ঘটে ।



वाराणसी ।

বারাণসী ।

“পূণ্যভূমি বারাণসী

বেষ্টিত বহুনা অসি

বাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত,

আনন্দকানন নাম

কেবল কৈবল্যধাম

শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত ॥”

হিন্দুধর্মের কেন্দ্রস্থান—হিন্দুগত্যতার লীলাক্ষেত্র বারাণসী দেখিব—এ ইচ্ছা অনেক দিন হইতেই হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। কিন্তু আশা পূর্ণ হয় নাই—বারাণসীর মধ্য দিয়া একাধিক বার গিয়াছি—নানিরা কান্দী-দর্শনের সুবিধা হয় নাই। এবার সে সুযোগ উপস্থিত হইল। আর কালবিলম্ব না করিয়া যাত্রার উত্তোগ করিলাম। পথে গয়ায় কোন আত্মীরের সহিত সাক্ষাতের জন্য বোম্বাই ডাকগাড়ীতে যাত্রা করিলাম। ট্রেনে কামরার দুই জনমাত্র সহযাত্রী—একজন যুরোপীয় ধর্মপ্রাণক, আর একজন হিন্দুস্থানী জহরী। রাত্রিতে নিদ্রার কোন অসুবিধা বা অন্তরায় ঘটিল না।

প্রত্যবে উঠিয়া দেখি, বাঙ্গালার সমতল ভ্রাম প্রান্তর ছাড়াইরা আসিয়াছি—ভূমি প্রস্তরময়—কোথাও পথ পার্শ্বস্থিত প্রান্তর হইতে উচ্চে অবস্থিত, কোথাও অনতিগভীর খাতের মধ্যে পথ। এই পথে বহু গুরুত্ব আছে, নিশায় নিদ্রিত অবস্থায় সেগুলি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। গয়ায় আত্মীর আখার ক্ষুদ্র ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত কথা শেষ করিলাম। গয়া ছাড়াইরা ট্রেন শোণ নদের উপরিস্থিত সেতু অতিক্রম করিল। এই সেতু ভারতে সর্কোপেক্ষা বৃহৎ ও মৈর্য্যে পৃথিবীর সকল সেতুর মধ্যে দ্বিতীয়। এই স্থানে শোণের বিস্তার এক ক্রোশের অধিক। দীপ্তকাল—সোণের বিশাল বক্ষ বালুকাস্ত—সেই বালুকাবিস্তারমধ্যে স্থানে স্থানে শীর্ণ জলধারা ও জলজ বা জল-কুলজ গুহ। ইহার পর দাসারামে দূরে সরোবর-মধ্যস্থিত হুমায়ুনবিজয়ী শেষ সাহের সমাধি লক্ষিত হইল। মোগলসরাই ষ্টেশনে আমাদিগকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। তখন সুবলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। আমাদিগের পাড়ী-খানি বোম্বাই ডাকট্রেনের অঙ্গচ্যুত করিয়া অবোধা ও রোহিলখণ্ড লাইনের ট্রেনে ছুড়িয়া দেওয়া হইল। এই স্থানে মনে পড়িল, গতবার বখন এই পথে গিয়াছিলাম, তখন এই প্লাটফর্মে পাড়াইরা পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়

আমাদিগকে বারাণসীর কত কথা বলিয়াছিলেন—সংস্কৃত গ্রন্থের বচন হইতে বারাণসীর প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

গ্রীকগণ যথার্থই বলিয়াছেন, যে জিজ্ঞাসা করিতে পারে—বারাণসীর প্রতিষ্ঠাতা কে? সে হিমাগিরের প্রতিষ্ঠাতা কে—এ প্রশ্নও করিতে পারে। সেখিনি বলিয়াছেন,—বারাণসীর মত প্রাচীন নগর দুর্লভ। পঞ্চবিংশ শতাব্দী পূর্বেও বারাণসী প্রসিদ্ধ ছিল। যখন ধ্যাবিলন ও নাইনিভে প্রথাহলাভলালসার পরম্পরের প্রতিযোগী, যখন রোম ও গ্রীস প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই—তখনও বারাণসী প্রসিদ্ধ। তখন হয় ত বারাণসীর পণ্যে সগমনের রাজসম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছিল। বারাণসীর প্রাচীনত্ব যেমন বিশ্বকর, ইহার শক্তিও তেমনই অসাধারণ। এই দীর্ঘকালে কত নগরের উত্থান ও পতন হইয়াছে—বারাণসীর গৌরবরাশি অন্তর্নিহিত হয় নাই। অগ্নিদাহ, বিধ্বা বিজ্ঞেতার ধ্বংসচেষ্টা, কালের করণ স্পর্শ—এ সকল অবহেলা—উপহাস করিয়া বারাণসী আজও হিন্দু জগতের সক্তি ও মেহ সম্ভোগ করিতেছে। তাহার গৌরবশ্রী বিন্দুমাত্র মলিন হয় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএনত্সাং বারাণসীর সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছিলেন। সে সমৃদ্ধি আজও অক্ষুণ্ণ। এমন সৌন্দর্য্যও অগতে কচিং দৃষ্ট হয়। অন্নক্ষণমধ্যেই দূরে বারাণসীর বিচিত্র দৃশ্য দৃষ্ট হইল। আকাশ দেখাচ্ছন্ন—তাই পূর্বে সূর্য্যকরোজ্জ্বল অথরতলে বারাণসীর বে রূপ দেখিয়াছিলাম, আজ আর তাহা দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু বারাণসীর বাহা বিশেষত্ব মেঘে বা স্নোয়ে তাহার কোম বৈলক্ষণ্য হয় না—বারাণসীর নিরে গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, তাই একেবারে বারাণসীর সমগ্র দৃশ্য নয়নসমক্ষে সপ্রকাশ হয়। হিন্দুর এই প্রধান তীর্থে হস্তামাগার সর্বোচ্চ চূড়া আরজজেবের মসজিদের—ইহাই আরজজেবের প্রান্ত রাজনীতির স্পষ্ট নিদর্শন।

বারাণসী নয়নপথে পথিক হইবামাত্র ট্রেণ হইতে শতকণ্ঠোখিত বিখ্যাতের ও অন্নপূর্ণার জরথনিত্তে গগন পূর্ণ হইল। যেন ডক্তির উদ্বেলিত উচ্ছুকে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হইল। সে ভাব বুঝাইবার নহে—বৃষ্টিবার। খৃষ্টধর্ম্মবাহক পার্কার তদীর গ্রন্থে • বলিয়াছেন, বারাণসীতে হিন্দু যাজীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু এই বৃদ্ধিতে ধ্বংসের চিহ্ন স্পষ্ট—ইহা ধ্বংসের পূর্ব্বেগানী চাকলামাত্র। এই কথার উত্তরে মার্ক টোয়েন ছদ্মনাম-

ধারী জগদীশ্বর মার্কিন লেখক লিবিয়াভেন (১) কোন ধর্মের মূর্তা সম্বন্ধে একদল ভবিষ্যদ্বাণী বড়ই অনিশ্চিত। প্রোটেষ্ট্যান্ট মতাবলম্বীরা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ক্যাপলিক মতের আসন্ন মূর্তার সংবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সে মতের মূর্তা হয় নাই। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এই কথাই বলা যায় যে, প্রকৃত কথা এই যে, পার্কার খৃষ্টধর্মপ্রচারক—একজনে তাঁহার উক্তিতে তাঁহার বাসনাই ব্যক্ত হইয়াছে।

বড়ই দুঃখের বিষয়, হিন্দুর সঙ্গপ্রধান তীর্থ-সম্বন্ধে কোন হিন্দু একখানি পুস্তক লিখেন নাই। বারাণসীসম্বন্ধীয় সকল পুস্তকই ইংরাজের রচনা। তন্মধ্যে সেরিং এর (২) পুস্তক সদ্যপেক্ষা বিলম্ব। তবে তিনি খৃষ্টধর্মপ্রচারক ছিলেন—তাঁহার গাঢ় হিন্দুধর্মের প্রতি উপহাসে কলুষিত। পার্কার ও কেপ (৩) উভয়েই খৃষ্টধর্মপ্রচারক। তাঁহাদিগের পুস্তকের পরিচয়ে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রিন্সেপের রচনা (৪) প্রধানতঃ প্রবৃত্তি-বিষয়ক। ইহা একগুণে অত্যন্ত দুঃপ্রাণ। দর্শকের পক্ষে গ্রীত্বলের পুস্তকই (৫) সর্বোৎকৃষ্ট। গ্রীত্বস্বরূপ খৃষ্টধর্মবাক্যক হইলেও তাঁহার পুস্তকে অন্তর্ধর্মবিষয়ের বিশেষ চিত্র নাই। আর উপাদেশ পুস্তক—কলানিপুণ হ্যাভেলের নবপ্রকাশিত পুস্তক। (৬) ইহাতে শিল্পীর তুলিকায় বারাণসীর বিভিন্ন সৌন্দর্য্য সমুচ্ছল বর্ণে চিত্রিত।

বারাণসীতে আমি নবগত; আত্মীয়ের বাসা খুঁজিয়া লইতে কিছু কষ্ট পাইলাম। বাসার বাইরা আত্মীয়দিগের পরই বারাণসী দেখিতে বাহির হইলাম। পথে জনতা; মন্দিরের দ্বারে জনতার পদ ভ্রম; পথিপার্শ্বে সন্ন্যাসীর বাহুল্য। বিপনীতে নানা দেবমূর্তি। চারিদিকে স্নান কুন্ডনের গন্ধ। গৃহপ্রাচীরে পৌরাণিক চিত্র। কোন ফরাসী গ্রন্থকার বলিয়াছেন, বারাণসীতে বিগ্রহের সংখ্যা মানবের সংখ্যার প্রায় ত্রিগুণ। (৭) বারাণসীতে পথে কুল পদ-ধলিত হয়—তাই ট্রিভস্ বারাণসীকে বিধলিত কুন্ডনের নগর বলিয়াছেন। (৮)

- (১) More Temples Abroad.
- (২) The Sacred City of the Hindus.
- (৩) Benares.
- (৪) Views of Benares.
- (৫) Kashi the City Illustrious.
- (৬) Benares the Sacred City.
- (৭) Romantic India—Andre Chevrillon.
- (৮) The Other Side of the Lantern.

প্রথমেই দশাশমেঘ ঘাটে বাটলাম। পথে বাঙ্গালীর সংখ্যা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। জানিতাম, কান্দিতে বাঙ্গালী যথেষ্ট—কিন্তু বাঙ্গালীর সংখ্যা যে এত অধিক তাহা জানিতাম না। আশীর ধারণা ছিল, প্রাচীন-মতাবলম্বী প্রবীর্ণগণই কান্দিবাস করেন,—এখন দেখিলাম, বহু ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিও জীবনের সাগাহে বাঙ্গালীর বন্ধে শান্তির সন্ধান করিতেছেন। বাঙ্গালীতে চিকিৎসকেরও বাহুল্য। বাঙ্গালীতে অন্ন ব্যয়ে বাস করা যায়। এত করকারীর আমদানি আর কোথাও হয় কি না সন্দেহ; রাহনগরের বাঁধাকু আকারে ও স্থানে অতুলনীয়। বাঙ্গালীতে কৃষকের বাহুলাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিপনীতে দেব-পূজার জন্য তুপাকার গাঁদা, জবা ও কাটমলিকা; গৃহস্থের উদ্যানে গোলাপ ও চন্দ্রমলিকার আকার ও সংখ্যা দেখিবার মত বটে। আবার বাঙ্গালীতে সন্তানদিগের শিক্ষার সুবিধাও বাঙ্গালী বাসের অন্ততম প্রয়োজন। সরকারী কুইন্স কলেজ ও পেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ ব্যতীতও অনেকগুলি ইংরাজী বিদ্যালয় কান্দিতে আছে। কুইন্স কলেজের গৃহ নয়নাভিরাম। প্রাচীন গথিক স্থাপত্যরীতিতে গঠিত। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ মেজর কীটোর রচিত আদেশে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এই গৃহ নির্মিত হয়। কাহারও কাহারও মতে ভারতে ইংরাজ আর এরূপ শাস্ত্রীযাব্যয়ক গৃহ নির্মিত করান নাই। কলেজের প্রাঙ্গণ বহুদূরবিস্তৃত—ইহাতে গৃহের সৌন্দর্য্য আরও বর্ধিত হইয়াছে। একই গৃহে চোর-বেকে ইংরাজী শিক্ষা ও কলাসে সংযুক্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ণ সম্মিলন। কলেজের নিকটেই অধ্যক্ষের ও একজন অধ্যাপকের বাসগৃহ। উত্তরদিকে পাঠাগার নির্মিত হইতেছে। এই গৃহে বহুশৃঙ্গা পুস্তক ও পুঁনিগুলি রক্ষিত হইবে। ইহাতে অল্পমন্ত্ৰিগু পাঠার্থীদের সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে। গ্রীষ্ম ঋতু করিয়া বলিয়াছেন—গৃহটিতে স্থাপত্য সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই। ইহা এ দেশে ইংরাজের অধিকাংশ গৃহের সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। কলেজের পশ্চাতে একটি ভগ্নশীর্ষ প্রস্তর স্তম্ভ। গাজীপুরের সন্নিকটে ইহা আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে ইহার উচ্চতা প্রায় ২১ হস্ত। স্তম্ভপায়ে স্তম্ভ অক্ষরে যে লিপি ক্ষোদিত তাহাও অনেকটা ক্ষয়িত হইয়াছে। ইহার পাদদেশে ইহার আবিষ্কারের ও আনয়নের বিবরণ ক্ষোদিত হইয়াছে। কলেজের চূড়া-গৃহ হইতে দূরে সারনাথ দৃষ্ট হয়।

সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ মিসেস্ জ্যানি বেগান্ডের অক্ষর কীর্তি। কলেজের

জ্ঞান কানীনয়েণ বহুশ্রী অটালিকা ও বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করিয়াছেন। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে বিজ্ঞানসংলগ্ন নানা গৃহ নানা দাতার যশস্বয়ী করিতেছে। প্রাচ্যেণ বারানসী, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী নানা জাতীয় জাত জীভা করিতেছে, একত্র পাঠ্যভ্যাস করিতেছে, ছাত্রাবাসে একত্র বাস করিতেছে—এ দৃষ্ট বস্তবিকই বড় আনন্দদায়ক। এই বিদ্যালয় যে ভারতে জাতি-সংগঠনে বিশেষ সহায়তা করিতেছে তাহাতে সন্দেহনীয় নাই।

ভূটেকলাসের রাজা জয়নারায়ণ কর্তৃক ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জয়নারায়ণ কলেজ এক্ষণে খৃষ্টধর্ম প্রচারকদিগের কর্তৃত্বাধীন।

ভিক্টর রাজা উদয়প্রতাপ সিংহ তদীয় পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুর পর সংসার-বিরাগী হইয়া কানীতে বাস করিতেছেন। তিনি প্রধানতঃ কৃত্রিম বালকদিগের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার আবশ্যক ব্যয় মিস্সাহার্ষ ১০ লক্ষ টাকা, ছইটি গৃহ, ১৮০ বিঘা জমী ও গৃহ নির্মানার্থ আরও ১৫০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। সরকারী কলেজে ও হিন্দু কলেজে সংলগ্ন শিক্ষার স্বতন্ত্র বনোবস্ত থাকায়, ভারতের নান্য স্থানের বহু পণ্ডিত কানীতে বাস করায় ও নান্য ছাত্র বিদ্যার্থীদিগের আহ্বানের ব্যবস্থা থাকায় বারানসীতে সংস্কৃতশিক্ষার্থীদিগের বিশেষ স্রবধা হয়।

ভিক্টর রাজা হিন্দু কলেজের নিকট একটি আত্মরাত্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভূটেকলাসের রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত কানীনকর আত্মরাত্রম বহু দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। আমরুক্ষ মিশনের সেবাপ্রমে কনখল, ব্রহ্মাবন প্রভৃতির মত কানীতেও আত্মরাত্রম আশ্রয় পাইয়া থাকে। বিজয়নগাধিপের প্রাসাদ-সান্নিধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি ক্ষুদ্র হাঁসপাতাল ও ঔষধালয় বিদ্যমান। এইগুলি ব্যতীত কানীতে সরকারী ও খৃষ্টধর্মরাজকদিগের বহু হাঁসপাতাল ও ঔষধালয় আছে।

পবিত্র মণিকর্ণিকার ঘাটে দান সমাপন করিয়া তীর্থদর্শক দেবদর্শন আরম্ভ করেন। এই মণিকর্ণিকা মহাশয়ানের সহিত পৌরাণিক দানবীর হরিশ্চন্দ্রের পুত্র্য নাম বিজড়িত। বৃদ্ধ দেবও কানীর উপকণ্ঠে সায়নাথে বীর ধর্মমত প্রচারিত করিয়াছিলেন। কারণ, তখনও বারানসী হিন্দুর মহাতীর্থ। এই তীর্থে সর্গদা ধর্মশিপাহুর সমাগম হইত। ইহা হইতে বারানসীর প্রাচীন-যের কিছু আভ্যাস পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস, কানীর প্রতিষ্ঠা ভারতে আর্থানিবাসারস্ত্রেরই সমসাময়িক। কানীতে তদুভাগ ও মণিকর্ণিকার চিত্তানলে

মৃতদেহ ভস্মসাৎ করা হিন্দুর সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। বর্ষাবারিপাতে গঙ্গার জলধারা ১৫১০ হাত উচ্চ হয়। তখন তীরস্থ বহু ক্ষুদ্র মন্দির জলে ও কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া যায়। বর্ষার পর সেই সকল মন্দিরের কর্দ্দম দূর করিতে হয়। বর্ষাকালে শবদাহের অভ্যাস অল্পসিদ্ধ হইত বলিয়া প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণাশ্রম শীতলপ্রসাদ খজাপ্রসাদের অংশী বাবু মতিচাঁদের যত্নে ও প্রায় লক্ষযুগ্ম দ্বারা এক জুহুয় প্রস্তরনির্মিত ষাট প্রস্তত হইয়াছে। অল্প সময় নিরে গঙ্গার কূলে শবদাহ হয়, বর্ষায় উপরে চত্বরে গঙ্গাগর্ভে শবদাহ হইতে পারে।

দশাশ্বমেধ ষাটকে ষাটবস্ত্র বারাগসীর মধ্যবর্তী ষাট বলা বাইতে পারে। দক্ষিণে অসিনঙ্গম হইতে উত্তরে বরুণা পর্যন্ত বারাগসীতে প্রায় পঞ্চাশটি ষাট বিস্তারিত। তন্মধ্যে অনেকগুলির অসংরত অবস্থা প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের উত্তরাধিকারী-দিগের অমনোযোগ বা অবস্থাবিপর্ধ্যায়ের প্রমাণ দিতেছে। ভারত-ধর্মমহামণ্ডল এই সকল ষাটের সংরক্ষণবিষয়ে মনোযোগী ও উদ্যোগী হইলে ভাল হয়। দশাশ্ব-মেধ ষাটে এক অদ্ভুত ইত্যাহার আছে—ইহাই প্রকৃত দশাশ্বমেধ ষাট—কেহ কাহাকেও অল্পরূপ বুঝাইয়া প্রবঞ্চিত করিলে আইন অঙ্গসারে দণ্ডনীয় হইবে! পূণ্য তীর্থে সামান্য অর্থের জন্য গবাকনা কি ঐতই জলভ?

ষাটের উপর একটি চুঙ্গী নাগল আদায়ের কাগ্যালয়। ইহার বামে আর একটি ষাটে কানীর গৃহনির্মাণার্থ চুণার প্রস্তরের আমদানী হয়। নিকটে দক্ষিণে বাজারে মৎস ও তরকারী বিক্রীত হয়। কূলে জৈনমন্দির বিস্তারিত বলিয়া কানীর নিরে গঙ্গার কতকংশে মৎসগ্রহণ নিষিদ্ধ। স্থানের পক্ষে দশাশ্বমেধ ষাটই সর্বাপেক্ষা জুগম ও হরক্ষিত। কেবল এই ষাটেই শকটারোহণে আগমন সম্ভব। এই রাস্তা কিছু দূর যাওয়া গোপুলীর নিকট তিন দিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

দশাশ্বমেধ ষাটের পরেই উত্তরে মানমন্দির ষাট। এই মানমন্দির অন্নপূর্ণ-প্রতিষ্ঠাতা জগসিংহের অপূর্ণ কীর্তি—কিন্তু বর্তমানে ধ্বংসোদ্ভূত। মহারাজ জগসিংহ জ্যোতিবগননার অল্প অন্নপূর্ণে, দিল্লীতে, উজ্জয়িনীতে, মথুরায় ও বারাণসীতে মানমন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীতে বর্তমানে মান-মন্দিরের চিত্রমাত্র অবশিষ্ট আছে; অপর কয়স্থানে মন্দিরগুলি এখনও বিস্তারিত। এই মন্দিরে বহু স্তূপবৎ স্তম্ভ রহিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, অন্নপূর্ণাধিপ স্বীয় জ্ঞানকিন্দু বংশপতির এই কীর্তি-সংরক্ষণে সচেষ্ট হইয়েন নাই। পণ্ডিত বাগুদেব শাস্ত্রীজীও এই মন্দিরবিবরণ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মন্দিরেই বিক্রীত হয়।

ইহার পর মণিকর্ণিকাই প্রধান ঘাট। মধ্যে নেপালী মন্দির ও ক্ষুদ্র ঘাট। মন্দির ও তৎসংলগ্ন অতিথিশালাও নেপালী প্রণায় কার্ঠে ও ইষ্টকে নির্মিত। ইহা বারাণসীতে অসাধারণ বটে। মণিকর্ণিকার পর সিকিয়ার ঘাট—এক বিশাল ধ্বংসাবশেষ। এই স্থানে ইন্দোর দরবার এক বিশাল ঘাট ও তদুপরি এক বিরাট প্রাসাদ নির্মিত করাইতেছিলেন। কিন্তু নিম্নে ভিত্তি সেই গুরুভার প্রস্তরের ভারসহনোপযোগী না হওয়ার সমস্ত ঘাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তথ্য প্রস্তররূপ দেখিয়া প্রাসাদকল্পনার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায়। তাহার পর গোয়ালির ঘাট উল্লেখযোগ্য। ঘাটের উপর অট্টালিকা প্রস্তরস্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার কিছু পরে ভৌসলা ঘাট ও গোলওয়ার নিদর্শন—বাকীয়াও ঘাট। মহারাষ্ট্ররদিগের নিদর্শন এই সকল ঘাট পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থিত। কানীতে মহারাষ্ট্রর অধিবাসীও বসে। ইহার পরই দ্রষ্টব্য—পঞ্চগঙ্গা ঘাট ও তদুপরি আরম্ভের মসজিদ। এই স্থানে নদীকূল অত্যন্ত উচ্চ—খিলবৎ। তদুপরি এই মসজিদের চূড়ায ১৪০ ফিট উচ্চ। পূর্বে চূড়া আরও উচ্চ ছিল কিন্তু জর্জ হওয়ার ইহার কতকংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। চূড়া হইতে বারাণসীর দৃশ্য অতুত; সমগ্র সহর পদপ্রান্তে প্রসারিত, অগণিত মৌখ ও মন্দির, নগরের অধিকাংশ রাজপথই সজ্জার, উচ্চ হইতে তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না—যেন সমস্তই সহর—মৌখের ও মন্দিরের সম্মিলন, কেবল মধ্যে মধ্যে বুদ্ধের স্তম্ভ শোভা সে দৃশ্যে বৈচিত্র্য প্রদান করে। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে দূরে সায়নাথও নাকি দৃষ্ট হয়।

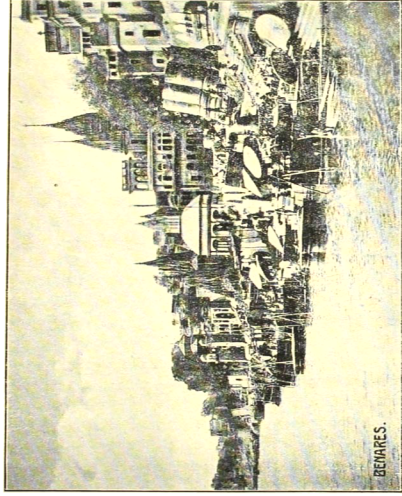
দশাশ্বেধ ঘাটের দক্ষিণে প্রধান ঘাট—শিবালয় ঘাট ও কেশব ঘাট। এই কেশব ঘাট বাঙ্গালীটোলার অবস্থিত ও প্রধানতঃ বাঙ্গালী কর্তৃকই ব্যবহৃত। শিবালয় ঘাট স্নানার্থ বড় ব্যবহৃত হয় না। ইহার সহিত বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত। ঘাটের উপর চৈতসিংহের হুর্গ প্রাসাদ আজও বর্তমান। এই স্থানে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে চৈতসিংহকে ধরিতে যাওয়া ইংরাজ সেনাদল নিহত হয়। প্রাসাদের সন্নিকটে নিহত ইংরাজসেনাপতিত্রয়ের সমাধি। আর যে স্থানে তালারা নিহত হইয়াছিল, সে স্থান হইতে বহু দূরে চৈতগড়স্থানার নিকটে একটি প্রাচীর-বদ্ধ সমাধিক্ষেত্র নিহত সিপাহীগণের স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছে। শিবালয়ঘাটের উপরস্থিত প্রাসাদে লর্ড কার্জনের নির্দেশে নিবদ্ধ প্রস্তরফলকে এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘোষিত হইতেছে। গঙ্গা তীরে কানীধামে এই আধুনিক, ঐতিহাসিক নিদর্শন কেমন আত্মনিক বলিয়া মনে হয়। এই প্রাসাদ বর্তমানে ইংরাজের

বৃত্তিভোগী করজন দিল্লীর সম্রাটবংশীয় ব্যক্তির বাসস্থান । প্রাসাদও বিশেষ অসংকুলত নহে ।

বারাণসীতে আধুনিক ঐতিহাসিক নিদর্শন অধিক নাই । এই প্রাসাদ ব্যতীত আর হুইট স্থান উল্লেখযোগ্য—নাদেশ্বরকুটী ও মাধোদাসের বাগান । চেন্সিংহের সহিত পোলযোগের সময় ওয়ারেন হেস্টিংস এই বাগানে ছিলেন । সাধত আলি অমোঘ্যার নবাব হইলে রাজ্যচ্যুত নবাব ওরাজীর আলিকে এই উদ্যানগৃহে রক্ষা করা হয় । তাঁহার ব্যবহার সন্দেহোদ্দীপক বলিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রেসিডেন্ট চেম্বার প্রতীক্কে নৃশংসভাবে নিহত করেন । কালেক্টর ডেভিস তখন সপরিণামে নাদেশ্বরকুটীতে বাস করিতেছিলেন । তিনি অসাধারণ সাহস সহকারে আত্মরক্ষা করেন । মাধোদাসের বাগানে এক্ষণে রাখাখানী সম্রাটের প্রধান আস্তানা । চেম্বার বাসগৃহ এক্ষণে কালেক্টরের কাছারী । নাদেশ্বরকুটী কান্দীরেণের সম্পত্তি—অতিখিশালরূপে ব্যবহৃত । গৃহগাত্রে লর্ড কার্জনের নির্দেশে নিবদ্ধ প্রস্তরফলক পুরীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার পরিচয় দিতেছে । ক্যান্টনমেন্ট ট্রেন হইতে সহরে বাইতে সর্বপ্রধান দ্রষ্টব্য—পূর্বকথিত সমাধিক্ষেত্র । তাহার পর উল্লেখযোগ্য—রাজা মাধোলালের নূতন প্রাসাদ । শিবালয় ঘাট হইতে নিরে (কান্দীরে গঙ্গা উত্তরবাহিনী বলিয়া উত্তরে) জলের কলের জল-গ্রহণ দান । এই জল ভেলুপুরার পরিকৃত করিয়া সহরে বণ্টন করা হয় । ইহার পর বারাণসীর উত্তরসীমা অসিসমূহ । নদী-গর্ভ পার্শ্বস্থ ভূমির সহিত গ্রাম সমতল—কেবল বর্ষার জলধারার অতিব অশুভব করা যায় ।

বলা বাহুল্য বারাণসীর সর্বত্র দেবালয় । বারাণসীতে দেবালয়ের সংখ্যা এত অধিক যে, যাহারা সমস্ত জীবন বারাণসীতে বাস করিয়াছেন—তাঁহাদের পক্ষেও সমস্ত দেবালয়ের বর্ণনা করা অসম্ভব । কান্দীরে দেবালয়-প্রতিষ্ঠা হিন্দুর পরম আকাজিক কার্য—কাষেই দেবালয়ের অন্ত নাই । তন্মধ্যে বিশেষত্বের ও অল্পপূর্ণার মন্দিরই সর্বপ্রধান । উত্তর মন্দিরই সঙ্গীর্ণ গলিরাস্তার অবস্থিত । বিশেষত্বের মন্দির বৃহৎ নহে ; মন্দির গলিরাস্তায় অবস্থিত বলিয়া মং-রাজ রণজিৎ সিংহের ব্যয়ে নির্মিত স্বর্ণচূড়া নিকট হইতে দেখা যায় না । মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে, ভারতের প্রায় সকল হিন্দু মন্দিরের মত ইহা একদ্বার নহে—তিন দিক হইতে মন্দির-গর্ভে প্রবেশ করা যায় । প্রাঙ্গণ কোন

আর্যাবর্ত—



দীক্ষিতা খাট—বারাণসী ।

জন্মের ব্যয়ে খেত ও কৃষক মর্শ্বেরে মজিত—প্রত্যেক মর্শ্বরথের চারি কোণে একটি করিয়া রক্তমুদ্রা নিবদ্ধ—বহু ব্যক্তির পাদমর্শ্বেরে মুদ্রাগুলি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত; মন্দিরে প্রস্তর-কোদিত শিল্পশ্রব্যাও অধিক। বর্তমান বিবেচকের মন্দির বহুদিনের নহে। পুরাতন মন্দিরের ভিত্তির উপর—হিন্দুর তাঁহের মধ্যস্থলে—আওরঙ্গজেবের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ মসজিদ। আওরঙ্গজেব মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মসজিদ মন্দিরের উপাধানে নির্মিত হইয়াছিল—মসজিদের প্রাচীরে এখনও কোদিত প্রস্তরে তাহার স্মৃষ্টি প্রমাণ দেখা যায়। মসজিদের পার্শ্বেই জ্ঞানবাণী। প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসময়্রে দেব মন্দিরের পুরোহিতগণ বিবেচককে এই কুপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রাখা করিয়াছিলেন। অহল্যাবাই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এই কুপের উপর ও চতুঃপার্শ্বে প্রস্তরখাড়া একটি মনোরম আচ্ছাদন নির্মিত করিয়া দিয়াছেন। পূর্বে কুপমধ্যে পুষ্পাদি নিক্ষিপ্ত হইত; বহু শতাব্দীর সঞ্চিত আবর্জনার কুপোদক পুষ্টিগন্ধময় হইয়াছিল। মধ্য ইহার সংস্কারের পর হইতে কুপমুখ বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অর্ঘ্যাদি বস্ত্রোপরি নিক্ষিপ্ত ও পরে স্থানান্তরিত হয়। পুরোহিত রক্ষুর সাহায্যে মল উত্তোলন করিয়া যাত্রীদিগকে দিয়া থাকেন। গ্রীষ্ম বলিয়াছেন, হিন্দুরা ইহার মল পুত বলায় খৃষ্টানগণ বিজ্ঞপ করেন; কিন্তু খৃষ্টান-দিগের নিকট কি পুত বারির কলনা অজ্ঞাত?

নিকটে কালঠৈরব, সূর্য্য, শনি প্রভৃতির মন্দির। কালঠৈরব কানীর সহর-কোত্তরাল। পূজা করিয়া তাঁহার অহুমতি না লইলে বিবেচকদর্শন নিষ্ফল হয়। তাঁহার দণ্ড গ্রহণ করিয়া পরে বিবেচক দর্শন করিতে হয়। যাত্রীমাজেই শনির পূজা করিতে ব্যস্ত—কারণ নির্দেশ বাহ্যলমাজ। সূর্য্য-দেব সপ্তাশ্রমে উপবিষ্ট। হিন্দুরা কি আলোকের সপ্তবর্ণময়ময়ের কথা অবগত ছিলেন? বিবেচক দর্শন করিয়া সাক্ষী-বিনায়ক দর্শন করিতে হয়। তিনি বিবেচক ও অন্নপূর্ণা দর্শনের পূণ্য লিপিবদ্ধ করেন। এই পথ হইতে কচুরী গলি দিয়া দশাশ্রমেঘ ঘাটের পথে আসা যায়। ছই রাস্তার সংযোগ-স্থলে অনেকগুলি খাবারের দোকান আছে। বোধ হয় উহাই গলির এই নামকরণের কারণ। কানীর মিটার ও অস্ত্রাস্ত্র খাবার অতি উপাদেয়। পথের উত্তর পার্শ্বে পূজার বাসন ও অস্ত্রাস্ত্র পিতল ত্রযোয় দোকান। দশাশ্রমেঘ ঘাটের নিকট দিয়া—দক্ষিণা মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া, চক্রতীর্থ ও মণিকর্ষিকা হইয়া, গঙ্গাতীর

বহিরা, পকগঙ্গাঘাটের উপর বৌমাধবের ধ্বজা দেখিয়া, তৈলস্বামীর মূর্তি মন্দির হইয়া, জ্ঞানবাণী, বিবেচনায় ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া, এই পথে পুনরায় দশাশ্বমেধের নিকট উপনীত হওয়াই প্রাপ্ত ।

‘অর্দ্ধবন্দেশ্বরী’ রানী ভবানীর পূণ্যকীর্তিতে কালীধামে বাঙ্গালীর নাম পরিচিত রহিয়াছে । তাঁহার কীর্তির মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—প্রথম কালীর সীমানিকারণ ও কান্দি-প্রদক্ষিণের পকক্রোশবাণী পথের সংস্কার—দ্বিতীয় তুর্গা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা । বানরের প্রাচুর্য্যহেতু তুর্গাবাড়ী বিদেশীয় দর্শকদিগের নিকট Monkey Temple বা বানরমন্দির নামে পরিচিত । কেহ মন্দিরে উপস্থিত হইলে চারিদিক হইতে বহু বানর আসিয়া আহাধোর জন্ত তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলে । কখন কখন দুই এক জন বিদ্রোহী বানরদিগকে আহাধা দিতে দিতে মন্দিরে প্রবেশ করার মন্দির-দ্বারে ব্রিধর্মীর প্রবেশ-নিষেধ-জ্ঞাপক বিজ্ঞাপন । পার্শ্বে তুর্গাকূণ্ড নামক সরোবর । ইহার জল বড়ই অপরিষ্কার—সরোবরের সংস্কার বিশেষ প্রয়োজন । নিকটে স্বামী ভাকরানন্দেব্র সমাধি ;—স্বরক্ষিত উদ্ভানমধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে স্বামীজির শ্বেতমর্ম্মর মূর্তি । সম্মুখে মর্ম্মরশচিত সমাধি ।

হিন্দু কলেজ, ভিক্টা আত্মপ্রদর্শন, জলের কল প্রভৃতি দেখিয়া রামনগরে যাওয়া যায় । রামনগর পরপারে—কান্দীনরেশের রাজধানী । চেতসিংহ সিংহাসন-চ্যুত হইলে জ্ঞাতি মোহিত নারায়ণ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন । বর্তমান রাজা তাঁহারই বংশধর । স্বর্ধ্যাকালে কালী হইতে পরপারে স্নানভেজ রবিবরে উদ্ভাসিত প্রাসাদের শোভা যেমন মনোরম—প্রভাতে রামনগর হইতে বরাণসীর বিচিত্র শোভা তেমনই চিত্তবিমোহন । তখন বরাণসী নিদ্রাবসানে আগিয়াছে । ঘাটে বর্ণবিচিত্র্যবহুলবেশধারী স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীর সমাগম । ঘাটে শতকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে । গঙ্গার বারিপ্রবাহে নিখাল্য ভাসিয়া বাইতেছে । কালীর পূণ্যক্ষেত্র তখন পূর্ণ বহিয়ার সপ্রকাশ ।

কান্দীর সৌন্দর্য্য গঙ্গাতীরে । সার রিচার্ড টেম্পল বথার্থই বলিয়াছেন, অগতে আর কোন সহরের এরূপ নদীকূলসৌন্দর্য্য নাই । আর অর্ধশত ঘাট হইতে সোপানশ্রেণী গঙ্গাপার্শ্বে নাথিয়া গিয়াছে ।

বাঙ্গালার সহরের বিকৃত ও শকর-স্থাপত্য নিবর্শনের পর কালীর স্থাপত্য দেখিলে চক্কু জুড়ায় । বরাণসীর নতুন গৃহশিল্প ও প্রাচ্য স্থাপত্যাদর্শে

গঠিত। চকে পানী, প্রধান পানী, টেলিগ্রাফ আফিস, টাউন হল প্রকৃতি মনোরম। টাউন হল বিজয়নগরাধিপের ব্যারে নিশ্চিত। পথের পরপারে নগরী প্রচ্যেপণী স্তম্ভ কার্যালয়ও উঠে। মিউনিসিপাল আফিস হাঁসপাতালের নিকটে অবস্থিত। একথও অস্বাস্থ্যকর ভূমিতে ভিক্টোরিয়া উদ্ভান প্রতিষ্ঠিত করিয়া নগরের সে অংশের সৌন্দর্যের ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করা হইয়াছে।

কানীর অধিবাসীর একচতুর্থাংশ মুসলমান। কানীতে মসজিদ অনেক। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকটই মসজিদের ও বেণীমাধবের ধ্বজা নামে খ্যাত মসজিদের উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। প্রায় সকল প্রধান মসজিদেই বিনষ্ট হিন্দুমন্দিরের স্থাপত্যনিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীডসের পুস্তকে সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

বারাণসীর প্রধান শিল্প-রেশমী বস্ত্র, বেণারসী কাপড় নামে খ্যাত কিং-বা ও পিত্তল দ্রব্য। লোকের কচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিংবাবের ব্যবহারের হ্রাস হইয়াছে—এ ব্যবসায়ের এখন আর উন্নতি নাই। পিত্তলের ও তাম্রের দ্রব্য প্রায়ই পূজার উপকরণরূপে গঠিত হইত। বর্তমানে যুরোপীয় মহলে সমাদৃত হওয়ার যুরোপীয় আদর্শেও বহুবিধ দ্রব্য গঠিত হয়। সম্ভবতঃ ইংরাজ রাজ্যে এই ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়াছে। কানীর আর এক শিল্প কাঠের রঞ্জিত খেলনা।

হিন্দুরা দেবকর্মে তাম্রপাত্র ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে যুরোপীয় বিজ্ঞান-চাচাৰ্য্যগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পানীর জল একদিন তাম্র-পাত্রে রাখিলে সর্বদোষশূন্য হয়।

কানীর দক্ষিণে পরঃপ্রণালীবাহিত আবর্জনারি গঙ্গার নীত হয়। ইহাতে বহু বিদেশীয় পর্য্যটক কানীর নিয়ে গঙ্গার পুত ব্যতির মলিনতার উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞপ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্রয় সরকারী রসায়নাগারের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ জীবাণুবিদ ডাক্তার হ্যানকিন বলিয়াছেন, গঙ্গার ও যমুনার জলে কলেরা জীবাণু থাকিতে পারে না। সে বাহাই হউক, পরঃপ্রণালীর গতি-পরিবর্তন বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

• "I have discovered that the water of the Ganges and the Jumna is hostile to the growth of the cholera microbe, not only

পর্যাপনকে সুগম্যমানের নবাজের জন্ত কালীনত্রেণ এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করিয়াছেন । গ্রীডুস ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহাতে আধুনিককালে বাণাণসীতে যে উদারতা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাই স্থূলভাষায় দেখা যায় । গ্রীডুস বৃত্তিতে পারেন নাই, উদারতাই হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব । হিন্দু কখনও প্রচারকনিয়োগাদিধারা অস্ত্র ধর্মের ক্ষতি করিয়া নিক্সিকর্মের চেষ্টা করে নাই ; পরন্তু সঙ্গীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়া বিশ্বজনীন উদারতার আদর্শ সংস্থাপনই করিয়াছেন । হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব বর্জনে নহে—গ্রহণে, ত্যাগে নহে—প্রেমে, সঙ্গীর্ণতার নহে—উদারতার ।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ।

আলোক ।

(ইংরাজী হইতে)

রাত্রি হেরিছে অদূত নয়নে,
দিবলের হুঁ একটা লোচন ;
তবু জেনো, সেই একেরি বিহনে,
বিশ্ব আধারে হয় নিমগন ।

মন চেরে দেখে লক্ষ নয়নে,
একটি লোচনে ছদ্ম চার ;
তবু জেনো, সেই একেরি বিহনে,
জীবনের জ্যোতি বীরে নিবে যার ।

শ্রীধরীশঙ্কর বসু ।

owing to the absence of food materials, but also owing to the actual presence of an antiseptic that has the power of destroying this microbe. At present I can make no suggestion as to the origiu of this mysterious antiseptic,"—The Cause and Prevention of Cholera.

মালদহের পল্লী-কথা রামাবতী ও গোড়

(বিশেষ বিবরণ)

রামাবতীর

রাজমার্গ, হাটবাজার, অট্টালিকা, দেবালয়, অধিবাসী,
ধর্ম্মাচরণ, ব্যবহার ও মনুষ্য জাতি।

রামাবতী নগরীর সংস্থানের কথা এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি উপনগরীর নামমাত্র পূর্বপ্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে; উহাদের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি মালদহের প্রাচীন রাজধানী, নগর, উপনগর, পল্লী প্রভৃতির ঐতিহাসিক বিবরণ অমূল্যকালে ত্রুটি হইয়াছেন। এই কার্যের সর্বপ্রথম উৎসাহদাতা ও অগ্রগণ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, মহাশয়; তাহার ঐকান্তিক উৎসাহে ও চেষ্টায় মালদহের পল্লীকাহিনী প্রকাশিত হইতে চলিল। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি দেশের যে মহৎ কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, তাহার বিবিধ অগ্রগণ্যের মধ্যে ইহা একটি কুদ্রাংগ মাত্র। ‘মালদহের পল্লীকথা’ মালদহের প্রত্যেক ঐতিহাসিক প্রাচীন স্থানের সর্বপ্রকার ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে। উহাতে কুবি, শিল্প, বাণিজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন সামাজিক চিত্রাদিও প্রদত্ত হইয়াছে। অধ্যাপক সরকার মহাশয় এই মালদহের ‘পল্লী-কথা’ প্রকাশের মূল। তাহার ঐতিহাসিক অমূল্যকানকারী ছাত্রগণ মালদহের প্রাচীন ও বর্তমান ঐতিহাসিক কাহিনী সংগ্রহে ও প্রচারে নিযুক্ত হইয়া কার্যে ত্রুটি হইয়াছেন। অধ্যাপক সরকারের মালদহের ঐতিহাসিক অমূল্যকানকারী ছাত্রগণের সমবেত শক্তিতে ঘাঘা আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইবে বা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ ‘আর্য্যাবর্তে’ প্রকাশিত হইবে।

রামাবতীর শোভা

রামাবতীর সংস্থান-বর্ণনা-কালে আরও কয়েকটি নগরউপনগরাদির নামোল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল স্থানাদির পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিতে করিতে,

মালব্ধের সমগ্র প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানসমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি রামাবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সবিশেষ বিবরণ-প্রদানের জন্ত লিখিত হইল।

নগরের শোভা কিরূপ মনোহর ও সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিতে হয়, কবি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। কবিগুরু বাম্বীকি অধোধ্যায় শোভা বেরূপ চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী কবিগণও সেই প্রকারে স্ব স্ব বর্ণনীয় বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। কবিগণের বহু কল্পনা অসত্য হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের রাজধানীর শোভা-বর্ণনা বহু স্থানে বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়। তাবম্বর বাম্বীকি অধোধ্যায় শোভা-বর্ণনা করিয়া বাহ্য বিলাসিতার নিদর্শনটুকু তাহাই লঙ্কার শোভাবর্ণনায় বিবৃত করিয়াছেন, তিনি “কাকনেনাবৃত্তাং রম্যাং” হইতে আরম্ভ করিয়া যে অভূতলীয় বিলাসিতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সেই সময়ের পক্ষে অদ্বিত ব্যাপার। বখন দেশের সত্যতা কিরূপ ছিল তাহা আমাদের বিবেচ্য বিষয়। লঙ্কার রাজপথে আলোক দিবার ব্যবস্থা ছিল; রাজ-গৃহে যত্নবৃত্ত বাজনীতে বায়ুলকালন হইত। রামের অধোধ্যায় সে সকল ছিল না।

রামাবতী পালরাজ রামের অধোধ্যায়, সক্ষ্যাকর কলিকালের বাম্বীকি। তিনি রামাবতী দেখিয়া বাহ্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বড় উপায়ে। রামাবতী-প্রবেশ-সীমা-ভূমি পুণ্ড্রোত্তান ও কলোত্তানে শোভিত ছিল। তথায় পবন কেতকী-কুহুম-সুবাসিত ও সরোবর প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলে শোভিত ছিল। উত্তান ভ্রমরগুহন-মুখরিত ছিল। তথায় বহু দেবালয়ের উন্নত হেমচূড়া দূর হইতে রামাবতীর পরিচয় দিত। নগরী রাজপদোপলীবিগণের আবাস-ভবনে ও বিবিধ রাজভোগ্য গৃহে শোভিত ছিল। রামাবতীর পশ্চিম পার্শ্বে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। সে স্থান বানিজ্যার্থী সাধু বণিকগণের সংঘ, ও তরঙ্গীসমূহে সমাকুল ছিল ও তথায় ধনকুবেরগণের বাসভবন শোভা পাইত। বন্দর, হাট, বাজার, বিপণিসমূহে রামাবতী শোভিত ছিল। রামপাল সত্ৰীক এই রামাবতী নগরে সাধু জনগণে পরিবৃত্ত হইয়া গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন।

সক্ষ্যাকরের বর্ণনায় বহুকাল পরে, আজ ছইশত এক বৎসর গত হইতে চলিল, যনরাম রামাবতীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বেল রামাবতীর পথ, হাট, উত্তান ও শোভার পরিচয় নন্দী কবির বর্ণনীয় বিষয়েরই কুল্য বলিয়া মনে হয়।

ঘনরামের রামাবতীর শোভা।

“দেখ ঐ সারি সারি গুয়া নারিকেল।
কদম-কুহম চাপা বহুল ঐকণ ॥
আম জান পলাশ পিপুল তরুবরে।
সারি সারি পুষ্কর প্রান্তরে শোভা করে ॥
হস্তীনানগর হেন হর অহমান।
পরিসর পাষাণে রচিত পুষ্করান ॥
মঠ কোটা মন্দির সহর সৌধময়।
কত ঠাই দেউল দেহারা দেবালয় ॥
কত কাঁচা-কাঞ্চন-কলস শোভে তার।
ঐ দেখ পতাকা উড়িছে মন্দ বায় ॥
মাতুল-মন্দির যেতে জানি ভাগে পথ।
সেন কন কি কাজ উদ্দেশে দণ্ডবৎ ॥
* * * * *
দেখা পাই দ্বৈবৎ মেশোর বাটী আগে।
পাও কি না পাও দেখা চাও জানি ভাগে ॥
বলিতে বলিতে বেলা হইল অবশেষ।
রমতি নগর এসে করিল প্রবেশ ॥” (১২-দর্শ)

দুইশত বৎসরের পুরাতন কথা।

দুইশত বৎসর পূর্বে ঘনরাম রামাবতীর বর্ণনা করিয়াছেন। তখন হয় ত তিনি গোড় উপনগরীর কিঞ্চিৎ সঙ্কীৰ্ত্তা দর্শন করিয়াছিলেন এবং সঙ্ক্যাকর নন্দীর বর্ণনা দেখিয়াছিলেন। সেই কারণে ঘনরাম নন্দী কবির—

“দরদলিতকনককেতককাস্ত্রিমপাশেবকুণ্ডলমহিতাম্।

অরবিন্দেন্দীবরমরসলিলসুভিনীতলবঙ্গনাম্ ॥” ২২ (রাম-৩ পরি)

এবং—

“অপি ধবলধামলোখা লক্ষ্মীভারতিল্লবপুৰলীলাম্।

নিরুপরি কনককলসসেনকার পীবরপয়োধরাভোগার ॥” ২৩ (ঐ)

এই প্রকার রচনার অহুকরণ করিয়াছিলেন। রামাবতীর বিবিধ বর্ণনাগ-
রচিত মন্দির “কনকধামলোখা” সঙ্ক্যাকর বিবকর্ণ-বিনির্দিষ্ট বলিয়া বর্ণনার
শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

খনরামের সময়ে মোসলমানরাধধানী ভেরতাবাদও ছিল না, লক্ষণের রাজধানী লক্ষণাবতীও ছিল না, রামাবতীও তখন রমতী হইয়া প্রাচীন সৌন্দর্য্য হারায়াছিল । কিন্তু এক ধর্ম্মসম্রদায় তখনও রমতী গোড়নগর সম্বন্ধে দৃষ্টিতে দেখিত বলিয়া রমতী গোড়ের প্রাচীন শোভার কথা গাহিয়া জনগণজনয়ে সেই প্রাচীন সৌন্দর্য্যের একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল । কবিকঙ্কন, খনরামের পূর্বে, চণ্ডীতে গোড়নগরের চিত্র জনয়ে লইয়া কালকেতুর গুজরাটে বন কাটাইয়া গোরব বোধ করিয়াছিলেন । খনরামের রমতী ও গোড়বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া স্বীকাণ করি । তিনি রমতী গোড়ের যে সম্ভব চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেরই উপভোগ্য হইয়া রহিয়াছে ।

রামাবতীর পথ

সেকালে দক্ষিণ দেশ হইতে গোড় রমতী আসিতে হইলে অধিকাংশ স্থলে “তরতীপুরের” নিকট বড়গঙ্গা পার হইয়া গোড় উপনগরে প্রবেশ করিত হইত । রাজমহল ও অন্তান্ত স্থানে পারাপারের ঘাট থাকিলেও সকল ঘাটগুলি হ্রস্কিত ছিল । এবং দক্ষিণ দেশ হইতে আগত পথিকের পক্ষে প্রথম পথই সরল ছিল । বর্তমান মোসলমান গোড়ের “কোতোয়ালী” দরজা তখন ছিল না, কিন্তু ঐ স্থান দিয়া উত্তর গোড়ে আসিবার পথ ছিল এবং অত্র একটি পথ রামকেলীর পার্শ্ব দিয়া গঙ্গাতীরে উত্তর দিকে প্রসারিত ছিল । এই পথোক্ত পথ দিয়া পাটল-চণ্ডীদেউলের পার্শ্ব হইয়া তখন বড় সাগর দীঘতীরে আসা চলিত । পূর্বে প্রাণ্ড নদী ছিল । রামাতিটা, ধর্ম্মপুর, চণ্ডীপুর কমলাবাড়ী তখন বড়িষ্ট গ্রাম ছিল, তৎপরে ঢাকন, সোণাতলা (হুবর্ণ) ও কাকন সহর রামাবতীর অন্তর্গত ছিল । ইহারই পশ্চিমে আদিশূর-দত্ত ব্রাহ্মণভূমি “ব্রহ্মপুত্রী”, পার্শ্ব “হরিকোটি” (হরিপুর) দিয়া অধিরথ পঙ্গারামপুর, কানাইপুর, ব্রহ্মপুত্রী ও হরিকোটি পেনল. গঙ্গারামপুর, দৈবকীপুর, প্রভৃতি বাণিজ্য-বন্দরশোভিত উপনগরসমূহে প্রবেশ করিতে হইত ।

সেই সময়ের রামাবতী একগুণার রমতী বা অমৃতী ছিল না । এখন অমৃতী পঙ্গার ঘেরাড । প্রাচীন রামাবতীর দুই তৃতীয়াংশ পঙ্গাতেই চিরদিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করিয়াছে ।

সেই সময়ে বড় সাগর দীঘির সম্মুখিত হইতে অর্থাৎ রামাতিটা, ধর্ম্মপুর, চণ্ডীপুর, কমলাবাড়ী, ঢাকন, সোণাতলা, কাকনসহর, হরিপুর, অধিরথ,

পদ্মারামপুর, পিছলী, দৈবকীপুর ইত্যাদি মহলা লইয়া রামাবতীনগর নির্দিষ্ট হইত, ইহা সহজেই বিবেচনা করা চলে।

লক্ষণাবতী

সেনবংশীয় শাসনকালে পাটনচণ্ডী ও লোহাগড় হইতে উত্তরে চণ্ডীপুর ঘারবাসিনী পর্য্যন্ত লক্ষণাবতী নগর ছিল, তদ্ব্যতীত সাগরদীঘির নিকট কোতোয়াল-ঘার হইতে লোহাগড় পর্য্যন্ত লক্ষণাবতীর দক্ষিণস্থ উপনগর ছিল। বড় সাগর দীঘির সন্নিকটবর্তী কোতোয়ালঘার হইতে চণ্ডীপুরের ঘারবাসিনী পর্য্যন্ত খুব সম্ভব লক্ষণাবতী নামী সৌধমালা-সমাকীর্ণ নগরী ছিল এবং উত্তরে অর্ধনারীখর শিবদুর্গা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রামাবতীর সীমা

রামপালের সময় লক্ষণাবতী* কতিপয় বর্ধিষ্ট উপনগরের সমষ্টি ছিল। রামাবতীর দক্ষিণস্থ উপনগর এবং বর্তমান কাকনসহর হইতে পদ্মারামপুর, পিছলী পর্য্যন্ত প্রকৃত রামাবতী; তৎপরে কিছু দূরে পালরাজধানী গোড় নগর ছিল।

জৈনতাবাদ

ধনরাম জৈনতাবাদ লক্ষণাবতীর সহিত পরিচিত ছিলেন, কিন্তু “ধর্ম্মগীত”-কারকেকা ঐ দুইটি নগরকে গোড় বলিতেন না। তাঁহার। রামাবতীর উত্তরের যে গোড় তাহাই প্রকৃত বৌদ্ধগোড় বলিয়া জ্ঞাত ছিলেন। ধর্ম্মের গানে সেই গোড়ের উল্লেখ করিতে হইত; ধর্ম্ম-পণ্ডিতগণ সেই ধর্ম্মবল্লভের গোড় বৌদ্ধ গোড় গোড়কে আজিও সম্মান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপূজার গোড়ের একাধিকবার উল্লেখ করিতে হয়। গোড়ের রাজা যে ধর্ম্মপূজা করিতেন, ধর্ম্মপূজকগণ আজিও তাহা বলিয়া গুরু অহতব করিয়া থাকেন।

রামাবতীর রাজমার্গ ও শাখাপথ

পথ-বর্ণনার সুবিধার জন্য জৈনতাবাদ ও লক্ষণাবতীর একটা স্থল ধারণা করিয়া লইলাম। লক্ষণাবতীর উত্তরাংশ হইতে দুইটি পথ উত্তরদিকান্তিমুখে প্রসারিত ছিল। এই দুইটি পথের মধ্যে একটি পথ গঙ্গাতীর দিয়া উত্তরমুখে সরল রেখার স্তায় রামাবতী পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ঐ পথই পশ্চিমাংশ বেষ্টিত করিয়া গোড়ে গিয়াছে এবং দক্ষিণ ভাগের (ডাহিনের) পথটি রামাবতীর পূর্ব পার্শ্ব দিয়া ধর্ম্ম-

* তৎকালে লক্ষণাবতী নাম প্রাপ্ত হয় নাই।

কের দ্বার বক্রভাবে হরিপুর প্রকৃতির পূর্বাংশ দিয়া বর্তমান কাজল দীঘির পশ্চিম পাশে দিয়া উত্তর মুখে গোড় নগর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল । এই পথটির এই প্রকার বক্র হইবার কারণ, পূর্বভাগে পদ্মা নদীর বিস্তীর্ণ বাক ছিল । তাহা বর্তমান কালে গোদবাইল ও ভাতিয়ার বিল নামে খ্যাত রহিয়াছে । সুতরাং রামাবতীর পূর্ব, পশ্চিম, ও উত্তরের কিয়দংশ জলময় দুর্গভাঙ্গা অভিন্নকিত ছিল ; এবং এই দুইটি পথ রামাবতীর পশ্চিম ও পূর্বপার্শ্ব দিয়া প্রসারিত ছিল । উত্তর পথেই গোড় নগরে বাতরা বাইত । রামাবতীর পূর্বপার্শ্বে গোড়-গমনের বক্র পথটি বর্তমান পাথালে গড়ের পশ্চিমেই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, একটি পূর্বমুখে এবং অপরটি কাজল দীঘির নিকট দিয়া উত্তরমুখে প্রসারিত ছিল । এই উত্তর-প্রসারিত উন্নত পথটি কিয়দূর যাইয়া আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি রাস্তা পশ্চিমমুখে গঙ্গারামপুরে প্রবেশ করিয়াছে । বর্তমান কালে এই প্রকারের উন্নত রাস্তাগুলিকে “গড়” বা “আইল” বলে ।

বে পথটি পূর্বমুখে বিস্তীর্ণ ছিল উহা বক্রভাবে কোথাও ঠাকুর আসানের গড়, কোথাও বৃদ্ধ-গড় নামে খ্যাত হইয়া রাইপুর অর্থাৎ গিলাবাড়ীর কিছু পশ্চিমে যাইয়া মহানন্দার অনতিদূরে বিলীন হইয়া গিয়াছে ।

খনরাম ও রামাবতীর পথ

খনরাম এই উন্নত প্রাচীন পথটির সহিত সর্বিশেষ পরিচিত ছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন—

“বাজে বোড়া কাড়া সিঙ্গা সদর নিশান ।

লবুগতি পশ্চাৎ রাখিল গোড়খান ॥ ১৫০

বামে রাখে মালদহ দক্ষিণে গিলাবাড়ী ।

মহানন্দ† পেরুতে বিগড় চাইল বাড়ি ॥” ১৬০

(১৪ বর্গ)

মালদহ ও গিলাবাড়ী

এই স্থানেই খনরামের কাব্যের সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে । এই প্রকারের বর্ণনা দেখিয়া খনরামকে বলিতে ইচ্ছা করে, তিনি গোড় রমতী ভ্রমণ করিয়া এ দেশের জনপ্রবাদাদি লইয়া ‘ধর্ম্মমঙ্গল’ রচনা করিয়াছিলেন ।

রামাবতীর উত্তরস্থ গোড় নগরী ত্যাগ করিয়া বামে মালদহ রাখিয়া পূর্ববর্ষিত

† মহানন্দার প্রাচীন নাম মহানন্দ ।

পথে গিলাবাড়ী দক্ষিণে রাখিয়া মহানদী (বর্ধমান মহানন্দা) পার হইয়া লাউসেন কাউর (কামরূপ) রাজ্য কপূর ধবলের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিয়াছিলেন ; পুত্র সম্ভব বানপুর বুনবুনচতী দিরা কীত্তর গিয়াছিলেন । আজিও মালদহে গিলাজাতি বিজ্ঞান রহিয়াছে । দুইশত বৎসর পূর্বে ঐ স্থান দুইটি প্রসিদ্ধ ছিল ।

রামাবতী ও পালগণের বিস্তীর্ণ নগর

তাহার পরে এই পাল গোড় বা বৌদ্ধ গোড় হইতে রামাবতী (রমতী) কিছু দূরে থাকিলেও উত্তর নগরীর মধ্যভাগে কোন প্রকার বিভাগ-সূচক উদ্ভান, কামন বা প্রান্তর ছিল না । রামাবতী ও গোড় যেন একই নগর ছিল বলিয়া মনে হয় । সুবিস্তীর্ণ গোড় ও রামাবতী সৌধমালাকীর্ণ একটি নগরী বলিয়াই উপলব্ধি হইত । লাউসেনের মাতুল মহামদঃ যখন গোড়রাজদ্বয়ার হইতে নিজ বাসস্থান রামাবতীতে আগমন করিতেন, তখন—

“রাজ-সভা হতে পাত্রে যায় নিজ ধামে ।

সহর বাজার পাড়া রয় ডানি বামে ॥” ২১ (১২ সর্গ)

সুতরাং গোড় ও রমতী ঘনসন্নিবিষ্ট লোকাবাসে পূর্ণ ছিল । ঘনরামের কাব্য উপভাস নচে, উহার অধিকাংশ বাপারই প্রকৃত । ঘটনা ও স্থানগুলিও প্রকৃত । এই কারণে উহা ঐতিহাসিকগণের আদরের সামগ্রী হওয়া উচিত ।

কিছুদিন পূর্বে ধর্মমঙ্গল জাতীয় পুস্তকগুলি একেবারে অসার বলিয়া উহার প্রতি দুই চারিজন বাতীত সকলেই অপ্রজ্ঞা প্রকাশ করিতেন, এক্ষণে ঐতিহাসিকগণ ঐ প্রকারের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে বখেটে ঐতিহাসিক উপাদানসংগ্রহে সমর্থ হইতেছেন । ধর্মমঙ্গল বৌদ্ধ পালরাজগণের সময়ের একটি চিত্রপট অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে । সেই চিত্র হইতে আমরা বহু বিষয় জানিতে পারিয়াছি ।

কবিকল্প ও ঘনরাম

কবিকল্প ঘোষণমান গোড়ের চিত্র নিখুঁত ভাবে নকল করিয়াছেন । ঘনরাম পাল গোড়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন । ঘনরামের সভ্যপ্রিয়তার চিহ্ন ক্রমশঃ দেখাইব ।

ঐ মহামদের জীবনকালে রামাবতীনগরী প্রতিষ্ঠিত না হইলেও পরবর্তীকালে যে স্থানে রামাবতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই স্থানের গোড়োপকণ্ঠে তাহার বাসভবন ছিল । ধর্মমঙ্গল-কথকণ সেই স্থানের নাম রামাবতী বলিয়াই অবগত ছিলেন ।

বন্দর, চাঁদনী, গোলাঘাট

বৈকুণ্ঠ কবিগণ গোড়ো বাইশ বাজার দেখিরাছেন । বনরাম গোড় রমতী এক কবিতা হাট বাজার পাড়ার শ্রেণী বসাইয়া দিয়া গিয়াছেন । পকাশ বৎসর পুর্বে কানাইপুর নামক স্থানে চাঁদনী, গোলাঘাট নামক প্রাচীন গঙ্গাতীরবর্তী গঙ্গাসমূহ (বাহা অতি প্রাচীনকালে গঙ্গাতীরে ছিল, বর্তমান সময়ে গঙ্গা সরিয়া বাওয়াতে অমৃতীনালা নামে রহিয়াছে) মহাজনের আড়তে জনপূর্ণ হইয়া থাকিত এবং নালাটি নৌকার পূর্ণ থাকিত । ঠিক ঐ স্থানেই প্রাচীন রামাবতীর গঙ্গাতীরবর্তী বন্দর ছিল ।

গঙ্গানানের ঘাট

এই স্থানে বঙ্গবাসী জনগণ গঙ্গানান করিতে আসিত । “অমৃতী” নামক পিত্তলময় জলপাত্র এই স্থানের কংশবণিকগণ নিৰ্ম্মাণ করিত । আজিও প্রবাদ আছে, জলপথে বঙ্গদেশ হইতে বাহারা কানী প্রভৃতি তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহারা প্রত্যাগমন কালে এই গঙ্গের ঘাটে নৌকা রাখিয়া গোড়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, অমৃতীর কড়ির বিবিধ খেলনা, দৈবকীপুরের পিত্তলের খেলনা, কাকন-সহরের ধর্ম্ম-দ্রোপাদির জলকার ও মালদহী রেলবী কাপড় জুস করিয়া দেশে লইয়া বাইতেন ।

রামাবতীর বিভিন্ন পলী

সেই রামাবতীর প্রাচীন স্থিতি আজিও গোলাঘাট, চাঁদনী নামে বর্তমান রহিয়াছে । আজিও কামারপাড়া, দোণারপাড়া, লাউরাপাড়া (নাপিতপাড়া) ব্রাহ্মণ-গাঁ বা পাড়া, ঠাকুরবাড়ী ইত্যাদি বহু নামে বিতীর্ণ স্থান স্থিতি হইতেছে । প্রাচীন পাণাশেড়ু, ইষ্টক-প্রথিত পথ, সহরের মধ্যে গড়, পরিখা, কৃত্রিম জলপ্রণালী, সেবালয়ের উন্নত ভূপ আজিও অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । বনরাম যে কামারপাড়ার কথা বলিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই কামারপাড়া আজিও “লোহারপাড়া” হইয়া বনভূমিতে রহিয়াছে ; যেন জীবন্ত রামাবতীর স্থিতি আগাইবার অন্ত ভাষার অশানভূমি বর্তমান রহিয়াছে ।

রামাবতীর সহিত ধর্ম্মপূজকগণের সম্বন্ধ

এই রামাবতী নগরে ধর্ম্মপূজা প্রচারার্থ রামাবতীর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ধর্ম্মপূজক পণ্ডিতগণ রমতীর সন্মান করেন এবং ইহা তাঁহাদের তীর্থস্থানের মধ্যে অন্যতম । এই সংস্কার বড় সাধারণ নহে । বহু বৎসর হইতে ধর্ম্মপণ্ডিতগণ বংশো-

বলী জন্মে এই সংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছেন এবং এই সূত্রে গোড় রমতীর ইতিহাস, বিকৃতই হউক বা অবিকৃতই হউক, তাহার এক প্রকার অবগত আছেন।
ধর্মের গীতেও এই সূত্রে একটা ঐতিহাসিক প্রবাহ চলিতেছে,—

“জন্ম নিতে যাও গোড় রমতী নগর।

ধার্মিক ভূপতি বার রাজা গোড়েশ্বর ॥ ২৫৪

অগ্নেছে কলির অংশে পাত্র পাপমতি।

সে হবে তোমার ভাই কর্ণসেনপতি ॥ ২৫৫

বেণুবার পিতা তোর জননী মহরা ॥ ২৫৬

সুতরাং রামা০ রমতীনিবাসী বেণুবারের কথা। ধর্ম স্বয়ং ছলনা করিয়া দেব-নর্তকীকে বধন আপন পূজা-প্রচারার্থ গোড় রমতী নগরে পাঠাইয়াছিলেন, তখন বুঝিতে হয়, ঐ দ্বান ধর্মপূজার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। ধর্ম তাহা দেখিয়াছিলেন কি না, জানি না; তবে ধর্মপূজকগণ দেখিয়াছিলেন।

ধর্মপূজাকালে লাউসেনী পদ্ধতি অহুগারে কালু ডোম ও তাহার স্ত্রী লবী ডোমনীর পূজা করিতে হয়। এই কালু ডোমের বাড়ী রমতীতে ছিল। এ ক্ষেত্রে কালু ডোমের পরিচর প্রদানের প্রয়োজন কি তাহা বলিয়া রাখি,—কালু ডোমের পূজাটি প্রাচীন না হইলেও নিতান্ত আধুনিক নহে। ধর্মপূজার মন্ত্র ও অহুষ্ঠান-গুলি প্রাচীন। রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির মধ্যে কালু ডোম বড় স্থান পায় নাই, কিন্তু পরবর্তী কালে লাউসেনী ধর্মপূজা-পদ্ধতির মধ্যে কালু ডোম সত্রীক স্থান পাইয়াছে। সুতরাং নীচ কালু ডোম ধর্মরূপার দেবতার আসন পাইয়াছে। রামা-বতী তাহার অন্যতম। এই ধর্মপূজক তান্ত্রিক-বৌদ্ধগণকে তখন এদেশে “দলুই” বলিত।

“পেঞ্চল সহর গোড় প্রবেশে রমতী।

পথে দেখা হইল কালু ডোমের সংহতি ॥” ৪৬০ (১৩ সর্গ)

কালু ডোমকে লাউসেন মরনার লইয়া বাইবার অস্ত্র প্রলোভন দেখাইয়া-ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

“বান্ধাব পুরট পাগ পেরো পট্ট ধুতি।

দলুই সবার কাণে দোলাইব মতি ॥” ৪৮২ ॥ (১১ সর্গ)

* দার্শনিক গঙ্গুলী রত্নাপুরের কথা লিখিয়াছেন—“রত্নাপুর বাই তার তৃতীয় দিবসে।”
৭৬—“তরাসে খেলায় ছুটে রত্নাপুর ক্ষিপ্র।”—১৮ “রত্নাপুর বিদ্যাপতি নাই রত্নাপুরে ॥” ১০০

“সহর কোটাল হইল কালু মহাবল ।

চারিদিকে চোকি থাকে দলুই সকল ॥” ৫২২ ॥ (ঐ)

ইহাতে একটি কথা মনে হয়—“দলুই” ডোমের পূর্ব উপাধি নহে; যখন তাহার্য্য বর্ষপুঙ্ক হইয়াছিল, তখন “দলুই” উপাধি পায়। সম্ভবতঃ “দলুই” বর্ষপুঙ্ক নীচ জাতিতে বলা হইত। বলিতে পারি না, এই মাল-দহের দলুই পরবর্তীকালে উত্তরে গিয়া সম্মান পাইয়াছে কি না। এই দলুইগণকে লইয়া এদেশে লাউসেন যেমন ধর্ম-প্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ বৌদ্ধ-তান্ত্রিক কালবিক্রম ত্রিপুরা দেশে গিয়া এই প্রকারের ধর্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। ভিক্তবতের দলুই নামও ইহার অহরূপ। সন্ধ্যাকর নন্দী রাম-চরিতে দেবপালকেই হউক কিবা অন্ত কোন পালরাজকেই হউক লক্ষ্য করিয়া সমুদ্রকুলবংশ * বলিয়া গিয়াছেন।

যনরাম বলিয়াছেন—

“কুমুদবাঈব-বন্ধু সিদ্ধু পিতা যার ।

অবশ্য ধরনী ধন কি কহিব তার ॥” (১৪ সর্গ)

পালরাজের “সিদ্ধু-পিতা” বলিয়া যনরাম প্রকাশ করিয়াছেন এবং সবিশেষ ইতিহাসও প্রদান করিয়াছেন। এক্ষেত্রে যনরামের ও সন্ধ্যাকর নন্দীর কথা এক হইয়া বাইতেছে। এক্ষণে দেখিতেছি, যনরাম মিথ্যা পাল-কাহিনী বর্ণনা করেন নাই।

সন্ধ্যাকর নন্দী-লিখিত পালবংশের ইতিহাসের সহিত ধর্মমঙ্গলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পাইতেছি বলিয়া ধর্মমঙ্গল কবিকল্পনা বলিয়া ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এই রমতী নগরের বেণুরায়ের কস্তার সহিত সম্ভবতঃ গোপালের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং এক পক্ষে গোড়েবরের বগুরবাড়ীও রমতী হইতেছে।

রামপালের রামাবতী তৎকালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। শেষ গুজোদয়াতে রামপালের একটি কীর্তিকথা লিখিত আছে। যথা—

“রামপালস্য এক পুত্র ত্বেন কদাচিদ্-বোবিদ্ধবিতা। জ্ঞাত্বা স রাজা স্বপুত্রং

* In the Ramacharita the Palas are said to have been descended from the ocean-god. (M. Asia 8-19 Vol. III No 1 Preface page, 2 Introduction) 1910,

শূলেন যোজয়ামাস। অদ্যাপি তেবাং বশো গীরতে লোটৈঃ। রামপালো রাজা একমেব পুত্রঃ অপরাধিনমনপরাধিনবা শূলেন যোজয়ামাস। বক্ত কীর্ত্তিমহুবোন্ পুণ্যালোকৈর্গীরতে।”†

যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, এই মহতী কীর্ত্তির স্থান বলিরা প্রাপ্য সম্মানে রামাবতীরই অধিকার। এই প্রবাদ অবলম্বনে বনরাম মহামদের পুত্রগুলিকে শূলে চাপাইরা দিরাছেন কি না বলা যায় না।

এই রামাবতী হইতে রামপালপুত্র মদনপাল বে তান্ত্রশাসন পট্ট প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিতে পাই—শ্রীরামাবতী নগর পরিসরসমাবাসিত শ্রীমচ্ছরৎকাক্যাবারং। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীরামপালদেবঃ পাদাহুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমদ্রদনপালদেব কুশলী।

রামাবতী নগরে বে দিন মদনপালদেবের এই মহান্ শ্রীমচ্ছরৎকাক্যাবার স্থাপিত হইরাছিল এবং সেই উৎসবকেন্দ্রে আগমনের অস্ত্র গন্ধাবকে ধ্বজপতাকাदि-শোভিত নৌসেনু প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল, সে দিন দেশবিদেশের রাজভ্রমণের আগমন-অনিত “বাহিনীথরপুরোৎপাত ধূলীধূস্রিত দিগন্তরাল” হইরা উঠিয়াছিল। এই সেই রামাবতীর কথা বলিতেছিলাম।

শ্রীহরিদাস পালিত।

বুধা নহে।

(ইংরাজী হইতে)

বলিত না—“বিফল প্রয়াস,
বুধা দ্রম, বুধা বেহ-নাম।
শত্রু নাহি যানে পরাজয়
কাল ঘাড়া, আমণ্ড তাই রয়।”
আশা যদি হয় জাতিদ্রম,
তর সেও বিদ্যা কথা কর।
অদূরে ধূসের অন্তরালে,
হৃত পলায় অরিবলে ;
বিত্রগণ পঙ্কজে ধাবিত,
তুমি খেলে বিদ্রম নিশ্চিত।

খেদা ছের লাভ উর্ধ্বচর,
কটে তিল অশ্রমর হর ;
ফিরে দেখ শতধান চেয়ে,
নীড়বে এসেছে সিদ্ধ খেয়ে !
শধু নহে পূরব পথাকৈ
নিবালোক খেদা বের ককে।
সমুখে রবির উর্ধ্বগতি
কি মন্তর মনে হয় অতি ;
পঙ্কিমেতে ফিরাও নয়ন—
ধরাতল আলোক মগন !

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ।

† শেখ শুকৌদয়ার বাহা লিখিত আছে তাহাই লিখিত হইল।

লাল ফুল ।

(১)

নীলার তপস্তার সঙ্গে বোধ হয় কিছু অভিসম্পাত ছিল। সে ভগবান্ ও রূপবান্ স্বামী পাইয়াছিল; কিন্তু আশা মিটাইয়া স্বামীকে দেখিতে বা স্বামীর সেবা করিতে পারিত না। তাহার পিতৃবংশের একটি দোষ ছিল। বিবাহের পর নীলার স্বত্তর তাহা গুনিয়া বধুর সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহার স্বামী বতীন্দ্রনাথ কোন্ কালের সেই বংশের দোষ ধরিয়া ভ্রীকে ত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি পিতার কথার উপর কথা কহিতেন না। সেই জন্ত লুকাইয়া লুকাইয়া কলেজের ফেরৎ নীলার সঙ্গে দেখা করিয়া বাইতেন। তাণ্ড ও অবশ্য প্রত্যাহ পারিয়া উঠিতেন না। নীলার সমস্ত আকুল আগ্রহ স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। সেই প্রেমপূর্ণ নয়ন, প্রবৃত্ত ললাট, হাসিমাখা অধর দেখিবার জন্ত নীলা পাগলিনীর মত গবাক্ষে বসিয়া থাকিত। বতীন্দ্রবাবু নীলাদের বাটার সম্মুখে আসিয়া গবাক্ষে দৃষ্টিপাত করিতেন। হায় সমাজ! দুইটি প্রেমপূর্ণ ছদর মিলিবার জন্ত সর্ব্বই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তবু ত মিলন হয় না! মিলনের সামান্য সম্বন্ধটুকুতেই নীলা হুখী হইত। কিন্তু হুখের সঙ্গে কত আশঙ্কা—লুকাইয়া আসা, যদি স্বত্তর কোন দিন জানিতে পারেন তাহা হইলে পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। পিতা ক্রুদ্ধ হইলে কি পুত্র আর আসিবেন? তাহা হইলে—তাহা হইলে নীলার কি হইবে? কি বে হইবে, সে কথা নীলা ভাবিতে পারিত না। ভাবনার শেষ সীমার বাইতে তাহার ইচ্ছা ছিল না। কারণ সে জানিত, সে অবহার যুক্তা ভিন্ন আর গতি নাই।

(২)

নীলা সর্বদাই ভাবিত, এখন তিনি কি করিতেছেন?—যদি কেহ আসিয়া বলিত! হৃদয় সর্বদাই হৃদয়সর্ব্ব্বের জন্ত ব্যাকুল। নীলা আপন হৃদয়কে আপনাই ভিরঙ্কার করিত। অবুক হৃদয় না বুঝিয়া তবুও ব্যাকুল হইত। নীলার সইয়ের কাছে নীলা হুখহুখের সব কথাই বলিত ও মাঝে মাঝে বলিত, “ঠাকুরমার গল্পের দেই লাল ফুল যদি থাকিত, তাহা হইলে আমি সর্বদাই তাহার সঙ্গে থাকিতাম, অথচ কেহ দেখিতে পাইত না।” একদিন

সই ধরিয়া বলিল, “তোমার লাল ফুলের গরমটি বল। বাহার মন্ত্র তোমার এত দুঃখ, তাহার গরমটি আমি তুলিব।” “তবে তুমি” বলিয়া লীলা সইয়ের সহিত স্বীয় শয্যার শয়ন করিয়া গম আরম্ভ করিল।—

এক রাজার দুই রাণী ছিলেন। বড় রাণী একটি সম্মান রাখিয়া লোকান্তরিত হইলেন, ছোট রাণীর খুব আনন্দ হইল। তবে সঙ্গে সঙ্গে সতীনের কাঁটাটি বাইল না, এই বাহা একটু দুঃখ। রাজকুমারকে ধাই মাগুব করিতে লাগিল। ধাই ছাড়া রাজকুমারকে কাহারও আদর করিবার উপায় ছিল না; এমন কি রাজা ও নহে। যদি রাজা কোন দিন তাহাকে কোলে লইতেন, তাহা হইলে রাণী তিন দিন মানাগার হইতে বাহির হইতেন না। কাণেই রাজা আর তাহার দিকে চাহিতেন না। তিন বৎসর পরে ছোট রাণীর একটি টুকটুকে ছেলে হইল। তাহার মন্ত্র দুই মাস ধরিয়া রাজ্যে উৎসব হইল। এক দিন মধ্যাহ্নে ছোট রাণী ছেলেকে লইয়া আদর করিতেছেন,

“খোকা আমাদের চৌধুরী,

হাঁ করেছেন গঙ্গাগিরি

হাতে পেরেছেন চাপা

খোকার বউ ডাক্ছে।

ভাত খাওসে বাবা।”

রাজকুমার সেই দাগানে ধাইবার কোলে ছিল, ছড়া শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, “ছোট না, আমার বউ আমার ডাক্বে? ছোট রাণী মাগিয়া বলিলেন, “সরে যা।”—তিনি ছেলেকে বলিলেন,

“খোকনের খণ্ডর বার হাতে

দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে

আর খোকনের খাণ্ডী পান খায়

বাউটি বাধা দিয়ে।”

বড় রাজকুমার বলিল, “না, খোকার খাণ্ডী নয়, আমার খাণ্ডী।” ছোট রাণী মুখ রাখা করিয়া বলিলেন, “ভালা সতীনের কাঁটা। ছেলেটাকে আদর করিবারও বো নাই।” সেই দিন রাজা আসিয়া অন্বরে দেখিলেন, রাণীর মুখ অন্ধকার। সেই রাগের ফলে বড় রাজকুমার ও ধাই রাজবাটীর

পার্শ্বে আর একটি ছোট বাগীচে রহিলেন। সেই দিন অবধি রাজবাগীচে তাহাদের 'প্রবেশ নিষেধ' হইল।

রাজকুমার যখন বৌবনে পদার্পণ করিল, তখন আপনার অবস্থা বুঝিয়া সে আর সে রাজ্যে থাকিতে চাহিল না। বাইমা তাহাকে বড় ভালবাসে, বলিলে মত দিবে না, সেই জন্য তাহাকে কিছু না বলিয়া সে এক দিন গভীর রাত্ৰিতে পিতার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কত কষ্টে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ছাড়াইয়া অর্ধেক দিন উপবাসী থাকিয়া বড় রাজকুমার এক নূতন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার মলিন দেহ, ক্লম্ব কেশ ও ছিন্ন বস্ত্র দেখিয়া রাজ্যে কেহই তাহাকে ঠাঁই দিল না। সে গাছতলার থাকিত ও ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিত। সেই সময় বাইমা'কে স্মরণ করিয়া রাজকুমার নয়নজলে বক্ষ ভাসাইত। এক দিন-রুটি হইল। সারা রাত রাজকুমার বলিয়া ভিজিল। প্রাতে তাহার আর উঠিবার ক্ষমতা রহিল না। একজন কৃষক সেই দিক্ দিয়া বাইতে ছিল, রাজকুমারের অবস্থা দেখিয়া তাহার দয়া হইল। সে তাহাকে আপন পূর্ণকুটীরে লইয়া গেল। কৃষকের বহু রাজকুমার সুস্থ হইলেও সেই কুটীরে রহিল। কিছুদিন থাকিতে থাকিতে রাজকুমার শুনিল, সেই দেশের রাজকন্যা রাত্রিকালে শয়নকক্ষে থাকেন না। অথচ রাজা রাজ্যের সকল বাটী অনুসন্ধান করিয়াছেন; কোথাও কন্যাকে দেখিতে পায়েন নাই। প্রাতঃকালে সেখা বার রাজকন্যা আপনার পালকে শয়ন করিয়া আছেন! রাজা কন্যাকে কত দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সখীরাও জিজ্ঞাসা করিয়াছে, রাজকন্যা বলিয়াছেন, "কোথার আবার বাইব?" অথচ সকলে যতক্ষণ আগরিত থাকে ততক্ষণ রাজকন্যা নিদ্রা যাবেন। সকলে নিদ্রিত হইলে রাজকন্যাকে আর পাওয়া যায় না। একদিন নিশীথে সখীদের নিদ্রা ভাঙ্গিলে তাহারা দেখিল, রাজকন্যা শয্যায় নাই। রাজবাগীর সকল কক্ষ খুঁজিয়া তাহাকে পাওয়া গেল না। অথচ প্রাতে রাজকন্যা বিছানার! সেই দিন হইতে রাজা-রানী ভয়ে ভয়ে প্রত্যহ নিশীথে কন্যার গৃহে আসিতেন, আর শয্যা শূন্য দেখিতেন। তাঁহারা মনে করিলেন, ইহা নিশ্চয়ই উপদেবতার কাব। তাঁহাদের মনে সন্দেহ রহিল না। প্রতিদিন সকলে পরামর্শ করিত, রাত্ৰিতে আগিয়া থাকিবে ও কি ঘটে দেখিবে। কিন্তু রাজকন্যার গৃহে প্রবেশ করিবার কিছুক্ষণ পরেই সকলে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইত। আর

পাঁচ বৎসর এইরূপ হইতেছে। রাজা রাজ্যময় ঘোষণা করিয়াছেন, রাজকন্তা রাত্রিতে কোথা যাবেন, তাহা বে বলিতে পারিবে, তাহাকে রাজা সহ রাজকন্যা দান করিবেন। কত রাজপুত্র কোটালপুত্র চেষ্টা করিয়াছেন, কেহই সকলপ্রম হইতে পারেন নাই। রাজকুমারের ইচ্ছা হইল,—এ ব্রহ্মা ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সে ভাবিল আমি নিঃস্বল, ধনজনহীন আমি সকলপ্রম হইতে পারিব কি? তথাপি থাকিয়া থাকিয়া রাজা ও রাজকন্তা-নাভের লোভ তাহাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল।

আজ পাঁচদিন কৃষক বড় পীড়িত, রাজকুমার তাহার কাছে বলিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছে। কৃষক রাজকুমারকে বলিল, “বাহা আমার বাড়ীর দক্ষিণ দিকে দুই ক্রোশ গেলে একটি জঙ্গল। সেটী জঙ্গলে গোলপাতার এক বকর ছোট ছোট গাছ আছে। শিকড় সমেত সেই গাছ যদি আনিয়া দাও, তবে তাহার রস পান করিলেই আমি সুস্থ হইব।” রাজকুমার সানন্দে স্বীকৃত হইল।

জঙ্গল হইতে শিকড় সমেত গাছ লইয়া ক্রিষ্ণবীর সময় রাজকুমার দেখিল, একটি পক্ষীর শাবক কাটাগাছে পড়িয়া কটপট করিতেছে; কিছু-তেই উড়িতে পারিতেছে না। তখন রাজকুমার গাছগুলি রাখিয়া শাবকটিকে তুলিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। সেই সময় ঝড়ের মত একটা পক্ষ হইল ও রাজকুমার প্রান্তে পাইল, কে বলিতেছে, “আমার সন্তান লইয়া বাইতেছিল?” রাজকুমার উপরদিকে চাহিয়া দেখিল, এক বৃহৎ পক্ষী উড়িতে উড়িতে আসিতেছে ও ঐ কথা বলিতেছে। রাজকুমার বলিতে বাইতেছিল, “আমি শাবক লইয়া পলাই নাই, শাবককে রক্ষা করিয়াছি।” কিন্তু বলিবার সময় হইল না। পক্ষী নিমেষে আপনায় শাবক কাড়িয়া লইল ও পক্ষাঘাতে রাজকুমারকে উটাইয়া ফেলিয়া দিল। শাবক ক্রীণবরে জননীকে সকল কথা বলিল। তখন বৃহৎ পক্ষী রাজকুমারের কাছে আসিয়া কথা চাহিল ও তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। পক্ষীতে এমন সুন্দর কথা কহিতে পারে যেখান রাজকুমারের বিশ্বাস হইল। সে আপনায় সকল কথা বলিল, রাজ্যের কথা বলিল, কৃষকের কথা বলিল, আর রাজকন্তার কথা বলিল। পাখী সব শুনিয়া বলিল, “রাজকুমার তুমি আমার শাবককে পাঁচাইয়াছ, আমি তোমায় কিছু উপকার করিব। তুমি আমার শাবকটিকে লইয়া থাক। আমি এখনই আসিতেছি।” বলিয়া পাখী উড়িয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে পাখী ঠোঁটে করিয়া একটি লালফুল ও একটি শালক আনিয়া রাজকুমারের হাতে দিল ও বলিল, “এই ফুলটি তুমি যতক্ষণ কাপে রাখিবে ততক্ষণ কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবে না। আবার যখন কাপ হইতে ফুল ফুলিবে তখন সকলে তোমাকে দেখিতে পাইবে। আর তুমি আমার পালকটির ডব্বের কাজল চক্ষুতে দিয়া রাজকুমার ঘরে বাইলে তোমার নিদ্রাকর্ষণ হইবে না। তবেই তুমি রাজকুমার ব্যাপার সব জানিতে পারিবে।” রাজকুমার আনন্দে ফুল, শালক ও সেই গাছতলি লইয়া কুবকের বাটী বাইল। কুবক আরোগা হওয়ার পর রাজকুমার কুবককে বলিল, “আজ রাজিতে আমি আসিব না।”

রাজকুমার সেই লাল ফুলটি কর্ণে দিয়া ও পাখীর পালকের কাজল পরিয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইল। সে সকলকে দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু তাহাকে যে কেহ দেখিতে পাইতেছে না, ইহা প্রথমে রাজকুমারের বিশ্বাস হইতেছিল না। যখন সে বাহিরবাটী হইতে আন্দরে ও ক্রমে রাজকুমার গৃহে আসিয়া একটি কোণে দাঁড়াইল অথচ কেহ কিছু বলিল না, তখন সে বুঝিল, সত্যই লাল ফুলের অসাধারণ গুণ।

গভীর নিদ্রাধে রাজপুরীর যখন সকলেই নিদ্রিত, তখন রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকুমার সতরে চাহিয়া দেখিলেন, বিশালকার চারিজন পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারকে প্রণাম করিল। রাজকুমার তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছাদে আসিলেন, রাজকুমারও তাহাদের সহিত ছাদে আসিল। রাজকুমার দেখিয়া বিম্বিত হইল, ছাদের কোণে একখানি স্বর্ণনির্মিত রথ। রাজকুমার তাহাতে উঠিলেন, রাজকুমারও এক পাশে উঠিল। তখন সেই চারিজন পুরুষ রথ চালাইয়া আকাশের দিকে লইয়া চলিল ও যথো যথো রাজকুমারকে বলিতে লাগিল, “রথ আজ ক্ষত চলে না কেন ? যোধ হইতেছে আর কেহ রথে উঠিয়াছে। কিন্তু উঠিলে আমরা অবশ্যই দেখিতে পাইতাম।” রাজকুমার বলিলেন, “তোমরা যখন রাজপুরীতে প্রবেশ কর তখনই সকলে মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়। কে উঠিবে ?”

এ কি ! রাজকুমারের চক্ষুর সমক্ষে এ কোন যশ-রাজ্য উপস্থিত হইল। এ কোন্ দেশ, বাহাতে শত সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত ? রথ খাদিন। রাজ কুমার সহিত রাজকুমার এক অপূর্ণ সত্য উপস্থিত হইল। রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে রাজা ও রাণী বসিয়া আছেন। পরীক্ষা পূর্ব চারি ব্যক্তি

করিতেছে। কি প্রকার গীত-বাণী শ্রুত হইতেছে! মধুগন্ধে দশদিক ভরিয়া পিয়াছে। এ কি সৌন্দর্য্য ও আনন্দপূর্ণ সভা? হুঃ কখন ইহার কাছে আসিতে পারে না। হুঃ বলিয়া যে কোন জিনিষ আছে, এ প্রাচ্যের শোক তাহা জানে না। একি স্বর্ণ? ইনি কি দেবরাজ ইন্দ্র? রাজকুমারের মনে হইতে লাগিল, সে যেন কখন এ-দশে ছিল। এইরূপ ভাবনার রাজকুমার যখন তখন, তখন শুনিতে পাইল, মধুর স্বরে কে তাহাকে ডাকিতেছে, “রাজকুমার, বৎস! আমার কাছে আইন। লাল ফুল খুলিয়া ফেল।” রাজকুমার চাহিয়া দেখিল, রাজা ডাকিতেছেন। লাল ফুলটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে রাজকুমার সিংহাসনের কাছে নত হইয়া বলিল। রাজকুমার ব্যাকুল ভাবে ডাকিলেন, “জয়ন্ত! জয়ন্ত আমার! এতদিনে আমার তোমার দেখিলাম? জয়ন্ত আমার!” সে স্বরে কি আকুলতা, কি প্রেম-আহ্বান! সকলের নয়নে আনন্দাশ্রু ছুটিয়া উঠিল। রাজকুমার জ্ঞানহারার মত সিংহাসনের কাছে বলিয়া রহিলেন। যেন কি মনে পড়ে, পড়ে না।

রাজকুমার ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “দেবরাজ! আর যেন আমি আমার স্বামীকে না হারাই। উহার কি কিছুই মনে পড়িতেছে না? আমার দিকে উনি কিরিয়া চাহিতেছেন না কেন?” “মা স্থির হও, তোমার পতিভক্তির স্তম্ভেই এত দীর্ঘ জয়ন্তের শাপ-মোচন হইল। এই লও, জয়ন্তকে এই পারিজাত-মালা পরাইয়া দাও, সব কথা উহার মনে পড়িবে।” রাজকুমার মালাগাছটি রাজকুমারের গলার দিলেন। তখনই রাজকুমার প্রেমপূর্ণনেত্রে রাজকুমার দিকে চাহিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রণাম করিল।

দেবরাজ মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস সব কথা যদি স্বরূপে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বল, কেন তুমি স্বর্ণচ্যুত হইয়াছিলে।” রাজকুমার ধীরে ধীরে বলিল, “সে দিন সভার উপস্থিতি সমর আমি আসি নাই ও আমার নীহারকে আসিতে দিই নাই। কারণ, তাহার সেই প্রেমপূর্ণ সৌন্দর্য্যমাখা মুখখানি ছাড়িয়া সভার নৃত্যগীতে যোগ দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পরদিন আপনার মুখে শুনিলাম যে, আমি কণ্ঠব্যচ্যুত হইয়াছি, স্তম্ভাং বিনকতক আমার স্বর্ণচ্যুত হইয়া মর্ত্যে জন্ম লইতে হইবে; বাহার মোহে মুগ্ধ হইয়া নির্দিষ্ট কার্য্য করি নাই, তাহাকে বিনকতক ছাড়িতে হইবে। আর নীহার আমার অনেক বার বলিয়াছিল, ‘কণ্ঠব্যকর্ণ করিয়া তবে প্রেমের আরাধনা করিলে কি ভাল হয় না?’ আমি সে কথা শুনি নাই, সেজন্য আমিই

এই মর্ত্যে জন্মিব। কিন্তু নীহার আপনার পারে ধরিয়া আমার সঙ্গে জন্ম লইতে চাহিল। তাহার পর আর আমার কিছু মনে ছিল না। আমি সব ভুলিয়া মর্ত্যে ছিলাম।”

দেবরাজ বলিলেন, “নীহারের কোন ইচ্ছাকৃত অপরাধ ছিল না। তাহার আনন্দের পরই, আমি প্রতি রাত্রিতে স্বপ্ন পাঠাইয়া তাহাকে স্বর্গে আনিতেছি ও প্রাতে পাঠাইতেছি। তুমি কোথায় তাহা নীহারকে জানিতে দিই নাই। কিন্তু সে প্রতি নিশার আমাকে গীতবাঞ্চে ভুট করিয়া—বর চাহিয়াছে, বাহাতে শীঘ্র তোমার সহিত মিলন হয়, উভয়ে শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে আসিতে পার। সেই ছোট পাখী ও বড় পাখী আমার দূত, আমার অগ্রমতিতে তোমাকে লাল ফুল দিয়া আসিয়াছে। আজ তোমরা মর্ত্যে বাও, বিবাহের পর শাপমুক্ত হইয়া চলিয়া আসিবে।” জরত ও নীহার দেবরাজ ইচ্ছাকে প্রণাম করিয়া রথে আসিয়া উঠিল।

পরদিন রাজপুত্র রাজকন্তার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, “আমি পনিয়া দেখিয়াছি, রাজকন্তাকে পরীতে উড়াইয়া লইয়া যায়। কিন্তু আজ রাত্রিতে আমি আপনাদের লইয়া রাজকন্তার গৃহে থাকিব ও কিছু মন্ত্র পাঠ করিব—তাহা হইলে আপনাদেরও মোহ-নিদ্রা হইবে না, রাজকন্তাকেও পরীতে লইয়া যাইবে না। যদি আমি পারি, তাহা হইলে এক মাসের মধ্যে আমার রাজকন্তাকে দান করিবেন কি না?” রাজা বলিলেন, “তুমি যদি আমার কন্তাকে অপদেবতার কৃষ্ণক হইতে উদ্ধার করিতে পার, তাহা হইলে রাজ্য ও কন্তা উভয়ই তোমাকে দিব। রাজপুত্রের কথামত সব হইল। সে রাত্রিতে সকলে ঘাপিয়া রহিল, কাহারও ঘুম আসিল না এবং রাজকন্তাকেও পরীতে উড়াইয়া লইয়া গেল না।

তাহার পর রাজকুমারের সঙ্গে রাজকন্তার বিবাহ হইল। বিবাহের পূর্ব-দিন রাজকুমার রাজার কাছে হইতে অনেক টকা লইয়া কুবককে দিয়াছিল। রাজা ও রাণী বড় আনন্দে কেনিষ কৃষ্ণক হইতে উদ্ধার-কর্তার সঙ্গে কন্তার বিবাহ দিলেন। কিন্তু ফুলশয্যার পরদিন সকলে দেখিল, রাজপুত্র রাজকন্তা চিরনিদ্রায় মগ্ন। সমস্ত রাজ্যের আনন্দ গভীর শোকে পরিণত হইল।

সই দীর্ঘনিশ্বাস কেলিয়া বলিল, “রাজারানীর জন্ম বড় কষ্ট হয়, আর একটা গল্প বল না, সই!” লীলা বলিল, “সেকলে গল্প আমার মনে থাকে না। মা’র কাছে ঐ গল্পটি শুনি। আমার নাকি সেই রকম একটা লাল ফুল

পাইতে ইচ্ছে হয়, তাই ঐ গল্পটি এত মনে ছিল। তুই এত গল্প শুনিতে ভালবাসিস, মাকে বলিস তিনি বলিবেন।”

(৩)

আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তবু লীলা বতীনবাবুকে ছাড়ে নাই, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছে। কারণ, আজ বতীনবাবুর কলেজ বন্ধ হইল। তাঁহার পিতা পুত্রকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, “কলেজের ছুটি হইলে দেশে বাইরা জমাজমী দেখিও। তবু দুই মাস আপনারা তদারক করিলে নারের গোমস্তা সারেন্তা থাকিবে।”

সেই কথা বতীনবাবু লীলাকে আজ বলিয়াছেন। কি করিয়া সে আজ তাঁহার দেবতাকে ছাড়িবে? যে দুই তিন দিন অন্তর দেখিয়াই মন দাব্বিতে পায় না, সে দুই মাস দেখিতে পাইবে না! মাহুষের যদি ইচ্ছা-মুক্তা হইত তবে আজ লীলা হাসিতে হাসিতে বতীনবাবুর বক্ষে প্রাণত্যাগ করিতে পারিত। তাহা হইলে কি সুখেরই হইত! পিতার অমতে এক্রপ লুকাইয়া লুকাইয়া বতীনবাবু কি চির দিন আসিতে পারিবেন? সর্ব্বদাই এই বিচ্ছেদের আশঙ্কার অপেক্ষা কি মুক্তা ভাল নহে? বতীনবাবু সাধরে লীলাকে কত বুঝাইতেছেন।—কেন মিছা ভয় পাও? কখন কি পিতার মত কিরিবে না? আর এ দুই মাস ত দেখিতে দেখিতে বাইবে। এই দুই মাসের বিরহ সহ্য করিতে পারিবে না? শেঠা কর, পারিবে। এত অধীরা হইয়া আবার কষ্ট দিও না। হায় বতীনবাবু, সকল মানব-মানবীর যদি সহ-শুণ সমান হইত, তাহা হইলে অগতে এত দুঃখ কষ্ট থাকিত না। অনেক কষ্টে ত্রাণি আটটার সময় তিনি লীলাকে বুঝাইয়া বাটী ফিরিলেন, বাইবার সময় লীলাকে দেশের ঠিকানা দিয়া বাইলেন, তথ্য পিতামাতা কেহ নাই, চিঠি বাইলে কোন ক্ষতি নাই। তিনিও প্রত্যেক দিন পত্র লিখিবেন, প্রতিজ্ঞত হইলেন।

(৪)

বতীনবাবু পনের দিন পরেই দেশ হইতে চলিয়া আসিলেন; পিতাকে বলিলেন, দেশের জলবায়ু সহ্য হইল না। সেই দিন বতীনবাবুর ছোট বোন দাদার পকেট হইতে একটি পেনসিল লইতে গিয়া পণ্ডে লিখিত দুই খনি লাল চিঠি পাইল। সে একটু একটু পড়িতে শিখিয়াছিল, কিছুই বুকিল না। কিন্তু তাহার দিদি নীতি পড়িতে ভালবাসে বলিয়া ছুটিয়া বাইরা দিদির হাতে দিল।

দাদার পকেটে খ্রীলোকের হাতের লেখা পত্ৰপূর্ণ চিঠি ! দিদি কোতুল
দমন করিতে না পারিরা পড়িতে বসিল ।

জদয়দেবতা,

বলেছ আমার বাঁধিতে জদয়
ব্যাকুলতা বাঁতে নাহিক হয় ।
নুতন এ কথা শুনে পাই ব্যথা
পারি না জীবন হলেও নয় ॥
সমাজ সংসার সকলি আমার
তোমায়ে দেখার আশার কাছে ।
'নির্ভর সংসার' বলে বার বার
দিতেছ বাতনা জদয় মাঝে ॥

• কেন—পারি না ছাড়িতে দেখার আশা,
কেন—ভুলিতে পারি না ও ভালবাসা ?

• দেখার আশার রেখেছি জীবন,
বাবে না সে আশা হলেও মরণ ।

তোমার লীলা

জদয়দেবতা,

চাহি না স্বর্গের সুখ-নন্দন-কানন
দেখিতে চাহি না আমি অমরা ভুবন ।
প্রণমি বখন আমি দেবতা-চরণে
তখনো তোমার কথা পড়ে শুধু মনে ।
কাব কৰ্ম্ম করি যবে সংসার-মাকারে
তখনো তোমায়ে ছেঁচি জদয়-আগারে ।
প্রাতঃকালে উঠি যবে হরষিত মনে
তখনো নিমগ্ন প্রভু, তোমারি স্বরণে ।
মধ্যাহ্নে ও-সুখ ভাবি ব্যাকুলিত প্রাণ,
আমি কি পেয়েছি তব হৃদিপ্রান্তে স্থান ?
রাজিতে বখন হই নিদ্রার মগন
তখনো তোমারি প্রভু নেহারি স্বপন । ইত্যাদি

চিঠি দুইখানি পাঠ করিয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল। সে বুঝিল, বৌ-দিদি লিখিয়াছে। কবে কাহার কি দোষ ছিল বলিয়া এ নির্দয়তা বড়ই অস্বাভাবিক হইল। সে ভাবিল, সে জনকজননীর পারে ধরিয়া বৌদিদিকে আনিতে বলিবে। ইহাই ভাবিয়া সে মাতার কাছে ঘাইয়া সব কথা বলিল ও তাঁহাকে পত্র দুইখানি দিল। পত্র দিয়া সে বলিল, “যদিও এ পত্র তোমাদের পড়া উচিত নহে, আমার দেওয়াও উচিত নহে; কিন্তু বাবা পড়িলে সব বুঝিতে পারিবেন। সেই বখশ দাদা লুকাইয়া বাইতেছেন, তখন বৌদিদিকে আনিতে দোষ কি? সুখমার যদি কোন ছুটবরে বিবাহ হয়, আর তাহার খন্তররা এই রকম করে তাহা হইলে কি হয়? তুমি বাবাকে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল। বিবাহের পূর্বে খোঁজ না লইয়া এখন এ ব্যবস্থা কি সঙ্গত?” বতীনবাবুর মাতা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আচ্ছা আজ বলিব। দেখি কি হয়।”

বতীনবাবুর পিতা বৈকালে জ্বর নিকট হইতে সেই পত্র পাইলেন; খানিকটা পড়িয়া লজ্জিত হইয়া জ্বর হাতে দিলেন ও বলিলেন, “এ পত্র তোমার বা আমার কাহারও পড়া উচিত নহে। তুমি কেমন করিয়া এই পত্র পড়িবার অস্ত্র আমাকে অহরোধ করিলে?” “কি করিল বিশংকালে লজ্জা করা বৃথা। তাহা না হইলে স্বরমা কি এ পত্র আমাদের হাতে দিত? তোমার গোঁ—বৌ আনিব না; এখন বুঝ ব্যাপার কি হইতে পারে।”

বতীনবাবুর পিতা বুঝিলেন, সে কথা ঠিক; এই জন্তই পুত্রের দেশের জল-বায়ু সহ্য হয় নাই। উপযুক্ত পুত্র যদি বধূকে লইয়া ভিন্ন হয়, তখন মান কোথায় থাকিবে? অনেক ভাবিয়া তিনি বধূকে লইবার মত করিলেন।

(৫)

সেই দিন বতীনবাবু দেখিলেন, লীলার চুল রুক্ষ, সে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কথায় কথায় লীলা বলিল, “আমার পাগলামী-চিঠিগুলি সব ছিঁড়িয়াছ ত?” বতীন্দ্রনাথ বলিলেন, “সবই আবার বন্ধে আছে। কেবল শেষের দুইখানি আমার পকেটে আছে।” লীলা বলিল, “সে কি? যদি কেহ পড়ে তাহা হইলে ত মুকিল।” বতীনবাবু বলিলেন, “আমার আমার পকেট হইতে লইয়া কে পড়িবে?” লীলা বিবরমুখে বলিল, “যদিই বা কেহ পড়ে!”

তাহার পরদিন বতীনবাবু ভগিনীর কাছে সব শুনিলেন। স্বরমা চিঠি পড়ার অস্ত্র কথা চাছিল ও পত্র দুইখানি কিরাইয়া দিল। বতীনবাবু বলিলেন, “তুই বে আনন্দের সংবাদ দিলি, স্বরমা, তাহাতে আবার কথা কি?”

(৬)

লীলার অদৃষ্টদেবতা হাসিয়া চাহিয়াছেন । এখন সে শান্তিপূর্ণ প্রাণে তাহার দেবতার কাছে আছে । প্রথম লীলাকে আনিতে সমাজে গোল হইতাহিল । যতীনবাবু পিতা বিবরী লোক, তিনি সহজেই সব মিটাইয়া ফেলিয়াছিলেন ।

মিলনের পর লীলার সই কেদিন লীলার সহিত দেখা করিতে আসিল । কথার কথায় সেই লাল ফুলের কথা উঠিল । সই হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, “সই, তুই লাল ফুলের জন্ত আগে ঠেচ্ছা করিছিলি । লালফুল পেলেই তোরা সকল ছাণের অবগান হইবে । বল দেখি, কি লাল ফুল পেয়েছিলি ও কোন্ বর্ণের দূত দিয়াছিল ।” লীলা হাসিতে হাসিতে যতীনবাবু বাক্স খুলিয়া সেই দুই খানি লাগটি বাহির করিয়া দিল ও বলিল, “এই দেখ লাল ফুল । আর স্বর্গের দূত—সে আমার নমস্করণ ও সুবন্দা ।” শ্রীমতী শ্রীলালম্বরী দাসী ।

দীন রাজ্যেশ্বর ।

বামন্যাহ * পাশে আসি' মহিমী কহিলা দীরে—
 “হে ধর্মপতি !
 রা'বিবার কালে আদি কর্ণধোনে পুড়ে' হাত
 ছের কি দুর্গতি !
 নারীর সৌভাগ্য এ বে শামিপুত্রকণ্ডা মা'দি'
 বহুতে রক্তন ;
 নাহি রহে রেশ, নাথ, শুধু যদি বেহ যোরে
 দাসী একজন ।”
 আঘরে ধরিয়া হাত কহিলেন বামন্যাহ
 ককণ বচনে,
 “বড় পাইলাম মাথা তোমার এ বশা, প্রিয়ে,
 হেরিয়া নয়নে ।
 আদি রাজ্যেশ্বর ; কিন্তু গ্রান, সতি, পতি 'তব
 কত নিঃশ, বীন ।
 জীবিকানির্ভর্য্যহতরে বিজ্ঞান-সময়ে সিধি
 পু'বি, প্রতি দিন ।
 রাজকোষে আছে বত মনিমুক্তা অর্ধরাশি,
 গজিত সে ধন ;
 নাহি অধিকার যোর সাধিতে প্রজার অর্ধে
 নিম্ন প্রয়োজন ।
 রাজ্যেশ্বরী হয়ে তবু ঐতর্য্যবিকিতা ছুবি,
 চিরকালগিনী ;
 অক্ষর অভাষ্য পতি ; কোথা পাবে দাসী, মিত্রে,
 বরিস-পুহিনী ।” শ্রীমদধীমোহন ঘোষ ।

রাজা মটুক রায় ।

(৩)

এ দিকে চম্পাবতী স্বামী পাইবার আশায় গোবীপুঞ্জা আরম্ভ করিয়াছিলেন । “চম্পার উপর শেষে সদয় হইয়া গোবী, বর দিতে গেল শেষে রথের ভর করি ।
• • • ভবানি বলিল মাগো শান্ত কর মন, খণ্ডন না হবে কভু বিধির লিখন । মিলিবে স্বন্দর পতি জাতি মোছলমান, সেই জন হয় মোর ভণ্ডির সন্তান ।
আনিবে তাহার নাম গালি জেন্মা পীর, রাজ্যতি ছাড়িয়া করে হইয়া ককির ।
আনিবে তাহার পিতা ছাছা ছেকন্দর, সোণার বানিল সেই বিরাট নগর । বলি
রাজার কস্তা জান অজ্ঞা গুন্সুরি, আমার সে বুন-বেটি তোমার শান্তি । মোর
বুনবেটা গালি আমি হই মাসি, কার্তিক গণেশ হইতে তারে ভালবাসি । তুমি
চম্পাবতী তোরে দিল এই বর, আমার বুনের বেটা স্বামী হবে হোর । এতক
বলিয়া গোবী গমন করিল, রথ আরোহণ করি বৈকুণ্ঠে গেল ।”

এ দিকে কাস্তপুরে বলিয়া গাঙ্গী সাহেব স্বপ্ন দেখিলেন যে, কালুকে সত্তর
ব্রাহ্মণ নগরে চম্পার ভদ্রাসে পাঠাইতে হইবে ; কোন ভর নাই, মটুক রাজার
সহিত বুদ্ধে গাঙ্গীর অর্থ হইবে । কালু আজ্ঞার নাম লইয়া ব্রাহ্মণ নগরান্তিমুখে
যাত্রা করিলেন । ছিরা নিয়া দুই তাই নদীঘাটে থেরা দেয় । তাহার কালুকে
নগরে প্রবেশ করিতে বারবার নিবেদন করিল । পাটনিছর কিছুতেই ককিরকে পারে
লইয়া বাইতে স্বীকার হইল না, অবশেষে মণি মুক্তা ও মোহরের প্রলোভনে
তাহারা কালুকে পার করিয়া দিল ।

ককিরকে নৌকার তুলিয়া তাহার বলাবলি করিতে লাগিল, “দক্ষিণ
মাঝেতে আছে দেও একজন । জবন দেখিতে পাইলে করে সে ডোকাণ ।
ওপারেরে গেলে তোমার বাইবে রাক্ষসে । মেজে পেতে খাও তুমি গিয়া অস্ত
দেশে । কালু বলে বাব আমি করে দাও পার, অদৃষ্টেতে আছে বাছা ঘটবে
আমার ।”

কালুর রাজদর্শন ঘটিল । তিনি রাজসভার গাঙ্গী সাহেবের অলৌকিক
কর্মতার পরিচয় দিলেন, অবশেষে চম্পার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাবও
করিলেন । ককিরের প্রত্যাবে মটুক রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কালুকে বন্দী করি-
লেন । এদিকে গাঙ্গী সাহেব ধ্যানে কালুর বিপদ অবগত হইয়া “আকছোদ্

করিয়া দ্বিধে, উড়িলেন বাও ভরে পৌছিলেম হৃন্দর বনেতে । হৃন্দর বনেতে গিয়া বৃক্ষভণে দাঁড়াইয়া বাঘ সবে লাগিল ডাকিতে । গাজির গুনিয়া ডাক, বাঘ আইল লাখে লাখ, এসে সবে ছালাম করিল, ছালাম করিয়া কের জমিনেতে রেখে ছের বলে সাহেব কি দায় ঘটিল । নরনেতে দেখি নির, বল কি হইল কির, গাজি বলে কান্দিয়া তখন, জেরপেতে কালু যায় বে প্রকারে একে একে বত বিবরণ ।”

গাজী সাহেব অবশেষে বেড়াভাঙ্গা, কাণকুট, চিলাচকু, কেন্দো, দেশেওরাঙ্গা প্রভৃতি ব্যায় সমভিবাণীরে কান্তনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । গাজী সাহেব নদী পার হইবার সময়ে ব্যায়দিগকে ভেড়া করিয়া পার করিলেন, নিশিযোগে নদী পার হইয়া গাজী সাহেব রাজধানী অবরোধ করিলেন । এই যুদ্ধ-প্রসঙ্গে অনেক অজগবি ও অপ্রাসঙ্গিক কথা অবতারণা আছে । তন্মধ্যে দক্ষিণা রায়ের প্রসঙ্গগুলি আমাকে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে হইবে । কারণ, ত্রিবৃত্তা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ যে ব্যায়ের দেবতা দক্ষিণ-রায়ের ভগ্নাবহ মূর্ত্তি দেখিতে পাই এবং প্রাচীন কবি মুকুন্দরায়ের পুথিতে যে দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যান অবগত হওয়া যায়, সেই দক্ষিণ রায় যে আমাদের বশোহর জিলার অন্তর্গত বর্তমান লাউজিনি গ্রামের রাজা মটুক রাঘের বন্ধু ও দেনাপতি ছিলেন, তাহা প্রমাণ করিবার বাসনা রহিয়াছে ।

রাজ্যিতে ককির সাহেব আসিয়া ব্যায়গণসহ ত্রাঙ্কণা নগর অবরোধ করিয়া-ছেন, এই সংবাদ প্রত্যাঘে অবগত হইবারাত্রই মটুক রাজা দক্ষিণা রাঘকে সংবাদ দিলেন । রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া “এতক গুনিয়া রায় হাসি হাসি কর, এর লাগি তর কেন রাজা মহাশয় । এই সবে বাই আমি থাক খোলালেতে, মারিব সকল বাঘ ফকির সহিতে । এতক বলিয়া বির গোখাধল হইয়া, যুদ্ধেতে চলিল অঙ্গে বসন পরিয়া । আশি গজের লম্বা ধুতি পরিয়া লইল, আশি মনের টোপ বির মাথায় পরিল । হাজার মনের এক জিজির কোমরে, কলিয়া বান্ধিল বির ধুতির উপরে । হাজার মনের এক খয়ের লইল, তার পরে ঢাল এক পৃষ্ঠে জুলে দিল । বারস মনের পদা হাতেতে লইল, বাজা করি সংগ্রামেতে সাজিয়া চলিল ।”

বাজাকালে পথে অমঙ্গল দেখিয়া দক্ষিণার ভদ্র দমিয়া গেল, যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য ব্যায় দেখিয়া দক্ষিণারায় ভীত অন্তঃকরণে নদীকিনারে ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাদেবীকে স্মরণ করিলেন । “ডাক গুনি গঙ্গাদেবী উঠিল তানিয়া, প্রণাম করিল বির গঙ্গাকে দেখিয়া । আশীর্বাদ করি দেখি জিজ্ঞাসে তখন, কহ কহ বির ঘোরে ডাক কি কারণ । কান্দিতে কান্দিতে বির লাগিল কহিতে, তন মাগো

বলি আমি তব চরণেতে। মটুক রাজা সেবিতছে ছোট কালাবধি, সেবিয়া আসিছে তার জনক অবধি। সে রাজার জাতকুল আজি মাগো জার, ফকির এক আসি তার কড়া গিতে চার। বেদোনার বাব আনিয়াছে সাথে কোঠে, ব্রাহ্মণা নগর সব রাবিরাহে বিরে। দয়া করি ওগো মাতা দেহ না কুস্তির, তবে তারে দেখি আমি কেমন ফকির। গঙ্গাদেবী বলে বির বলহ সত্তর, সে ফকিরের নাম কিবা কোন দেশে বর। এত জনি বলে রায় গুনগো জননি, গাজি সাহা নাম তার লোকমুখে শুনি। পশ্চিম দেশেতে আছে বিরাট নগর, পিতা তার বাদশা জান নাম ছেকন্দর। অজুণা বলির কড়া তাহার জননি, লোকমুখে শুনিয়াছি আমি নাহি চিনি। এত জনি গঙ্গা বলে সন্দেহ কি এতে, ব্রাহ্মণ চলিয়া গেছে মোছলমান ভেতে। গুনহ দক্ষিণ রায় বলি যে তোমার, গাজি সাহা জান মোর ভরিপুর হয়। রক্ত মাংস এক জান নাহি হয় পর, যেটা হইতে দয়া আছে গাজী পরে মোর। আমি আর গোত্রী দোহে সহায় তাহার, ফিরাইতে কার শক্তি বিবাহ চম্পার। ৭ * * কুস্তির না দেহ যদি কারণে আমার, এখনি মরিব আমি নিকটে তোমার। এতেক বলিয়া বির গদা লইয়া হাতে, মারিতে উঠার বির আপনার মাথে। তাহা দেখি গঙ্গা বলে থাক থাক বির, কুস্তির দিতেছি আমি তোমার খাতির।”

এইবার দক্ষিণা রায়ের কুড়ীয়ে ও গাজী সাহেবের ব্যাগে তুফল সংগ্রাস উপস্থিত হইল। গাজী সাহেবের ব্যাগগণ নবদত্তবিহীন হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। তখন গাজী সাহেব আশ্রয়স্থান হইয়া রোস্তমের তেজ বাড়াইয়া দিলেন। কুস্তিরগণ রোস্তমের তাপ সহ করিতে না পারিয়া নদীতে ঝাঁপ দিল, ব্যাগগণ আসিয়া দক্ষিণা রায়কে আক্রমণ করিল। দক্ষিণা অনন্তোপায় হইয়া পুনরায় গোত্রী আরাধনা করিলেন “কান্দিয়া কহেন বির দেখির সদমে, কি বলিব দেখ মাগো আপন নয়নে। তুফকের বাঘে মোরে রাখিল ঘিরিয়া, নগরের লোকজন মরিল ডালিয়া। এই অস্ত করি মাগো তোমাকে স্মরণ, ভূত ও পিশাচ দেহ আমার কারণ।”

অতি কষ্টে দক্ষিণা রায় ভূত প্রেত পাইলেন। পুনরায় যুদ্ধ চলিল। প্রেতগণের লোষ্ট্রে নিক্ষেপে ব্যাগগণ ভগ্ন হইয়া যুদ্ধস্থান হইতে প্রস্থান করিল। নিরুপায় হইয়া গাজী সাহেব অগ্নিদেবীকে আহ্বান করিলেন। অগ্নিভরে পিশাচগণ ভগ্ন ভস্ম দিল। তখন দক্ষিণা রায় ব্যাগের সংরক্ষণে অগ্নির হইয়া এক হস্তার ছাড়িলেন। সেই হস্তায় স্বর্ণ মস্ত কল্পমান হইল, ব্যাগগণ অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিল। মোটের উপর দক্ষিণা রায়ের নিকট ব্যাগগণ পরাজিত হইল। দক্ষিণা রায়

গদাঘাতে গাজী সাহেবকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইলেন। উভয়ে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। অবশেষে গাজী সাহেব আশার নাম স্বরণ করিয়া দক্ষিণাকে হস্তস্থিত আশা ফেলিয়া মারিলেন, দক্ষিণা আশার আঘাতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। গাজী তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। দক্ষিণা চম্পাবতীর বিবাহে সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত হওয়ার মুক্তি পাইলেন।

এ দিকে দক্ষিণা রায় যুদ্ধে ধরা পড়িতাছেন শুনিয়া মটুক রাজা স্বয়ং যুদ্ধ-সজ্জা করিলেন। তিনি বলিলেন, গাজীকে ধরিয়া মারের নিকট কালু ও গাজীকে বলি দিবেন। “কালির নিকটে কালি পুজার সময়, হুই জনে নরবলি দিব যে নিশ্চয়।”

তীর তোপ ঢাল বর্ষা ঢাক ঢোল দিগা বাঁনী হাতী ঘোড়া উট প্রভৃতি লইয়া মটুক রাজা সৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সৈন্যের পনতরে মেদিনী কাণিল, ঘুলায় আকাশ ঢাকিয়া গেল। যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ব্যাঘ্রগণের তেজ মটুক রাজা সহ করিতে পারিলেন না, হাজার হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাঘ্রের দ্বারা আহত হইতে লাগিল। মটুক রাজা প্রথম দিনের যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। “ভাগিয়া মটুক রাজা কোন্ কাম করে, আছিল দ্বিগুণ কৃপু সেই রাজার ঘরে। সেই কুপের জল রাজা কুস্ত কৈরে হোলে, ত্রিবিধে গো ছিটাইল গিয়া রণস্থলে। হাতী ঘোড়া বত তার মরে গিরেছিল, সবার গায়েতে জল ছিটাইয়া দিল। আর বত লোকজন মরেছিল তার, ছিটাইরে দিল জল অঙ্গেতে সবার। ‘জত লোক মরে ছিল পাঁচরা জীবন, হাতি ঘোড়া বেঁচে তার উঠিল তখন।’ পরদিন আবার যুদ্ধ বাধিল, গাজীর ব্যাঘ্রগণ মৃত প্রায় হইল। তিনি ঘানে মটুক রাজার মৃত সৈন্যগণের প্রাণ-প্রাপ্তির কারণ অবগত হইলেন। “গাজী বলে শুম বাঘ কহি সন্ধান, মৃত্যুজীবকুপ আছে ঘরেতে রাজার। সেই কুপ আছে ঘরের অশুক স্থানেতে, গো হত্যা করিয়া যদি ফেল সে কুপেতে, তবে সে পলকে রণজয় হইয়া জায়, বাঁচিবার শক্তি আর কাক নাহি রয়।”

গাজীর পরামর্শ কার্যো পরিণত হইল, কিংকৃপের জল নিশাবোপে পো-রক্কে অপবিষ্ট করা হইল। পরদিন মটুক রাজার হত সেনা জীবকৃপের জলে আর প্রাণ পাইল না। রাজা যুদ্ধে হারিয়া গেলেন, গাজী সাহেবের ব্যাঘ্রগণ তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। মটুক রাজা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিবেন এবং গাজীর সহিত চম্পার বিবাহ দিবেন, স্বীকৃত হওয়ার গাজী রুজার বন্ধন ঘুলিয়া দিলেন। তখন মহা সমাধরে কালু গাজী মটুক রাজার গৃহে গমন করিলেন।

যত ভ্রাস্ত্রণ ছিল পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিল, নগরবাসী সব মুগলমান হইল; খুব ধামের সহিত চম্পার পরিণয়-কাণ্ড সমাধা হইয়া গেল।

কিছুদিন স্বত্ববাহিনী থাকিয়া গাজী চম্পাপাণে অবদেয়াজ্ঞা করিলেন। গাজী সাহেব পথে পথে ভ্রমণ করিবার সময় চম্পাকে হালুদেব কুল করিয়া রাখিতেন এবং পরে বাহুব করিতেন। চম্পাকে লইয়া কালু গাজী পাতালদেশে গেলেন, তথায় জ্যোতিষাভা কুলুহাসের সহিত মিলন হইল। তিন ভ্রাতা ও দুই বধু আমোদ আক্লাদ করিতে করিতে বিয়াটনগরে প্রভাগমন করিলেন। কালু রাণী অক্ষুণ্ণ জুহুরীর নিকট ফকিরি লইয়া গৃহভাগ হইতে চম্পাবতীর বিবাহ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার পরিচয় দিয়া জননী মনস্তৃষ্টি করিলেন। এই স্থানেই মুগলমান কেতা-বের বহান শেষ হইল।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

বীণাপাণির উদ্ধোধন।

কক্সারিয়া বীণার স্বরে মরাল'পরি বহুবপরে
সোণারস্বপনপরশ লয়ে সরস হরষ ভরে,
কে আসেরে আগারে ধরা আবার মোদের স্বরে।
আলোকরথে হ্রালোক হ'তে জ্ঞান দেশের বাণী,
ভুলোকমাঝে পুলক লয়ে আসছে বীণাপাণি,
ওগো মোদের বীণাপাণি।

কাহার আঁচল বাতাস পেয়ে, মলয় আজি এলো খেয়ে,
 সুক্লমুখে আঁকুল বৃকে রসাল আছে চেয়ে,
 চমকে উঠে পাপীরা পিক মধুর উঠে গেয়ে ।
 আলোকরথে ছালোক হ'তে জ্ঞান দেশের বাণী ॥
 ভুলোকমাঝে পুলক লয়ে আসছে বীণাপানি ॥

ওগো কাহার বীণার তানে ভ্রমর আগে নবীন প্রাণে,
 শুক্ণো তরু মগ্নরিছে কুহুমকিনলরে,
 কন্দ যুধী কদমর মেলে, নোহারপুত হ'য়ে ।
 আলোকরথে ছালোক হ'তে জ্ঞান দেশের বাণী,
 ভুলোকমাঝে পুলক লয়ে আসছে বীণাপানি ॥

ওগো কাহার মণির হারে পীযুষ করে শত ধারে,
 কাহার চরণ পরশ পেয়ে শিউরে উঠে ধরা,
 হাসছে যে সে সোণার স্তম্বে পরাণ দিনেহারা,
 আলোকরথে ছালোক হ'তে জ্ঞান দেশের বাণী,
 ভুলোকমাঝে পুলক লয়ে আসছে বীণাপানি ॥

এলোকেশে স্বভাববালা ধরছে কাহার বরণভালা,
 বসন্ত, তা'র কুহেলিকার ঘোমটা নেছে হরে'
 সীমন্তে তা'র রবিকরের পীযুষধারা ঝরে,
 আলোকরথে ছালোক হ'তে জ্ঞান দেশের বাণী—
 ভুলোকমাঝে পুলক লয়ে আসছে বীণাপানি ॥

শ্রীকালিদাস রায় ।

অদৃষ্টচক্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঘটক।

আখিনের মধ্যভাগ। অপরাহ্নে ভট্টাচার্য মহাশয় ও-প্রতিবেশী শিবরতন চট্টোপাধ্যায় ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহের সম্মুখস্থ চাতালে মাথুরের উপর বসিয়া আছেন। শেখ আখিনে দুর্গোৎসব—বাঙ্গালার মহোৎসব; বাঙ্গালীর জীবনে মিলনের—আনন্দের উৎসব, ভট্টাচার্য মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমার গঠনকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ভট্টাচার্য মহাশয় প্রতিমাগঠনের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিলে উভয়ে বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন। আকাশে ধূসর মেঘ। এবার বর্ষা বিলম্বে আরম্ভ হইয়াছিল, আজও শেষ হয় নাই, একদিন যদি আকাশ মেঘশূন্য হয়—পরদিন হইতে আবার বর্ষণ হইতে থাকে। দুই এক বিন্দু বৃষ্টি পড়িল। ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, “মা কি এবার কীদিতে কীদিতে পিজালয়ে আসিবেন?”

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, “তাহাই সম্ভব। পূর্বে এই শরতে বাঙ্গালার উৎসব ছিল; এখন শরতে ঘরে ঘরে স্নান রচিত হয়। ঘেনে শাহা নাই—সুখ নাই—আনন্দ নাই। এ অবস্থায় মা’র কীদিতে কীদিতে পিজালয়ে আসাই সম্ভব।”

“চলুন ঘরে বাই।” বলিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় উঠিলেন ও মাজরটি লইয়া বাইবার জন্ত হুকা লইয়া আগত ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

এমন সময় একজন যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এই কি মহেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটা?”

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, “হঁ। কাহাকে চাহ?”

“জাহাঙ্গী সহিত একটু কালের কথা কহিতে আসিয়াছি।”

“আমারই নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য। বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘরে চল।”

তিন জনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রথম কক্ষে দুইখানি তরুণোবের উপর সতরফি ও তছপরি চাদর বিছৃত ছিল। তিনজন তাঁহাতে উপবিষ্ট হইলেন। যুবক এক পার্শ্বে পদম্বর খুলাইয়া

বসিল বেথিয়া তট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “উঠিগা ভাল করিয়া উপবেশন কর।”

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, “এ কালের ছেলেদের বাক্য ক্ষুত্ৰা পূর্ণা সহজ নহে।”

তট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, “আমরা বন্ধন ছাড়াইতে পারিলে নিশ্চিত হই, আর ইহারা কেবল বন্ধনের উপর বন্ধনের পক্ষপাতী।”

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, “সেটা বরসের ধর্ম্ম। যে বরসে বন্ধনেই জুথ, সে বরসে বন্ধনমুক্ত হইতে চাহিলে সংসার চলিবে কিরূপে?”

যুবকের দিকে চাহিয়া তট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার কাছে কি প্রয়োজন, বাবা?”

যুবক বলিল, “আপনার একটি বিবাহযোগ্য কন্যা আছে।”

তট্টাচার্য্য মহাশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবককে ভাল করিয়া দেখিলেন, বলিলেন, “হাঁ।”

“এখন বিবাহ দিবেন?”

“ভাল পাত্র পাইলেই দিব।”

“আমার সন্মানে একটি পাত্র আছে। পাত্রের পিতা পশ্চিমে এজিনিয়ার; পাত্র পিতার একমাত্র পুত্র; এন্ট্রান্স পাস করিয়া—”

বাধা দিয়া তট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “ভাল ওসকল কথা পরে হইবে। আমি স্বয়ং বন্দ্যোপাধ্যায়। পাত্র কি?”

যুবক সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, “আমি কি তাহা না জানিয়াই আসিয়াছি? পাত্র মুখোপাধ্যায়।”

“মুখোপাধ্যায়।—বোপেশ্বর পণ্ডিতের কাহার সন্তান?”

যুবক এত কথা জানিয়া আইসে নাই; বলিল, “আমি সে সংবাদ লইয়া আসি নাই। আপনি এখন বিবাহ দিবেন কি না জানিতে আসিয়াছিলাম। সব সংবাদ লইয়া আর একদিন আসিব।”

“ভাল কোন্ গাঁই জান?”

যুবক সন্তক কণ্ঠধ্বনি করিতে করিতে বলিল, “তাহা আমি বলিতে পারি না।”

তট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?”

“কলিকাতা হইতে।”

“বাবা, ঘটকালী তোমার কাব নহে। তুমি ঘটক হইলে পাত্রের পরিচয় না জানিয়া বুড়া মাহুষের বাড়ী সন্ধান করিতে আসিতে না।”

যুবক বিব্রত হইল; বলিল, “আমি নৃতন ব্রতী।” তাহার পর সে নমস্কার করিয়া উঠিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, বৃত্তিতে কোথায় বাইবে? একটু অপেক্ষা কর।”

“বিলম্ব হইলে ট্রেন পাইব না।”

“এখন ত কোন ট্রেন নাই।”

যুবক অপ্রতিভ হইল, কিন্তু অপ্রতিভ তাব কাটাইয়া বলিল, “পথ ভাল নহে, একটু অপেক্ষা বাই।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বুলিলেন, যুবক অপ্রতিভ হইরাছে, আর কিছুকণ থাকিলে পাছে আরও অপ্রতিভ হয় এই আশঙ্কায় বাইতেছে। তিনি আর কিছু বলিলেন না।

যুবক চলিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “বাপারটা কি?”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “বুঝা গেল না। আজকালকার ছেলেদের বুঝা আমাদের সাধ্যাতীত।”

ভট্টাচার্য্য উঠিয়া বাহিরে বাইরা যুবককে লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার গৃহ হইতে কিছু দূরে রাজপথ দুই দিকে গিয়াছে। যে পথ ষ্টেশনের দিকে গিয়াছে যুবক সে পথে না বাইরা যে পথ ঘাটের দিকে গিয়াছে সেই পথে গেল।

* * * * *

ঘাট হইতে কিছু দূরে তীরে একখানি নৌকা বন্ধ ছিল। যুবক বাইরা সেই নৌকায় উঠিল। সন্ধ্যা বতীশচক্রে সেই নৌকায় ছিল। যুবক উপহিত হইতেই দুই তিনজন জিজ্ঞাসা করিল, “সংবাদ কি?”

যুবক বলিল, “এমন বিপদেও মাহুষ পড়ে। আর একটু হইলেই মরা পড়িতাম।” এই বলিয়া যুবক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত কথোপকথনের সায়াংগ বিবৃত করিল। তনিয়া অমূল্যচরণ বলিল, “তোমাদের যেমন কর্ম তেমনই ফল ফলিয়াছে। আমি বুলিয়াছিলাম, সুরেশ্বর একটা অনর্থ ঘটাইবে।”

একজন যুবক বলিল, “কিন্তু আপনি ত পেন্সন সুরেশ্বরের বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছিলেন।”

অমূল্যচরণ বলিল, “তাৎহাতে কি ? কেহ বুদ্ধিমানের কাব করিলে তাহাকে বুদ্ধিমান্ বখিয়াছি বলিয়া কি সে নির্যোথের কাব করিলে তাহার বুদ্ধির নিন্দা করিব না ?”

“একজন লোক কি কখন বুদ্ধিমান্ এবং কখন নির্যোথ হয় ?”

“কথাটা ভাল করিয়া বুঝিরা তবে তর্ক করা ভাল । ইংরাজীতে একটা কথা আছে, শরতানকেও তাহার বাহা প্রাপ্য তাহা দিবে । কোন লোক যদি কখন প্রবুদ্ধির কার্য করে, তবে তাহার প্রশংসা করিতে কুষ্ঠিত হওয়া উদারতার পরিচায়ক নহে । তদ্বির ‘কর্ণণা বাধাতে বুদ্ধি ।’ হুয়েবর কি কখন এরূপ কার্য করিয়াছে যে, এ কার্যে সে দক্ষ হইবে ? এরূপ কার্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-সাধন, এরূপ কার্যে অশিক্ষিত লোক পটুত্ব লাভ করিতে পারে না ।”

কথাটা ক্রমে তর্কের বিষয় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া একজন যুবক বলিল, “বাহা হইবার হইয়াছে, সে বিষয় লটারী তর্ক করা বৃথা । হুয়েবর যে ধরা পড়ে নাই, ইহাই সৌভাগ্য—আশা করি, ইহাতে আমাদের বন্ধুবরের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে ।”

অমূল্যচরণ বলিল, “আমিও সর্কাস্তঃকরণে সেই আশা করিতেছি । হুয়েবর যে ধরা পড়ে নাই, সেটা দৈবাৎ ঘটিয়াছে । কিন্তু তাহার ধরা পড়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল । আগ্রকার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বেন ভবিষ্যতে সাবধান হইতে শিখি ; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত না হই ।”

যে যুবক অমূল্যচরণের বাক্যে বিরক্ত হইয়াছিল, সে জনাত্মিকে বলিল, “সঙ্গপদেশ পিতামাতার নিকট, গুরুমহাশয়ের নিকট, এমন কি পাঠাপুস্তকেও অনেক পাইয়াছি । সে ক্ষমত্বজনের সহিত ঐতিহ্যমণে আসিবার প্রয়োজন ছিল না । অমূল্যধাবুর ভাবটা এইরূপ যে, পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি তাঁহারই হস্তগত, আমরা সব অজ্ঞান । লোকটার দান্তিকতা অসহ ।”

তাহার পর নানা কথা হইতে লাগিল । কিন্তু যতীশচন্দ্র সে কথোপকথনে বেন সম্পূর্ণরূপে যোগ দিতে পারিতেছিল না, সে কেমন অশ্রমবর্ক । সে কি ভাবিতেছিল । তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া একজন বৃহস্প্য করিয়া বলিল, “ভায়া কি ইহারই মধ্যে নিরান হইলে ?” সকলে হাসিল । যতীশচন্দ্র সে হাসিতে হাসি মিলাইল । কিন্তু যতীশচন্দ্র সত্য সত্যই সরোজার কথা ভাবিতে ছিল । পরতের অপরাহ্নে উজ্জল রবিকরে উদ্ভাসিতা—অদম্যকুঁয়ণ্য হারদ্যোতিত

বন্ধ—উদ্বেগোদ্ভববোনার রূপ তাহার তরুণ জন্মের মুখ্য করিয়াছিল। তাহার পর তাহার সঙ্গীদিগের কথায় তাহার হৃদয়ে যে আশাবীজ নিক্ষেপ হইয়াছিল বালিকার কুলপরিচরে সে বীজ ক্রমে অদ্বিগত হইয়াছিল। তাই আজ সে সরোজার কথা ভাবিতেছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

দুর্ভাবনা ।

ধরনীধরের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার মত বিষয়ী ব্যক্তির চরিত্রে তাহার কতকগুলি বিশ্বকর বোধ হইত। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন, জননীর কথার প্রতিবাদ করা তাঁহার অভ্যাস-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি যে স্থানেই থাকুন না কেন—যত ক্ষতি হয় আকাতেই সহ্য করিয়া শায়দীয়া পূজার সময় গৃহে আসিতেন ; বলিতেন, বিজয়ার দিন যে জননীকে প্রণাম করিতে না পারে, সে অতি দুর্ভাগ্য। একবার পূজার সময় তিনি কোন খরস্রোতা তরঙ্গিনীর উপর সেতু-নিৰ্ম্মাণ-কাণ্ডের তত্ত্বাবধানে একজন ইংরাজের সহকারী ছিলেন। পূৰ্ণবিভাগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নদী দুইবার অর্ধনিৰ্ম্মিত তন্তাদি ভাঙ্গিয়া আপনার স্রোতঃপথের বাধা দূর করিয়াছিল। দিনরাত্রি হুকুম খাটাইয়া কাৰ চলিতেছিল। এই অবস্থায় ধরনীধর পূজার ছুটিতে বাড়ী ঘাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার উপরস্থ কর্মচারী বলিলেন, “তুমি কি পাগল হইয়াছ ? এখন দিবসে আহারের ও রাত্রিকালে নিদ্রার সময় করিতে পার না—তখন ছুটি।” ধরনীধর বলিলেন, “সে বাহাই হউক, আমি ঘাইব। যা আমার পথ চাহিয়া আছেন।” কর্মচারী বলিলেন, “টেলিগ্রাফ কর।” ধরনীধর বলিলেন, “যা বুলিলেও আমার মন বৃষ্টিবে না।” কর্মচারী বিরক্ত হইলেন ; বলিলেন, “আজ তিন দিন হইল আমি তোমার পদ ও বেতন বৃদ্ধির জন্ত লিখিয়াছি ; তুমি এখন বাড়ী বাইলে আমি তোমার বিরুদ্ধে লিখিতে বাধ্য হইব।” ধরনীধর বলিলেন, “চাকরী বার সেও ভাল, তাপাি অন্ততঃ একদিনের জন্ত একবার আমাকে বাইতেই হইবে।”—তিন দিন দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া ধরনীধর তন্তনিৰ্ম্মাণকাণ্ড শেষ করিয়া কর্মস্থান ত্যাগ করিলেন। ডাকগাড়ী তাঁহার গ্রামের নিকটবর্তী ষ্টেশনে থামে না—অগত্যা পরবর্তী ষ্টেশনে নামিয়া পদত্বজে চারি কোশ পথ অতিক্রম করিয়া ধরনীধর গৃহে আসিলেন। সে দিন বিজয়া ; রাত্রি দশটা

বাজিরা গিয়াছে। বতীশচন্দ্র ঘুমাইরাছে। সুপ্ত গৃহে ধরনীধর জননী আসিরা আছেন। তাঁহার চরণে হুচিহ্না—নয়নে অশ্রু। পুত্র কেন আসিল না? কখনও ত এমন হয় নাই! এমন সময় গৃহঘার হইতে ধরনীধর ডাকিলেন, “মা!” পুত্রের কর্তব্যর তনিরা বিহ্বলা জননী ক্রুতপদে বাইরা দার মুক্ত করিলেন। পুত্র মাতৃচরণে প্রণত হইরা আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। জননীর হৃৎপিণ্ড আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইল। বলা বাহুল্য ধরনীধর আসিবার পূর্বে তিন দিন অসাধারণ পরিশ্রম করিরা বে কার্য্য করাইরাছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপরহিত কর্ম্মচারীর বিরক্তির আর অংকাশ ছিল না, তিনি সানন্দে সহকারীকে ছুটি দিরাছিলেন।

এবারও পুত্রার সময় ধরনীধর গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিরা তিনি গৃহাগত পুত্রের পাঠবিষয়ের সংবাদ লইলেন। অকণাশ্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি পুত্রের অঙ্কে পারদর্শিতার পরীক্ষা করিরা বিশেষ চিহ্নিত হইলেন। তিনি বুলিলেন, পুত্র অকলিঙ্কার কোন চেষ্টাই করে নাই; তাঁহা'র পক্ষে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব।

অমূল্যচরণ কিছুদিন পূর্বে একখানি মালিকপত্র বাহির করিরাছিল। বতীশচন্দ্রের বহু রচনা তাহার গৌরব বর্দ্ধিত করিরাছিল। বতীশচন্দ্র তাহাতে বিশেষ আশ্রয়প্রদান লাভ করিরাছিল। সে পত্রখানির কয় সংখ্যা এমন ভাবে এমন স্থানে রাখিরাছিল যে, ধরনীধর সহজেই সেগুলি দেখিলেন। কতকগুলি প্রবন্ধে পুত্রের নাম দেখিরা তিনি বতীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এসব প্রবন্ধ কি তোমার রচনা?” বতীশচন্দ্র বলিল, “হাঁ।” সে মনে করিরাছিল, তাহার এই কৃতিত্বের পরিচয়ে পিতা বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। কিন্তু ইহাতে ধরনীধর আনন্ডিত হইলেন না; পরন্তু ইহাতে তাঁহার হুচিহ্না বর্দ্ধিত হইল। তিনি পুত্রকে বলিলেন, “পাঠ্যবহ্যর নানা দিকে মন দিলে পাঠের অল্পবিধা হয়। সেই অল্পই সকালে এদেশে শিক্ষার্থীর কঠোর ত্র্যচরণের ব্যবস্থা ছিল। ঘুরোণে বিভ্রাণে বাসব্যবস্থাও বোধ হয় এই কারণেই উদ্ভাবিত হইরাছে। পাঠ্যবহ্যর অনন্তকর্ম্ম হইরা পাঠে মনোনিবেশ করাই কর্তব্য। এখন প্রবন্ধ লিখিরা কোন বিষয়ে মতপ্রকাশের বয়স তোমার হয় নাই। শিক্ষা সম্পূর্ণ কর, অভিজ্ঞতা লাভ কর—মতামত প্রচারণের বখেট প্রবোগ পাইবে। আমাদের পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন, বাধরগল্পের গুরুর শিক্ষা না পাইলে কাহারও মতের মূল্য হয় না,—অর্থাৎ চাউলের দর না জানিলে—সংসারের ব্যাপার না বুঝিলে কাহারও

বুঝি পরিপক্ব হয় না।” শিতার একথা পুস্তকের ভাল লাগিল না। ইহার পর ধরনী-ধর পুস্তকের কার্যের ও বন্ধুদিগের বিষয়ে অহুসকান করিতে লাগিলেন। জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, তাহার বন্ধুরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার গৃহে আসিয়া থাকে। তিনি অনেকের নাম সংগ্রহ করিলেন। বৃদ্ধা অমূল্যচরণের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বিশেষ প্রশংসা করিলেন। জননীর নিকট তাহার কথা শুনিয়া ও তাহারই সম্পাদিত মাসিকপত্রে পুস্তকের প্রবন্ধাদি দেখিয়া ধরনীধরের মনে হইল, তাহারই সহিত বতীশচন্দ্রের অধিক ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা এবং তাহার পরিচয় জানিলেই তিনি তাহার বন্ধুদলের পরিচয় পাইবেন।

ধরনীধরের একজন পরিচিত ব্যক্তি কলিকাতার থাকিতেন। উভয়ে বহুদিন এক স্থানে কাৰ্য্য করিয়াছিলেন। খাণদসমূহ অরণ্যমধ্যে পথিনির্ধারণজ্ঞ উভয়ে একত্র বাস করিয়া বহু দিন বহু কষ্ট ও বিপদ সহ করিয়াছিলেন। এমনও হইয়াছে যে, তাদের নিকট বস্ত্র জন্তুর গর্জন শুনিয়া উভয়ে অগ্নি জ্বালাইয়া একত্র জাগিয়া রাত্রি কাটাওয়াইছেন। একের বিপদে অপরই সহায় ও সম্মল ছিলেন। ধরনীধর যদি সামাজিক হইতেন তবে রামতারণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় ও অনাবিল বন্ধুত্ব পরিণত হইত।

কিন্তু বিপত্নীক ধরনীধর হৃদয়ের উজ্জ্বল ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। তাঁহার সমস্ত মেহ ও ক্রোধবাসা পুস্তকে দিয়া তিনি কেবল তাহারই জন্ত কার্য্য করিতেন। কারণ, সেই পুস্তকই তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর একমাত্র স্মৃতি। নিঃসঙ্গ প্রবাসে এক এক দিন নিশীথে বিনিস্র ধরনীধর পত্নীর উদ্দেশে বলিতেন, “তোমাকে এক দিনের জন্ত হুখী করিতে পারি নাই। তুমি ঘাহাকে রাখিয়া গিয়াছ, যেন তাহাকে হুখী দেখিয়া মরিতে পারি। তাহা হইলেই এই দুঃখ-দাবানল-দগ্ধ নিফল জীবন সার্থক মনে করিব।” ধরনীধরের বাহাই হউক তাঁহার প্রতি রামতারণের ভাল-বাসার ও প্রকার অভাব ছিল না। ধরনীধরের নির্মল চরিত্র, প্রবল কর্তব্যবুদ্ধি, অসাধারণ অধ্যবসার রামতারণের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি প্রকার সকার করিয়াছিল। রামতারণ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। একদিন যথাস্থে ধরনীধরকে তাঁহার গৃহে উপস্থিত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কয় বৎসর পরে উভয়ে সাক্ষাৎ—‘সেকালের’ অনেক কথা হইল। তাহার পর ধরনীধর তাঁহার আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন। রামতারণের পুত্র নিবারণচন্দ্র বতীশচন্দ্রের সহপাঠী ছিল। তাহার নিকট পুস্তকক্ষে সংবাদ লইবার উদ্দেশেই ধরনীধরের বন্ধু-গৃহে আগমন। শুনিয়া রামতারণ বলিলেন, “আমি

ভূমিহাছি, বতীশ বাজে কাবে অধিক সময় দেয়, পাঠবিষয়ে কিছু অমনোযোগী । সে বড় ধোঁশ-মিলিরাছে । আমি ছই একবার মনে করিয়াছি, আপনাকে এ কথা লিখি । কিন্তু লিখি নাই, কারণ সে অল্প দিকে খ্যাতি অর্জন করিতেছে, সেও ত স্নেহের বটে । বিশেষ সে আপনার একমাত্র সন্তান—তাহাকে ত আর উদারতার চিন্তার চিন্তিত হইতে হইবে না ।” ধরনীধর বলিলেন, “এখন হইতে অল্প দিকে মন দিলে কোন দিকেই কিছু হইবে না । ই”চড়ে পল্ল ফলে কোন কাণই হয় না ।” রামতারণ বলিলেন, “নিবারণ এখনই আসিবে । কলেজের ছুটির সময় হইয়াছে ।”

অল্পকণ পরে পার্শ্বের কক্ষে পুস্তকের পদশব্দ শুনিয়া রামতারণ ডাকিলেন, “নিবারণ !” বৃক গৃহে প্রবেশ করিয়া নতমস্তকে পিতার আজ্ঞাপ্রতীকার রহিল । রামতারণ বলিলেন, “যে ধরনীধর বাবুর কথা বহুবার তোমাদিগকে বলিয়াছি ; যিনি বহু বার বহু বিপদে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ইনিই সেই ধরনী-বাবু । নিবারণ আসিয়া ধরনীধরকে প্রণাম করিল । “ধাক—ধাক” বলিয়া তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন । নিবারণ বসিল । তখন রামতারণ পুস্তকের নিকট ধরনীধরের আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন । ধরনীধর তাহাকে জ্ঞাতব্য বিষয়ে করেকটি প্রশ্ন করিলেন । নিবারণ বলিল, “আমি বতীশের সম্বন্ধে অধিক কিছু জানি না । সে আমাদিগের সহিত বিশেষ না । বাহিরেই তাহার বন্ধুর বাহল্য । বাহা হউক আমি বতদূর পারি, সংবাদ লইয়া তাহাকে বলিব ।”

ধরনীধর বিদায় লইলেন, এবং বন্ধুপুস্তকের বিনীত ব্যবহারে ও পুস্তকের চাকল্যে কি প্রভেদ, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বিহগকুজিত সাহায়ে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । তাহার মুখ চিত্তার মলিন । ইহার ছয় দিন পরে শানগরের ঘাটে একখানি নৌকা লাগিল । নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া রামতারণ পথ জিজ্ঞাসা করিয়া ধরনীধরের গৃহে উপস্থিত হইলেন । ধরনীধর সংবাদের অল্প বাইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন । তিনি আশা করেন নাই যে, রামতারণ সংবাদ লইয়া স্বয়ং আসিবেন । তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে ধরনীধর বিশেষ আনন্দিত ও আপ্যায়িত হইলেন । কিন্তু তিনি স্মৃতিতে পারেন নাই যে, বন্ধুবৎসল রামতারণ যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অবিলম্বে বন্ধুকে তাহার পুস্তকের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ বিপদ জ্ঞাপন করা কর্তব্য বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন । বাল্যের বন্ধুত্বের শীর্ণধারা অনেক সময় জীবনে বিফৃত বাসুকাত্ত প্রোন্তরে অদৃষ্ট হইয়া যায় । যৌবনের বন্ধু অনেক সময় জ্যোতিরের জলের মত

প্রবণ ও উজ্জ্বলিত এবং তাহারই মত অন্নকালস্থায়ী। বারুকোর বন্ধু বীর—
বীর—গভীর ; তাহার চাকলা নাই, কিন্তু গভীরতা আছে, তাই তাহার স্থায়ী।

দুই একটি কথার পর রামতারণ বলিলেন, “নিবারণ সকল সংবাদ লইয়াছে।”

ধরনীধর বন্ধুর মুখপানে চাহিলেন। সে সংবাদ বলিতে রামতারণের বেদন
আগ্রহ ছিল—ওনিতে ধরনীধরের তেমনই ঐন্দ্রিয় ছিল।

নিবারণ সংবাদ আনিরাছিল, বতীশচন্দ্র বিভাগরের নির্দিষ্ট পাঠে অত্যন্ত
অমনোযোগী। সে বিভাগরের নির্দিষ্ট পাঠ তাহার মত প্রতিভাবানের অস্ত্র নহে, এই
বিশ্বাসবশে সাহিত্যচর্চার বশবর্ত্তের চেষ্টায় ব্যাপৃত। তাহার একদল বন্ধু তাহার
সেই বিশ্বাস দৃঢ় করিতে ও সেই চেষ্টাবিষয়ে তাহাকে উৎসাহিত করিতে ব্যাপৃত।
তাঁহাদের কথার বতীশচন্দ্র আপনাকে অতিরিক্ত প্রতিভাবান্ বিবেচনা করিতে
আরম্ভ করিয়াছে। তাহার বন্ধুদিগের মধ্যে অমূল্যচরণ সর্বপ্রধান। এখন তাহার
উপর অমূল্যচরণের প্রভাবই অত্যন্ত অধিক। এই অমূল্যচরণের পরিচর পাইয়াই
রামতারণ কিছু চিত্তিত হইয়াছেন ও বাস্তব হইয়া বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইয়াছেন।

অমূল্যচরণ মাতুলের পরিচরে পরিচিত। তাহার মাতুল কলিকাতা সমাজে
বিব্রে ও বিনায় বিখ্যাত ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনি স্মৃতিবিহীন,
বিদ্বান্ কিন্তু দরিদ্র পায়ে ভগিনীদান করিয়াছিলেন। ভগিনীপতি হাইকোর্টে
উকীল হইয়া তাঁহারই একটি বোকদমা পরিচালনের অস্ত্র স্বকঃবলে বাইরা বিহ-
তিকার প্রাণভাগ করেন। সে শোকে অমূল্যচরণের মাতুল একান্ত কাতর হইয়া-
ছিলেন। তখন হইতে ভগিনী ও ভগিনীর একমাত্র সন্তান দশমবর্ষ বয়স্ক বালক
অমূল্যচরণ তাঁহার সংসারভূক্ত হইলেন। ভগিনীই সে সংসারের কর্ত্তা ছিলেন।
মাতুল ভাগিনের শিক্ষার অস্ত্র বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভাগিনের সাহিত্য
ব্যতীত অস্ত্র বিবরের অধারনে কোনরূপ উন্নতি করিতে পারিল না দেখিয়া তিনি
অপত্তা তাহার ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। ফলে
তাহার ইংরাজীর সহিত নগণ্য, সংস্কৃতের সহিত অল্প ও বাঙ্গালার সহিত ঘনিষ্ঠ
পরিচয় হয়। মাতুল বেহাধিকাহেতু ও লোকনিষ্ঠায় ভাগিনেরকে আবশ্যকমত
শাসন করিতে পারিতেন না ; এ দিকে মাতামহীর আদরটা কিছু অতিরিক্ত ছিল,
ইহাতে অমূল্যচরণ কিছু উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সে উজ্জ্বলতা মাতুলের বিশেষ
ক্লেশের কারণ হইয়াছিল। অমূল্যচরণ তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয় ছিল, তাঁহার পুত্র-
পণ্ড ও অমূল্য চরণের অপেক্ষা বরংকনিষ্ঠ ছিল। এ অবস্থায় তিনি আশা করিয়া-
ছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে অমূল্যচরণই তাহারিগের অভিভাবক হইবে। তিনি

সে আশার হতাশ হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ভাগিনের বলিয়া ও অনেক স্থলে প্রতিনিধি হইয়া অমূল্যচরণ কলিকাতার সমাজে পরিচিত হইয়াছিল। তাহাতে সে আচার-আবহারে “লেকোপারদ্রুত” হইয়াছিল। বিশেষ আপনার অজ্ঞতা ও অক্ষমতা গোপন করিয়া বিজ্ঞতার ও ক্ষমতার ভাণ করিতে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাই লখনাটপটাস্ত্র অমূল্যচরণ সমাজের উচ্চতরেও প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তাহার মাতুল মৃত্যুকালে তাহাকে ২৫০০০ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। সেই অর্থ হস্তে পাইয়া তাহার উচ্ছ্বলতা বর্ষাবারিপাতে স্রোত-স্রোতের মত কুলঙ্গারী হইয়া উঠে। ফলে সে সে অর্থ নষ্ট করিয়াছে। সংপ্রতি সে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিয়াছে। যতীশচন্দ্র তাহার প্রধান সহায়। চরিত্র-হীন উচ্ছ্বল অমূল্যচরণের সহিত ঘনিষ্ঠতা বন্ধুপুত্রের পক্ষে অকল্যাণকর হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়াই রামতারণ বন্ধুকে সে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন।

সকল কথা শুনিয়া ধরদীধর চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তখনও তিনি অমূল্যচরণের সহিত পুত্রের ঘনিষ্ঠতার স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, যতীশচন্দ্র কেবল প্রবন্ধ লিখিয়া মাসিক পত্র প্রকাশে অমূল্যচরণকে সাহায্য করে।

তিনি তাহাকে যে অর্থ দিতেন তাহা যে তাহার প্রয়োজনান্তিরিক্ত এবং সে যে পিতামহীর নিকটও অর্থ পাইত এবং সেই অর্থ বে অমূল্যচরণ; পত্র প্রকাশের নাম করিয়া লইত তাহা তিনি জানিতেন না।

বন্ধু গৃহে “নিষ্টমুখ” করিয়া রামতারণ বিদায় লইলেন। ধরদীধর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পর্যন্ত গমন করিলেন এবং রামতারণের নৌকা ছাড়িয়া দিলে ভাবিতে ভাবিতে গৃহান্তিমুখগামী হইলেন। তখন পশ্চিম গগনে দিনান্তশোভা কুটীরা উঠিয়াছে। দূরে প্রান্তরের পরপারে তরুণাবির ভ্রামশোভা বেন অবিচ্ছিন্ন। কেবল কতকগুলি তাল ও নারিকেল তরু নিঃসঙ্গ গর্বে উর্ধ্ব মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নারিকেল তরুর পত্র-মুহূর্ত আনত—তালের নবপত্র-গুলি উর্ধ্বগ—বেন পুরাতনগুলিকে পদতলে ফেলিয়া উঠিতে চাহিতেছে। পশ্চাতে গগন অস্ত্র রবির কিরণজালে রক্তাভারঞ্জিত। কেবল নিয় হইতে কতকগুলি মেঘ ধীর নিশ্চল গতিতে উঠিয়া ক্রমে সমস্ত গগন অন্ধকার করিতেছে। সেই সন্ধ্যা গগনে ধরদীধর আপনার জীবনের সাবৃত্ত উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার জীবনের সংগ্রহ অমনই আশার রক্তাভারঞ্জিত ছিল। কিন্তু কালমেঘ উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দীর্ঘকাল ভাগ করিয়া ধরদীধর গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাত্রিকালে আহারের সময় তাঁহার জননী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে?”

যুরোপ-ভ্রমণ।

ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড-অন্-এভন্।

ইংরাজি ভাষার অতিজ্ঞ লোক মাত্রেয়ই পক্ষে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড একটি মহা পীঠস্থান। এই গ্রামে সেক্সপীয়ার জন্মগ্রহণ করেন, পার্শ্বস্থ গ্রামে তিনি বিবাহ করেন ও শেষ বয়সে এই গ্রামে আসিগা বাস করেন।

টেশনে মামিয়া একটু আসিগেই একটি জন্মর কোঠায়া দেখা যায়। ইহা সেক্সপীয়ারের মার্কিন ভক্তদিগের দান। গ্রামে ঢুকিলেই কেমন একটু পুরাতনের ভাব মনে আইসে। যদিও অনেক বাটা আধুনিক, তথাপি মনে হয় যেন অধিবাসীরা এখনও বোড়শ শতাব্দির ভাবে বিভোর, আর যেন সকলেই সেক্সপীয়ারের স্বপ্রামাণ্য বলিয়া মনে মনে গোরব অহুভব করেন।

যে বাটাতে সেক্সপীয়ার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সেই পুরাতন ভাবেই সংরক্ষিত। বলা আবশ্যক যে, একজন মার্কিন ধনী এই আবাসটি ক্রয় করিয়া স্বদেশে সংস্থাপিত করিবার সঙ্কল্প করেন। তখন ইংলণ্ডের লোক ব্যস্ত হইয়া সভা ডাকিয়া টাকা তুলিয়া ৪৫০০০ টাকা মূল্যে বাটাটি ক্রয় করেন। এখন "Trustees and Guardians of Shakespeare's Birthplace" একটি রেজিষ্টারি করা সভা। এই সভা সেক্সপীয়ারের জন্মভবন বাতীত তাঁহার জীর পৈতৃক কুটার এবং New Place নামক তাঁহার শেষ বয়সের আবাসগৃহও ক্রয় করিয়া রক্ষা করিতেছেন।

যে বাটাতে মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা এখন মুন্সিয়বে পরিণত। অতি সামান্য একটি দ্বিভাগ কাঠের বাড়ী, নিম্নে ৪টি ও উপরে ৪টি ঘর। উপরের বে ঘরে শিশু সেক্সপীয়ার প্রসূত হইয়াছিলেন, সিঁড়ির পার্শ্বেই সেই ছোট ঘরে এখন সাবধানে ঢুকিতে হয়; পাছে বলিয়া পড়ে। বাড়ীটি অনেক কটে দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে, অনেক স্থানে কড়ি দিয়া চাঁড়া দিয়া সোজা রাখিতে হইয়াছে। এই বাটাতে সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে বত কিছু পুস্তক, চিত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে সে সকল, তাঁহার ও তাঁহার নিকট আত্মীয়দিগের হস্তলিপি, তাঁহার সমসাময়িক মুদ্রা, তখনকার কালের বাতি, তাঁহার অনুরীক ও তাঁহার পুস্তকের বতরূপ সংকরণ আছে, সবই সংরক্ষিত।

এই বাটাতে ঢুকিলে মনে যে এক অপূৰ্ণ ভাবের উদয় হয় তাহা বলাই

বাহুণ্য। উপরে উত্তরদিকে একটি ছোট ঘর। তাহার এক ধারে একটি জানিয়ার দর। সেই স্থানে কবির একটি তৈলচিত্র রক্ষিত, দেখিলে মনে হয়, যেন কবি স্বপ্নীরে উপস্থিত। বাটার পশ্চাতে (উত্তরে) একটি ক্ষুদ্র উদ্যান। এই স্থানে তাঁহার পুস্তকাবলীতে যত প্রকার গাছ বা ফুলের কথা আছে, সে সব রাখা হইয়াছে। প্রত্যেকের গায়ে একটি ক্রিয়া ফলক, কোন্ নাটকের কোন্ অঙ্কে কোন্ গভীকে এবং কোন্ ছাত্রে সেই লতা বা ফুলের কথা আছে, তাহা কোদিত।

এই বাড়ি দেখিয়া আমি পার্শ্বস্থ সটারি গ্রামে কবির জীয় কুটার Anne Hathaway's Cottage দেখিতে যাই। পথে পরিচিত পল্লীদুগ্ধ—ভ্রামল ক্ষেত্র; কৃষকরা কাষ করিতেছে; আকাশও সেদিন মেঘশূন্য—পরিষ্কার, যেন বলের ভ্রামল দুগ্ধ। গ্রাম্য রাস্তা দিয়া স্থানসম কাষে চড়িয়া গয়া স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি, খড়ের চালসেওয়া পুরাতন ছোট কুটার; সমুখে ক্ষুদ্র বাগান। নিকটে কাছাকাছি দেখিলাম না। স্বয়ং হড়কা খুলিয়া ভিতরে গিয়া দেখি, একজন জীলোক রক্ষী ভাবে আছেন। দ্রষ্টব্য বিনিবের মধ্যে সেকালের গুটিকতক চেয়ার টেবল প্রভৃতি, অগ্নিকুণ্ডের (fireplace) কাছে একটি চওড়া কুশুনির মত স্থান, সেই স্থানে বসিয়া বোধ হয় কবির জীয় সহিত গল্প করিতেন।

যেঠো রাস্তা দিয়া গ্রামে ক্রিয়া পুরাতন গির্জা দেখিতে গেলাম। এই স্থানে কবির Christening বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়াছিল। তাঁহার নাম-সম্বলিত সেই পুরাতন খাতার সেই সেই পৃষ্ঠা উন্মুল্ল করিয়া কাচের আধারে সংরক্ষিত। এই গির্জার High altar-এর বামে কবি মহানিদ্রার শয়ান। কি ভাগ্য, দেখিলাম তাঁহার কবর রেলিং দিয়া ঘেরা। তাহার পার্শ্বেই কবির স্মৃতিচিহ্ন বা মনুমেন্ট। গোরের উপর সেই পরিচিত inscription—"Good friend of Jesus love forbeare. &c." ট্রুটিকোর্ড গ্রামের রাস্তা পাতরবাধান, তবে পাতরগুলি কত কালের বলিতে পারি না, অনেক ক্ষয় হইয়াছে।

নিউ প্লেস (New Place) এ কবির বে বাসস্থান ছিল, তাহা আর নাই, তবে পার্শ্বে ঘনন করিয়া সেই বাড়ির ভিত্তি অনেক স্থলে পাওয়া গিয়াছে, এবং একটি পুরাতন কূপ—বোধহয় কবি বাহার জল ব্যবহার করিতেন—আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাটার পার্শ্বে কবির বন্ধু ভাশ (Thomas Nasb) এর

বাড়ী এখন ক্রয় করিয়া অরক্ষিত হইয়াছে। তথায় কবির বাটার যে সব অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহা ও কবির বহুবর্ণের অনেকের চিত্র প্রদর্শিত হয়। বলিতে জুলিয়াছি, সর্ব্বত্রই—গির্জার পর্য্যন্ত—দর্শকের নাম ও ঠিকানা লিখিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক রক্ষিত আছে।

New Place-এর পার্শ্বেই একটি সাধারণের ভ্রমণ-উদ্যান। তথায় একটি mulberry গাছ আছে। কথিত আছে, ইহা কবির স্বস্ত প্রোথিত একটি বৃক্ষের চারা।

তাহার পর পুতলিলা এডেনের তীরে নূতন মুজিরম এবং রঙ্গালয় দেখিতে গেলাম। অনেকেই জানেন, মুজিরম লেখিকা যোহি করেলির যন্ত্রে ও চেটার ইহা স্থাপিত। প্রতি বৎসর ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ কর্তৃক এই রঙ্গালয়ে লেস্‌পীয়ারের নাটক অভিনীত হয়। যোহি করেলি এই গ্রামেই বাস করেন। বেশ বড় লাল পাথরের বাড়ী। নিম্নে প্রকাণ্ড পুস্তকালয়, সিঁড়িতে এবং উপরে চিত্রশালা এবং প্রকাণ্ড রঙ্গালয়। পার্শ্বে স্বস্ত উদ্যান, তাহাতে কবির রোজনাম্ভিত মূর্তি।

কিরূপ যন্ত্রে ও কি ভক্তির সহিত ইংলণ্ডবাসী তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কবির স্মৃতিচিহ্ন আগ্রহকর রাখিয়াছেন! আমাদের দেশের কবিদিগের স্মৃতি আমরা কি তাহে রক্ষা করিতেছি!

বার্মিংহাম।

ট্র্যাফোর্ড হইতে আমি বার্মিংহামে বাই। যে ট্রেণে বাই তাহা অনেকটা সেকালের খিদিরপুর বাইবার ট্রামের স্তায়, হুইখানি গাড়ি ও একটি এঞ্জিন; তবে গাড়িগুলির অবস্থা হুই ধারাই কাচ আঁটা।

পথে ইংলণ্ডের বন দেখিলাম। রেলের পার্শ্বে গ্রাম খুব কম, কেবল অগ্নয়, তবে অগ্নয়ও বেন অরক্ষিত বলিয়া মনে হইল।

শুভ্রমে একটি তদ্রলোকের সঙ্গে একমিনি কথা হইতেছিল। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, বার্মিংহাম বাইতেছেন কেন? আমি বলিলাম, ইংলণ্ডের একটি Manufacturing town দেখিবার ইচ্ছা আছে। তিনি বলেন, যদি শিল্প কোথায় স্বভাবের সৌন্দর্য্য হরণ করিয়াছে তাহাই দেখিতে চাহেন (Nature absolutely spoilt by art) তবে লিড্‌স্‌ (Leeds) বাউন। বাস্তবিকই বার্মিংহামকে স্বস্তর বলা যায় না, কেবল চিমুনি ও ধূম। অবশ্য সহরের পার্শ্বে বেশ খোলা বারগা আছে এবং

কয়েকটি সুন্দর পার্ক ও আছে । একটি—ক্যাননহিল পার্ক—আমি দেখিয়াছিলাম । তথাপি town proper এর প্রশংসা আমি করিতে পারি না । ইহাকে লণ্ডনের একটি ছোট ও অপরিষ্কার সংস্করণ বলা যাইতে পারে ।

এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বাঙ্গালী ছাত্র পড়িতেছেন । সকলের সঙ্গেই আলাপ হইল । একজন আমার কলিকাতার আমার ছাত্র ছিলেন । আর দেখিলাম, এ স্থানের প্রাচ্য সভা (Oriental Association) ; ভারতবর্ষীয়, তুর্ক, মিশরদেশীয়, ব্রহ্মদেশীয় ও চীনদেশীয় ছাত্রেরা ইহার সভা । একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক বামিংহামে ডাক্তারি করিতেছেন, তিনি ইহার সভাপতি । তিনিলাম, একটি ভারতসভাও আছে ; কিন্তু আমি তাহার অধিবেশনে যাইতে পারি নাই ।

বামিংহামে একদিন কতকগুলি বাণক ‘ব্র্যাকি’ ‘ব্র্যাকি’ বলিয়া কিছু দূর আমার পশ্চাৎগমন করিয়া ছিল, আর কোথায়ও এ ভোগ ভুগিতে হয় নাই ।

এডিনবরা

স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা অতি সুশোভন ক্ষুদ্র নগর ; তিন দিক্ পাহাড়ে বেষ্টিত । সহর অতি পরিষ্কার । প্রধান রাস্তা প্রিন্সেস্ স্ট্রীট ; এক ধারে অতি সুন্দর বাগান এবং অল্প পার্শ্বে মনোরম সৌধাবলী—দেখিতে বড়ই চমৎকার । কথিত আছে যে, যুরোপের মধ্যে ইহাই সুন্দরতম রাস্তা । মনে করুন, কলিকাতার চৌরঙ্গী রাস্তার বাটীগুলা যদি সবই সুশ্রী হইত এবং সমুখের মরদান বাদ পত্রপুষ্প শোভিত সুন্দর উদ্ভানে পরিণত হইত, তাহা হইলে কি সুন্দর শোভা হইত । প্রিন্সেস্ স্ট্রীট অনেকটা ইহারই অনুরূপ । বাগানটি (Prince's Garden) রাস্তা হইতে খানিকটা নীচু, এবং এই স্থানে একটি অতি মনোরম বাড়ি আছে । বাড়িটি বাগানের এক কোণে, যেন একটা প্রকাণ্ড ডাণ্ডিবিহীন ওয়াচ (openface) নামিত রহিয়াছে, বাড়ির কাঁটা এবং অকগুলি সমস্তই কুহ্মে রচিত—বিদ্র্য-সংযোগে বাড়ি চালিত হয় । •

এই রাস্তার পার্শ্বে সহরের প্রধান প্রধান বিপণিক্ষেত্রী দেখা যায় এবং উদ্ভানের পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড সৌধ স্তার ওয়ালাটার স্কটের মনুমেন্ট । ইহা একটি মন্দিরের স্তার বাটা ; তাহাতে স্কটের প্রতিমূর্ত্তি স্থান আছে ।

এডিনবরার এক পার্শ্বে শম্পাভূত গুটিকতক সুন্দর পাহাড়, তাহাদের নাম Blackford Hills এবং The Braids । এই দুইটি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায়

এডিনবরাবাসীদিগের—বিশেষতঃ প্রণয়ীদিগের—সমীরণ-সেবনের প্রিয় স্থান। এই পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে মানমন্দির স্থাপিত।

অত্র পার্শ্বে সুপ্রসিদ্ধ Holyrood Castle এর পার্শ্বে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ Arthur's Seat নামক পাহাড়। ইহাতে ভূগাদি বড় নাই। পাহাড়টি দেখিতে যেন একটি বৃহৎ গৌরীকির স্তর—সেই জঙ্গলই এ নাম।

এডিনবরা পার্কত্যা সহর; ক্রমাগতই উচু নিচু। তবে সহরের মধ্যে Prince's Garden ভিন্ন আরও একটি প্রকাণ্ড পার্ক আছে, তাহারই ধামে এডিনবরার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসালয় (পরিবার মধ্যে সর্কোপেক্ষা বৃহৎ Infirmary) এবং সুনিষ্ঠাঙ্গিটি স্থাপিত।

সহরের মধ্যে দেখিবার যিনিব অনেকগুলি আছে, তবে সেগুলির বর্ণনা করিবার পূর্বে এডিনবরা হইতে কিছু দূরে অবস্থিত দুইটি স্থানের কথা কিছু বলিব।

প্রথম, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ও স্বর্গের উপজ্ঞানপাঠকের সুপরিচিত পুরাতন রস-লিনক্যান্স (Rosslyn Castle)। ইহা এখন ধ্বংসাবশেষে পরিণত। দুই একটি ঘর খাড়া আছে, একটির দরজার উপর বাটী নির্মাণের তারিখ পড়া যায়—খৃষ্টাব্দ ১৩০৪। নিয়ে অত্র কারাগৃহগুলি অনেকটা অতন্ন আছে। হুর্গের পার্শ্বেই প্রকাণ্ড পাহাড় ও নিবিড় জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে ছোট একটি নদী এবং নিকটস্থ পার্কত্যা রাস্তা। Glens দেখিতে বাস্তবিকই বড় সুন্দর। তিন দিকে এই পাহাড় ও জঙ্গল একধারে সুগভীর পরিখা; এ দুর্গ যে বাস্তবিকই দুর্ভেদ্য ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, এডিনবরার নিকটে সমুদ্রের উপর সেতু Firth of Forth Bridge তনিসাধি, ম্যাসপো সহরের নিকটস্থ টে (Tay) সেতু ইহা অপেক্ষাও বড়; কিন্তু তাহা আমি দেখি নাই। এই কার্ণ অব্ কোর্ন ব্রিজ স্থপতিবিশ্ভার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাঁচ সহস্র লোকের সাত বৎসর অহোরাত্রব্যাপী পরিশ্রমের ফলে ও পাঁচ কোটির অধিক টাকা খরচ করিয়া এই সেতু নির্মিত। সেতুর উপর ডবল লাইন রেল পাতা। অলের নিকট দাঁড়াইয়া সেতুটি অত্যন্ত উচ্চ দেখার এবং অপর কূল ভালরূপ নজরে আসিলে না। আমি যে দিন সেতু দেখিতে গিয়াছিলাম ইংলণ্ডের নৌবাহিনীর এক অংশ—খাতনামা ড্রেডনট (Dreadnought) প্রকৃতি ১০১২ খানা বৃহৎ জাহাজ সে দিন সেতুর নিকট ছিল।

এডিনবরাহর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির কথা বলিবার পূর্বে তথাকার অধিবাসী-দিগের একটা কথা বলিব। অনেকেরই জানেন, স্কটল্যাণ্ডে ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রবল, এবং রবিবারে কেহ কোনওরূপ কাৰ্য্য করেন না, অর্থাৎ Sabbath-keeping পূরা মাত্রার প্রবল, কিন্তু গুলিলে চমৎকৃত হইবেন যে, রবিবারে বালকবালিকাদিগকে পর্য্যাপ্ত খেলিতে দেওয়া হয় না—অন্ততঃ বাটার বাহিরে এই অবস্থা। বালকবালিকাদিগের ক্রীড়াহল পর্য্যাপ্ত সে দিন বন্ধ। হয় ত বৈকালের দিকে কেহ কেহ বেড়াইতে পার, কিন্তু সে দিন খেলাধুলা একেবারে নিষিদ্ধ।

এডিনবরাহর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে প্রধান তিনটি—(১) হোলিরুড প্রাসাদ (২) এডিনবরা ক্যাসল্ এবং (৩) ক্যালটন হিল।

হোলিরুড—স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে ইহা খুব সুপ্রসিদ্ধ স্থান। অতি প্রাচীন কাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্কটল্যাণ্ডের রাজাদের ইহাই আবাস ছিল। অতি-বৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে এবং Arthur's Seat নামক পাহাড়ের গাত্রে এই প্রাসাদ। প্রাসাদের সম্মুখে একটি অবিশাল প্রাঙ্গণ, তাহাতে একটি সুকূট-শোভিত কোঠারা। প্রাসাদের মধ্যে কতকগুলি ঘর এখনও রাজা এডিনবরাহর আসিলে ব্যবহৃত হয়, সে সব প্রকোষ্ঠে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। তবে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মেরী—সুইন্ অব্ স্কটসের বাসগৃহগুলি সবই দেখা যায়। দুই একটি ঘর বেশ বড়; প্রায় আর সব কক্ষই ক্ষুদ্রায়তন। বিশেষতঃ যে কক্ষে রাণী মেরী আহার করিতেন এবং যথা হইতে তাহার শ্রিয়প্রাপ্ত ব্রিটিশকে ধরিয়া আনিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে হত্যা করা হয়, সে কক্ষটি অতিশয় ক্ষুদ্র, একটি রেল গাড়ির কামরার মত। প্রায় সর্ব্ব-ঘরেই স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে খ্যাত ব্যক্তি-দিগের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত এবং ছাতগুলি অনেক Heraldic inscriptionsএ সুশোভিত। যে কক্ষে রাণীর সভাধিবেশন হইত, সে কক্ষটি কিছু বড় এবং তাহার দরজার নিকট একটি পিষ্টলফলকে লিখা আছে, সেই স্থানে ব্রিটিশ-হত হইলেন। বলিয়া রাখা উচিত যে, ঘরের মধ্যে কাঠমণ্ডিত, ছাতও তাহাই।

প্রাসাদের পূর্ব্বগাত্রে পুরাতন চ্যাপেলের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই স্থানে সেকালের অনেক রাজা রাণী ও প্রধান প্রধান লোকের দেহ সমাহিত, কিন্তু এখন সমাধিগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এডিনবরা ক্যাসল্ বা দুর্গ—সমুদ্র পাহাড়ের একটি শৃঙ্গ কাটিয়া সমতল

করিয়া তাহার উপর এই দুর্গ নির্মিত। প্রবেশদ্বার দেখিলে লিমলাঠিলে বড়লাটের প্রাসাদের প্রবেশদ্বার মনে পড়ে।

ভিতরে অসংখ্য দুর্গেরই মত অনেকগুলি ফটক, কোনও কোনও ফটকের উপরিস্থ কক্ষ কারাকক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত। আবাসগৃহগুলি অতি ক্ষুদ্রাতন। একটি ঘরে ফটলাণ্ডের রাজমুকুট ও রাজকীয় মণিরত্ন রক্ষিত রহিয়াছে। যদিও ইংলণ্ডের রাজা ফটলাণ্ডের রাজা বটেন, তথাপি ফটলাণ্ডের রাজকীয় পরিচ্ছদ, মুকুট, মণিমুকুট প্রভৃতি লণ্ডনে লইবার নিয়ম নাই। তাহা এই ক্যাসলে রক্ষিত থাকে; রাজা ফটলাণ্ড আসিলে তাহা ব্যবহার করিতে পারেন। এই কক্ষের পার্শ্বে একটি সামান্য কক্ষ। তথার বেরীর পুত্র গ্রেটব্রিটেনের বুদ্ধরাজ্যের প্রথম অধিপতি ফটলাণ্ডের বর্ষ ও ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌স্‌ ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেই কক্ষে এখন একজন জীলোক বসিয়া Picture Post card বিক্রয় করেন। যে রক্ষী রাজমুকুট প্রভৃতির প্রতীক, সেও Picture Post card, কাগজচাপা প্রভৃতি বিক্রয় করে।

ক্যাসল এখনও সেনাবাসের জন্য বাদ্যত হইয়াছে।

ক্যাল্টন হিল (Calton Hill)—এডিনবরা সহরের ভিতর একটি পাহাড়। ইহার উপর কবি বার্ণসের মনুমেন্ট আছে, নেলসনের মনুমেন্ট আছে, একটি জ্যোতিষিক মানমন্দির আছে, আর আছে একটি অর্ধসমাপ্ত গৃহ, তাহাকে ফটলাণ্ডের গর্ব ও দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি বলে (the pride and poverty of Scotland) ওয়াটস্‌ন যুদ্ধে যে সকল সৈন্য হত হয়, তাহাদের সম্মানার্থ এই গৃহ বা মনুমেন্ট আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে ইহা সমাপ্ত হয় নাই, তাই এই নাম।

এডিনবরার ম্যুনিসিপাল মার্কেটক্রস, Market Cross (বাগানের মধ্যস্থ ক্রুশ কাঠ) প্রভৃতি দেখিবার জিনিস ঘটে। তথাকার হাইকোর্ট অতি ক্ষুদ্র, নিম্নতলেই আদালতগৃহ। নূতন ও পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার জিনিস। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় ছাত্র অধ্যয়ন করেন, অধিকাংশই চিকিৎসাশিক্ষার্থী। একটি কথা উনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী অনেক ব্রীটিশ ছাত্র এডিনবরার আছেন। তাহাদের প্রভাবে এডিনবরার নেটভ ছাত্ররা ভারতবর্ষীয় ছাত্রের সহিত সম্বাবহার করেন না। এমন কি উনিলাম, যদি কোনও ব্রীটিশ ছাত্রের আহ্বারকালে কোনও ভারতবর্ষীয় ছাত্র সেই টেবলে গিয়া বসে, তবে প্রথমোক্ত ছাত্র আহ্বার ত্যাগ

করিয়া উঠিয়া যায়। আরও শুনিতে পাইলাম যে, ছাত্ররা নিয়ম করিতে চাহিয়াছিল যে, গ্রন্থভান্ডারটির সত্তরণপত্তার কোনও কালা ছাত্র সভা হইতে পারিবে না। সুখের বিষয়, অধ্যক্ষ এ নিয়ম রহিত করিয়া দিয়াছেন। তবে বলা উচিত যে, সব ছাত্রই এই বিষয়ভাবে পোষণ করে না; এবং ক্রমে ইহা কমিতেছে। সুখের বিষয় ইংলণ্ডের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ ভাবের কথা কিছু শুনি নাই। লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড প্রভৃতি স্থানে ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কিন্তু ব্যারিষ্টারির পীঠস্থানে Inns of Court এ ভাবে কিছু আছে, অন্ততঃ একটি স্থলে আমি দেখিয়াছি, বৃতীশ ও কালা ছাত্রদের বসিবার ঘর (Common Room) বস্তুতঃ।

কেম্ব্রিজ।

এদিনবরা হইতে ট্রেনে কেম্ব্রিজ আসিতে পথে কার্ণাইলের একলিফেকান (Ecclefechan) এবং বিবাহার্বী যুবকযুবতীর তীর্থস্থান গ্রেটনা দেখা যায়। রেল হইতে বতটা বুঝা যায়, হুইটিই অতি ক্ষুদ্র গ্রাম।

ফটলাগ ও ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ সহজেই বুঝা যায়। ইংলণ্ডের প্রথম ষ্টেশন ফ্লোরিস্টন (Foriston) দেখিলে মনে হয়, ই' গাছপালা ও সমতল ক্ষেত্র আছে বটে, Caledonia বাস্তবিকই Stern and wild পথে একটা আশাদের দেশের নদীর মত নদী দেখা যায়, বোধ হয় টে (Tay) কি টাইন্ (Tyne) রেলের দুই ধারে অনেক লবণের ও করলাব খনি দেখা যায়; আর Oxenholme নামক ষ্টেশন হইতে কলনার ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেক ডিষ্ট্রিক্টসএর ছবি দেখা যায়, দূরে পাহাড়গুলি বেশ দেখা যায়, হ্রদের কিছুই দেখা যায় না। পথে দুই ধারে অনেক শক্তক্ষেত্র, গোমেষাদি চরিতেছে। দেখিলাম একটি মেঘের লেজ গরুর লেজের মতই লম্বা!

রাগ্‌বি (Rugby) ষ্টেশনে প্রায় ৪০ মিনিট অপেক্ষা করিয়া গাড়ি বদল করিতে হইয়াছিল। ইচ্ছা ছিল, রাগ্‌বি স্কুল দেখিয়া বাইর, কিন্তু শুনিলাম স্কুল ষ্টেশন হইতে দূরে; সাধ অপূর্ণ রহিল।

সন্ধ্যার পর কেম্ব্রিজে পৌছিলাম। জ্ঞাতা সঙ্গে করিয়া বাসায় লইয়া গেলেন। তাঁহার আবাসস্থল হইতে বাসা প্রায় ১ মাইল দূর। ছাত্রাবাসে অবশ্য বাহিরের লোক থাকিতে পার না; কিন্তু তাঁহার আবাসস্থানের নিকটেও আমার ভক্ত বাটী পাবেন নাই; কারণ, রানাগারে আমার নিত্য প্রয়োজন এবং কেম্ব্রিজে অধিকাংশ বাটীতেই রানাগারের একান্ত অভাব।

কেব্রিজ অতি ছোট সहर, কলেজগুলি এবং ছাত্রাবাস বাদ দিলে আর কিছু থাকে না।

যে নদীর নামে কেব্রিজ খ্যাত সেই ক্যাম আন্দনের দেশের সাধারণ খাল অপেক্ষাও সরু; প্রায় দশ হাত চওড়া হইবে। আবার গ্র্যান্টা নামে যে নদী আদিয়া ক্যামে পড়িয়াছেন তিনি এত বড় যে একটি পাইপের ভিতর দিয়া ক্যামে প্রবেশ করিয়াছেন।

ছাত্ররা কেহ কেহ কলেজে বাস করেন; কিন্তু স্থানান্তাববশতঃ অনেকই বোর্ডিং হাউসে থাকেন। এই সব বাটী রেজেন্টারি করা। গৃহকর্ত্তীদিগকে কলেজের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। এতোক ছাত্রের ছুটি করিয়া ঘর, একটি শরনের এবং অল্পটি বসিবার। ছোট ছোট বাড়ী, এতোক বাড়ীতে ২,৩ বা ৪ জন ছাত্র বাস করেন। সন্ধ্যা ৮টার পরদার চাৰি পড়ে, ৮টার পর ১০টার মধ্যে বাটী কিরিলে ২ পেনি জরিমানা দিতে হয়, ১০টা হইতে ১২টা পর্যন্ত তিন পেনি, ১২টার পর প্রবেশ নিষেধ। গৃহকর্ত্তীকে খাতা রাখিতে হয়। তাঁহার গৃহস্থ ছাত্ররা কে কখন বাড়ী ফিরে লিখিয়া রাখিতে হয়, আবার অন্য বাটার কোন ছাত্র ৮টার পর তাঁহার বাড়ীতে থাকিলে কতক্ষণ ছিল তাহাও লিখিতে হয়। এতস্ত্রির রাখিতে এক একজন শিক্ষক (Proctor) দুইজন অজুচর (ইহাদিগকে Bulldog বলে) লইয়া সহরের রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান; ছেলেদের দেখা পাইলেন নাম ও কলেজের নাম লিখিয়া লয়েন। অপরাধীর জরিমানা হয়।

সকাল হইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত ছেলেদের তত্তাবধান কিছুই হয় না। লেক্চর শুনিতে না গেলে কেহ কিছু বলে না। সপ্তাহে কয়েক দিন কলেজে ডিনার খাইতে হয়। যদি কেহ নিয়ম মত ডিনার খায় এবং ৮টার পূর্বে বাসার আইসে তবে সে লিখা পড়া করুক বা না করুক পরীক্ষার উপস্থিত হউক বা না হউক কেহ খবর রাখিবেন না। কলেজে যিনি tutor থাকেন তাঁহার নিকট লিখা পড়ার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্য বলিয়া দিবেন কিন্তু না জিজ্ঞাসা করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। ফলকথা সবই আপনার চেষ্টার উপর নির্ভর করে এবং এসব স্থানে self-help বা আত্মনির্ভরতা যথেষ্ট শিক্ষা হয়।

কেব্রিজের কলেজগুলি অবশ্য খুব পুরাতন। অনেকগুলি কলেজ ক্যামের ধারে অবস্থিত এবং নদীর অপর পারে উদ্ভানদখলিত। কলেজের নদীর ধারের অংশকে Backs বলে। এ অংশ বেশ উপবনের ভ্রম; তন্নিলাম, দ্রৌমকালে বড় সুন্দর দেখায়।

King's College নামক কলেজের চ্যাপেল বেশ সুন্দর illuminated বাতারনশোভিত ।

কলেজ ভিন্ন কেব্বিজে দেখিবার জিনিস (১) মুজিরগহিত চিত্রশালা অনেক উৎকৃষ্ট চিত্রে শোভিত (২) পুস্তকাগার ইহাতে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকই আছে । এখন আইন হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের ১ খানি গ্রিটিশ মুজিরমে, ১ খানি অম্বকোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ১ খানি কেব্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দিতেই হইবে । (৩) বোয়ট্যানিকাল গার্ডেন বদা ছোট তথাপি সংগ্রহসম্পদে উল্লেখযোগ্য এবং (৪) ইউনিয়ন বা ছাত্রসভা এই সভায় ছাত্রদিগের পড়িবার জন্য পুস্তকাগার, থেলিবার আরগা, ধূমপানের স্থান এবং সভাসমিতির স্থান আছে । ছাত্র ভিন্ন শিক্ষকরাও অনেক সময় এই স্থানে আইসেন । ছাত্রসভাটি পালা ঘণ্টার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিলেও চলে । ইংলণ্ডের অনেক রাজমন্ত্রী বক্তৃতার হাতেখড়ি এই স্থানে হইয়াছে ।

কেব্বিজ ইংলণ্ডের ফেনল্যান্ড (Fen country) তে অবস্থিত, কাষেই অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর । কেব্বিজে আগেরের পর আমাদের দেশের মত নিগ্রাকর্ষণ হয়, এবং আমাদের দেশের মত এ স্থানে অরও হয় ।

কেব্বিজের চতুঃপার্শ্বে অনেক বেড়াইবার স্থান আছে । একটু দূরে দুইটি ছোট পাহাড় দেখা যায়, তাহাদিগকে ছাত্রভাষায় Gog এবং Magog বলে ।

কেব্বিজের নিকটে ঈলি নামক পুরাতন গির্জা । ঈলির গির্জাটি অত্যন্ত সুবৃহৎ এবং সুন্দর ভাবে সজ্জিত ।

Illuminated জানালায় বাহ্যস্থি এই যে, ঘরের ভিতর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন সূর্য্যকিরণে ছবি হাসিতেছে, কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখুন, সূর্য্যের সুবও দেখা যায় না, আকাশ বেগাবৃত্ত । বস্তু এইরূপ জানালা দেখিয়াছি সবই এইরূপ ।

শ্রীমরেন্দ্রকুমার বসু ।

আফ্রিকার ইসলামধর্ম।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের 'স্বাধীনতা' শ্রীমতী হেমলতা বেনী আফ্রিকার ইসলামধর্ম বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে ইসলামের সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ততা বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা প্রচলিত হইয়া থাকে; এই কারণে মুসলমানবিশেষের ধর্মনীতি-বিশুদ্ধ নানা প্রমাণক ব্যাখ্যা সাধারণের চিতে বস্তুসুল হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য আবরাহাই উক্ত প্রবন্ধী, কেন না বাঙ্গালা ভাষায় ইসলাম সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিয়া প্রবন্ধে অপরোচন আদ্য-সেরাই কর্তব্য, অথচ তাহার চেষ্টা এখনও আমাদের মধ্যে হয় নাই।

লেখিকার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত হত্বী হইয়াছি। কিন্তু এক বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বৃত্তব্য আছে। বহু বিবাহের কথার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "মহম্মদ খ্রীলোক-বিশেষের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু ২ ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অধিক নহে।" আজ যদি বিলাতের শব্দগোষ্ঠীবিশেষে পাল্লান্টে মহাসভায় হানি বিদ্যা গ্রীবাধীনতার পর্যাঙ্ক প্রবেশন হয়, তথাপি ২০০ শত বৎসর পরে খ্রীলোকেরা হত্ব বসিবেন, বিংশশতাব্দীর আরম্ভে খ্রীলোকবিশেষের উন্নতি সম্বন্ধে কিছু ২ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অধিক হয় নাই।" কল কথা এক মুগেই চিরমুগের জন্ত সনাতন বিধান করা অসম্ভব; তবে যে বিধানের কালাহুবাচী সন্তোষজনক বস্তু অধিক সে বিধান তত উৎকৃষ্ট। হজরত মোহাম্মদের বিধানে খ্রীলোকগণ এক সময়ে মোসলমান জগতে সর্ববিষয়ে পুঙ্খবহু করুণ সম্বন্ধ হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা এখানে সম্ভবে না। ইসলাম খ্রীলোকের উন্নতির জন্য বাধ্য করিয়াছে, তাহাই কাব্যে পরিণত করিতে সমাজগতের এখনও বহু বিলম্ব আছে। ইসলামের খ্রীলোকের আদর্শ বাস্তবিকই খুব উন্নত।

লেখিকা পরে লিখিয়াছেন, "অত্যন্ত পুঙ্খবহু চারিটি করিয়া বৈধপত্রী গ্রহণের নিয়ম থাকিলেও কার্যতঃ তাহাতেই তাহার শেষ নহে, কারণ ইচ্ছামত খ্রীত্যাগের অধিকার মুসলমানের আছে এবং মুসলমান যদি অন্তঃসারে খ্রীত্বাঙ্গীপণ মুসলমান অন্তঃসারের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।" চারিটি বিবাহ, ইচ্ছামত খ্রীত্যাগ এবং খ্রীত্বাঙ্গীপণকে ভোগের সামগ্রী বলিয়া গণ্য করা, তিনটিই মুসলমানের শাস্ত্রে আছে; কিন্তু ঐ তিনটি বিষয় এখানে বৈধপত্রভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাতে মুসলমান শাস্ত্রে যে বস্তু আছে তাহা বিলাতের অন্তঃসার আছে, এক্ষণ মনে করা অসম্ভব হয় না। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়ত্রয়ের অত্যন্তকটিতে যে বাধাবিধি আছে, তাহা হিসাব করিয়া যেখানে আর সেদিক মনে করিবার কোন কারণ থাকিবে না। শত শত বিবাহীকত্রীবিশেষে এককালীন চারিটিতে আবদ্ধ করিয়া হজরত মোহাম্মদ বুদ্ধিগত কার্যই করিয়াছিলেন, কারণ সহগ এক-বিবাহে প্রবৃত্তি উৎসাহিত করিতে গেলে তাহা তদানীন্তন আরব জাতির সম্যক অনুমানিত হইত না, সুতরাং তিনি ধর্মপ্রচারে তাহাদের সহায়তা লাভে ব্যস্ত হইতেন। একেবারেই এতদূর তাহার প্রধান কার্য; তদ্বিষয়ে হুই একটি সামান্যিক কুপ্রথা বঙ্গীয় রাধিকাও তিনি ধর্মপ্রচার করিয়া-ছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে কুপ্রথাগুলিকে বস্তুগত হইবার অবসর দিয়াছেন, এক্ষণ নহে, বরং সেগুলি বস্তুগত প্রথমে সংঘ ও পরে সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়, কোশলে তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন,—"তোমরা হুই তিন কথা চারিটি পর্যন্ত বিবাহ করিতে পার; কিন্তু যদি অত্যন্তের সহিত সর্বতোভাবে সমান ব্যবহার করিতে না

পার তবে তোমাদিগকে একটি বিবাহই করিতে হইবে।" (কোরান শরীফ চতুর্থ অধ্যায়।) কোরান শরীফের এই বচন বৃদ্ধ। বিবাহকে সংঘত করিতেছে। মোসলেম পণ্ডিতগণ এইরূপ অভিনব প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, ইসলামের পুত্র উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিতে গেলে দীকার করিতেই হইবে যে একাধিক বিবাহ সম্পূর্ণরূপে ইহার নীতিবিরুদ্ধ। আজ কাল মুসলমান শিক্ত সমাজে স্ববিবাহ বিরল তবে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, বাহাতে সমাজ দুশিত হইবার দ্বন্দ্বমাত্র সম্ভাবনা থাকিতে পারে এরূপ বিধান নাগ্রে থাকাই অগ্রহীত। এ আপত্তির অযৌক্তিকতা প্রমাণার্থ লিডাসা করা যাইতে পারে যে, হিন্দুসমাজে প্রাচীনকালে (এমন কি অল্পদিন পূর্বে কুলীনদিগের মধ্যে) বিবাহ বিধিতে যে সকল শাস্ত্রীয় রীতি প্রচলিত ছিল, তদ্বারা আধুনিক সমাজ দুশিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় কি?

"ইচ্ছানত" প্রীত্যাগ করিবার অধিকার মুসলমানের আছে, এ কথা সত্য নহে। বারীক বেহম প্রীত্যাগ করিবার ক্ষমতা আছে, প্রায়ও তেমনিই বাসিত্যাগ করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু কোনটিই "ইচ্ছানত" নহে। তাগে এত বাধা আছে যে, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে উহা বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া থাকে। যে হলে ত্যাগ না করিলে একবারেই চলে না, এবং তাগে পরিবারের মধ্যে আত্মপরিচয় সর্বত্র যে অনিষ্টটুকু ঘটে, রক্ষার তদপেক্ষা অল্প বিধির অধিকতর অনিষ্ট সবেল অনতিক্রম্য হইয়া উঠে, সেই হলেই বিচারকের নির্দেশে ত্যাগ করা শাস্ত্রসম্মত। ইহা কেবল একটি লঘুতর অনিষ্টবার। একটি গুরুতর অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার উপায়। ত্যাগ যে সমাজের অনিষ্টকর, একথা পরোক্ষে ইসলাম দীকার করিতেছে, "ঈশ্বর তোমাদিগকে যে যে কার্য করিবার অমুখতি দিয়াছেন, তদ্বাধ্যে প্রীত্যাগ বা বাসিত্যাগ তাহার নিকট বেহমত।"

শেব কথা "মুসলমান বিধি অনুসারে প্রীত্যাগীয়া মুসলমান প্রভুর ভোগের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। অতঃপর একথা সত্য যে, প্রাচীন আরবজাতির মধ্যে এ প্রথা বর্তমান ছিল, এবং হজরত মোহাম্মদ উহাকে একবারে উৎপাদিত করিতে বাওগা মুক্তিপন্নত বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু বাহাতে উহা আপনাপনি গোপ পাগ, তাহার বিধান করিতে তিনি জ্বলেন নাই। "তোমাদের দানাদিগকে ব্যতিচারে দাণ্ডা করিও না।" (কোরান শরীফ ২৫শ অধ্যায়) পুনশ্চ "যে ব্যক্তি ব্যতিচারে ভীত হয়, তাহাকে এরূপ বিবাহ (বানী বিবাহ) করিতে অমুখতি প্রদত্ত হইল। কিন্তু যদি তোমরা বানী বিবাহ না করিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমাদেরই মঙ্গল হইবে।" (কোরান শরীফ চতুর্থ অধ্যায়) হুতরাং হুতবিচার করিয়া দেখিতে গেলে, বানীবিবাহেই যে প্রভুর ভোগের সামগ্রী, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

মুসলমান শাস্ত্রের যে সকল বিধি কেহ কেহ অকল্যাণকর মনে করেন, তাহাদের দ্বারা রক্ষা উচিত যে, সে সকল বিধি ভিন্নতর নহে। সমাজ যত উন্নত হইতে থাকে, সেগুলি উচিত আপন। আপন। প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়। সমাজের শক্তির নিক দিয়াই শাস্ত্রীয় বিধিসমূহের বিচার করিতে হয়। হুতরাং "সঙ্গপ্রকার কোমলবৃত্তি, সাধুবৃত্তি ও পরার্থপরতা" দ্বারা কেবল যে পরিবার তাহাই যদি এইরূপ দুশিত হয়, তবে সমাজ কোনরূপে বিভ্রান্ত থাকিতে পারে না" বলিয়া লেখিকা যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা অসূচক।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মাননীয় লেখিকার নিকট আমরা ইসলাম সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের আলোচনা আশা করি।

ঐমোহাম্মদ আদাম আলী।

সমালোচনা।

প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস।*

অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের এই পুস্তকখানি প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য রচিত। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, “এই ক্ষুদ্র ইতিহাসখানি যে শ্রেণীর বালকবালিকার জন্য অভিপ্রেত পূর্বে তাহাদিগকে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল না। * * * ঘটনানাহল্যে পুস্তকখানির কলেবর পূর্ণ না করিয়া, যে সকল ঘটনা দ্বারা কোন একটি সময় বা কোন একটি রাজ্যের সম্বন্ধে একটি পরিষ্কৃত ধারণা হইতে পারে, কেবল সেইগুলিই বেওয়া হইয়াছে।”

পূর্বে প্রথম শিক্ষার্থী বাঙ্গালী ছাত্রকে বাঙ্গালার ইতিহাস পড়ান হইত। তাহাদিগের পাঠের জন্য মেনপুজা দৈন্যরচয়িতা বিদ্যাসাগর, পণ্ডিতপ্রবর রামগতি জায়রম ও মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস’ বহুদিন বিদ্যালয়ে পঠিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির পুস্তক পরিচিত ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে রচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন, “বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ শ্রীযুত সার্মমন্ সাহেবের রচিত ইংরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থেও অবিকল অমূল্য নহে।” রাজকৃষ্ণ বাবু পুস্তকে মৌলিকতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাহাও বাঙ্গালার শাসনকর্তাদিগের দ্বারাবাহিক ইতিহাস—সুতরাং কিছু নিম্ন।

যে স্থলে বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার বিদ্যাসাগর মহাশয় বা রাজকৃষ্ণবাবুও যথেষ্ট সরসতার সন্ধান করিতে পারেন নাই সে স্থলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সরস করিতে খগেন্দ্রবাবুকে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুখের বিষয় খগেন্দ্রবাবুর শ্রম সার্থক হইয়াছে। তিনি এই দুঃক্লম অমূল্যে বহু পরিমুগ্ন সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

বালক বালিকাদিগকে সরস ও সরলভাবে ইতিহাস শিক্ষা দিবার চেষ্টা প্রতীচ্যে বহুদিন হইতে হইয়া আসিতেছে। ‘লিটল্ আর্থার্স হিষ্ট্রী’ বহু ছাত্রকে ইংলণ্ডের ইতিহাস শিক্ষাইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডিকেন্স বালকবালিকা-

দিগের ক্ষত্র ইংলণ্ডের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। সংপ্রতি রাডিকার্ড কিপলিং একখানি ইতিহাসের মধ্যে মধ্যে কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়া রচনা সুরস করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

“বে বরসে কল্পনা পতীর গল্প, রাজপুত্ররাজকন্ডার উপকথাকে আশ্রয় করিয়া তুণ্ড হয়, সে বরসে গল্পের ছলে ইতিহাস শিক্ষা দিবার প্রণালী অবলম্বন করিলে স্ফুলের আশা করা বাইতে পারে। জ্ঞানবক্রির সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার মাত্রা কমিয়া যায়, সে সময় গল্পের সাহায্য আর তত আবশ্যক হয় না।”—এইজন্ড দুই বর্ষব্যাপী এই পাঠ্যপুস্তকখানির শেষভাগ অপেক্ষা প্রথমভাগেই গল্প বেশী দেওয়া হইয়াছে।”—এ সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বলিবার আছে। গ্রন্থকার পাঠ্যপুস্তকখানির আয়ুর্কাল বিবেচনা করিয়া একাংশে গল্পের নাত্রাধিক্য প্রদান করিয়া ইতিহাসের প্রতি কিছু অত্যাচার করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে একটু কান্দি দিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সাধারণতঃ তিন অংশে বিভক্ত করা হয়—হিন্দুপ্রাধিকাল—মুসলমানপ্রাধিকাল—ইংরাজপ্রাধিকাল। এই তিন অংশের প্রথম অংশের ইতিহাসই অসম্পূর্ণ। প্রাচীন ভারতবাসী হিন্দুদিগের ইতিহাসরচনাবিষয়ভার কারণ নির্দেশ করিতে বাইয়া পণ্ডিত-প্রবর ওল্ডেনবর্গ হইতে তক্ষণ লেখক ব্রাডলী বাট পর্যন্ত অনেকে অনেক প্রকার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ফলে প্রাচীন ভারতবাসীর ইতিহাসরচনাবিষয়ভাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমভাগের অসম্পূর্ণতার মুখ্য কারণ নহে। কোন প্রাচীন জাতিই সমসাময়িক ইতিহাস রচনা করে নাই। স্থাপত্যনির্ঘর্ষনে, সাহিত্যে, উৎকীর্ণ প্রস্তরে তাহাদের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিচ্ছিন্ন অংশের সংযোগফলে ইতিহাস রচনা করিতে হয়। ভারতে দীর্ঘকালব্যাপী বিদেশী শাসন ও বিজ্ঞেতগণকর্তৃক পূর্ববর্গদিগের কৌন্তিলোপচেষ্টা প্রভৃতি বিবিধ কারণে ইতিহাসের উপযুক্ত উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষিত হয় না সত্য; কিন্তু আবশ্যক উপাদানের অভাবও নাই। এই সকল উপাদান হইতে সংপ্রতি তিনসেন্ট স্থিখ প্রাচীন ভারতবর্ষের একখানি মনোজ্ঞ ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই অংশের ইতিহাস আমরা মিত্র মহাশয়ের মত স্নানিক্ত অধ্যাপকের অহু-সঙ্কামফলে নূতন কথা জানিবার আশা করি। গ্রন্থের এই অংশে অধিক গল্প দিয়া গ্রন্থকার আমাদেরকে সে আশায় হতাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ যে স্পষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বহুদিন হইল স্নকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ভারতবর্ষের ইতিহাসের অতি

প্রধান ঘটনাক্রম লইয়া স্থূললিত কবিতায় ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ‘ভারতখানি’ সংক্ষিপ্ত। আলোচ্য পুস্তকখানি সেক্ষেপ সংক্ষিপ্ত নহে। ইহা যে উদ্দেশ্যে রচিত, ইহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য হ্রাসিকি সৰ্ব্বক্ষেপে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

গ্রন্থের চিত্রসম্পদও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৪ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ পুস্তকে ২২খানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। চিত্রগুলির বাছাই সৰ্ব্বক্ষেপে গ্রন্থকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সেকালের জাহাজ, সেকালের চিত্র, সেকালের স্থাপত্য—এ সকলের ঐতিহ্য সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত হয় না। কিন্তু বহুপৃষ্ঠাখ্যাপী বর্ণনায় বাহা স্থান অসম্ভব, একখানি চিত্রে তাহা সহজেই স্পষ্ট হয়। গ্রন্থকার বর্ণনায় বিষয় বিশদ করিবার ক্ষমতা চিত্রনির্মাণে বিশেষ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন।

গ্রন্থের রচনাশৈলী যথাসম্ভব সরল। ‘জাহাঙ্গীর’ বর্তমান সংখ্যায় ‘দীন মোহাম্মদ’ শীর্ষক যে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনায় বিষয়টি গ্রন্থে নিয়মিতরূপে বিবৃত হইয়াছে—“বাদশাহের অনেক বেগম থাকে, নাসিরুদ্দীনের একমাত্র স্ত্রী ছিলেন। তিনি নিজ ঘাটে বাসিতেন। একদিন রাত্রিবার সময় তাহার হাতের আঙ্গুল পুড়িয়া যায়। তখন তিনি নাসিরুদ্দীনের নিকট একজন দাসী চাহিলেন। নাসির বলিলেন ‘আমি প্রজাদের অপেক্ষে রক্ষকমাত্র, নিজের জন্ত সে অপেক্ষা করিবার অধিকার আমার নাই।’ রাজ-মহিষীর ভাগ্যে দাসী রাখা ঘটিল না।”

গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে সৰ্ব্ববিধ ভ্রমবর্জিত করিবার ক্ষমতা যথাসম্ভব ব্যক্ত করিয়াছেন। “লচরার ভ্রমক্রমে বখতিয়ার খালজিকেই বঙ্গবিজেতা বলিয়া নির্দেশ করা হয়। কিন্তু বখতিয়ারের পুত্র ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদই বঙ্গবিজয় করেন।” এই ভুলটি বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বোধহয় এক ভিন্দেন্ট শিখ ব্যতীত আর কোন ঐতিহাসিকই ছাত্রদিগের ক্ষমতা রচিত গ্রন্থে এ ভুলটির সংশোধন করেন নাই। কিন্তু বহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, “যদি এ ভ্রম সংশোধন করাই আবশ্যক হয়, তবে এইরূপ প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকেই তাহা করা বাঞ্ছনীয়।”

এইরূপে নানা গুণে পুস্তকখানি বিশেষ সমাদৃত হইবার উপযুক্ত।

দিল্লী ।

যে ভূখণ্ডে দিল্লী নগরী অবস্থিত, সমগ্রক্ষেমে সেই স্থান নানা নাম ধারণ করি রাখে। অতি প্রাচীনকালে এই স্থানের নাম ছিল সমস্তপুকক। ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে এই স্থানেই ব্রাহ্মণ্য শক্তির সহিত ক্ষাত্র বলের ঘোর সংঘর্ষ হইয়াছিল। এই স্থানেই পাচটি পুত্রিণী খনন করিয়া পরন্তরাম ক্ষত্রিয়রাজে তাহা পূর্ণ এবং সেই শোণিতে তাহার পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন। পরন্তরাম তপস্বী ব্রাহ্মণের পুত্র, কিন্তু ক্ষত্রিয়রাজের দোহিত্র ও পুত্র। তিনি ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে কেন অগ্রধারণ করিলেন? এই অগ্রধারণ ব্রাহ্মণ জাতির সহিত ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্গর্ষেই পরিচায়ক। পুণ্ড্রপাণ্ডে জানা যায়, পরন্তরামের পিতা জমদগ্নি একজন বনবাসী তপস্বী ছিলেন। হৈহয়রাজ কার্শ্ববীর্য়ার্জুন যুগবার বাইরা রাজিকালে জমদগ্নির আশ্রমে বাস করেন। ঋষির একটি হোমধেহু ছিল। সেই হোমধেহুটি আবার কানধেহু। তাহারই প্রসাদে ঋষি সাহচর হৈহয়-নাথকে আতিথা-সংকারে পরিচুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলদৃশ্ত গর্ভাক্ষ কার্শ্ববীর্য়ার্জুনের সেই ধেহুটির উপর অত্যন্ত লোভ জন্মিল। সেই সবংসা ধেহুটিকে তিনি বলপূর্ব্বক মাহিম্বতী নগরে লইয়া যান। ইহাই হইল পরন্তরামের সহিত কার্শ্ববীর্য়ার্জুনের বিবাদের কারণ। এই বিবাদে দোদীওপ্রতাপ কার্শ্ববীর্য়ার্জুন নিহত হইলেন। ইহা ব্যক্তিগত বিবাদের কথা। কিন্তু ইহার অন্ত পরন্তরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিবার অন্ত একবিংশতি বার ঘোর যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইলেন কেন? তাহারও একটা কারণ আছে। সে কারণটি এই;—

“দৃষ্টং ক্ষত্রং ভূবোভারমব্রক্ষ্যামনীমশং ।

রজন্তমোবৃত্তমহনু কন্তন্তংপি কৃত্তহংসি ॥”

ভাগবত ৯।১৫।১৫

“ক্ষত্রিয়গণ বলদৃশ্ত, ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধাচরণী (অথবা বেদ-বিরুদ্ধাচরণী) রজঃ ও ভষ্মাণ্ডে আচ্ছন্ন হইয়া পৃথিবীর ভাবস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই অন্ত তাহাদের অপরাধ গুরুতর না হইলেও পরন্তরাম তাহাদিগকে নাশ করিয়াছিলেন।” এই শ্লোকে “অব্রক্ষ্যাম” এষ্ট বিশেষণ হইতেই এই ব্যাপারটি বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। বশিষ্ঠের সহিত ক্ষত্রিয়রাজ বিশ্বামিত্রের বিবাদের কারণও এইরূপ। বিশ্বামিত্র রাজা বশিষ্ঠের হোমধেহু নন্দিনীকে হরণ করিতে বাইরা বিপাকে

পড়িয়াছিলেন। এই বিখ্যাত পরওয়ারের পিতামহীর সোধার। আবার ক্ষত্রিয় রাজা কল্লহপাদ বশিষ্ঠের পুত্র শক্তিকে চাবুকের প্রহারে অক্ষত এবং কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন বরাহনন্দন বশিষ্ঠের ও অস্ত্রাস্ত্র কথিগণের আশ্রয় দণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা পরওয়ারের সময়ে বা তাহার কিছুকাল পূর্বেই ঘটয়াছিল। এই সময়ে এইরূপ আরও দুই একটি ঘটনা ঘটয়াছিল। ইহাতেই মনে হয়, তদানীন্তন ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ অপহরণ করিতে এবং ব্রাহ্মণকে অপমানিত করিতে কিছুমাত্র কুপ্তিত হইতেন না। এই কারণেই ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় জাতির বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছিল। মতুবা কেবল কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের অপরাধের জন্য পরওয়ার সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না।

পরওয়ার সমস্তপক্ষেই পাচটি বৃন্দ প্রস্তুত করিয়া ক্ষত্রিয়গণের স্বক্ষে তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ অকালেই ব্রাহ্মণ্য শক্তির সহিত ক্ষাত্র শক্তির সংঘর্ষ ঘটয়াছিল। ইহা একটি যুগান্তরকারী ব্যাপার। পরওয়ারের পিতা জমদগ্নির মাতুল বিখ্যাত ইহার পূর্বেই বশিষ্ঠের নিকট পরাকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন;—

“বিগবলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্।

বলাবলং বিনিশ্চিত্যতর্প এব পরং বলম্ ॥”

বিখ্যাত তপোবলকেই প্রধান মনে করিয়া ক্ষত্রিয়সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্তাপ্রভাবে ব্রাহ্মণসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার চেষ্টা সফল হয়। কিন্তু অস্ত্রাস্ত্র ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণবিষেই ছিলেন। অতঃপর পরওয়ারের হস্তে ক্ষত্রিয়গণ নিষ্কৃত হইলে ব্রাহ্মণ্য শক্তি আবার প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই ভীষণ ব্যাপারের পর হইতেই ছাপর নামে নূতন যুগ গণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং দিল্লী অকালেই এই যুগান্তরকারিণী ঘটনা সম্ভবিত হইয়াছিল।

পরওয়ারের সহিত যুদ্ধে ঐ অকল একেবারে জনশূন্য হইয়া অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ইহার পরে চন্দ্রবংশীর সম্রাট রাজপুত্র কুরু ঐ অরণ্য নষ্ট করিয়া ঐ ভূমি কর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই ক্ষত্র এই স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র ও কুরুজঙ্গল হয়। লোকে তখন ইহার প্রাচীন সমস্তপক্ষক নাম জুলিয়া যায় এবং ইহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পাণ্ডবদিগের সময়েও এই স্থানের কোম কোম অংশে জঙ্গল ছিল। ঐ বন বাণ্ডববন নামে বিখ্যাত। অর্জুন বাণ্ডববন দণ্ড করিয়া এই স্থানে ইন্দ্রপ্রস্থ মগর প্রতিষ্ঠিত করেন। পরওয়ারের

কিছুকাল পরে এই স্থানে সুদর্শননামে এক রাজা খাণ্ডবী নামে এক পুরী নিৰ্মিত করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বহু ধনরত্ন সংগ্রহও করিয়াছিলেন। কিন্তু কালী-রাজ বিজয়ের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলে এই স্থান তৎকালে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এরূপ একটি পৌরাণিকী বার্তাও পাওয়া যায়। রানারণের সময় এই ভূভাগ অসঙ্গীর্ণ ছিল।

যাহা হউক, বাপর যুগের শেষভাগে এই অঞ্চল আবার সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল। এই সময়েও ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত গৰ্ব্বাক্ত ও আত্মস্তম্ভী হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই সময় ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত বিলাসীও হইয়াছিলেন। এই স্থানেই বাপরের শেষভাগে সঙ্গারত্ন ধরার অধীশ্বর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের যজ্ঞের অংশটান হইয়াছিল। যজ্ঞসভা কিরূপ কাক-কোণে সজ্জিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যুধিষ্ঠিরের এই ঐশ্বর্য্য-দর্শনে হুয়োধ্যনের জ্ঞাতি-শুলভ ঈর্ষ্যানল সঙ্কলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থানেই—এই ব্যাপারেই ভারতে ক্ষত্রবীৰ্য্য-বিনাশের বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই বিবেকের বীজ অল্পকালের মধ্যে মহাত্ম্রমে পরিণত হইয়া কুরুক্ষেত্রের মহাসমররূপ বিবময় কল প্রসব করিয়াছিল। এই মহাযুদ্ধে ভারতের ক্ষত্রবীৰ্য্য চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া যায়। কথিত আছে, যে সময়ে হুয়োধ্যন সভামধ্যে দ্রোণদীকে লাজিত করিয়াছিলেন, সেই সময় এক বিকর্ণ ব্যতীত অস্ত্র কোনও ক্ষত্রিয়রাজই তাহার প্রতিবার করিতে সমর্থ হইতেন নাই। তদ্বশে সভাস্থ কতিপয় ব্রাহ্মণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে এই অভিলাষ প্রদান করেন যে, ভারতে ক্ষত্র তেজ অট্টিরেই লুপ্ত হইবে; কলিতে আর ক্ষত্রিয়জাতি প্রবল হইতে পারিবে না।

ইহার পরই কুরুক্ষেত্রের মহাহবে ভারতের ক্ষত্রিয়-শক্তি উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভারতের যে স্থানে বহু লোক যুদ্ধ করিতে ও অস্ত্র ধরিতে জানিত, তাহার প্রায় সকলেই এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রাণ দিয়াছিল। এই যুদ্ধে অষ্টাদশ অকৌহিনী সেনা প্রাণ হারায়। ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭ শত সৈন্য লইয়া এক একটি অকৌহিনী হইয়া থাকে। সুতরাং এই যুদ্ধে ৩২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯শত বোদ্ধা বিনষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গন্ধৰ্ব্ব, রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর বাহাও ছিল, যুধিষ্ঠিরের অবশেষ বক্ষে তাহাও নিঃশেষ হয়। এদিকে ঐ সময়েই বহুবংশ অন্তর্নিবাসে ধ্বংস হইয়া যায়। ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর সমগ্র ভারত বিধবার রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। নিতান্ত শিথ

ও হাবির ব্যতীত যৌদ্ধ জাতির মধ্যে আর কেহ ছিল না। তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম বিপর্যাস্ত হইতে থাকে, এবং বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইতে থাকে। সেই ক্ষণে ক্রীকৃষ্ণকে তৃত্যরক্ষণকারী অবতারণ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে যুগবিগ্ৰহকারী ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হইতে কলি নামে নূতন যুগ আরম্ভ হয়, তবে ক্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর হইতেই ঐ যুগ গণিত হইতে থাকে। ভারতের এই তৃতীয় যুগান্তরকারী ব্যাপারও কুরুক্ষেত্রে বা সনত্ত পক্ষে সঙ্গটিত হইয়াছিল।

তাহার পর ভারতের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কলিযুগ এখনও চলিতেছে। কিন্তু এই কুরুবর্ষে ইহার পরও ভারতের ইতিহাসের গতিপরিবর্তনকারী অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ইতিহাস ও ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনার কতকটা অনুমান করা যায় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অন্ততঃ পাচ ছয় শত বর্ষ পর্য্যন্ত ভারতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অপ্রতিহত প্রভাবে চলিয়াছিল। তাহার পর কি কারণে কোথায় কোন্‌ বিপ্লবের প্রভাবে এই ক্রিয়াকাণ্ড বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা কে বলিতে পারে? যুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্বেই যে এ দেশে বৈদিকক্রিয়াকাণ্ডের লোপ ও বিকৃতি এবং জ্ঞানকাণ্ডের অবনতি ও হ্রদশা ঘটিয়াছিল, একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। এই অন্ধকারাবৃত যুগে কুরুবর্ষে কত যুগান্তরকারী ব্যাপার সঙ্গটিত হইয়া গিয়াছে, কত অমরকীর্তি লোকলোচনের সম্মুখ হইতে কিছু কালের জন্য আত্মগোপন করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

সাত শত বর্ষের কিছু অধিককাল পূর্বে এই কুরুবর্ষেরই বক্ষে তিরোয়ার প্রান্তরে মহামদ সাহাবদ্দীন চোহান বংশীর পৃথ্বীরাজের হস্তে পরাজিত হইয়া প্রতিহিংসার সঞ্চারিত মনে স্বহানে প্রস্থান করেন। এই সময় আবার ভারতীয় রাজগণের মধ্যে জাতিবিবাদ পূর্ণরাত্ম্যে প্রকটিত হয়। সেই জাতিবিবাদই পৃথ্বীরাজের বলক্ষয়ের নিদান। তাহার পর স্থানেশ্বর-প্রান্তরে দিনব্যাপী সংগ্রামের পর ভারতের দ্ব্যন্তরে চিরকালের জন্য অন্তর্নিহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার পরই ভারতে পাঠান-শাসনের প্রতিষ্ঠা।

১৫২৬ খ্রষ্টাব্দে আবার ঐ পানিপথের বিশাল প্রান্তরে বাবরের শৌর্য্যে পাঠান-রাজবংশের অবদান হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ভারতে মোগল যুগের আবির্ভাব হয়। ইহার ত্রিশ বর্ষ পরে আবার এই পানিপথ-প্রান্তরে অকবরের সঙ্ঘাত হিন্দু সেনাপতি হিন্দুর ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধেই পাঠানদিগের ক্ষমতা

একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ভারতে আবার কতকটা শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইহার পর ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে উদীয়মান মহারাষ্ট্রীয় শক্তির সহিত সমবেত মুসলমান শক্তির তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। যে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি এই ঘটনার পূর্বদিন সমগ্র ভারত অধিকার করিবার কল্পনা করিতেছিল সেই মহারাষ্ট্রীয় শক্তি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী কুতুবেজের প্রান্তরেই চূর্ণ হইয়া যায়। এই যুদ্ধে মোগল শক্তি অস্বস্ত হইলেও অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। দ্রুত আবেদনাই আর ভারতে প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন নাই। এই যুদ্ধের পরই ভারতে ইংরাজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুপ্রস্তুত ও সুগম হইয়া উঠে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী লর্ড লিটন ভারতেশ্বরের প্রতিনিধিরূপে প্রথম দয়বার করিয়াছিলেন। তাহার পর লর্ড কর্জন সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয়ের অভিবেক দয়বার এই স্থানে অতি সমারোহে নির্বাহ করিয়াছিলেন।

এবার সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং ভারতে আসিয়া এই দিল্লীতেই রাজত্ব দয়বার করিয়াছেন। দিল্লীর চিরস্বামী কীর্তিমালায় সহিত সম্রাট পঞ্চম জর্জের স্থিতি বিভাজিত রহিবে।

শ্রীশচিব্রণ মুখোপাধ্যায় ।

সংগ্রহ।

বিবিধ।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

মৃত অষ্টোত্তর ব্রাহ্মণের 'ইতিহাস বিহিত' নামক গবেষণা: জি. এ. চন্দ্রবারকর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধে একটি হৃদয় স্পর্ষক লিখিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তিনি স্বামিন্দ্রের জীবনকথা ও তাঁহার মতামত সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই আলোচনা করিয়াছেন। স্বামী দয়ানন্দ আত্ম সমালোচকের প্রতিষ্ঠাতা। ইহা নীচে এই ধর্ম পকন, হৃদয়প্রবেশ প্রভৃতি প্রবেশে বিশ্বস্তি লাভ করিয়াছে, বাস্তব। দেশে ও স্থানে স্থানে এই ধর্ম প্রসারলাভ করিতেছে, হৃদয়: দয়ানন্দের চরিত্র ও মত মানবিক প্রকৃতি অনেকের কোকুলা উদীর্ণ হইতেছে। আমরা নিয়ে চন্দ্রবারকর মহাপ্রবন্ধের সেই সম্বন্ধের সার সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

চন্দ্রবারকর মহাপ্রবন্ধ লিখিয়াছেন পৃথিবীর মধ্যে ভারতে মধ্যে মধ্যে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন

প্রতিভাবান ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার। ভারতে বিশেষতঃ।

তাঁহাদের আবেশের অশ্রুসাক্ষী জীবন বাণন করিয়া মানবের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্রায় উপর প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকেন। বর্তমান যুগে দয়ানন্দ এই প্রকার মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি। আচারনিষ্ঠ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, সত্যীর্ণ ধর্মমতের মধ্যে লালিতপালিত হইয়া তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, মানবের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে স্বর্গীয় জ্ঞান ও শান্তির দিকে প্রাধিকারিত করিয়াছেন।

কাঁথিয়ার উপাধীয়ে যোতিরাহ্মে একটি ক্ষুদ্র পত্রীতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম উমানন্দ। উমানন্দর ঐ সকলে জন্মাবধি, মহাজন, ও জমিদার ছিলেন। উমানন্দর শিব উপাসক। যখন দয়ানন্দের বয়স পাঁচ বৎসর তখন তিনি তাঁহাকে তদেবপ্রচলিত প্রথামতে শিক্ষালাভ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। উমানন্দর শৈব ছিলেন, দয়ানন্দকেও তিনি শৈবধর্মের অগ্রগণ্য পালন করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। যখন দয়ানন্দের বয়স ১৪ বৎসর হইতে তখন শিব চতুর্দশীর দিন তিনি দয়ানন্দকে শিব চতুর্দশীর ব্রত ও উপবাস করাইয়া প্রাদেয় প্রান্তরিত শিবমন্দিরে লইয়া গায়েন। সেইখানে প্রায়শ সকল শৈব শিবনাম ধপ ও শিবনাম স্বীকর্তন করিতেছিলেন। বাসিনীর শেখতামে সকলে নিমিত্ত হইয়া পড়েন, এমন কি উমানন্দরও নিমিত্ত হইলেন। সেই বৈশ নিমিত্তকতার যখন সকলে নিমিত্ত হইয়াছেন, তখন দয়ানন্দ দেখিলেন, একটি সুদিক শিব-লিঙ্কের গায়ে বিচরণ করিতেছে। দেখিয়া বালকদয়ানন্দের মনে এই চিন্তার উদয় হইল, আমি সম্বন্ধে যে দেবতা দেখিতেছি, ইনিই কি বাস্তবিক কৈলাসনাথ পিনাকোপানি দেবালিঙ্কের মহাদেব? যদি তাহাই হইলে তবে পাত্ৰ্য সুদিককে বিভাডিত করিতে পারিতেছেন না কেন? এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইলে তিনি তাঁহার পিতাকে আশ্রিত করিলেন; এবং তাঁহাকে সম্বন্ধের কথা বিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা যে উত্তর প্রদান করিলেন তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধ হইল না। তিনি অবিলম্বে পুঁহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং জননীর নিকট হইতে কিংকি বিষ্টার লইয়া শিবমন্দির ব্রত ভঙ্গ করিলেন। এই দিন দয়ানন্দের মনে শৈবধর্মের প্রতি অবিশ্বাসের

বীজ উত্ত হয়। সেই মজ্জা দয়ানন্দের শিক্ষাপণ শিব চতুর্দশীর রজনীতে এই ঘটনার স্মৃতি উৎসবের বস্ত্রাণ, দয়ানন্দ বোধ উৎসব করিয়া থাকেন।

এই ঘটনার আর দুই বৎসর পরে কয়েকটি আত্মীরের বিরোধবাহ্যে দয়ানন্দের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ইতঃপূর্বে দয়ানন্দ শাস্ত্রগ্রন্থে জীবন ও মরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, মনে মনেও এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যে কোন উপায়েই হউক জীবন ও মরণ সমস্তার সমাধান করিবেন। তিনি যোগদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিবার মজ্জা কৃতসম্বল হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতানাতা তাঁহাকে এই সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিবার মজ্জা অনেক চেষ্টা করেন। অবশেষে একদিন দ্বৈতাচার্যের সঙ্ঘাতকালে গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ কালে তিনি শুদ্ধ চৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া দয়ানন্দ ভারতের নানাহানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যোগদ্বারা ভ্রমণ, শিক্ষা ও মতপরিবর্তন। সিদ্ধিলাভ ও জীবন মরণ সমস্তার সমাধান তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই মজ্জা তিনি বানী পূর্ণানন্দ প্রভৃতি স্তম্ভর নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি বানী বিরহানন্দের নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করেন। শুধা বাহ, বানী বিরহানন্দ দয়ানন্দকে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ও বৈদিক ধর্মের প্রচারের মজ্জা উপদেশ দিয়াছিলেন।

বিরহানন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দয়ানন্দ বৈদিকধর্ম প্রচার করিতে বহির্গত হইলেন।

তিনি প্রথমে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে নানাহানে বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে কুতবেলা হয়। দয়ানন্দ তথায়

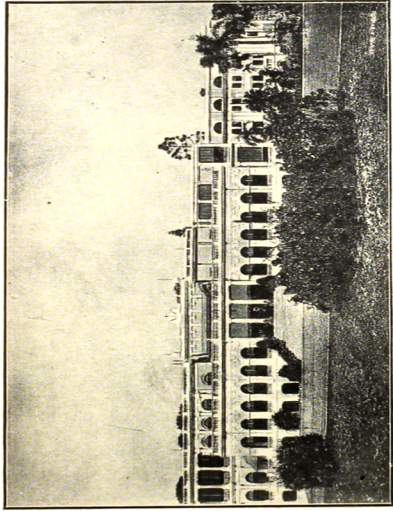
দীর্ঘ-মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কনোজ, করাচাবাধ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে কানপুরে একটি প্রকাণ্ড সভা হয়। কানপুরের লয়েট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ খেয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় হিন্দু পণ্ডিতবিশেষের সহিত দয়ানন্দের বিচার হয়। অতঃপর দয়ানন্দ ভারতের নানা স্থানে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১০ এপ্রিল তারিখে বোম্বাইয়ে প্রথম আধ্যাত্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আধ্যাত্ম সমাজের দলটি নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর আত্মীরে তাঁহার বেহাওয়ার হয়।

দয়ানন্দ বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে শ্রীলোকের ১৬ হইতে ২৪ বৎসর বয়সে

এবং পুরুষের ২৫ হইতে ৪৮ বৎসর বয়সে বিবাহ করা কর্তব্য।

তিনি বিদেশযাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিভেন, পূর্বকালে আধ্যাত্ম পাঠান বা আমেরিকার গমন করিতেন, শ্রীলুক ও অর্জুন, মুম্বাইয়ের সমস্তের মজ্জা উদ্বালক মুনিক আমেরিকা হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। পাণ্ডুপটী মাঝি ইরাণ বা পাকিস্তান রাজ্যের দ্রুহিতা ছিলেন। অর্জুন উলুপটীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, উলুপটী আমেরিকার কোন রাজ্যের প্যামেন্টের কন্ডা ছিলেন। হস্তরাজ্য আনন্ডাভার্ম বিদেশগমন ভারতবাসীর একান্ত কর্তব্য। শিক্ষা সম্বন্ধে দয়ানন্দ অবেতনিক ও বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষা পক্ষপাতী ছিলেন। প্রকৃত্য অবলম্বন ও শুদ্ধমূলে বাণ করিয়া অধ্যয়ন তাঁহার অভিপ্রায়।

আফ্রিকা বর্ড,—



বেনেডিক্টিন ।

বক্রেখর ।

— — —

যাত্রা ।

বক্রেখর অতি প্রাচীন তীর্থ; বঙ্গদেশের বীণতুম্ব জিলায় অবস্থিত। কিন্তু এই রম্য তীর্থের বিষয় বাঙ্গালার অনেকেই অবগত নহেন। পত্রিকার তীর্থ-তালিকার ইহার উল্লেখ আছে সত্য; কিন্তু বক্রেখরে তীর্থযাত্রীর বহুলা নাই। এই পুণ্য রমণীয় তীর্থ আমাদের গৃহদ্বারেই অবস্থিত, অথচ কোন্ পথ দিয়া তথায় বাইতে হয় তাহা আমরা অনেকেই অবগত নহি। বহু দিন হইতে আমার ভ্রমের এই তীর্থপরিশ্রমের বাসনা সুকায়িত ছিল। সময় ও সুযোগের অভাবে সে ইচ্ছা এত দিন অপূর্ণ ছিল। বিগত ১৭ই আশ্বিন, ১৩১৮, আমার ভাগ্যে এই তীর্থপরিশ্রম ঘটয়াছিল। টেট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর অতাল-সিঁড়িয়া ডাক লাইনের দুবরাজপুর ষ্টেশন হইতে বক্রেখর বাওরাই সুবিধা। কারণ দুবরাজপুর হইতে বক্রেখর ৪.৫ মাইলের অধিক দূর নহে; পথও পাখী—সুন্দর। কিন্তু দুবরাজপুরে অবস্থানের একান্ত অভাব, তবে সোধান বধন তখন পাইবেন এবং দুবরাজপুরে আশ্রয়স্থানও মিলিতে পারে।

আমি কিন্তু সিউড়ী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অবস্থানে বক্রেখর গমন করিয়াছিলাম। সিউড়ী দূরত্বে দুবরাজপুর হইতে ছাদল মাটল। সিউড়ী হইতে বক্রেখর মন মাইল মাত্র। বাতাসান্তের ভাড়া ৫ টাকা। সিউড়ীতে অবস্থানের অভাব নাই।

সিউড়ী হইতে পশ্চিমের অনিন্দ্যভ্রমের স্বাক্ষরপথ বক্রেখরগতিদ্বয়ে চলিয়া গিয়াছে। ১ মাইল দূরে অবস্থিত ঐতিপাড়া নামক গ্রামের এক মাটল দক্ষিণে বক্রেখর নামক নদীতীরে বক্রেখরতীর্থ। আমি সিউড়ীতে এক রাত্রি বাস করিয়া ১৭ই আশ্বিন বুধবার, একাদশী তিথির অকণরপূর্ণপ্রভাত প্রভাতে পূনা তীর্থ বক্রেখরগতিদ্বয়ে যাত্রা করিলাম। রাত্রিতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, তাই প্রত্যন্তে প্রকৃতিঃ শোভা দিগ্ধবহুর। প্রকৃত চিত্রে বাগিনাতমিষ্ট দারদ প্রভাতের করিত প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে শব্দটারোহণে গমন করিতে লাগিলাম। সিউড়ী সহর অতিক্রম করিয়াই প্রথমে স্থানীয় গগনে বিরাট ইন্দ্রবহুর অশ্রু শোভা আমার চিত্ত হরণ করিল। আমার বনে পড়িল,—

হে প্রকৃতি ! একি হেরি । কে তোমার হয়েছি যেহি,
 মেঘে নৌবাধিনো - নৈলে ইন্দ্রধনু-হার ।
 বর্ষে শিবিগুচ্ছ নথ,—মেঘানে যে সে বিস্তর ।
 নরনে পলক বোর, পড়িবে কি আর ।

আখিন মাগ । শরতের স্তম্ভল প্রকৃতি মেঘালোকে উজ্জলমধুরে শিশিরা হস্তিত
 মাধুর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে । চতুর্দিক দিগন্তবিস্তৃত শতপূর্ব প্রান্তর
 দিঘলচুড়িত অরুণানী পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভাতপবনে তরলান্বিত হইতেছে ।
 বাস্ত-ক্ষেত্রের এখন অপূর্ণ শোভা এক বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথাও দৃষ্টিগোচর
 হয় না । পথের উত্তর পার্শ্বে স্থানে স্থানে অসংখ্য প্রস্তুতিত রক্ত কোকনদ-
 শোভিত কুমুদকল্লাবর্ষিত সরোবরসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল । বীরভূম
 প্রদেশের স্তায় সরোবরশোভা বাংলাদেশ অত্র প্রচুর । বে দিকেই নেত্র-
 পাত কর দেখিবে, বিশাল সরোবরসমূহের বহু বর্ণগবৎ জলরাশি স্বর্গাকিরণে
 ঢল ঢল করিতেছে । কূলে কূলে বেত বলাকাশ্রয়ী বিচরণ করিতেছে ।
 নানাবিধ জলচর ও বনপক্ষীর কাকলীকোলাহলে আকাশ মুখরিত । কোথাও
 চরিত্তপাঙ্কাদিত শ্রাব্বে গেমহিবাশি পতঙ্গ নবীন তৃণ ভক্ষণে ব্যাপৃত ;
 কেহ বা বৃক্কাগার শয়ান হইয়া রোনমুনে পরিতপ্ত হইতেছে ।

এ প্রদেশে নারিকেল বৃক্ষ বিরল ; শ্রাব্ধই মেঘা যায় না । তবে বর্জ্জর
 ও তাল তরুশ্রয়ী দৃষ্টে চিত্র মুগ্ধ হইয়া পড়ে । স্থানে স্থানে বর্জ্জরতাল-
 বনবেষ্টিত পুষ্করিণী । আবার কোথাও গ্রামপ্রান্তে তাগাদেয় মালিকার স্তায়
 শ্রয়ীবদ্ধ শোভা বড়ই মনোমোহন । প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিলে
 একটি গ্রামের সন্নিকটে পথের উত্তর পার্শ্বে সারি সারি নিবিড় জটাজুটবিলম্বিত
 ষটকর ছায়াশীতল চিত্তানপথ (Avenue) কি মনোরম ! সেই স্থানে
 কিছুকণ অপেক্ষা করিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিয়া লইলাম ।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি স্থানসন্নিবিষ্ট আশ্রয়স্থানে বহুকাণের
 পুরাতন একটি শৈবালমণ্ডিত মন্দির দেখিলাম । এই ভীর্ণ—ভগ্ন ভগ্ন-
 মন্দিরে এখন আর নিরমিত উপাসনা হয় না ; তবে কখন কখন পরিভ্রান্ত
 পথিক বা কঁকর বিশ্রান্তার্থ এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভগবানের আরাধনা করিয়া
 থাকেন ।

৫

পথের ধারে একটি পারশের শোভা দেখিয়া আরি চমুৎকৃত হইয়াছিলাম ।
 বৃক্ষটি বেশ হরিহরমুতি । ইহার অর্দ্ধাংশ অগণ অপরিষ্কৃত তিক্তিভী পান্ধে

সমাজের! আমি ইহা শব্দটু চেষ্টে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। বোধ হয়, দুইটি বৃক্ষ এক স্থানে জন্মিয়াছিল; কালে দুই কাণ্ড এক হইয়া এই অপূর্ণ সুসুগন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। এ দৃশ্যটি বড়ই মনোহর।

রানী বাহালের সুদূর শৈলশ্রেণীর নিবিড় জুনীলশোভা নেত্রপথে প্রতি-
ভাত হইল। সমুখে অন্তলতাভূগাছাদি ও বৃক্ষবিহীন প্রান্তর—তৎপরে বনঝালী;—
তৎপশ্চাতে দূর—অতি দূর ধরণীপ্রান্তে গিরিমালা। বিচিত্র সুন্দর ঘননীল
তৃধরশোভা দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলাম। আমার শব্দটু ক্রমে ভীতিপাড়া
আমে গৌছিল। এই স্থানে আর পাঁচ শতের উপর তত্ত্বাবধায় বাস করে।
অনেক খোড়োঘরের দাওয়ার (অর্থাৎ বায়ালার) শুণীকৃত ভটি (Cucubus)
চালা রাখিয়াছে। কোন কোন দাওয়ার যত্ন মন্থন করা হইতেছে। এই স্থানে
অতি উত্তম তসর ও বাফতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। একশ তসর ও বাফতা
ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, ঢাকা, ঐহট প্রভৃতি স্থানেও প্রস্তুত হয় না।
ইহা বড়ই টেকসই ও সুন্দর।

এই স্থান হইতে দক্ষিণাভিমুখে শব্দটের গতি পরিবর্তিত হইল। আর
এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পূণ্য স্রোতাবিনী বজ্রেশ্বর নদীকূলে উপনীত
হইলাম। ইহা অতি অল্পপরিমিত বাসুকামর প্রিয়নদী; অদূরাহৃত কোন
পল্লভ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পূণ্যার্থ বজ্রেশ্বর ধাম পরিবেষ্টন করিয়া প্রবাহিত
হইতেছে। একই নদী স্থানে স্থানে তীর্থনামাঙ্ঘ্যে ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহ
করিয়াছে।

আমি শব্দটারোহণে পরপারে উত্তীর্ণ হইলাম। অধ্বয় অবলীলাক্রমেই
বাসুকাগর্ভ নদীর উপর দিয়া শব্দটু টানিয়া লইয়া গেল। আমি তীর্থক্ষেত্রে
উপনাত হইলাম।

বজ্রেশ্বর-তীর্থ।

বজ্রেশ্বরে উপনীত হইয়া আমি শব্দটু হইতে অবতরণ করিয়াই প্রথমে
দীর্ঘাট নিবাসী ধর্মপ্রাণ জমীদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নব-
প্রতিষ্ঠিত কাণীবাড়ীতে উপাহৃত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আর আড়াই
বৎসর হইল এই কাণীবাড়ী নিবাসিত হইয়াছে। জমীদার মহাশয় ইহাতে
জগদধার শ্রীমুখি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরমিত পুজার ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া
দিয়াছেন। তীর্থদর্শনেচ্ছা ভক্তলোকমাত্রই এই কাণীবাড়ীতে অবস্থান করিতে
পারেন। বাহ্যতে অতিথিঅত্যাগতের বহু ও পরিচর্যার ক্রটি পরিলক্ষিত

নাহর সে বিষয়ে জমিদার মহাশয়ের কামচারীর প্রতি বিশেষ আদেশ আছে ; কামচারী মহাশয়ও প্রভুর আদেশ বশ্যবাহিত পালন করিয়া থাকেন ।

কালোবাড়ীতে কিম্বৎকাল বৎসরান্ত্রে আমি একটি পাড়াকে তীর্থপ্রদর্শক দ্বিধা করিয়া তাহার সঙ্গে পরিদর্শনে বহির্গত হইলাম । আমি প্রথমে এই তীর্থের উত্তরা স্থানাদয় বর্ণনার পক্ষে এই স্থানের প্রাচীন বা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রদান করিব ।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ।

অরণ্যভীত পুরাকালে হুত্রত ও লোমশ কবি লক্ষ্মীর স্বরস্বর দর্শনার্থ ; নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন । কবিদ্বয় বথাকালে স্বরস্বরসত্তাপে উপনীত হইলে স্বরঃ স্বর্ণরাজ হস্ত ও অস্ত্রস্ত সভাসীন ব্যাক্তবর্গ সন্ধ্যায়ে কবিরাজ লোমশকে সাদর-সম্বন্ধনা করিলেন । ইহা দেখিয়া তদীয় বন্ধু হুত্রত কবি অতিমানে, কোঙে ও রোবে সভাস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন । তিনি নিদারুণ ক্রোধানন্দে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ও একল জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন যে, প্রস্থানকালে তাহার বেহের অষ্টাঙ্গ বঙ্গ হইয়া গেল । তদবধি তিনি কবি অষ্টাবক্র নামে সাধারণে সুপরিচিত হইলেন । বক্রাঙ্গ হইয়া বিকলাঙ্গ অষ্টাবক্র অশান্তচিত্তে পৃথিবীর নানা স্থান পথ্যতন করিয়া অবশেষে কাম্বোজ্যে উপনীত হইয়া অষ্টাবক্রেশ্বর নামক শিবস্থাপনা করিয়া শিবসাধনার ব্যাপৃত হইলেন । তাহার আত্ম মহাদেবের আদেশ হইল, যে পথ্যস্ত তিনি বঙ্গদেশের তপ্ত কান্দী নামক স্থানে গিয়া শিবসাধনা না করবেন সে পথ্যস্ত তাহার প্রতি কোন প্রত্যাদেশ হইবে না । ইহা শুনিয়া মহাবি অষ্টাবক্র বঙ্গদেশে এই বক্রেশ্বর নামক স্থানে আসিয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্যায় নিমগ্ন রহিলেন । ব্রহ্মাও প্রসন্ন-কান্দী মহাক্রান্ত তপস্যায় মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, এই তীর্থে আসিয়া যে ব্যক্তি সন্ধ্যায়ে তোমার পূজা ও গয়ে আমার পূজা করবে সে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের অধিকারী হইবে । অতঃপর বিধবস্ত্রীর প্রতি অষ্টাবক্রের তপস্যাপূত ক্রুদ্ধির উপর মান্দ্র নিম্নাণের প্রত্যাদেশ হওয়াতে দেবপত্নী বক্রেশ্বর নদীর পূর্বতীরে একটি সমৃদ্ধ মন্দির নিম্মাণ করিয়া অষ্টাবক্রের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করিলেন । বিধবস্ত্রীর নিম্মিত মন্দিরের অস্তিত্ব এক্ষণে নাই । বর্তমান মন্দিরটি ছই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন হইবে না । ইহাতে তাদৃশ হস্তশিল্পচাতুর্য্যও নাই । কিন্তু ইহা আকারে সুবৃহৎ । কেহ কেহ ইহাকে বৈদ্যানাথের মন্দিরের সম্বন্ধে উল্লিখিত করিয়া থাকেন

বটে; কিন্তু আমাৰ বিবেচনাৰ ইহা পুৰীৰ বিমলা দেবীৰ মন্দিরের অঙ্গৰূপ। বাহা হটক ভগবান্ বক্ৰেশ্বৰের মন্দিৰ সান্তাধাৰীন নহে। এই মহাদেব মহৰ্ণি অষ্টাবক্ৰেশ্বৰই স্থাপিত। পূজাৰ সময় দেবান্দিদেবকে অষ্টাবক্ৰেশ্বৰ নামে অভিহিত কৰা হয়। এই তীৰ্থেৰ অপর নাম ভগু কানী।

বৰ্তমান মন্দিৰ নিৰ্মাণের সময় মন্দিরের উত্তৰপূৰ্বকোণে কোদিত। সেই অংশটি রাজনগরের স.অমত্ৰী দৰ্পনান্ধাৰণ কৰ্ত্তক ১৬০৫ সালবাহন (খৃঃ ১৭৩১) সালে বিনিৰ্মিত। মন্দিরের পূৰ্বপ্রান্তে ভিতরের প্রাচীরপাত্ৰের একটি প্রস্তরফলকে হালধী ও জাৰব নামক দুই ভাতাৰ নাম পাওয়া যায়। অপর একটি প্রস্তরের ফলকে ১৬৭৭ বা (খৃঃ ১৭৫৫) সাল লিখিত আছে। এতদ্বিধ বাহা লিখিত আছে তাহা সম্পূৰ্ণ দুৰ্দ্ধাৰ্য। পাঠক ইহা হইতেই বক্ৰেশ্বরের প্রাচীনত্ব নিৰ্ণয় কৰিয়া লউন।

ডষ্টব্য স্থানাদিৰ বিবরণ।

বক্ৰেশ্বৰে আসিয়া প্রথমতঃ বক্ৰেশ্বৰ নদীতে কিছা কোন একটি পুণ্য কূটে স্থান কৰিয়া বক্ৰেশ্বৰ দৰ্শন কৰিতে হয়। মন্দিরের বগনা পূৰ্বই প্রথম হইয়াছে। এই মন্দিৰাত্মকত্বে ভগবান্ বক্ৰেশ্বৰ বিৰাজ কৰিতেছেন। মন্দিরে প্রবেশ কৰিয়া একটু নিৰে ভূগতে নানিয়া বাইতে হয়। দশক প্রথমে দেখেবন, একটি পিতল-নিৰ্মিত গোলাকার পেনেটের মধ্যস্থলে পিতল-নিৰ্মিত শিবলিঙ্গ। লিঙ্গের মস্তকে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। তদুপৰি কল কিছা ছুদ্র চালিলে কতকাংশ ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পার্শ্বস্থিত জল-প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া যায়। উক্ত পিতল-নিৰ্মিত লিঙ্গের পশ্চাদ্ভাগে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরনিৰ্মিত শিবলিঙ্গ বিৰাজিত। ইহাই বক্ৰেশ্বরের লিঙ্গমূৰ্ত্তি। ইহা প্রথমে দেখতে পাওয়া যায় না; পাণ্ডা মহাপৰ বলিয়া দিলে হস্তদ্বাৰা স্পৰ্শ কৰিয়া জানিতে পারিগাম। আমাৰ বোধ হইল যে, এই মূৰ্ত্তি বৈষ্ণৱাধেয় মূৰ্ত্তিৰ অঙ্গৰূপ; তবে উপৰিভাগ সাধাৰণ শিবলিঙ্গের জ্ঞাৰ—বৈষ্ণৱাধেয় মত চেন্টি নহে।

মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে মহাভূমি পীঠভূমি। ইহা ভায়ন্তবৰ্ণের একশকাংশ মহাপীঠের অন্তৰ্ভাগ। এই স্থানে দেবীৰ ক্ৰমধ্য পতিত হয়। এই পুণ্যক্ষেত্রে মহাদেবী মহিষমৰ্দ্দিনীৰূপে বিৰাজ কৰিতেছেন। পীঠভূমিৰ উপৰ কোন এক তক্ত মহাপুৰুষ অষ্টধাতুনিৰ্মিত একটি ক্ষুদ্র মহিষমৰ্দ্দিনী মূৰ্ত্তি সংস্থাপিত কৰিয়াছেন। বীৰভূমিৰ মহাপুণ্যৰ পৰাপীঠৰ মধ্য এই স্থানেই আদি

জগদ্ব্যবস্থার প্রীতি প্রথমে দর্শন করিলাম । অন্য কোন নীতহানে নৃতি
বেধি নাই ।

পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র মন্দির একোঠে তৈরব বর্ণনাধ অবস্থান করিতেছেন ।
মহাবিক্রম স্বদর্শনচক্ষে ছিন্নভিন্ন হইবার পর যে যে স্থান জগদ্ব্যবস্থার মোহাংশ-
পতনে নীতরূপে পরিণত সেই সেই স্থানেই ভোলানাথ মহেশ্বর তৈরবরূপে
বিরাজিত । প্রেমের একরূপ জলন্ত নিদর্শন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর পরিচালিত
হয় না । মহাগর্ভে নারীরা বক্রনাথের দর্শন ও পূজা করিতে হয় । বক্র-
শ্বর ও বক্রনাথ দুইটি স্বতন্ত্র শিবলিঙ্গ ।

বক্রেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে ও পশ্চাত্তাগে সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ প্রাচীন
শিবমন্দিরমালায় শোভা বিচিত্রদর্শন । মন্দিরসংখ্যা তিনশতাধিক হইবে ।
পত শতাব্দীতে ধনাঢ্য তীর্থযাত্রিগণের দ্বারা এই সকল শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছিল । বক্রেশ্বরের আরাধনা করিয়া যাহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছিল
তাহারাই মন্দিরস্থাপনা করিয়াছিলেন । মন্দিরগুলি কিন্তু আকারে বৃহৎ
নহে । প্রত্যেকটিতেই এক একটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত । কোন কোন মন্দির
হইতে দেবমূর্তি অন্তর্হিত হইরাছে ; কিন্তু এই মহাস্থানের মহাগাভায়া দেখিয়া
বোধ হয় যে, ক্ষুদ্রমন্দিরে দেখাওঁতেও পূজ্যতার বিরাজিত । অকস্মাৎ
কবিকল্প মধুসূদনের গভীর বাণী মৈব বাণীর দ্বার আমার কর্ণকূহরে প্রতিধ্বনিত হইল,

“দেবপুত্র দেবালয়ে অদৃষ্টে নিবসে

দেবতা ; তন্মের রাশ ঢাকে বৈদ্যনরে ।”

মন্দিরগুলির সংখ্যার বহুকাল হয় নাই ; হইবে কি না তাহাও বলা যায় না ।
দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐকান্তিক উৎপাত সহ্য করিয়া তাহাদের বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া
গিয়াছে । কতকগুলি ভ্রামল শৈবালে সমাচ্ছন্ন ; কতকগুলির উপরিভাগ
তৃণাববৃত্ত ; কতকগুলির শিরোদেশ শুষ্কলতা সমাহৃত । মন্দিরশ্রেণীর মধ্যে
মধ্যে সঙ্কীর্ণ গলির দ্বার পথ গিয়াছে । এতোক মন্দিরের ব্যবধান অপর
একটি মন্দির হইতে বৎসামাত্র । মন্দিরগুলির আত প্রাচীন শুষ্কীর্ণ দশা
দেখিয়া দিটার ফ্রাইন এই স্থানটিকে সে কালের প্রাচীন যুরোপীয় সমাধি-
ক্ষেত্রের সহিত তুলিত করিয়াছেন । বাস্তবিক এই নিষ্কল তীর্থভূমি গাভায়া-
বৈচিত্রে মহাসমাধিরই সাহিত তুলনীয় । শব হইতে শিব, সে শিব যে
মন্দির—প্রতিষ্ঠিত তাহাই মহা সমাধি মন্দির—সে মন্দির কো স্থানে প্রতিষ্ঠিত

নে স্থান মহাস্থান। পুন্ড্রহরি বারাগঙ্গা মহাস্থান; পুণ্যক্ষেত্র বক্রেশ্বরও মহাস্থান। এই স্থানের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।

কুণ্ড।

এই স্থানে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ বিরাজিত। এই সকল কুণ্ডের মধ্যে কতকগুলির জল অত্যন্ত উষ্ণ। ভূপর্ভ হইতে প্রস্রবণ মুছ বেগে উথিত হইতেছে বলিয়া জলের উপরিভাগে অসংখ্য বুদবুদ সৃষ্ট হইয়া আবার মিলাইয়া ধাইতেছে। এই প্রকারে ক্রমাগত বুদবুদ হইতেছে ও মিলাইতেছে। কেবলমাত্র যে বুদবুদ উথিত হইতেছে তাহা নহে; কয়েকটি কুণ্ড হইতে ঘন ঘনকারে বাষ্প উথিত হইতেছে ও গন্ধকের গন্ধ নির্গত হইতেছে। সম্ভবতঃ কুণ্ডগুলির অধোদেশে ভূপর্ভারের গন্ধকের খনি বিরাজিত। প্রায় সমস্ত কুণ্ডই বক্রেশ্বর নদীপার্শ্বে অবস্থিত। পশ্চিম বঙ্গদেশের আর কোন তীর্থস্থানে (এক রাজগৃহ ব্যতীত) এতগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ সৃষ্ট হয় না। সুতরাং একমাত্র সীতাকুণ্ড। সেই উষ্ণপ্রস্রবণই অনেকের নিকট সমধিক সুপরিচিত। কিন্তু বক্রেশ্বরের ও রাজগৃহের প্রস্রবণসমূহের বিষয় অনেকেই বিস্মিত নহেন।

কুণ্ডের সংখ্যা সর্বসম্মত আটটি। (১) ফার কুণ্ড (২) ভৈরব কুণ্ড (৩) অগ্নি কুণ্ড (৪) সোভাগ্য কুণ্ড (৫) জীবিত কুণ্ড (৬) ব্রহ্ম কুণ্ড (৭) খেতগঙ্গা (৮) বৈতরণী। এতদ্বিধা সূর্য্য কুণ্ড নামক আরও একটি কুণ্ড আছে। কিন্তু পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই।

উপরোক্ত অনেক কুণ্ডেরই জল যে উষ্ণ তাহা নহে। কতকগুলিতে শীতল জল বর্তমান। খেতগঙ্গা নামক কুণ্ডের অর্দ্ধাংশ শীতল ও অর্দ্ধাংশ উষ্ণ; বড়ই বিচিত্র।

এই সকল কুণ্ডে স্নান করিয়া পূজাভরণ প্রকৃতি সম্পন্ন করিলে অসীম পুণ্য সঞ্চিত হয়। তীর্থযাত্রার চিরপ্রথা অনুসারে প্রত্যেক কুণ্ডেরই বাহাঙ্গ্য পূরণে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক কুণ্ডেরই স্নান করিবার স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে। পাণ্ডাগণ স্নান করাইবার সময় তীর্থগাত্রীকে ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া থাকেন। কোন কুণ্ডেই স্নান করিবার সোভাগ্য আমার হয় নাই। কারণ, অগ্নিময় জলে স্নান করিবার শক্তি আমার গোপ্য? আমি কেবলমাত্র পাপহরা নদীর উপকূলে বসিয়া মহোচ্চারণে উষ্ণ নীর স্পর্শ করিয়া, খেতগঙ্গার জল স্পর্শপূর্ব্বক বক্রেশ্বর নদীতে গিয়া স্নান সমাপ্ত করিলাম।

এই স্থানের পাপহরা নদী বিখ্যাত। ইহার সলিল দূরাকীর্ণ ও অগ্নিময়।

যেন অমিতব্যয়ী বৈভবী । অপর প্রান্তে সৈকতভূমিতে প্রস্ফলিত চিত্রানলে একটি নদ তরীকৃত হইতেছিল । উক্তোরা পাপহরা পুণ্য নদীর কূলে বসিয়া আমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত আশ্ববিন্দিত হইলাম—জীবনের তুচ্ছ সুখদুঃখ বিলাসভোগ ও ঐশ্বর্যভুকার নবরস কণকালের ক্ষত আবার অজ্ঞান চিত্তে উপলব্ধি করিলাম । ঐ ত আবার সম্মুখেই একটি মানবদেহ ভস্মে মিশাইয়া গেল । উহার সবই ত পড়িয়া রহিল । কে তাহার মহাপথে চিরসাবী হউল ?—কে যেন অস্তর বিহরিত করিয়া বলিল—আবার কে ? অস্বাভিজিত কর্ণই তাহার চিরসঙ্গী । আবার কে ? আমি পাণ্ডার সাহায্যে নিম্নলিখিত মহাত্ম্যের আবৃত্তি পূর্বক নদীকূল পরিত্যাগ করিলাম ;—

‘ও’ ত্রিকূটে নিঃসৃত কেশি :সোভিবেৎকারিণি ।
 নঃপা পাপহরানি হং মম পাপহরা তবঃ ।
 বৎ পাপং বোধয়ে যামো কোমারোদ্ধিবে কৃতঃ ।
 তব সর্গং হংসে যে যেষা মমঃ পাপহরোদ্ধিবেৎ ।
 নমঃ পাপহরে কেশি শ্বেতাচ্যোতি বিজ্ঞাতঃ ।
 হংসি মানেন দ্বাঃনন পাপং মে বাতু সংকলঃ ।
 জন্মকোটি লক্ষ্যেন বৎ পাপং সমুপার্জিতং ।
 তত্ত্বাপং দ্বাঃ বাৎ পাহি হংসক্রেবদ্বিঃসঃ ।

শ্রবান ।

এই বক্রেশ্বর নদীকূলে শ্রবান । অনেকে এই শ্রবানকে মহাশ্রবান বলিয়া থাকেন । এ শ্রবানেও অসংখ্য নরনারীর মৃগ অহি ও ঋষ্যর মূর্তিত হইতেছে । এই স্থানে নগরের কোলাহল হইতে অতি দূরে অবস্থিত নির্জন নদীকূলে জীবন শ্রবানক্ষেত্রে বহু গ্রামের লবদাহ হইয়া থাকে ; এমন দিন নাই, যে দিন অন্যান্য দশটি মৃতদেহের সংস্কার না হইয়া থাকে । পাঠক পাঠিকা তারা পীঠের মহা-শ্রবানের বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন । এ স্থলে তাহার অধিক বর্ণনা নিম্নয়োজন । এই শ্রবানে পাপহরা নদীর কূলে একটি অঘোরপন্থী বোগীর কুটীর । বোগী এই কুটীরে একাকী বাস করিয়া বোগসাধনা করিয়া থাকেন । বোগীবর কোথার গিয়াছিলেন ; আবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই ।

সমাধি ।

যেত গঙ্গার উত্তরে উচ্চ টিলার উপর মালগিরি ; গিরি গোবামী নামক জনৈক সাধুর সমাধি মন্দির । এই স্থলে অক্ষয় বট বৃক্ষ অবস্থিত । বক্রেশ্বরমহাশয়

নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, এই সমাধিস্থানের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে তাহার প্রলেপ প্রদান করিলে কঠিন শূলরোগ আরোগ্য হয়। তদ্বধ গ্রহণের সময় গোসাক্ষী প্রভুর নিকটে একটি ভোর কৌশীন মানসিক ক্রিয়া সমাধির উপরে প্রদান করিতে হয়। এই গোসাক্ষী প্রভু ছই শত বৎসর পূর্বে বক্রেশ্বর তীর্থে বাস করিতেন। ইহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী এইরূপ যে,—যোগীবর বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে সমাধি লাভ করিয়া কান্দীধামে পুনরাবিতৃভ হইলেন এবং ঘটনাক্রমে তথায় বক্রেশ্বরনিবাসী করেকটি পাণ্ডাকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি আদেশ করেন—আমি ত্রীশ্রীবক্রেশ্বর ক্ষেত্রে সমাধি গ্রহণ করিয়াছি; তোমরা সেই সমাধির উপর একটি শিবলিঙ্গ অর্চিতে স্থাপিত করিবে। তিনিই ঐ পাণ্ডা-দ্বিগকে তদীয় সমাধির মৃত্তিকা ভক্ষণ ও প্রলেপের দ্বারা নিদাক্ষণ শূলপীড়া আরোগ্যের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। শুনিলাম, এই স্থানে আসিয়া অনেক শূলগ্রস্ত যোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

গুহা।

পূর্নলিখিত মহিষমর্দিনী দেবীর মন্দিরের নিকট একটি ক্ষুদ্র গুহা অবস্থিত। বহুকাল পূর্বে ছবিয়া গিরি নামক জনৈক যোগী এই গুহার বাস করিয়া যোগসাধনা করিতেন। গুহাটি সৈধ্যো চারি হস্ত, প্রস্থে আড়াই হস্ত, এবং উর্দ্ধে ও আড়াই হস্তের অধিক নহে। ইহার প্রবেশদ্বার উর্দ্ধে দেড় হস্ত, প্রস্থে এক হস্ত মাত্র।

ভৈরব বেদী।

বেতগঙ্গার পশ্চিমোত্তর কোণে ভৈরব বেদী। একটি প্রাচীন স্থলীর্ঘ শাপ্রলী তরুল পরিবেষ্টিত করিয়া অল্প গোলাকার বেদী নির্মিত। বৃক্ষতলে ভৈরব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই স্থলে অপর একটি নিম্নতরুর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বটবৃক্ষ।

বেতগঙ্গার অপর প্রান্তে বিশাল বটবৃক্ষ অবস্থিত। এই তরুরাজই অক্ষর বট। ইহার মস্তক হইতে শতসহস্র ফুল জটা বিলম্বিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তরুল স্থলীতল ছায়াময়। পূর্বে অনেক সেবদেবীর প্রতিমূর্তি এই তরুলে সংস্থাপিত ছিল, কিন্তু কালবশে সকলই অটোমূটে আবৃত হইয়া এক্ষণে লোক-লোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

কালীবেদী।

এই স্থানে কালীপূজার জন্য একটি চতুর্কোণ অল্পক্ষ বেদী নির্মিত হইয়াছে। এই বেদীতে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা পূর্বক মহাকালীর পূজা হইয়া থাকে।

এতদিন বক্রেখর ধামের অপর দ্রষ্টব্যের মধ্যে তিনটি পুষ্করিণীর বিষয় উল্লেখ-
যোগ্য । ত্রিধান প্রবেশের পথের বামপার্শ্বে সাতহুলী, চন্দ্রসারের ও দামুদারের
নামে হ্রদ দুই পুষ্করিণীর অবস্থিত । দক্ষিণে পূর্বোক্ত নবনির্মিত কালীবাড়ী ।
পুষ্করিণীর নীর জামল শৈবালে সমাচ্ছন্ন । আবার বোধ হয়, দীর্ঘকাল ইহাদের
পক্ষোদ্ধার হয় নাই ।

এই নিষ্ঠুর তীর্থভূমি বৎসরে দুইবার লোককোলাহলে মুখরিত হইয়া থাকে ।
মাঘ মাসে বীরভূমি কেন্দ্রবিষে মহাকবি জয়দেব গোস্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থ মহা মেলা
হয় । সেই সময় শতসহস্র তীর্থযাত্রী ও মেলাদর্শনার্থী পুণ্যক্ষেত্র বক্রেখরে
আসিয়া মহাদেবকে দর্শন করেন । ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশীর সময় এই স্থানে
যাত্রীর জনতা বর্ণনাতীত । সেই সময় ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি
দূর স্থান হইতেও ব্যবসায়ী আসিয়া এই স্থানে দোকানপাট খুলিয়া থাকে ।
এতদিন বৎসরের অপর সমস্ত সময় গুপ্তকালী বক্রেখরধাম জনশূন্য ।

এই তীর্থস্থান দেখিয়া আমার এইরূপ অনুমান হয় যে, এমন এক দিন ছিল
যখন এই তীর্থস্থানে প্রত্যহ বহু যাত্রী সমাগত হইয়া শিবার্চনা করিতেন । তখন
লোকের চিত্তে ভক্তি ছিল, তাই অনেকের মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়াতে পূর্বোক্ত
শিবমন্দিরসমূহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । এক্ষণে সে মহতী ভক্তি আর নাই—
লোকের হৃদয়াণ্ড তদহরূপ । শিবস্থাপনা বর্তমান কালে বন্ধ হইয়া গিয়াছে—
আর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় না । পূর্বপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি সংস্কারাভাবে জীর্ণ দশায়
উপনীত । বহু শিবলিঙ্গের মস্তকে বিঘ্নজলও নিকিপ্ত হয় না ।

আমি পূজা প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া অপরাত্রে শিউড়ী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন
করিলাম ।

ত্রিণগেন্দ্রনাথ সোম ।

বাল্যশিক্ষাবিস্তার ।*

যে রাজনীতিবিদগণ এ দেশে বিষয়বুদ্ধিবিক্ত জন্মের আদর্শ সেই চাণক্য বলিয়াছেন, বিধানের সহিত রাজার তুলনা হয় না; রাজা স্বদেশে পূজিত—বিধান সর্বত্র সম্পূজিত। এ কথা ভারতের প্রাচীন হিন্দুরা বেরূপ বুঝিয়াছিলেন বোধ হয় জগতে আর কোথাও কোন সম্প্রদায় সেরূপ বুঝেন নাই। তাই ভারতে যে সম্প্রদায় পার্থিব সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যাবিস্তরণই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন, ভারতের সামাজিক বিভাগে সেই সম্প্রদায়ের স্থান সর্বোচ্চে। ভারতে ব্রাহ্মণগণ সর্বদা বলিতে পারেন, তিন সহস্র বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের কোন পূর্ব-পুরুষ মূর্খ ছিলেন না। এ দর্প জগতে আর কে করিতে পারে? তখন ব্রাহ্মণগণ বিজ্ঞাবিস্তরণ জীবনের ব্রত করিতেন, মূপতিরা তাঁহাদিগের বিজ্ঞাবিস্তরণের সুবিধা করিয়া দিতেন,—ধনীরাও তাঁহাদিগকে আবশ্যকান্তিরিক্ত অর্থ দিতেন—যেন ধনাত্মকে—সংসারের হৃদাঘাতের তাঁহাদিগের বিজ্ঞাদানকাষে ব্যাঘাত না ঘটে। ভারতে এই ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই—ভারতবর্ষ জ্ঞানে জগতে সর্বত্র সমাপ্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানবান্ধিরে যে আলোকশিখা জ্বালাইয়াছিলেন, রাজনৈতিক ঝটিকারও তাহা নির্ঝাপিত হয় নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একদল অগ্নিহোতী; জ্ঞানান্ধবিষয়ে ভারতে ব্রাহ্মণগণ অগ্নিহোতী।

বিষয়ের বিষয় এই যে, যে দেশে পূর্বে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল—এখন সেই দেশই ক্রমে অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিশক্তিও বাড়িতেছে। আমরা যে সর্ববিষয়েই জগতের অজ্ঞান জাতির সহিত প্রতিযোগিতার পরাজিত হইতেছি শিক্ষার অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। ইংলণ্ডের, জার্মানীর ও আমেরিকার বিষয় বিবেচনা করিলে এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার সুব্যবস্থা না হইলে আমাদের এ দৃষ্টিশক্তি বাড়াইতে পারে না।

একদম দরিদ্রের সহিত ধনীর ও এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সহানুভূতির অভাবে হিন্দু সমাজে শিক্ষাবিস্তারকাৰ্য্য পদে পদে বাধা পাইতেছে।

হুর্ষে রাজারা, ধনবানগণ, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা এই শিক্ষাবিস্তার-কার্যে সহায়তা করাতেই ইহার উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল। বর্তমানকালে গভর্ণমেন্ট শিক্ষাবিস্তারে কিছু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। এবার সম্রাট স্বীয় সাম্রাজ্যপরিভ্রমণ স্রবণীয় করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষার ক্ষত্র—শিক্ষাবিস্তারে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। চেষ্টা করিলে সরকারী সাহায্যের মাত্রা বাড়িবে—এ আশা অবশ্যই করা যায়। কেনই বা করিব না ?

পূর্বেই বলিয়াছি, সেকালে হিন্দু সমাজে অর্থশালীরা শিক্ষকদিগকে অর্থসাহায্য করিতেন। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে গৃহে রাখিয়া—আহার্য ও শিক্ষা দান করিতেন। তখন শিক্ষাদান ব্যবসায়—অর্থগণের উপায় ছিল না; পরন্তু জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি হইতে উৎপন্ন পরার্থে আত্মোৎসর্গের নামান্তরমাত্র ছিল। সেই উচ্চ আদর্শের পুনরুত্থার করিতে হইবে। বাহারা শিক্ষিত তাঁহাদিগকে বৃদ্ধিতে হইবে, অশিক্ষিতদিগকে শিক্ষাদান করা তাঁহাদের কর্তব্য; বাহারা অর্থশালী তাঁহাদিগকে বৃদ্ধিতে হইবে, শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করিয়া সমাজের উন্নতিসাধনে সহায়তা না করিলে তাঁহারা কর্তব্যচ্যুত হইবেন।

আজ বঙ্গদেশে বিশ লক্ষ হিন্দু বাণক অশিক্ষিত অবস্থায় কালবাণন করিতেছে। ইহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে সমাজের পতন ঘুটিবে না—জাতীয় উন্নতির উপায় নাই। কিন্তু ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার উপায় কি? সকল সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। আমরা যদি ব্যক্তিগত, বর্ণগত ও শিক্ষাগত সকল প্রভেদ তুলিয়া একযোগে কাণ্ডা করিতে পারি, তবেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে। বাহাতে জাতীয় উন্নতি হইবে, সে কার্যে কি আমরা একযোগে রত হইতে পারিব না? যদি না পারি, আমাদের শিক্ষা বার্থ—জীবন বৃথা।

যুরোপে শিক্ষাবিস্তারব্যাপারে দেখা যায়—তথায় সকলকেই শিক্ষিত করিতে আন্তরিক চেষ্টা সম্প্রকাশ। তথায় ধনীরা অর্থসাহায্য দিয়া, শিক্ষিত-গণ ও ধর্মযাজকগণ চেষ্টা করিয়া সমাজের সকল স্তরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাহারই ফলে যুরোপের উন্নতি। আর তাহারই অভাবে আমাদের অসীম দুর্দশা।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ বলিয়াছেন, সহানুভূতি ভাষিতে ইংরাজ-শাসনের—মূলমন্ত্র হইবে। আমরা কি এমনই সঙ্গীর্ণচিত্ত হইয়াছি যে, আমাদের

বদেশবাদীদিগকে সহায়ত্ব দিতে কুণ্ঠিত হইব? আশা করি, আমাদের পূৰ্ব্বপুরুষদিগের আদর্শ স্মরণ করিয়া, আমরা সৰ্ব্ববিধ স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া মানুষের নত কাব করিতে অগ্রসর হইব।

বলা বাহুল্য সমাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যবহারও পরিবর্তন অবশ্যজ্ঞাতব্য। কি উপায়ে বর্তমান কালে শিক্ষাবিস্তারের সুবিধা, তাহা বিবেচনা করিয়া অবস্থার উপযোগী উপায় উদ্ভাবিত করিতে হইবে। মহকুমার মহকুমার স্থানীয় সমিতি সংগঠিত করিয়া স্থানীয় অবস্থা অবগত হইতে হইবে। কোন্ গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের কিরূপ ব্যবস্থা সম্ভব, তাহা বুঝিয়া স্থানীয় শিক্ষিত সন্তানদের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা—স্থানীয় অবস্থার উপযোগী উপায়—অবলম্বন করিলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে বৈয় ঘটবার সম্ভাবনা অল্প হইয়া আসিবে।

মূল সভা, মহকুমার অবস্থিত শাখাসমিতি ও পল্লীসমিতি একই দেহের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গরূপে কার্য করিয়া একই উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন। আমি পূৰ্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—সহায়ত্ব বাতীত এ কার্য অসম্পন্ন হইবে না—হইতে পারে না। তাই আমি আমার বদেশীয় শিক্ষিত ও ধনশালী ব্যক্তি মাঝকেই অগ্ররোধ করিতেছি, এই মহৎ অহুতানে যোগ দিয়া—পরামর্শ দিয়া, কার্য করিয়া। ধন দিয়া তাঁহারা জাতীয় উন্নতির উপায় করুন,—যে মহা বজের আয়োজন হইতেছে সেই বজ সম্পূর্ণ করিয়া, দেশবাদীকে তাহার ফলভোগ করিয়া ধন্ত হইতে দিন। যেরূপ শিক্ষাবিস্তারে ভারতবর্ষ এককালে সভ্যতার ও সমৃদ্ধিতে প্রধান ছিল—যেরূপ শিক্ষাবিস্তারে যুরোপ ও আমেরিকা আজ প্রখ্যাত লাভ করিয়াছে—সেইরূপ শিক্ষাবিস্তারে আমরাও যে আবার উন্নত হইতে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আশায় ও সেই উদ্দেশ্যে এই অহুতান অহুত্বিত হইয়াছে। আশা করি, বাঙ্গালী হিন্দুমাঝেই ইহাতে যোগদান করিবেন।

আমি সকল সন্তানদেরকেই এই অহুতানে যোগ দিতে আহ্বান ও অগ্ররোধ করিতেছি। যাহারা শিক্ষা দিবেন, তাহারা যেমন সাগ্রহে শিক্ষাদান করিবেন, যাহারা শিক্ষার্থী তাহাদিগকেও তেমনই আগ্রহসহকারে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। যে যে বারিবর্ষণ করে উদ্ধত ও উন্নত গিরিশৃঙ্গ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না; কিন্তু নিম্নভূমিতে যে তড়াগ সেই বারিগ্রহণের আশায় বুক পাতিয়া থাকে, তাহারই বক্ষে সে বারি সঞ্চিত হয়। শিক্ষার

যদি শিক্ষালাভ করিবার জন্য বাকুল না হইলেন, তবে শিক্ষাবিত্তারকার্য সম্পূর্ণ হইতে বিলম্ব অনিবার্য। ছুথের বিষয়, আত্মকাল হিন্দু সমাজে চারিদিকেই যে অবসাদ লক্ষিত হইতেছে, শিক্ষালাভপ্রয়াসও তাহা দেখা যাইতেছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বেও এ বিষয়ে যে আগ্রহ লক্ষিত হইত, এক্ষণে যেন তাহা মল্লীভূত হইয়াছে। তখন দরিদ্র শিতা ধনীরা ধারে ভিক্ষা করিয়াও পুত্রের শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহে সচেষ্ট হইতেন; দরিদ্র পুত্রও পরের ঘরে দরাসত অয়ে জীবন ধারণ করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। এইরূপ দারিদ্র্যের মধ্যে—বহুবিধ ক্লেশ সহ করিয়া উত্তরকালে বিজ্ঞানগুণে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন একরূপ বাঙ্গালীর সংখ্যা কম নহে। এখন আমাদের দেশে শিক্ষাবাদিগের মধ্যে এইরূপ আগ্রহ—এইরূপ কষ্টসহিষ্ণুতা—এইরূপ একাগ্রসাধনার সঙ্কল্পের অভাব নিতান্তই বেদনার কারণ। কলে যে সকল সম্প্রদায়ে মূর্থ ছিল না বলিলেই হয়, সে সকল সম্প্রদায়েও নিরক্ষরের বাহুল্য ঘটিতেছে। এ অবস্থান্তর বে কিরূপ শোচনীয় তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আমি পূর্বে শিক্ষাবাদিগকে তড়াগের সহিত তুলিত করিয়াছি। তড়াগ যেমন মেঘবর্ষিত বারি লাভ করিয়া তাহা পরার্থে ব্যয় করিয়া জীবের অশেষ কল্যানবিধান করিয়া থাকে—শিক্ষা লাভ করিয়া অপরকে শিক্ষাদানে উপকৃত করাই তেমনই শিক্ষিত ব্যক্তির কর্তব্য। তাহা না করিলে শিক্ষিত ব্যক্তি কর্তব্যচ্যুত হইবেন—দেশে শিক্ষাবিত্তারেও বহু বিষ ও বিলম্ব ঘটিবে।

পূর্বকালে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণগণ বিনাধারে বিদ্যাদান করিতেন। ভারতে বৌদ্ধগণও এই আদর্শব্রষ্ট হইলেন নাই; পরন্তু তাঁহাদিগের ভিক্ষুগণ ব্যক্তি-নির্ক্লেণ্ণেবে অবাধে শিক্ষাদান করিতেন। আজিও ব্রহ্ম প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রধান স্থানে বিহারে অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। ইংরাজাধিকারের পরও ছইজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ প্রাথমিক শিক্ষাবিত্তারে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন;—একজন ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞাসাগর,—আর একজন ভূসেব সুধোপাধ্যায়। ইহারা ছইজন সরকারী শিক্ষাবিত্তাগে কার্য করিয়া এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিত্তারের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাহাতে বাঙ্গালার শিক্ষাবিত্তারের ইতিহাসে ইহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ছুথের বিষয়, এখন আবার প্রাথমিক শিক্ষাবিত্তারের চেষ্টা হইতেছে এবং একাধিক স্থানে সকল বালককেই প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহাতে জ্ঞানে জ্ঞানে বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা

হয়, সে পক্ষে চেষ্টা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থমাত্রকেই বালকদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষিত করিবার চক্র সচেষ্ট হইতে হইবে। এ দেশে ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে ও অব্যবহিত পরে—প্রতীচা প্রণয়ন স্থল প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে নবদীপাদি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণ ছাত্রদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তখনও অল্পাংশ বর্ণের মধ্যে শিক্ষালাভের চক্র বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং অল্পাংশ বর্ণের বহু ব্যক্তি উন্নয়ন ও উৎসাহ সহকারে সর্ববিধ বাধা অতিক্রম করিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে এখন শিক্ষালাভের পথ বহুপরিমাণে সুগম হইয়াছে তখন তাঁহারা কেন শিক্ষালাভে সচেষ্ট না হইবেন? পূর্বে তাঁহারা শিক্ষাবিস্তারের চক্র ও যে চেষ্টা করেন নাই, এমন নহে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের চক্র যেমন বিপুল অর্থ দিয়াছিলেন—মতিলাল শীল মহাশয় তেমনই ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের চক্র বিপুল অর্থ দিয়াছিলেন। আমরা আশা করি, এমন আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, একবোলে দেশে শিক্ষাবিস্তারকার্যে মনোযোগী হইবেন। শিক্ষা ব্যতীত আমাদের উন্নতির উপায় নাই—শিক্ষার অভাবে আমাদের দুর্দশা বর্দ্ধিত হইতেছে—ইহা বুঝিয়া সকলে সমবেত চেষ্টায় এই অল্পাংশ সফল করিতে সচেষ্ট হইবেন। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি নাই। আমরা যদি সত্য সত্যই কার্যমনোবাক্যে দেশে এই শিক্ষাবিস্তারকার্যে সচেষ্ট হই—যদি আমাদের দুর্দশা দূর করিয়া উন্নতির উপায়বিধান করিতে প্রয়াস পাই—তবে এ অল্পাংশ অচিরে সফল হইবে এবং আমাদের দুর্দশার অমানিশাশেষে উন্নতির দিবাশোকবিকাশে অধিক বিলম্ব হইবে না।

ইহার চক্র আমাদের দুর্দশা দূর করিতে হইবে; বৃদ্ধিতে হইবে, শিক্ষা ব্যতীত উন্নতির অন্য উপায় নাই; বৃদ্ধিতে হইবে, এ কার্য সমাজের—সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না; আর বৃদ্ধিতে হইবে, উদার ও স্বাধীন সহায়ত ব্যতীত এই সমবেত চেষ্টা সফল হইবে না। বর্ণগত, শিক্ষাগত, অর্থগত সর্ববিধ বৈষম্য বিস্তৃত হইয়া আমাদের এই কার্যে বাধা দিতে হইবে, ইহার বিরুদ্ধে সাধা তাঁহাকে সেইরূপ সাহায্য দান করিতে হইবে। কাহারও ঐকান্তিক বৃত্তি বিফল হয় না। আমরা সমবেত চেষ্টায় এই কার্যে প্রবৃত্ত হইলে অচিরে সাক্ষ্য লাভ করিতে পারিব। তাহা হইলে আমাদের বর্তমান দুর্দশার অবসান হইবে—ভবিষ্যৎ উন্নতির

পথ অগম হইবে—আমরা! আমাদের পূর্বপুরুষাঙ্কিত নষ্টগৌরবের পুনরুদ্ধার
করিয়া ধন্ত ও জগতে সমাদৃত হইতে পারিব ।

শ্রীরাসবিহারী ঘোষ ।

বসন্তের উপহার ।

আজ অস্তরে মম জাগিছে কেবল
 তোমার মুরতিখানি ;
যেন পশিছে অবগে সঙ্গীত সম
 তোমার অতুলবাণী ।
আমি হৃদয়ে তোমায় তকতি-অর্ঘ্য
 কতই ত করি দান ;
তবু জাগ্রত থাকে আকুল বাসনা,
 তৃপ্ত হয় না প্রাণ ।
তাই শোভা-মণ্ডিত নব বসন্তে
 আকুল হৃষিত চিতে,
প্রভো, রচিয়া মালা নূতন পুষ্পে
 এসেছি তোমারে দিতে ।

শ্রীসরোজবাসিনী শুক্লা ।

চন্দ্রদ্বীপ।

বাঙ্গালার ইতিহাসে চন্দ্রদ্বীপ একটি প্রসিদ্ধ স্থান। চুংখের বিষয় যে চন্দ্রদ্বীপের সমাজপতিহে, শৌর্পো ও বিহাচর্যায় আগ্র ও আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি; ওরুর্ধ্ব মগ ও ক্রিষ্ণীর গর্ভে বর্ষ করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত মূল্য-মানাধিকারেও যে স্থান প্রায় তিন শত বর্ষ বাঙ্গালার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঙ্গালীর বিরত-দৌরব ঘোষণা করিতেছিল সেট প্রসিদ্ধ বার ভূঁটদ্বার অন্ততম চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের পরিচয় ও চন্দ্রদ্বীপের অবস্থানাদি অনেকটাই অবগত নহেন।

চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস।

সেনবংশীয় রাজা দনৌজমাধবের রাজত্বের পূর্বে চন্দ্রদ্বীপের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ আছে। যথা—

(১) সেনবংশের রাজা দনৌজমাধবের গুরু চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ভগবতীর আরাধনা করিতেন। কিন্তু তদীয় পত্নীর নাম ভগবতী হওয়ার তিনি পত্নীর নাম লুপ্ত করেন মনে করিয়া মনের চুংখ নৌকাযোগে সমুদ্রে প্রাণত্যাগ করিতে যান। অনন্তর ভগবতী ধীর-কল্পাবেশে দেখা দিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাপন করিতে বলেন এবং বর দেন যে, সেই স্থান তৎ হইয়া মুক্তিকা হইবে এবং তাঁহার নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া খ্যাত হইবে। এদিকে তদীয় শিষ্য দনৌজমাধব ব্রহ্মবিষ্ট হইয়া সমুদ্রে ডুব দিয়া মদনগোপাল ও কাত্যায়নী বিগ্রহ প্রাপ্ত করেন। পরদিন সেই স্থান শুষ্ক হইয়া দ্বীপাকার হয়। তিনি গুরুর উদ্দেশে অশ্রুসারে তপ্যার রাজধানীস্থাপন করেন এবং গুরুর নামানুসারে দ্বীপটির নাম চন্দ্রদ্বীপ রাখেন।

(২) তিব্বতীয় গ্রন্থ হটতে মহামতোপাধ্যায় শ্রীধর সতীশচন্দ্র বিহাচর্যন মহোদয় সংগ্রহ করিয়াছেন—প্রসিদ্ধ চন্দ্র বাচর্যপ্রণেতা চন্দ্রগোমার ঠেঠেদেবীর নাম ও পত্নীর নাম এক হওয়ার তিনি পত্নীত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার দত্তর্য বারেন্দ্রপ্রদেশের রাজা দনাতন চন্দ্রগোমীকে পেটিকাঘর করিয়া গঙ্গার ছাড়িয়া দেন। চন্দ্রগোমী গঙ্গাস্রোতে গমন করিয়া সমুদ্রোপকূলে দ্বীপাকারে আবির্ভূত হইলেন, তৎকালে সেই দ্বীপটির চন্দ্রদ্বীপ নাম হয়।

(৩) বিদিশ্বর প্রকাশিকা বিবৃতিতে আছে যে, মহাদেবের লগাটামিতে ললিত হইয়া চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি হয়।

চন্দ্রবীপে পুত্রা বিজ্ঞোঃ পুত্রা চ ব্রহ্মিকা ।
 মহাশেখর প্রসাদেন সখা ভূততি স্তম্ভিকা ।
 লক্ষ্যমানসপ্রায়েন বিদ্যামাং চি চন্দ্রাং ২৩ ।
 দলীভূতা চ পৃথিবী দৈবানাং স্থপ-কারিকা ।
 মেঘনা নদী পুত্রা ভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী ।
 ইন্দ্রিল পুত্রী যক্ষ সীমা বঙ্গিণে চ হুন্দর বনঃ ।
 জিনং যোজন বিদিতো গোন কস্তোতি বর্জিতঃ ।
 সোর কাশ্মে চ যৌনেসৌ বিধ্যতো নৃপশেখর ।
 চন্দ্র বীপঃ পশ্চিমে চ সীকঃগোহি তথোত্তরে ।
 বাকলাখো মহা ভাগে রাজধানী সমীপতঃ ৷ (১২১) ।

এই দেশের কারিকার আছে,—

৫৫ বীপজ সীমাঃ রত্নাকরো নিরাকরঃ ।
 চন্দ্রবৎ কীৰ্ত্তে তত্র চন্দ্রবৎকর্ত্তে বপুঃ ।
 তত্র তদু ভগ যোগেন চন্দ্রবীপ ইতি স্মৃত ।

চন্দ্রবৎ কঁহরুদি হয় বলিয়া ঐহার চন্দ্রবীপ নাম হইয়াছে ।

এই সকল প্রবাদের মূলে ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না সন্দেহ । বহু প্রাচীন কালে যশোরের অস্থির থাকা সত্ত্বেও যেমন প্রতাপাদিত্যের সময় যশাই পাটনীর নামাঙ্ক্যারে যশোরের কিপ্রা দিল্লীর বণ হরণ করে বলিয়া যশোরের নামের উৎপত্তি এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল তদ্রূপ এক এক সময় চন্দ্রবীপ সম্বন্ধে এক একটি কথার রটনা হইয়াছিল । দনৌজমাধবের সময় চন্দ্রবীপের উৎপত্তি অপ্রমাণনিক ; যেহেতু দনৌজমাধবের পিতৃব্য মাধবসেনের অধিকৃত বাদশ বীপের মধ্যে বাকলা চন্দ্রবীপের নাম আছে । এতদ্বির প্রাচীন কুলাচাৰ্য্য ফরানকমিশ্বরের কারিকার আদিশূরপ্রসঙ্গে চন্দ্রবীপের উল্লেখ দেখা যায় । যথা—

সিহা চ বোদ্ধ রাজান যথা পৌড়াধিপান্ বলাং ।
 ত্রাশলিতীঃ তথা চন্দ্রবীপঃ শ্রীচৈঃ সংজ্ঞকঃ ।

(বিসকারিকা) ।

আবার আদিশূর চরিত্রের ভাষাতা কাম্বীরাদিপতি ভরাবিতা গৌড়ের পাঁচজন রাজাকে পরাজিত করিয়া যন্ত্ররক তাহার অধীশ্বর করিয়া বায়েন । এই পাঁচজন রাজার মধ্যে সমস্তট প্রদেশের রাজাও একজন (সাহিত্য ১৭১২) উক্ত প্রবাণাঙ্ক-সারে আদিশূরের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও চন্দ্রবীপ যে একটি রাজ্য ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় ।

২য় প্রবাদটিও অন্যত্র বলা যায় না। যেহেতু, চন্দ্রগোনার গুপ্তর বারংবারেণের রাজা গুপ্তীয় ১ম শতাব্দীর গোত্র (বাণী ৩৫) কিন্তু তৎপুত্রও যে চন্দ্রদ্বীপের অধিক ছিল তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ৩য় প্রবাদের মূলে যে ঐতিহাসিক তথ্য আছে তাহা পরে আনোচিত হইবে। ৪র্থ প্রবাদটির স্বাক্ষর কাননিকরণ করা যায় না।

খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর শেষভাগে পুন্ড্রাধিপ চন্দ্রবংশীয় বঙ্গদেশ জয় করেন। এই সময় চন্দ্রবংশীয় নামাঙ্কনসারে ইহার চন্দ্রদ্বীপ নাম হওয়া অসম্ভব নহে; যেহেতু, তাহার কয়েক বর্ষ পরেই সমুদ্র গুপ্তের সময় সমস্তট প্রবেশে রাজ্য গঠিত হয় (সাহিত্য ১৭৭২)। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত এই স্থানে গুপ্ত-বংশের অধীনে সামন্ত রাজগণ রাজত্ব করিয়াছেন পরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইহা খড়্গবংশের শাসনাধীন হয়। ইহার পর আদিশূর চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করেন। খৃষ্টবংশের পর পালবংশের ও সেনবংশের-দিগের অধীনে কে কখন রাজত্ব করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। ১১৯৯ খৃঃ খ্রিঃকী কর্তৃক গোড়বিজয় হইলে রাজা কেশব সেন তদার ভ্রাতা বিক্রমপুরের স্বাধীন রাজা বিক্রম সেনের আশ্রয় লইলেন। বিক্রম সেনের মৃত্যুর পর দ্বন্দ্ব কেশব সেন কিছুদিন (১২৪৫-১২৫০) রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দমনোজমাধব বিক্রমপুরের সিংহাসনারোহণ করেন। দিল্লীর বঙ্গবন মদ্রিহুদিন তুঘলকে শাসন করিতে যখন আইসেন তখন (১২৮০ খৃঃ) স্বর্ণগ্রামাধিপতি দমনোজমাধব জলপথে দিল্লীশ্বরকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর স্বর্ণগ্রাম মুসলমানাধিকারভুক্ত হইলে তিনি ১২৯০ খৃষ্টাব্দের সমকালে কি তাহার কিছু পূর্বে সমুদ্রতীরে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। সেই হইতে চন্দ্রদ্বীপের স্বাধীন ইতিহাস কতক পাওয়া যায়।

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের প্রাচীন তথ্য অসম্ভবান করিলে বুঝা যায় যে, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যটি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম অংশকে স্বর্ণগ্রামপ্রদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশকে প্রকৃত চন্দ্রদ্বীপ বলে। স্বর্ণগ্রামপ্রদেশ প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। নক্ষত্রগণ তত্ত্বের ৭ম পটলে বর্ণিত আছে যে, সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূভাগ বঙ্গ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবী ভাগবতের মতে গঙ্গা বা ভাগীরথী এবং পদ্মা পৃথক নদী; পূর্বকালে ভাগীরথী বা গঙ্গার সহিত পদ্মার যোগ ছিল না; বরং তখন পদ্মা বর্তমান ব্রহ্মপুত্রনদের স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই পদ্মাই তখন নলিনী নামে আখ্যাত ছিল। রামায়ণে (বাণকাণ্ড ৪৩৭ অধ্যায়) আছে—কেশবক

ভগ্নীরূপের তপস্ৱার সমুদ্রে হইয়া বিন্দুসরোবরের অভিমুখে প্রস্রাকে পরিত্যাগ করেন ; তথা হইতে গঙ্গা সমুদ্রারার প্রবাহিত করেন ; হুমাধিনী, পাবনী ও গলিনী এই তিন যাত্রা পূর্ণ দিকে—সুচকু, সীতা ও সিদ্ধ এই তিন শ্রোত পশ্চিম দিকে ও অবশিষ্ট একটি শ্রোত মহারাষ্ট্র ভগ্নীরূপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহিয়া সমুদ্রে পতিত হয় । এই শ্রোতই গঙ্গা বা ভাগীরথী । কালক্রমে ভাগীরথীর শ্রোত (বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া) পল্লার মিলিত হইয়াছে । এত নবপ্রবাহিত শ্রোত শেষে পদ্মা নামে পরিচিত হয় (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ম অধ্যায়) এবং হুগলা প্রদেশ অর্থাৎ বর্তমান বরিশাল করিমপুরাদি পৃথক হটরা পড়ে । পুরাণতত্ত্বাদিতে দেখা যায়, সতী মঙ্গলারে দেহ-ভাগ করিলে তাহার দেহ বিক্ষুচিত ৫১ পত্র বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে পতিত হয় এবং প্রত্যেক স্থলে একটি করিয়া পাঠস্থান হয় । তাহার ভগবতীর এক এক অংশ এবং একজন করিয়া ভৈরব আছেন । হুগলা প্রদেশাত্মগত বর্তমান বরিশাল জিলার শিকারপুর গ্রামে দেবীর মাসিকা পতিত হয় । তাহার দেবী হুগলা উগ্রতারা বর্তমান আছেন । এবং ঝালকাঠীর নিকটবর্তী নরুলাপুর গ্রামের দক্ষিণপার্শ্ব-সংলগ্ন শিববাড়ী গ্রামে ভৈরব জায়ক আছেন ।† কথিত আছে যে, সৌগন্ধা নদীর এক কূল দেবী ভগ্নর কূল ভৈরব । বরিশাল জিলার প্রাকৃতিক দৃষ্টে দেখা যায় যে, উক্ত শিববাড়ীর দক্ষিণ অংশে অসংখ্য নদ নদী এবং উত্তর অংশ মনমণী-বিহীন । ইহাতে অনুমান করা যায় যে, পূর্বকালে শিকারপুর পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল । পরে শিববাড়ী হইতে চর পড়িতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দীপ হয় এবং মধ্যস্থ অংশ সৌগন্ধা নদীতে পরিণত হয় । পূর্বোক্ত দীপ তৎ প্রবাহের মহাদেবের ললাটায়িত্তে জল শুষ্ক হইয়া দীপ স্বজন বোধ হয় এই শিববাড়ী হইতে আরম্ভ হয় । এই দীপই পরে চন্দ্রদীপ নামে আখ্যাত হয় । আড়িয়ালখা এবং তাহা হইতে বহির্গত যে নদী বরিশালের নিকট দিয়া নগাছটি, ঝালকাঠী, কাউখালী প্রভৃতির স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে সম্ভবতঃ তাহাষ্ট প্রাচীন সৌগন্ধা নদীর একটি লুপ্তপ্রায় প্রবাহ । পূর্বোক্ত দীপ কখন কত দূর বিস্তৃত হইয়াছে তাহা সঠিক বলা যায় না । রানারূপের কিস্কিকা কাণ্ডে (৪০ অধ্যায়) লিখিত আছে যে, হুগ্রীব

† শিববাড়ী গ্রামকে কোন কোন প্রযুক্তির স্থানগাইল বলিলেও ইহা বলিপদভ্রান্তিতে ও সেটেলস্কেটের কাগজাদিতে শিববাড়ী গ্রাম বলিয়া লিখিত হয় । পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোক ও ভাবগাইল বলিয়া কোন গ্রাম জানে না ।

† মহারাষ্ট্রে আছে যে, ভীর্গপর্বাটনে হুগলা, নটকুতা ও পকৎকার গাইলে বর্গলোকপুত্রিত হয় ।

বনপর্ক, ১৪ অঃ ।

পূর্বদিক্‌গামী যানরগণকে সীতার অবস্থানার্থ সামুদ্রিক দ্বীপ সকলে বাইতে বলিয়া ছিলেন। ইহাতে অশ্রুমান করা যায় যে, রানারগণের সময় দ্বীপ দৃষ্ট হইয়াছিল। মহাভারতে (বনপর্ক ১১৪ অঃ) আছে যে, যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া নন্দা ও কৌশিকীতীর্থে রানারি করিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইলেন ও তপস্য পূরণত নদীমধ্যে অবগতন করিয়া সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, মহাভারতের সময় এই দ্বীপ বহুদূর দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছিল। কানিগাম রত্নাশ্রমের ঐক্য সর্গে রত্নর দ্বিধিকর প্রসঙ্গে গঙ্গাশ্রোতমধ্যস্থ বহু দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন। চীনদেশের পরিব্রাজক হিউয়েন সিংহ প্রভৃতির ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সমস্ত প্রদেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকলের আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, চন্দ্রদ্বীপ ব্রাহ্মণ্যের দক্ষিণ-পূর্বাংশ অর্থাৎ প্রকৃত চন্দ্রদ্বীপ আধুনিক হইলেও নিত্য অল্প দিনের মধ্যে। ভূমিকম্পে ও জলপ্রাবনে মধ্যে মধ্যে ইহার অনেক স্থান বিলীন হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপের অবস্থানাদি।

প্রাচীন কুলগ্রহ মহাবংশাবলীতে প্রসিদ্ধ কার্ণবের বাসস্থানপ্রসঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের নাম এইরূপ লিখিত আছে—

পূর্বদিক্‌ উত্তরপূর্ব দিক্‌ ইচ্ছামতী তপোত্তরে।

মধুমতী পশ্চিমে চ সমুদ্রে দক্ষিণে তপা।

বোধ হয় শতাব্দীতে পদ্মা এখন কানাইপুত্রে নিরে প্রবাহিতা ছিল তখন ইচ্ছামতী মধুমতী নদীর উৎপত্তি স্থলের কিঞ্চিৎ উত্তরে পদ্মার অপর পারে পদ্মা হইতে পূর্বাভিমুখে বর্তমান পাবনা ও ঢাকা জিলার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া এক্ষণে নদে নিমিত্ত হইতেছিল। এখনও উহার নিদর্শন আছে। ব্রতরাস পাবনা ও ঢাকা জিলার দক্ষিণাংশ এবং সমস্ত করিমপুর, বাখরগঞ্জ জিলা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত হইতেছে। ইহার সমর্থক আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

বাহা ভূমি দক্ষিণে চ কুল দ্বীপোহি উত্তরে।

সমগ্রাৎ দাসদারগত দাসকোহরম্ মহীপতিঃ।

(বিশ্বকোষ। ভবিষ্য ব্রহ্মণ্ডে উত্তরখণ্ড)।

এই চন্দ্রদ্বীপ পূর্বেই ইচ্ছামতী নদীর উৎসতীরস্থ পাবনা জিলার কুশদ্বীপ পত্তনগণ্য হইলে পূর্বে দ্রোণের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়। বাহা ইউক মহারাজ দনৌজনাথবের সময় এই স্থান চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত হইলেও পরবর্তীকালে বোধ হয় ছিল না।

• দ্বিবিভক্ত প্রকাশিকা বিগতিতে মেঘনা ও বলেশ্বরের মধ্যস্থ ইদিলপুর হইতে সুলতান পর্গাপ্ত ভূভাগ চন্দ্রবীপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । যাহা তোডরমল বাক্‌লা সরকারের এইরূপ সীমানা দিয়াছেন—খালি-ফিতাবান বা যশোহরের পূর্ব সাধারণতঃ পদ্মার পশ্চিম তীরে, বদীপের দক্ষিণ পূর্ব কোণে, দক্ষিণে ভাটি পর্য্যন্ত ভূভাগ বাক্‌লা সরকার । যাহা হউক যাহা তোডরমলনির্দিষ্ট সীমা ধরিলে সমস্ত করিমপুর, বাখরগঞ্জ এবং খুলনা ও যশোহরের কতকাংশ চন্দ্রবীপের অন্তর্গত ।

চন্দ্রবীপের রাজধানী ।

পূর্বে চন্দ্রবীপের রাজধানী কখন কোথায় ছিল তাহা বলা যায় না ; তবে রাজ্য দনৌজমাধবের সময় হইতে কচুয়া ও নাথবপাণা এই দুইটি রাজধানীর পরিচয় পাওয়া যায় । ইহার পূর্বে বাক্‌লা যে চন্দ্রবীপের রাজধানী ছিল তাহা কতক অসম্ভব করা যায় ।

পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত বাউফল থানার অধীন কচুয়া নগরী চন্দ্রবীপের প্রাচীন রাজধানী । ওখায় ২১টি পুরাতন দালানের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় । কচুয়ার পার্শ্ব কালাইয়া নদীর অপর তীরে কনলার নদী এখনও বর্তমান আছে । কচুয়ার পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত তেতুলিয়া নদীর অপর পার্শ্ব চরবাসীদিগের কাহারও কাহারও বাক্‌লাই আখ্যা দেখা যায় । জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বল যে, বাক্‌লার বাস ছিল বলিয়া তাহাদের বাক্‌লাই আখ্যা হইয়াছে । সম্ভবতঃ পূর্বে কচুয়া ও বাক্‌লা সংলগ্ন গ্রাম ছিল ; কালক্রমে বাক্‌লা নগরী তেতুলিয়ার অন্তর্হিত হইলে মহারাজ দনৌজমাধব বাক্‌লার সংলগ্ন কচুয়া নগরীতে রাজধানীস্থাপন করেন ; কিন্তু তাহা বাক্‌লা নামে প্রসিদ্ধ থাকে । এমন কি পরবর্তীকালে নাথবপাণা যখন রাজধানী হয় তখনও কেহ কেহ রাজাদিগকে বাক্‌লার রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । পূর্বোক্ত প্রাচীন সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থেও রাজধানীর নিকটে বাক্‌লার অস্তিত্ববর্ণনা আছে । পূর্বে বাক্‌লা প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল । ষোড়শ শতাব্দীর দুর্যোগীয় পরিত্রাঙ্গকদিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখা যায় যে, বাক্‌লা নগরী চাউল, রেশমী ও কার্পাস বস্ত্রের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল । বহুদিন হইল বাক্‌লা নগরী নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে । এই স্থানের অধিবাসীর মধ্যে দুই একটি বংশের পরিচয় এখনও পাওয়া যায় । বৈকবগ্রন্থে পাওয়া যায় যে, প্রসিদ্ধ বৈকবকুলতিলক রূপ ও সনাতনের বাড়ী বাক্‌লার ছিল ;

— তাঁহাদের পূর্বপুরুষ বাসনিক ক্রিমোপলকে বাক্‌লা হইতে যশোহরের কতকখান্দে

অবস্থান করিতেন। রূপ ও স্নাতন কর্ত্তী রাজন ছিলেন; সেনবংশও কর্ত্তী হইতে এ বেশে আইসেন। সম্ভবতঃ সেই জন্তই রূপ ও স্নাতনের পূর্ণপুরুষগণকে সেনবংশীয় রাজগণ সার্বের আগ্রহ দিরাছিলেন (বাণী ৩) এতদ্বির দনৌজনাথব গোড়দেশে হইতে কুলাচাৰ্য্য ও অনেক কুলীন কারহ আনাইয়া বাস করান।

দমোদ নাথব রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।

সেই হইল বঙ্গর কারহ গোষ্ঠীপতি।

গোড় হইতে আনাইয়া কারহ কুলপতি।

কুলাচাৰ্য্য আনাইয়া করাইল বিতি। (বঙ্গর কারহ কারিক।)

মহারাজ দনৌজনাথব ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের আমলে অনেক কুলীন কারহ কচুয়া ও বাঙ্গলাবাসী হইলেন। রাজাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ থাকার বহুবংশীয়গণই এইখানে প্রবল ছিলেন। বহুবংশীয় তিন সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায় (১)। দনৌজনাথব পুত্রবহুর কন্যা বিবাহ করিলে (২) পুত্রবহুর প্রপৌত্র চক্রপাদি বহু কুসম্পতি পাইয়া কচুয়াবাসী হইলেন। পরবর্ত্তীকালে চক্রপাদীর উত্তর পুরুষ চান্দী দাস বংশে বিবাহ করিয়া চান্দীবাসী হইলেন (খোদাল-চন্দ্র নামের বাগরগঞ্জের ইতিহাস, ১৫৭পৃঃ) ষষ্ঠীস্বতঃ সেনবংশীয় শেষ রাজা ভরদেব দেহেরগাতি নিবাসী বলভদ্র বহুর করে কন্যা সম্প্রদান করিলে বলভদ্র বহুর পুত্র পরমানন্দ বহু রাজ্য পাইয়া কচুয়াবাসী হইলেন। রাজধানীপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বংশ নাথবপাশায় যাইলেন। এতদ্বিন্ন বংশ বহু বংশীয় শ্রীগর্ভ বহু নান্দা-নগর হইতে পুচুরায় আসিয়া বাস করেন। এই বংশীয় বলদান বহু ভরতকান্তী-বাসী হইলেন। চলপ্রাবন, নগ ও কিরিন্দীর অত্যাচার এবং রাজধানীপরিবর্ত্তনের জন্ত ক্রমে কচুয়া তনশুক্ত হইয়া পড়ে। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের পরই রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় কচুয়া হইতে নাথবপাশায় রাজধানীপরিবর্ত্তন করেন। নাথবপাশা বরিশাল হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। তপায় রাজপ্রাসাদ ক্রমেই ভগ্নলব্ধ হইয়া পড়িতেছে। মাণিক মুদীর বংশধর ও অত্যন্ত কয়েক ঘর ধনী থাকিলে ৬ গ্রামটি ক্রমে ভীতিরনক হইয়া দাড়াইতেছে। দুর্গাসাগর নানক প্রকাণ্ড বীথিকা এখনও অতীতের স্মৃতি জাগাইতেছে।

(১) কৃতকর্ত্তা অঙ্গাদিক্ত হইলেও ফোম সমঃ এরপ বিশেষ বর্ণনা বাগা উপকারি হইতে পারে।

(২) সন্তোম কর্ণবংশের পঞ্চাংশীম গুহায়ত।

বহুবংশে দ্বন্দ্বাজ নাথবায় বিশেষতঃ।

(পুত্রবহুর সম্বন্ধ—বিশ্ব বাচস্পতি কৃষ্ণিকা) —

রাজাদিগের পরিচয় ।

দনৌজমাধব রাজা হইয়া সমাজসংস্কার করতঃ সামাজিক বিপ্লবলাভ করিতে চেষ্টা করেন ; রাজ্য ও কার্য্যের এর ইটতে ভঙ সনিকরন করেন । ইঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রমাবরত, তৎপুত্র কৃষ্ণবরত, তৎপুত্র হরিবরত ও তৎপুত্র অরুণব ক্রমান্বয়ে চারিজন প্রায় ১৫০ বৎসর রাজত্ব করেন । রাজা কৃষ্ণবরতের কন্যা কমল-বেবী কালাইয়া নদীর তীরে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তিন হ্রোগ তের কার্ণি (প্রায় ৩০০ বিঘা) বিস্তৃত একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করান । এই দীর্ঘ কমলার দীঘি নামে খ্যাত । ১৮৭৬খৃষ্টাব্দের জলপ্লাবনে এতদ্বশে গৃহাদি জলমগ্ন হইলে শত সহস্র লোক এই কমলার দীঘির উচ্চ পাহাড়ে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল । রাজা অরুণবর পুত্র ছিল না । তিনি একমাত্র কন্যাকে বেহেরগাতিনিবানী বলভদ্র বহুর করে সম্ভ্রমণ করেন । রাজার মৃত্যুর পর তনৌর দৌহিত্র পরমানন্দ বহু চন্দ্রবীণের রাজা হইলেন ।

বলভদ্ররাজ্যে ধীমান পরমানন্দ নামকতঃ ।

তত্ত নাতানহঃ কুপ্তী অরুণবেবা মহাবলী ।

চন্দ্রবীণস্ত হৃপাতঃ সেনবংশ-সুহৃদঃ ।

মৃত্যুকালে প্রাপ্ত ন হি ততঃ পঞ্চদশবতঃ ।

পরমানন্দক তৎপুত্র চন্দ্রবীণেশ্বরোত্তমবৎ । (কৃষ্ণচর্য্য গ্রন্থ)

পরমানন্দ বহুও সামাজিক বিপ্লবলাভের চক্র বদ্ধ করতঃ ৯ম সমীকরণ করেন । পরমানন্দের পুত্র ভগদানন্দ পুত্র ভগবদ্রত ছিলেন ও গঙ্গাদেবীর উপাসনা করিয়া মৃত্যুকালে গঙ্গার্তে আত্মসমর্পণ করেন । ভগদানন্দের পুত্র কন্দর্প-নারায়ণ রায় সর্বস্বান্ত্রবিধারক কন্যাতালী ও প্রবল পরাক্রম রাজা ছিলেন । ইনি যখন সর্দার গাভিরে বুড়ে পরাস্ত করিয়া ও মগদিগকে নিহত করিয়া বাহুবী-কাঠী, কুন্দকাঠী, হোসেনপুর ও নাথবপাশা নগরী স্থাপিত করেন । রাজা কন্দর্প-নারায়ণ রায় ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন । কন্দর্পনারায়ণের নামাঙ্কিত একটি কানন এখনও নাথবপাশা রাজবাড়ীতে আছে । কন্দর্প নারায়ণের পর হইতেই ক্রমে রাজবংশের কন্যাকর ২৫তে থাকে । ইঁহার পুত্র রামচন্দ্র বিজয় ও জ্ঞানী ছিলেন । ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে সুত্রোপীয়া পরিভ্রমকগণ এইখানে আসিয়া ইঁহার বিশেষ প্রশংসা করেন এবং চন্দ্রবীণমধ্যে ধ্বংপ্রসারের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন । তখন রামচন্দ্রের বয়স একাদশ বর্ষ । বহুদিন তাঁহার সহিত —বনোহরেরমহারাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যার সহিত বিবাহের কথাবার্তা চলে । সেই

সময় কিছুকালের রাজা রামচন্দ্র প্রবাসী ছিলেন। সেই অবসরে মগ ও
 ফিরিকীরা বাহুল্য্য ক্রিয়ায় অধিকাংশ স্থান দখল করে। কিন্তু রাজা রামচন্দ্র আসিরা
 পুনরায় তাহা অধিকার করেন। মগরাজ প্রতাপসিংহ চন্দ্রদ্বীপ অধিকার ও
 তপায় সমাদ্রাধিপত্য লাভের জন্য বিবাহসম্বন্ধে তানাজা চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্রকে
 বন্দী করেন। রামচন্দ্রের সেনাপতি রামনারায়ণ সিংহ চৌবটি দাঁড়বৃত্ত নৌকা
 বৃক্ষপ্রভাববন্ধক সমুদ্রা নদীর উপর দিয়া টানিয়া লইয়া বাঙ্গার উদ্ধার করেন।
 রাজা সেনাপতিকে রাহচৌধুরী উপাধি দিয়া ভূমিদার্য অর্পণ করেন। তৎপরে
 উজীরপুরে বাস করিতেছেন। হুদুয়ার রাজা লক্ষ্মণাণিক্য চন্দ্রদ্বীপের আক্র-
 মণ করিলে রাজা রামচন্দ্র বেঘনা নদীর মধ্যে তাঁহাকে দ্রুত ও বন্দী করিয়া রাজ-
 ধানীতে আনয়ন করেন। তপায় লক্ষ্মণাণিক্যের মৃত্যু হয়। রামচন্দ্রের পুত্র
 কীর্ত্তিনারায়ণ মোঘুকে অধিকার ছিলেন। তিনি বেঘনানদীর উপকূলে ফিরিকী-
 দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দ্রুতীভূত করেন। তাহাদ্বারনগরের
 (জোকার) নবাব তাহার সহিত মিত্রতা করেন। এক দিন তপায় গমন করিয়া যখন
 ভোজ্যের আরাণ লগ্নায় তিনি জাতি নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া মহাসাধনায় হিন্দুর
 প্রদেপে প্রস্থান করেন। কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র প্রতাপনারায়ণ, তৎপরে কীর্ত্তি-
 নারায়ণের ভ্রাতা বাহুদেবনারায়ণ, তৎপর বাহুদেবনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ রাজা
 হইলেন। প্রেমনারায়ণ অপুত্রক কাশপ্রদেশে পতিত হইলে তাহার ভাগিনের উলা-
 ইলের উদয়নারায়ণ নিয রাজা হইলেন। প্রেমনারায়ণের স্ত্রীর কুচক্ষে উদয়নারায়ণ
 মুগ্ধাবাদের নবাবের হস্তে বন্দী হইলেন। এক দিন নবাব তাঁহাকে
 এক ব্যায়ের সমুখ প্রেরিত করেন; কিন্তু উদয়নারায়ণ অমিতবিক্রমে
 মুগ্ধাবাতে ব্যায়ক ভূপাতিত করিলে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায়
 তাঁহাকে চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন প্রদান করেন। এই উদয়নারায়ণের পর
 হইতে রাজগণ কনিবাররূপে পরিগণিত হইলেন। কারণ, তখন বঙ্গে
 ইংরাজপ্রাধান্ত। উদয়নারায়ণের পর তৎপুত্র শিবনারায়ণ, তৎপুত্র লক্ষী-
 নারায়ণ, তৎপুত্র ভয়নারায়ণ ক্রমান্বয়ে রাজা হইলেন। ভয়নারায়ণের মাতা
 দুর্গাবতী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দুর্গাদেবীর নামক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন
 করান। যে স্থানে ২১০ হাত মাটির নিম্নে ভল পাওয়া যায় সে স্থানে একরূপ
 গজার ও প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা কি প্রকারে খনন করা হইয়াছিল তাহা আশ্চর্য্যান্বিত
 হইতে হয়।

এই নারায়ণের সময় চন্দ্রদ্বীপ বিক্রীত হয়। তৎপরে দুর্গদেবনারায়ণ। ইহা —

হুই দত্তক পুত্র ছোট রাজা ও বড় রাজা নামে খ্যাত । বরিশালের রাজকীয় দরবারে এখনও উইাদের শ্রেষ্ঠ আসন ।*

শ্রীহেমন্তকুমার বহু ।

বার্থ বসন্ত ।

হে বসন্ত, গুরুভাঙ, পরি' চির-নব সাজ,
 পর পুষ্প নুকুল ভূষণ,
 সেই পুরাতন স্রীতি বিবাহ-মিলন-স্মৃতি
 ল'য়ে আনি' দিলে দরশন ।
 শুল মোর কুজবনে আজি তব আগমনে
 কে করিবে মঙ্গলাচরণ,
 অথা রচি' এ কুটীরে চিরাগত অভিধিরে
 কে লগিবে করিয়া বরণ !
 'ত'মি' কোকিলের গান, পঙ্কজে বাধিয়া তান
 বীণাঘরে কে দিবে ঝঙ্কার,
 পরিপূর্ণ করি' সাজি তুলি' নব পুষ্পরাজি
 কে রচিবে মালা-অলঙ্কার !
 কে আজি মাধবী-বনে বসিবে সে শিলাসনে,
 মন্দানিলে শিথিল অঞ্চল !
 কাহার মেহের প'রে দুটিবে সোঁহাপত্তরে
 চন্দ্রকর—পুলকবিহ্বল !
 আজি এ দখিণা বায় ধীরে কৈদে বহে যার,
 যারে ধোঁজে—না পায় সন্ধান !
 কুজন-গুজনে গানে বনের মর্মরে, প্রাণে
 জাগে শুধু বিলাপের তান ।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ ।

* কার্যতঃ জাতিগত সামাজিক প্রবৃত্তি বাস্তবতার ইতিহাসের—বিশেষ চন্দ্রবীণের ইতিহাসের--প্রধান

— উপকরণ ভাষ্যতঃ কার্যতঃ কুলপ্রবৃত্তি ইতিহাসে বহু উপাদান সংগৃহীত হইল । *

অদৃষ্টচক্র।

নষ্ট পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

ধরনীধর প্রথমে বনে করিয়াছিলেন, বড়দিনের ছুটির সময় তৃত্য নাসের ছুটি লইয়া গৃহে আসিবেন; ততদিনে পুত্রের বিজ্ঞানময় বন্ধ হইবে—তিনি তাহাকে নিকটে রাখিয়া তাহার অধ্যয়নের ভাবাবধান করিবে। কিন্তু রানতারপরে নিকটে তিনি বাহ্য অবগত হইলেন, তাহাতে তিনি কিছু বিভ্রান্ত হইলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন, ততদিন বিলম্ব করাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না—তিনি তৎপূর্বেই বাড়ী আসিবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কংগ্রেসে গমন করিলেন।

কংগ্রেস হইতে আসিবার পূর্বে তিনি জননীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ডাকবিভাগের রূপার শানগরে না যাইয়া শ্রামনগরে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্ধানে হরকরাবিশেষে কষ্টে বিয়া শেখে “এ নানের কোন মালিক গ্রামে নাই”—২নং পিরন চক্ৰকান্তের এই মন্তব্যসহ প্রত্যর্পিত হইয়াছিল। স্মরণ্য তাহার আগমন-সংবাদ গৃহে পৌছে নাই।

ধরনীধর নৌকার আসিতেছিলেন,—ভারতের পাপহারিণী পুণ্যভোয়া তীর্থবীর প্রবাহে উত্থান বাহিরা নৌকা অগ্রসর হইতেছিল। ধরনীধর এ বার কিছু অধিক দিনের ক্ষত গৃহে আসিতেছিলেন—সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু অধিক ছিল। সে সকলের মধ্যে পুস্তকই অধিক। ধরনীধরের কোন সখ ছিল না। তিনি তাহার বার্ষিক্যভোগ জীবনে—নিঃসঙ্গ প্রবাসে কেবল বিস্তারিত শান্তি ও সাধনা, সুখ ও আনন্দ পাইতেন। আর তাহার ক্ষমতা অভিশ্রব ছিল,—পুত্র যতীশচন্দ্রকে তিনি সর্ববিধ অভাব হইতে অব্যাহতি লাভের উপযুক্ত অর্থ দিবেন,—সে স্বচ্ছন্দে জ্ঞানার্জন করিয়া খ্যাতিলাভ ও পারিবারিক সুখভোগ করিবে; তাহার জীবনে অবস্থা-বিপাকে এই উভয়ের একটুও লাভ ঘটে নাই। এই আকীর্ণার জন্যই তিনি আশ্রয় বিবেশে চাকরী করিতেছেন; তাহার জীবনের সারাংশ অনাগ্রাসে কাটাঁইবার জন্য আশঙ্কিত কর্তৃক তিনি বতদিন পূর্বেই করিয়াছেন—সেই জন্য এখনও তাহার প্রবাসকাল সহ করা নিম্নস্বভাব।

নৌকা অগ্রসর হইতেছিল। গঙ্গাপ্রবাহের দিকে চাহিয়া ধরনীধর ভাবিতেছিলেন, এই গঙ্গার কূলে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা—প্রাচীন ভারতের মানস-পন্থ বিকশিত হইয়াছিল, তাহার সৌরভ আজও শিল্পে ও সাহিত্যে বস্তুমান; এই গঙ্গার

কূলে আটান ভারতবাসীরা যে ধর্ম ও সমাজশুভলা উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন এত দিনেও তাহা বিপ্লব হয় নাই—কত দয়—কত সনাতন কালসাগরে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ আরও বহুমান ; তাহার পর এই গঙ্গার কূলে রক্তনির্জিত বিপ্লব গঙ্গার নিশ্চি হইতে অগ্নি ও সেমিটিক সভ্যতার অপূর্ণ মিশ্রন হইয়াছিল, যে ধর্ম প্রভাবের নরুহুনি হইতে নরুহাত্যার নত প্রলয়মূর্ত্ত প্রবল বেগে বাহির হইয়াছিল তাহাও এই গঙ্গার কূলে আসিয়া মিষ্ট শান্তি লাভ করিয়াছিল ; তাহার পর নতুন অতঃ নতুন দৃষ্টি, কিন্তু যে নগণ্য গ্রাম ইংল্যান্ডের রাজধানী হইয়া আজ প্রাসাদমালিনী মহানগরীর শ্রী ধারণ করিয়াছে সেই কলিকাতাও গঙ্গার কূলে অবস্থিত । কত বিপ্লবধাতা, কত পরিবর্তনপ্রবাহ গিয়াছে ; কিন্তু গঙ্গা সমভাবে ভারতবর্ষকে প্রিভূতা ও উৎসবতা দান করিয়া ধন্ত করিতেছে ।

সহসা নদীকূলে বাতরব তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল । ধরনীধরের মনে পড়িল—আজ চগন্ধাত্মী পুজার বিজয়া । তিনি চাহিয়া দেখিলেন, কাহারা গঙ্গা-জলে প্রতিমা বিসর্জন করিতে আসিয়াছে । সংসারের প্রতিই এইরূপ । পূর্বদিন যে প্রতিমাকে অবগধন করিয়া অগজজনীর সম্মুখ অতীব কঠিনে সাজে হইয়াছি ; বাহার চরণতলে প্রণত হইয়া মহাপ্রজির নীলা দেওয়া বিদিত, ভজিত, ভক্তি-রসানুত হইয়াছি আজ আর তাহাকে কোন প্রোচন নাই, তাই আজ সে প্রতিমা নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে ! ধরনীধর ভাবিলেন, তাহার বাণ্যকালে বাদ্যনার পল্লীতে পল্লীতে কত পূজা হইত, পূজার কি আনন্দ—কি উৎসব ছিল । তখন এই সব উৎসবে নিলনের আনন্দালোকে সনাতনের সকল হর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত । আর এখন ? ধরনীধর ভাবিলেন—কত অল্প দিনে কি পরিবর্তন ! কিন্তু পুরাতন উৎসব গেল, কোন নতুন উৎসব তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে কি ? উৎসবহীন—আনন্দহীন—সুখহীন ভাতি কত দিন আগম্য অস্তিত্ব-সংরক্ষণে সক্ষম হইবে ?

ধরনীধর ভাবিতে লাগিলেন । নৌকা অগ্রসর হইতে লাগিল । নৌকা বখন শানগয়ের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল, তখন দিন শেষ ; পশ্চিম গগনে অস্তগমনোদ্ধত তপনের তেজহীন আলোক গভাগনিলে ঝিকঝিক জলিতেছে । ধরনীধরের নৌকা ঘাটে ভিড়বার অক্ষক্ষণ পূর্বে আর একখানি নৌকা ঘাটে ভিড়িয়াছিল । সে নৌকা হইতে করজন সুবক অবতরণ করিয়াছিল । ধরনীধর গৃহে বাইয়া জব্যাবির অতঃ হৃত্যকে পাঠাইবেন বলিয়া কূলে অবতরণ করিলেন । সুবকগণ

তাহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। তাহাদের কথোপকথন তাহার প্রবণগোচর হইল। একজন বলিল, “আজ যাওয়াটাই তপা হইল।” আর একজন বলিল, “কেন?” প্রথম বক্তা বলিল, “কারণ কিছুটা অগ্রসর হইল না।”—তৃতীয় জন বলিল, “ওহে পদবাটের সকান না জানিয়া কি ভ্রম জন্ম করা যায়? সব সংবাদ হস্তগত হইলে তখন কর্ত্তবানির্ভারণে বিলম্ব হয় না। সাক্ষ্যও সহজ হয়। ক্রমে সব সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতেছে।” চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, “যোগ্যো যোগ্যো মিলন প্রকৃতির নিয়ম। এক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? তবে সব কাণ্ড অল্পসময়সাধ্য হয় না।” প্রথম বক্তা বলিল, “বতীশ বাবুর এ বিবাহ সংঘটিত হইবেই।” অম্বা বাবু, ভ্রাম্যপূতার সময় আপনি আসিতে পারেন নাই; আনন্দের আশিরাছিলাম। সেই সময় আনন্দের কথা প্রসঙ্গে ঠাকুরমাকে বলিয়াছি, ইচ্ছাপূরে মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের একটি পরনা স্থলধী অবিবাহিতা কজা আছে। তাহার সহিত বতীশবাবুর বিবাহ হইলে বড় মানার। অতঃপর আমার কণায় সায় দিয়া বলিয়াছিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর পাশেই তাহার বাড়ীলগ্ন; সেও মেরেটিকে দেখিয়াছে।” একজন বলিল, “অতঃপর ত বাড়ীলগ্ন, আর তোনার?” জিজ্ঞাসিত হইয়া সুবক উত্তরে বলিল, “অতঃপর।” সে অকৃতকার; সকলে খুব হাসিল। এমন সময় নৌকা হঠাৎ মাঝি ডাকিতে ডাকিতে আসিল, “বাবু—ওগো বাবু; নৌকার এই ছড়ি ফেলিয়া আনিয়াছেন।” সুবক যখন পচাটিকে চাহিল। বতীশ-চক্র দেখিল। ধরনীধর আসিতেছেন। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের ভিত্তরে আপনাতঃ নগ্ননকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার পর সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থার কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিবার পর যাইয়া পিতৃচরণে প্রণত হইল। তাহার সঙ্গীরা পূর্বে কখনও ধরনীধরকে দেখে নাই। তাহারা বিশ্বাসে নির্ভীক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাঝি ছড়ি দিয়া চলিয়া গেল।

বতীশ মতদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কি বলিবে বুঝিতে পারিল না। তাহার পদব্রজ কম্পিত হইতে লাগিল। ধরনীধর পুত্রকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “ইহারা তোনার বন্ধু?”

বতীশ মুখ তুলিল না, মুহূর্ত্তের বলিল, “হাঁ।”

“বাগীশে সংবাদ দিয়াছ? ইহাদের আহ্বানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে?”

“হাঁ।”

তখন ধরনীধর সুবকদিগকে সন্মান করিয়া বলিলেন, “আপনারা আমার পুত্রের বন্ধু। আমি বিদেশে থাকি, তাই আপনাদিগের সহিত আশীর পরিচয়

হয় তা। আর আপনাদের সহিত সাক্ষাতে পরম শ্রীত হইলাম।” যুবকগণ বৃদ্ধের পরিচয়ে স্তম্ভিত হইল। অনুল্যঙ্গন সর্বাঙ্গে বিপন্নভাবে গোপন করিয়া আসিয়া ধরনীধরকে প্রণাম করিল। তাহার পর একে একে সকলেই ধরনীধরকে প্রণাম করিল। তিনি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া তাহাদিগের পরিচয় লইতে লইতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইগেলেন। কিন্তু যুবকগণ বৃদ্ধিতে পারিল না, তিনি তাহাদিগের ব্যবহার ও বাক্যালাপ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন।

গৃহে আসিয়া ধরনীধর হুঃ যুবকদিগের আহ্বারের তত্ত্বাবধান করিলেন; এবং সেই অবসরে তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর তাহারা বিদায় লইল।

যতীশ সেদিন আর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না।

সে দিন রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া ধরনীধর ভাবিতে লাগিলেন। তিনি দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছিলেন। তথাপি তাহার নয়নে নিদ্রা আগিল না। হৃচ্চিক্তাজনিত মানসিক চাকলা তাঁহাকে জীবনে মৃত্যুর আবাদ, বাধিত শোকাভূত সকলের যন্ত্রণার নির্মাণোপায় নিম্নাহিত লাভ করিতে দিল না। তিনি পুত্রের কথা ভাবিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার তাহার বহুদিগকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে, বিশেষতঃ অনুল্যঙ্গনকে, দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। উজ্জ্বলতা ও অতিরিক্ত সুরাপান তাহার দেহে আপনাদের কলঙ্কিত স্পর্শচিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল; সে চিহ্ন ধরনীধরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। ধরনীধর যতাবতঃ সকল বস্তুকে ও ব্যক্তিকে পৃথকপৃথকরূপে লক্ষ্য করিতেন; তাঁহার অবলম্বিত ব্যবসারে তাঁহার দেহে স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণশক্তি শাণিত অস্ত্রের মত তীক্ষ্ণ হইয়াছিল। আবার বহুবিধ লোকের সহিত ব্যবহারের কলে তিনি লোকচরিত্রবিচারে বিলক্ষণ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। অনুল্যঙ্গনকে চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। তিনি পুত্রের কল্পিত ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার ছায়াপাতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। আজ হৃচ্চিক্তাতাড়িত ধরনীধরের মানসপটে মৃত্যুশয্যায় শয়ান পতীর বৃষ্টি ছুটিয়া উঠিল। ধরনীধরের নয়নে অশ্রু দেখা দিল। তিনি উদ্দেশে বলিলেন, “তুমি তোমার পুত্রকে আশীর্বাদ কর। তোমার পুণ্য—তোমার আশীর্বাদে পুত্রের সকল অকল্যাণ দূর হইবে,—সকল বিপদের অবসান হইবে।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পিতাপুত্র।

ধরনীধর গৃহে আসিলেন। তখনও যতীশচন্দ্রের বিজ্ঞানের বন্ধ হয় নাই; কাসেট সে কলিকতায় থাকিত, শনিবারে গৃহে আসিত। নপ্তাহান্তে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইত। যতীশচন্দ্রের মনোভাব গোপনের চেষ্টা সত্ত্বেও ধরনীধর স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন, শনিবারে গৃহে আসিতা যতীশ কেবল ভাবিত, কবে সোমবার আসিবে—সে কলিকতায় ফিরিয়া যাইবে। পিতা যখন পুত্রকে নিকটে পাইবার জন্য এত ব্যাকুল, পুত্র তখন পিতার সান্নিধ্য ক্লেণকর বোধ করে! কেন এমন হয়? বেহুশ পিতা আপনার নিকট আপনাকে দোষী প্রতিপন্ন করিয়া পুত্রের ব্যবহার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, দোষ তাঁহার; তিনি বিদেশে থাকেন, পিতাপুত্রে বর্ষান্তে বা বর্ষমধ্যে দুইবার সাক্ষাৎ হয়—সেও অমদিনের ভ্রম; এ অবস্থায় পিতাপুত্রের মধ্যে স্বাভাবিক বেহসবন্ধ নিশ্চল হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু এ চিন্তায়—এই কথাই মন শাস্ত হইল না। বেহ নিয়গামী সভা; কিন্তু বেহ কি বেহ আকর্ষণ করে না? আর তিনি যে সংসারের সকল সুখ স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ জীবনে বাসন করিতেছেন, সে কাহার জন্য? সেই বিদেশে তাঁহাকে রোগে ওজ্রবা করিবার কেহ নাই; তাঁহার মৃত্যুকাল সমাগত হইলে পিপাসাওক্ষমণ্ডে জলবিন্দু দিবার কেহ থাকিবে না—হয় ত কোন বনমধ্যে বা গিরিনিধরে ভূত্যাগকর্তৃক পরিত্যক্ত তাঁহার শব শৃগালকুকুরের আহাৰ্য হইবে। তিনি কাহার জন্য বিদেশে প্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন? পুত্র কি তাহা বুঝিতে পারে না? ধরনীধর ভাবিতেন। সে ভাবনার কেবল বাতনা। তাহার বশেষে অবসর—যে কাব নইয়া তিনি সময় কাটাইতেন—হৃদয়ের শোক ভুলিতেন—এখন সে কাব নাই, কায়েই ভাবনার আশ্রয় ছিল না। সময় সময় বসন হৃদয়ের ভারে হৃদয় অবসর হইয়া পড়িত তখন তিনি কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন; মনকে বুঝাইতেন, তিনি তাঁহার কর্তব্য পালন করিতেছেন—তাহাই তাঁহার কার্য। হায় কর্তব্য, তুমি অনেক সময় সংসারমলমূষিতে মগ্নিচিহ্ন! মাত্র—স্নাতপণিককে কেবল বিশ্রাম বাতনা দান কর।

এই ভাবে মাসাধিক কাল কাটিবার পর যতীশচন্দ্রের কণেক বন্ধ হইল। সে গৃহে আসিতে গাহিল না—তখনও পরীক্ষার দুই মাস বিলম্ব আছে, এই সময়ের মধ্যে সতীর্থদিগের সহিত অনেক আবশ্যক বিষয়ের আলোচনা ও শিক্ষাদানের

নিকট আবৃত্তক বিষয় জ্ঞানই নতুন প্রারম্ভ হইবে—এই ওজুহাতে সে কলিকাতার থাকিতে চাহিল । কিন্তু ধরনীধর বলিলেন, যখন সে যে দিন ইচ্ছা প্রভাতে কলিকাতার বাইরা অপরাহ্নে কিরিয়া আসিতে পারিবে, তখন তাহার পক্ষে গৃহে আসাই শ্রেয়ঃ ; বিশেষ গৃহে অধায়েনে কোনরূপ অসুস্থতার ভটিবে না, এবং অকসংক্ষেপে তিনি আবৃত্তক সাহায্য করিতে পারিবেন । নিতান্ত অনিচ্ছায় যতীশ গৃহে আসিল ।

গৃহবাস যতীশের ভাল লাগিত না । সে কলিকাতার তাহার সাহিত্যিক সহচর-দিগের সহিত মিনিবার জন্ত ব্যস্ত হইত । বিজ্ঞানগণের নির্দিষ্ট নীতিসমূহ পুস্তক পাঠে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না ; অথচ তাহাকে সেই সকল পুস্তক পাঠে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করিতে হইত । এ অবস্থায় তাহার যে প্রারম্ভ কলিকাতার বাইরার প্রয়োজন হইত তাহা বলাই বাহুল্য ।

ধরনীধর পুস্তকের ব্যবহার লক্ষ্য করিতে লাগিলেন—তাহার ব্যবহারে বাধিত হইতে লাগিলেন । তিনি বুঝিলেন, বিহগ-শাবক যখন আপনায় পক্ষে ভয় দিয়া অনন্ত অস্থির উড়িতে শিখে—সে যখন আপনি আপনায় আহাণ্য সংগ্রহ করিতে পারে, তখন বাহিরে তাহার সহস্র বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও বিহগ-জননীর পক্ষে তাহাকে আর নীড়ে—আপনায় পক্ষতলে রক্ষা করা অসম্ভব । তাহা বুঝিয়া পুস্তকের বিপদসম্ভাবনার তিনি চকণ হইলেন । পিতামাতার এই বেহসম্মত চাকনো আনন্ড তরুণ বয়সে বিরক্ত হই; কারণ, আশঙ্কা পরিণত বয়সের ধর্ম ; কিন্তু যখন মাসেরা তরুণ যয়স প্রতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ের উপনীত হই—যখন পুস্তকজ্ঞার বিপদনকার আনন্দিগের পিতৃভবর চকণ হইতে আরম্ভ হয়, তখন আনন্ড সে চাকল্যের স্বরূপ হুষ্টিতে পারি এবং পিতামাতার প্রতি পূর্বব্যবহার শ্রবণ করিয়া অলুতপ্ত হই । কিন্তু অনিকাংশ স্থানে তখন তাহারা সে চাকল্যের অতীত হইয়া চির-শান্তি লাভ করিয়াছেন ।

পুস্তকের পাঠে অনন্যোন্মাদ লক্ষ্য করিয়া ও অকস্মাৎ তাহার আবৃত্তক লক্ষ্য-ভার অভাব দেখিয়া ধরনীধর বুঝিলেন, তাহার পক্ষে এবার পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার আশা নাই । ইহা বুঝিয়া তিনি বিশেষ বেধিত হইলেন । তিনি প্রত্যয়ে পুস্তকের সমুদয় ভবিষ্যৎ সাকল্যের স্বরূপে সকল স্থাং—সকল অস্থিধা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন : পুস্তকের জন্ত শ্রম করিয়া আপনায় বার্থ জীবন সার্থক মনে করিতেন । এখন পুস্তকের ব্যবহারে সে স্বপ্ন টুটয়া যাইতে লাগিল । কিন্তু হতাশা অপেক্ষা অশ্রদ্ধা অধিক বেদনার কারণ হইয়া দাঁড়াইল । পূর্ববার গৃহে আসিয়া

বন্ধু রামভাণ্ডারের কপাততও যে আশঙ্কা সৃষ্টি হইয়া উঠে নাই—যে আশঙ্কা বেহুপ্রবণ পিতৃদমের পুত্রের প্রতি বিধান শিথিল করিতে পারে নাই, অমূল্যভাণ্ডারের ধ্বংসনে সে আশঙ্কার স্বরূপ সপ্রকাশ হইয়াছিল, সেই বিধান বিচলিত হইয়াছিল। পুত্র এমন বন্ধু কেমন করিয়া সংগ্রহ করিল? গোপকব বন্ধু দেখিয়া যদি লোকের চরিত্র বুঝা যায় তবে বতীশ এখন নিকলভ, কিন্তু যে, “অসংসারে থাকিলে পরে অধর্মের ফল ফলে” সেই অসংসারে থাকিয়া সে কত দিন অবিচলিত থাকিতে পারিবে? পথ শিথিল—পথিক সংসারজ্ঞানানভিত, তাহার পক্ষে মতর্কতা অব্যাক্তাবিক। এ অবস্থায় পদে পদে পন্থাচ্যুতির সম্ভাবনা। এই সকল ভাবনার ধরলীধরের জন্য সর্বদাই বাতাবিকুল বাগিদির মত চকল থাকিত। তিনি প্রবাস হইতে গুহে আসিয়া সুখলাভ করা দূরে থাকুক নুতন অস্থির পীড়িত হইতে লাগিলেন। কেবল প্রবাসেও যেমন গৃহেও তখনই অধ্যয়নে তিনি সময় সময় সকল হুং তুলিতেন—সকল আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন,—সকল চিন্তা হইতে মুক্ত হইতেন।

একদিন মধ্যাহ্নে—আহারের পর স্নান করিয়া ধরলীধর ‘বিষ্ণুপুরাণ’ পাঠ করিতেছেন এমন সময় তাঁহার জননী সেট কর্তে প্রবেশ করিলেন। সে দিন একাদশী। নাকে দেখিয়া ধরলীধর পুস্তকপাঠ বন্ধ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, আজ একটু শুইলে না?”

মা বলিলেন, “শীতের বেলা দেখিতে দেখিতে যায়; তাই ‘স্বাভ’ শুই নাই। একটা কথা বলি বলি মনে করি, হইয়া উঠে না; আজ বলিতে আসিয়াছি।”

“কি কথা, মা?”

“বতীশের বিবাহ দিতে হইবে। চেমন ভাগর হইয়াছে। আমি আর কত দিন বাঁচিব? আমার মাথাও বটে, আর বৌকে ত সংসারের কাণ শিখাইয়া দাইতেও হইবে। আমি আর কোন আপত্তি তুলিব না।”

দুই বৎসর হইতে মা বতীশের বিবাহের কথা বলিতেছেন। এতদিন ধরলীধর বিলম্ব করিয়াছেন। কিন্তু এবার তাঁহার মতপরিবর্তন ঘটয়াছে। চকলদমর দাব্য করিতে—উদ্ভ্রান্তকে সংসারে বন্ধ করিতে প্রেমের মত উপায় আর নাই। বুকের তরুণ রূপের প্রেম-পিপাসা ব্যাক্তাবিক। তাই বধূ প্রেম-বন্ধনে বন্ধ করিয়া পুত্রকে বিপদের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার কথা এবার ধরলীধরের মনে হইয়াছে। কাণেই এগার আর তিনি পূর্ব পূর্ব বারের মত পুত্রের অধ্যয়নে কতির সম্ভাবনার কথা বলিয়া জননীর প্রত্যবে কোন আপত্তি করিলেন না;

বলিলেন,—“আমি পাত্রীর সন্ধান লইব । গ্রামে ত আর ঘটক নাই । কলিকাতায় বাইরা রামতারণকে বলিয়া আসিব কি ?”

স্বা বলিলেন, “সে-ই ভাল কথা । আমি একটি পাত্রীর সন্ধান পাইয়াছি । যতীশের ছুইজন বন্ধু মেয়েটিকে দেখিয়াছে । তাহারা বলে, মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ ভগবতী ।”

স্বা'র কথা শুনিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের দিন নদীকূলে যতীশচন্দ্রের সহচরবৃন্দের কথা ধরনীধরের ননে পড়িল । তিনি বুঝিলেন, তাহারা এই পাত্রীর কথাই বলিতে-ছিল । তিনি মিজাসা করিলেন, “মেয়েটির পিতৃাণের কোণার ?”

“ইচ্ছাপুরে । মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কন্যা ।”

“ভাল ; আমি সন্ধান লইব ।”

এ সম্বন্ধে সন্ধান লইবার উপায় সম্বন্ধে ধরনীধরকে কিছু চিহ্নিত হইতে হইল । পূর্বে যখন বাদামার পত্নী আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল—পত্নীর অভাব দূর করিয়া উপায় পত্নীতেই পাকিত—তখন গ্রামে ঘটক ছিল । এখন পত্নীগ্রামের অবস্থা পরিবর্তিত । বিবাহ প্রায় সহস্রই নিম্পন্ন হয়—পূর্বের মত দৃশ্যমুহুর পরিচয়ের ব্যবস্থা আর নাই । কায়েই গ্রামে এখন ঘটকের অভাব । অনেক ভাবিয়া ধরনীধর গ্রামের “ঠাকুরদাদা”—হরিনাথ ভট্টাচার্য্যকে সব কথা বলিয়া ইচ্ছাপুরে মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন ।

বৃদ্ধ হরিনাথ আবশ্যক সংবাদাদি লইয়া আসিলেন ; ধরনীধরকে বলিলেন, “তারা হে ! তোমার ঘরে মেয়ে দিতে পারা মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সৌভাগ্য, সন্দেহ নাই ; কিন্তু মেয়েটি লক্ষে একটি—সে মেয়ে আনিতে পারাও সৌভাগ্য ।”

ধরনীধর জননীর সহিত এ বিষয় পরামর্শ করিলেন । হরিনাথের কথা শুনিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার জননীর আগ্রহ যেন দশগুণ বর্দ্ধিত হইল ।

তাহার পর একদিন ধরনীধর স্বয়ং হরিনাথকে সঙ্গে লইয়া ইচ্ছাপুরে গমন করিলেন । বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল । কথা হইল, এখন “আশীর্বাদ” হইয়া থাকিবে ; যতীশের পরীক্ষার পর বিবাহ হইবে । ধরনীধর দেখিলেন, মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কন্যা সাক্ষাৎ ভগবতীই বটে ।

যতীশ তুলিল, ইচ্ছাপুরে সেই বালিকার সহিতই তাহার বিবাহ স্থির হইল । অধায়নে তাহার ষেটুকু মনোযোগ ছিল—তাহাও গেল । সে বহুনাশ্ট স্থপ-লোকে বিচরণ করিতে লাগিল । যুবকের উদ্দাম কল্পনা তাহাকে যে প্রভাভ্যে লইয়া গেল সে প্রভাভ্যে স্থপ এই স্থপ-শোক-তাপময় জগতে লাভ করা যায় না

বেলভেডিয়ার।*

—:—

কলিকাতার উপকণ্ঠে বিত্ত পল্লীশোভার মধ্যে আলীপুরে* বঙ্গের ছোটলালের বাসভবন বেলভেডিয়ার অবস্থিত। গৃহের বর্তমান নাম অবশ্য স্মরণীয়। কিন্তু গৃহটি এখন মূলমামান শাসনসময়ে নির্মিত বলিয়া জানা যায়। যখন ভারতবর্ষ যোগল শাসনাধীন—দিল্লীর সিংহাসনে আওরঙ্গজেব অধিষ্ঠিত তখন সুবা বাদশাহর শাসনকর্তা আজোম ওলসান মুগলার জন্ত এই গৃহ নির্মিত করান। তাহার পর হগলীর কর্তৃক মূলমামান শাসনকর্তা সময়ে সময়ে এই গৃহে বাস করিতেন। দেখা যায়, পলাশীর যুদ্ধের পর ড্যান্সিটাট এই গৃহের অধিকারী হইলেন। কি হুত্রে যে উহা তাহার হস্তগত হয় তাহা জানা যায় না। জনৈক মূলমামান ঐতিহাসিকের নতে ঝাংতাকরের নিকট হইতে যে অর্থ গৃহীত হয়—তাহার মধ্যে বীর অংশের টাকা দিয়া ড্যান্সিটাট উহা ক্রয় করেন। কিন্তু তিনি কাহার নিকট হইতে উহা ক্রয় করেন, তাগা জানিবার উপা নাই। ড্যান্সিটাট পরঃ ইটালীয়ান ছিলেন; গৃহ অধিকারের পর উহার আবশ্যক পরিবর্তন ও সংস্কার শেব করাইয়া বীর মাতৃ-ভাষার উহার বেলভেডিয়ার নামকরণ করেন।

ক্রাইভ শাসন-সংস্কারে সচেষ্ট হইলে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ইংরাজ কন্স-চারীরা এই গৃহে সমবেত হইয়া ক্রাইভের মিনগ্রন প্রত্যাখ্যান করাই কর্তব্য স্থির করেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ক্রাইভের স্বদেশগমনে ড্যান্সিটাট গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন। তখন কাউন্সিলের সভ্য হইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতার আশিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস তৎকালপ্রচলিত রীতি অমসারে আলীপুরে এক উদ্যান বাটিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্যানবাটিকা ড্যান্সিটাটের গৃহের দক্ষিণে—সম্ভবতঃ বর্তমান এগ্রিহটিকাল্গারাল সোসাইটীর উদ্যানে অবস্থিত ছিল। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে 'ইংলিশম্যান' পত্রে জনৈক লেখক লিখিয়াছিলেন, এই গৃহ বেলভেডিয়ারের হাতায় অবস্থিত ছিল। আমগা সম্ভবতঃ কার্ণাটবরণে দেখিতে পাই, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস বীর উদ্যানবাটিকার গমনের পথে—কানীবাটে আদিগঙ্গার উপর একটি সেতু নির্মাণের অহুমতি চাহিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত লেখকের মতে যে স্থানে বর্তমান কালীবাটের সেতু অবস্থিত ঐ স্থানে অবস্থিত একটি পুরাতন

* কলিকাতা জর করিয়া সিংহাসনে উহার আলীপুর নামকরণ করেন। আলীপুরে তাহারই শেব চিহ্ন বিদ্যমান কি না জানা যায় না।

জীর্ন সেতুর পরিবর্তে হেষ্টিংস একটি নূতন সেতু নির্মাণ করিতে গাহেন। তিনি আর্থিক অসুস্থতি পাইলেও—পরবৎসর স্বদেশে গমন করার সেতুনির্মাণ হয় নাই।

দেখা যায়, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ১৮০০০ টাকার একটি গৃহ বিক্রয় করেন। ঐ গৃহ বেলেভেডিয়ার কি না বাকশাও* দে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কির তৎকালে কোম্পানীর কনস্ট্রাক্স লাতের জ্ঞান সন্দেহই তমী ও গৃহ জন্ম-বিক্রয় করিতে। অসৌখ্য, কনিকাতা, রিপড়া, সুখসাগর প্রভৃতি নানাস্থানে হেষ্টিংসের গৃহের উল্লেখ আছে। সুতরাং এই গৃহ সে বেলেভেডিয়ার এমনই মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ড্যানসিট† স্বদেশে প্রত্যাপ্ত হইলে গভর্নর ভেরেলসেই ঐ গৃহে বাস করিতে থাকেন। ওলন্দাজ নৌসেনাধ্যক্ষ ট্যাভোরিনাস ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন,—
ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেক ডিরেক্টর হংলী গমনকালে ভেরেলসেই কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কনিকাতা হইতে প্রায় দুই ঘণ্টার পথ তন্নীর উত্তান গৃহে গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই উত্তানগৃহ বেলেভেডিয়ার। ভেরেলসেই কর্তৃক-কালে মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রায়ই বেলেভেডিয়ায় বাইতেন।

ইহার পর কাউটার গভর্নর হইলে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে চুঁচুর ওলন্দাজ গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে এই বেলেভেডিয়ার ভবনে তাঁহাদের প্রীত্যর্থে সন্মতি ও পানভোজনের ব্যবস্থা হয়।

কাউটারের পর গভর্নর হইয়া হেষ্টিংস বেলেভেডিয়ায় বাস করিতে থাকেন। এই সময় তিনি তাঁহার বেলেভেডিয়ারসংলগ্ন উত্তানগৃহ ভাবীপত্নী ও তাঁহার সম্মানবিগের জন্য ছাড়িয়া দেন। এই বেলেভেডিয়ায়ই তাঁহার সহিত নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী কানাল উপদানের সাক্ষাৎ হয়। বেভারিঙ্গ; বলিয়াছেন, হেষ্টিংস বর্তমান হেষ্টিংস হাউস লিখিতে বেলেভেডিয়ার লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার এই অসুস্থমানের কোন কারণনির্দেশ করেন নাই। এই সময় হেষ্টিংস বর্তমান হেষ্টিংস হাউসের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করান। বিবাহান্ত্রে তিনি এই নবনির্মিত গৃহে বাস আরম্ভ করেন। তখন কেবল সামাজিক নিমন্ত্রণাদির জন্য বেলেভেডিয়ার ব্যবহৃত হইত। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের প্রতিবন্দী কিলিপ ফ্রান্সিসের কুটুম্ব ও আইভেট পেরেটারা ম্যাক্লেবী লিখিয়াছিলেন যে, তিনি সন্মতিকোষে হেষ্টিংসের

* Bengal under the Lieutenant-Governors.

† Gleig's Memoirs of Warren Hastings.

‡ Trial of Nand Kumar.

বাণানবাড়ীতে নিবাসিত হইয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, আলীপুরের কোন বাতীতে আগাধের পর তিনি ও কর্ণেল মনসন বেড়াইতে বেড়াইতে হেষ্টিংসের নতুন গৃহে গমন করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস কোন সময়ে বেলভেডিয়ার ক্রয় করেন তাহা জানা যায় না। কিন্তু দেখা যায়, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল টলীকে ঐ গৃহ বিক্রয় করেন। মিসেস ফে* লিখিয়াছিলেন যে, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলভেডিয়ারে হেষ্টিংস পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রের টাকাকার ফার্নিচার বলেন, তিনি হেষ্টিংস হাউসেই গিয়াছিলেন; হেষ্টিংসের দুইটি গৃহ পরস্পর সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকায় নবাবগড়ের পক্ষে এরূপ ভ্রম অসম্ভব নহে। ইহার পর দেখিতে পাই, হেষ্টিংসের সহিত ঘেরণ যুদ্ধে আহত ফ্রান্সিস বেলভেডিয়ারে নীত হইলেন। হেষ্টিংস বলেন, তিনি বেলভেডিয়ারে নীত হইলেন। ফ্রান্সিস লিখিয়াছেন, তিনি টলীর গৃহে নীত হইয়াছিলেন। আগরা পুর্বেই বলিয়াছি, টলী হেষ্টিংসের নিকট হইতে ঐ গৃহ ক্রয় করেন। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘেরণ যুদ্ধের কারণ সকলেই অবগত আছেন। তবে ইহার সংঘটনস্থান সযত্নে অনুসন্ধান আছে। বাট্টির মতো আলীপুর রোডের ধনঃ ভবনের উত্তর সীমার নিকটে উহা সংঘটিত হয়। কিন্তু লং বাহা লিখিয়াছেন : তাহাতে বোধ হয়, আদি গঙ্গার উত্তর কূলে কলিকাতার দিকে বর্তমান জিরাটে সেতুর নিকটে ইহা সংঘটিত হয়।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখের কলিকাতা গেজেটে বেলভেডিয়ার ভাড়ার বা বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হয়। ঐ বৎসর বেঙ্গল টলীর মৃত্যু হয়। বোধ হয়, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের পক্ষ হইতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। গৃহ বিক্রীত না হওয়ার মেয়াদ ক্রম বার্ষিক ৩৫০০ টাকা ভাড়ার কৃতি বৎসরের জন্য উহা ভাড়া লগেন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস বিলাতে পত্নীকে লিখেন যে, আলীপুরের সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ নিলামে চড়াইয়া উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ার তিনি আপনাই ডাকিয়া রাখিয়াছেন। তিন খণ্ডে সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে নতুন বাতী, পুরাতন বাতী, ও সাদা জমীর উল্লেখ দেখা যায়। নতুন বাতী অবশ্য বর্তমান হেষ্টিংস হাউস, পুরাতন বাতী বোধ হয় বেলভেডিয়ারসংলগ্ন উদ্যানগৃহ। বাট্টির টলীর নিকট বেলভেডিয়ার বিক্রয়ের কথা বিস্তৃত হইয়া বেলভেডিয়ার এই ফিরিত্তিক্রম মনে করিয়া

Original Letters from India.

Echoes from Old Calcutta.

Selections.

জনসংপত্তিত হইয়াছেন। হেষ্টিংস বনেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার প্রতিনিধি-
বিশেষের চেষ্টায় তাঁহার সম্পর্গ বিক্রান্ত হয়। তখন বাবহারজীব জ্যাকসন পুরাতন
বাটী ২৭৫০০ টাকা, টমসন ও টানার্ন নতুন বাটী ২৭০০০ টাকা এবং
এটর্নী জ্যানিকোন সারা সন্মা ৭৫০০ টাকার ক্রয় করেন। তখনও প্রায় ৭০ বিঘা
জমী অবিক্রান্ত থাকে। হেষ্টিংসের পত্নীর পুণ্যপঙ্কজের পুত্র জুনিয়াস ইম্‌হক
ভারতে বাস করিতে আসিলে হেষ্টিংস এই জমী তাঁহাকে বেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে মেজর টমার প্রতিনিধিরা বেগভেডিয়ায় গৃহ টমাস দ্বতকে
বিক্রয় করেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বার্ক দ্বতের নিকট হইতে ও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বার্কের নিকট হইতে বেগভেডিয়ায় ক্রয় করেন। ১৮৪১
খৃষ্টাব্দে উহা মাকিননের হস্তগত হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসর তৎ-
কালীন প্রধান সেনাপতি সার এডওয়ার্ড প্যাঙ্গে এই গৃহে বাস করেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন এডভোকেট হেনারল চার্লস প্রিন্সেপ এই গৃহের
সংগ্রহ করেন। বোধ হয় তিনি তখন এই গৃহেই বাস করিতেন। পরে ১৮৪১
খৃষ্টাব্দে প্রিন্সেপ উহা ক্রয় করেন। *

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় গেজটেনাট-গভর্নরের পদ সৃষ্ট হইলে তাঁহার বস-
বাসভক্ত বড়লাট লর্ড ড্যানহাউসের পরামর্শে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রিন্সেপ-
পরিবারের নিকট হইতে এই গৃহ ক্রয় করেন। ঐ বৎসর ১৭ই ফেব্রুয়ারী
তারিখে লর্ড ড্যানহাউস লিখেন—ঐ গৃহ ৮০০০০ টাকা খরিদ করিয়া ২০০০০
টাকায় উহার সংগ্রহ করাইলে বোটে ব্যয় পড়িবে ১০০০০০ টাকা। উহার মূল
শতকরা বার্ষিক ৩০ টাকা ও সংস্কারের ব্যয় শতকরা বার্ষিক ২৪০ টাকা হিসাবে
ধরিয়া গেজটেনাট-গভর্নরের নিকট নাসিক ৫০০ টাকা ভাড়া আদায় করিলে
সরকারেরও ক্ষতি হইবে না, অধিবাসীর প্রতিও অবিজ্ঞ হইবে না। ইহার পর
২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি লিখেন যে, গেজটেনাট-গভর্নরকে কলিকাতায়
অবস্থানহেতু সামাজিক নিমন্ত্রণাদিতে প্রচুর ব্যয় করিতে হইবে—তাণ্ডা বিবেচনা
করিয়া বাঙ্গালায় ছোটগাটের নিকট বাড়ীভাড়া আদায় না করাই শত
ভগবধি বেগভেডিয়ায় বেঙ্গল ছোটগাটনিগের বাসভবন। বলা বাহুল্য এই গৃহে
বহুবিধ পরিবর্তন ও পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে ও হইতেছে।

এই গৃহসংলগ্ন জমীরও কতকাংশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়।
হেষ্টিংস-পত্নীর পুত্র ইম্‌হক ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে নবাব নাজিমকে একটি অট্টালিকা ও

তৎ-সংলগ্ন জমী সমেত পুষ্করী প্রকৃতি বিক্রয় করেন। উহার চৌহদ্দী দেখিয়া মনে হয়, ঐ জমী বেলভেডিয়ায়ের দাঁকিলে ছিল। বর্তমানে ঐ জমীতেই এগ্রিহট-কাল্‌চারাল্‌ সোসাইটীর উদ্যান ও আলিপুর রোড হইতে কালীবাটের পূর্ণ পর্য্যন্ত লম্বিত সাতার উত্তরাংশের গৃহগুলি অবস্থিত। কে তাঁহার রচিত নেটকাকের ভাবনীতে মেটকাকের যে বাসগৃহের স্থাননির্ণয়ে অঙ্কন হইয়াছেন ইহাই বোধ হয় সেই গৃহ। ইহা নবাব সাহেবের কুটী বলিয়াই পরিচিত ছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সার সিমিল বিডন ঐ গৃহ ও জমী ক্রয় করেন ও তিন বৎসর পরে বাড়ী ভাঙ্গিয়া জমী গভর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করেন। তখন ঐ জমীর কতকাংশ বেলভেডিয়ায়ের হাতাছুক করা হয় ও কতকাংশ আলিপুর গোরাবারিকের অন্তরগত রাখা হয়। এই শেবাুক্ত জমীই এখন পূর্ণোক্ত সোসাইটীর অধিকৃত।

যাহারা কলিকাতার বড়লাটের ও ছোটলাটের উভয়েরই বাসভবন দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বেলভেডিয়ায়ের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। সকল ছোটলাটই ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। সার হার্বার্ড ক্যাথল পীর ভাবনীতে লিখিয়াছেন—ইহা “a charming house in charming grounds” সার রিচার্ড টেম্পল পীর পুস্তকে ইহার বর্ণনায় প্রাণশা করিয়াছেন। এমন কি বড়লাট হার্ড ডাকরিণের পত্নী সন্ন্যাস লিখিয়াছেন যে, দুঃসৌন্দর্য্য ও আশ্রয়বিষয়ে বেলভেডিয়ায়ের সহিত লাট-প্রাসাদের তুলনা হয় না।†

বেলভেডিয়ায়ের অর্থ সৌন্দর্য্যের রূপ। সার রিচার্ড টেম্পল সভাই বলিয়াছিলেন—বর্তমান কেন্দ্রে এনাম সার্থক হইয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

০ Men and Events of my Time.

† Our Viceregal Life in India.

রামায়ণী সভ্যতা ।

সাহিত্য ।

রামায়ণী যুগে ভারতবর্ষে যে সকল শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল শাস্ত্রাবির তৎকালীন অবস্থা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব ।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রসম্পদ, বাহ্য গ্রন্থাকারে আমাদের নিকট পরিচিতি হইতেছে, ঐ সকল শাস্ত্র তৎকালে কিরূপ ভাবে জন-গণের নিকট পরিচিত ছিল এবং কি ভাবেই বা আলোচিত হইত তাহার সম্বন্ধে রামায়ণে বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না । “আমরা পূর্ববর্তী “লিঙ্গা প্রণালী” প্রবন্ধে (১) বলিয়াছি যে, তৎকালে লিপি-প্রণালী প্রচলিত না থাকায় মৌখিক শিক্ষাদান প্রণালীতে প্রচলিত ছিল এবং শাস্ত্রাবির গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ না থাকিয়া জনগণের স্মৃতিমন্দিরে বিস্তারিত থাকিত ও তৎকৃত স্মৃতি ও শ্রুতি নামে পরিচিত ছিল । বাস্তবিক বেদের প্রোকগুলি যে যুগে যুগেই রচিত হইয়া স্মৃতিতে রক্ষিত হইত ও স্মৃতিতে প্রচারিত হইত বেধেও তাহার ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । *

(১) আর্য্যাবর্ত্ত—অগ্রহাষণ, ১৩১৭ ।

= দুর্ভাগ্য স্বরূপ আশ্রয় ভূক্বেষের ১ম অষ্টক, ১ম বওন, ৩য় অধ্যায়, ৩০ পুষ্ঠ হইতে ১৪৭ কণ্ডকের পঞ্চদশ উচ্চত করিলাম ।—

“যুগে লোক রচনা কর, বেগের স্তায় তাহা বিস্তার কর, উৎস স্ততি বিশিষ্ট গারজীজনে রচিত হুত পাঠ কর ।”

৩৪শে পট্টম বক্ত ।

ঐহৃত বৈশেষিক বিজ্ঞানজ্ঞ বচনায় বেধে বৃহত্তম সংখ্যা বাচক শব্দের উল্লেখ দেখিয়া দুর্ভাগ্য সহিত বৈদিককালে লিপিসিদ্ধান্তের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন । তিনি লিখিয়াছেন, “সকলেই জানেন যে, লিপিসিদ্ধান্তের পূর্বে লিপিসিদ্ধান্ত নথো লিপিত বিস্তার প্রচলিত থাকে না । তৎ প্রতিকারণ এই যে, লিপিত বিজ্ঞা অতি গহন অতি দুর্লভ ; লিপি সাহায্য ব্যতীত তাহার শিক্ষা বা অধুশীলন সম্ভবপর হয় না । কাজেই লিপিত লিখক অবস্থা প্রত্যেক লিপিত লিখার অন্তিম থাকে । লিপিসিদ্ধান্তের লিপিসিদ্ধান্ত, আর লিপিসিদ্ধান্তের অন্তিম, এতদুভয়ে আমরা বলিতে পারি । বৈদিক যুগের যখন লিপিত লিখকের অস্তিত্ব ছিলেন, তখন জাননা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাহার লিখকের নথো অবস্তাই কেন না কোন লিপিসিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল । কেন না, লিপির সাহায্য ব্যতীত লিপিত লিখা অধুশীলিত হইতে পারে না ।”

(উপাসনা ৬৪ বর্ষ ১৩০ পুষ্ঠা)

লিখকের লোক যে লিপিতের উচ্চ উচ্চ সংখ্যা লিপন করিতে পারে না বা উচ্চ সংখ্যায় লিপিবান করিতে পারে না একথা সকল সময় স্বীকার করা যায় না । বর্ত্তমানকালে অসংখ্য পাঠ্যদ্রব্যের লিপিসিদ্ধান্ত দেখিলে আশ্চর্য্যবিত হইতে হয় । তাহার নিকট লোকের স্তায় এক দুই করিয়া সহস্র পৃষ্ঠায় লিপন করিয়া তাহার একটা লিপিনেত্র করিতে না পারিলেও তাহার লিখকের লিখক ইহা অসম্ভব বৃহত্তর সংখ্যায় লিপন লেখান করিতে পারে । পাঠ্যদ্রব্য লিখক হিসাবে লিপন করিয়া

বর্তমান সময় ভারতের প্রাচীন সম্পদ বলিষ্ঠ কেসকন শাস্ত্রের প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বেদ সর্বাঙ্গের প্রাচীন । রামায়ণে বেদের উল্লেখ আছে ; কিন্তু তাহা গ্রন্থরূপে পরিচিত নহে । রামায়ণে পক্ষ, সান ও যজুঃ এই তিন বেদের উল্লেখ স্পষ্ট ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় ।

হুমানের বিস্তারিত লক্ষ্য করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

নাম্বুধেদ বিনীতস্ত ন যজুর্বেদ ধারিণঃ ।

ন সানবেদ বিহবঃ শক্যঃস্বং বিস্তাষিতুম্ ॥ ২৮ ॥ কি ৩ ।

রামের এই উক্তি নধ্যে কেবল তিন বেদেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; অপর বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না ।

তবে কি রামায়ণের সময় চারি বেদ প্রচারিত হয় নাই ? বেদ কি তখনও “ত্রয়ো” নামেই পরিচিত ছিল ?

অপর বেদ যে অস্তান্ত তিন বেদ হইতে আধুনিক তাহা কতকগুলি ধর্মগ্রন্থ বিশেষভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । ভাষ্যত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও হরিবংশ—ইহাদিগের মধ্যে বেদ তিনটি । শতপথ নামক প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও যুহং আর্য্যক উপনিষদ্ প্রকৃতিতেও তিন বেদের কথাটি উল্লিখিত হইয়াছে । পুরুষ সূক্ত মধ্যেও তিন বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । ঋক্বেদের টীকার সারণ্যচর্চাও তিন বেদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । এ সকল গ্রন্থের কোনখানিই বোধ হয় অপর বেদ হইতে প্রাচীন নহে । অতএব এই পরবর্তী গ্রন্থগুলিও তৎপূর্ব্ববর্তিত গ্রন্থকে বেদের সম্মানিত পর্যায়ে স্থান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে । ইহার একমাত্র কারণ, অপর বেদ সংগৃহীত হইয়াও বচকাল পর্যন্ত অস্তান্ত বেদের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই ।

রামায়ণে অস্তান্ত বেদের সঙ্গে অপর বেদের উল্লেখ না থাকিলেও বালকাণ্ডের ১৫শ সর্গে অপর সন্ধে সামান্ত উল্লেখ দৃষ্ট হয় । বেদজ্ঞ ঋষি শ্রদ্ধাশ্রুত কিয়ৎকাল সমাধিস্থ হইয়া থাকিয়া পরে স্তোত্রঃ দশরথকে বলিলেন—

উষ্টিং তেহহং ক্রিয়াম্যসি পুত্রোহ্যং পুত্র কাশ্যং ॥

অপর নিরসি প্রোক্তম্যসিঃ সিন্ধাং বিধানতঃ ॥

যুগে যুগে সহস্র কাহনের হিসাব দিতে পাওয়া । “লিপি জ্ঞানের পূর্বে লিখিতের মধ্যে লিখিত বিস্তারিত প্রচলিত থাকে না” পণ্ডিত মহাপ্রাণ এই উক্তিও অনেক সময়েই প্রমাণ করিতেছি । যেহেতু, লিপিজ্ঞানহীন ভূতা প্রতিদিন শত পরসর হিসাব যুগে যুগে প্রবাহ করিতেছে এবং প্রত্যেক প্রবোধ দিগন্ত কিং কিং প্রচলিত করিতে পারিতেছে । এই অতীত এই উক্তি কিভাবে প্রমাণ হইতে পারে ? লিপি জ্ঞানহীন অধিবাসীরা যেভাবে অপর বেদের মত সংগৃহীত পদ্মা করিয়া যুহং হইতে যুহন্তন সংসার অধুনা জন্ম লাভ করে প্রাচীন আচার্য্যও যে সেইরূপ প্রক্রিয়ায়ই পদ্মা করিতেছেন তাহা আমরা ক্রমে আলোচন করিব ।

এই শ্লোকের অপর শব্দটির দ্বারা অপর বেনকেই নির্দেশ করিতেছে এমন বুঝা যায় না। অপর ঋষিপ্রণীত বহুকেও বুঝাইতে পারে।

কাহারও কাহারও মতে অঙ্গিরবংশীয় মহর্ষি অপরই অপর বেদের রচয়িতা। মহর্ষি অপররচিত অপরশীর্ষক শ্লোকগুলি পূর্বে “ঐরী”র অন্তর্গত ছিল; মহর্ষি রেদবাস সেগুলি ঐরী হইতে পৃথক করিয়া তাহার দ্বারা অপর বেদের ভাগ সমাধান করেন। ইহার পর অপর বেদে আরও কতকগুলি শ্লোক যোজিত হয়।

মহর্ষি বেদবাস কোন্ সময়ে অপর বেদের বিভাগকরিয়া সমাধা করেন তাহা অপর বেদের ১২ কাণ্ডের ৭২ শ্লোকে লিখিত আছে। ঐ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, “উক্ত বেদের সঙ্কলনকালে কৃত্তিকা নক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে অবস্থিত ছিল এবং অশ্বেষার শেষে কিংবা মঘা প্রথমে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল।”

এই গণনা অনুসারে দ্বিতীয় হইয়াছে যে, বর্তমান সময় হইতে ৪৩২৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৫১৪ খৃঃ পূঃ অপরবেদ রচিত হইয়াছিল।* এই রচনাকাল রামায়ণের পূর্ববর্তী না পরবর্তী?

রামায়ণের প্রথম স্তর মহর্ষি বামদেবকর্তৃক মুখে মুখে সঙ্গীতরূপে রচিত হইয়াছিল। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহু কবির বহু কল্পনা যোজিত হইয়া ইহার কলেবর বর্ধিত হইয়াছে এবং অন্তঃপর কোনও কৃতি লেখকের পরিশ্রমে ও পাণ্ডিত্যে তাহা সংগৃহীত হইয়া লিপিত ও প্রচারিত হইয়াছে। লিপিত এবং প্রচারিত হইবার পরও প্রাতি শতাব্দীতে এবং ধর্মবিপ্লবের উত্থান এবং পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ক্রটি ও ধর্মাহুঘায়ী অজ্ঞান বাবতীর ধর্মগ্রন্থের ভ্রাস ইহারও পরিবর্তন ও পরিবর্জন ক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। একদা স্থলে বর্তমান রামায়ণের কোন্ অংশ আদি কবির রচিত ও কোন্ অংশ পরবর্তী সময়ে সংযোজিত হইয়াছে তাহা সাংস করিয়া বলিতে যাওয়া নিরাপদ নহে। তথাপি রামায়ণে স্থলে স্থলে এমন কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় যাহা স্পষ্টই কোনও নির্দিষ্ট সমাজবিপ্লব বা ধর্মবিপ্লবের পর সংযোজিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণে এইরূপ প্রকিপ্ত অংশ এত অধিক প্রবেশলাভ করিয়াছে যে, তাহাতে রামায়ণের স্রষ্টার অনেক পরিমাণে ধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে অনেকেই রামায়ণকে আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

রামায়ণ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইবার পর যে সকল সাময়িক ভাব পরবর্তী

* শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে এই গণনা দ্বিতীয় করিয়াছেন। বাহার্য্য তাহার পন্থা দেখিতে ও বুঝিতে চাহেন তাহারা ‘বিষকোষে’ “অপর বেদ” শব্দ দেখুন।

লেখকগণকর্তৃক সেই গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে সনাতনের দৃষ্টিতে হীন করিয়াছে এই স্থলে সেটরূপ হই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াই মূল প্রত্যয়ের অঙ্গসংগণ করা যাউক।

(১) “অবতারবাদ” রামায়ণের একটি মারাত্মক প্রকিপ্ত বিষয়। বাস্তবিকতায় সঙ্গীতে অবতারবাদের কোনও ভাব ছিল না। তৎকালীন সনাতন অবতারবাদ-বিষয়ে ঘোর অনভিজ্ঞ ছিল। এমন কি অবতারের কথা দূরে থাকুক সেই প্রাচীন সনাতন অবতারের মূল বিষয়েই সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন দেবতাই তখন সমাজে পরিকল্পিত হয়েন নাই। পাঠক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রামায়ণের সেই আদিম স্তরটির প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার আভাস প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

রামায়ণে দেবতার সংখ্যা মাত্র তেত্রিশটি তার। আমরা রামায়ণের দেবতা সীম্বক প্রথকেই আলোচনা করিয়াছি।*

কৈকেয়ী রাজা দশরথকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিয়া দেবুর্ভাদিগকে ও ব্রহ্মদেবী, মহাত্মা এবং কমতামুক্ত পদার্থসমূহকে সাক্ষী করিতেছেন—

তচ্ছবুস্তত্র ত্রিংশদেব্যাঃ সোহু পুরোহিতাঃ ॥ ১৩

চন্দ্রাদিত্যৌ নভঃশ্বেব গ্রহস্বাত্মাহনী দিশঃ ।

ভগবত পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্ষা সরাক্ষসা ॥ ১৪

নিশাচর্যাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ ।

যানি চাক্তানি ভূতানি জানীযুর্ভাদিতং তব ॥ ১৫

সত্যসঙ্কো মহাতেজা ধর্মজ্ঞাঃ সত্যাবাক্ত চিত্তাঃ ।

বরঃ সম দদাত্যেতৎ সর্কে শূন্য দৈবতাঃ ॥ ১৬ (অঃ ১১)

“ইত্রপ্রভৃতি তেত্রিশ দেবতা (১) শ্রবণ করুন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নভোমণ্ডল, দিক্, ভগৎ, পৃথিবী, গন্ধর্ষ, রাক্ষস, নিশাচর প্রাণী, গৃহদেবতা, অস্ত্রাণ দেবতা সকলে অবগত হউন, এই সত্যসঙ্ক ধর্মজ্ঞ নহীপতি দশরথ আমাকে অভিলষিত বর প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন।”

* রামায়ণের সম্বন্ধ—সাহিত্য, —১৩১৬—ভা.৩—২২১ পৃষ্ঠা।

(১) যাদব আদিভা, একাদশ রত্ন, অষ্ট বহু ও যদ্বিনীকুমারবর এই তেত্রিশটি দেবতা। ইহার বৈদিক ও রামায়ণী বৃক্ষের দেবতা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই সনাতনের পরবর্তী। বেদে বিষ্ণু উল্লেখ আছে, কিন্তু বেদে দিক্ ব্যবহারে অপরিবেশন নহে। ঐষ্টপুত্র পঞ্চম পর্বাধ্যায়ে যাকের “নিকৃত” লিপিবদ্ধ হয়। যাকের নিকৃতও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের কোন উল্লেখ নাই। তিনি অগ্নি ইন্দ্র ও সূর্যকেই প্রধান দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

কৈকেয়ী সমাজপ্রজিষ্ঠিত দেবতাদিগকেই ভক্তিভরে মাত্র করিয়াছিলেন। কৈ, তাহাতে ত বিফুর নান নাই! রাম যে বিফুর অবতার বলিয়া রামায়ণে কল্পিত হইয়াছেন, যে ব্রহ্মা বাণীকিকে রামায়ণ লিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন ও যে শিবের ধনুর্ভঙ্গ করিয়া রাম জনকনন্দিনীর পাণিলাভ করিয়াছিলেন আমাদের বর্তমান সমাজের এই প্রসিদ্ধ দেবতায়কে কেন কৈকেয়ী পরিত্যাগ করিলেন।

(২) যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রেষ্ঠ দেবতায়ের জন্মকাল পৌরাণিক যুগে স্থাপ্য করিতে হয়, তবে ইহাদের সংস্রষ্ট যে সকল গল্প ও পুরাণ রামায়ণে স্থান পাইয়াছে তাহাদিগকে ও পরবর্তী প্রসিদ্ধ রচনা বলিয়া স্থাপ্য করিতে হইবে।

ব্যাপ্তিক রামায়ণে বর্ণিত সমুদ্রমন্থন, নন্দনভয়, রামের হরধনুভয়, পরশুরামের বিষ্ণুহবিষয়ক আখ্যানিকা বা কুরু-বিষ্ণু-বিরোধ প্রভৃতি অত্যন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবসম্বন্ধীয় গল্প বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের অভ্যুদয়কালে সেই সেই ধর্মাবলম্বী কবিদ্বারা লিখিত হইয়া রামায়ণে সংযোজিত হইয়াছে।

(৩) রামায়ণে বুদ্ধমতের উল্লেখ করিয়া সেই নতকে নাস্তিক বাধ বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। (অযোধ্যা । ১০৯) রাম জাবানির নাস্তিকতাপূর্ণ বাক্যের নিন্দা করিয়া বলিলেন—

বথাহি চৌঃ স তথাহি বুদ্ধ-
তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তদাকি যঃ শক্যতনঃ প্রজানাম্
স নাস্তিকে নাস্তিমুখে বৃধঃ ভ্রাতৃ৷৩৪

“চোর বেতুপ দণ্ডাহ বুদ্ধমতাহসারী তথাগত নাস্তিক এবং আপনিও সেইরূপ দণ্ডাহ জানিবেন। প্রজাগণের বুদ্ধিপরিতৃষ্ণির চক্র নাস্তিক ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা ভালার কঠবা। পণ্ডিত বাজি নাস্তিকের সহিত ব্যাক্যলাপও করে না।”

ভাবালিকথিত নাস্তিক্যবাদ চাপ্যকের নাস্তিক্যবাদের অনুরূপ। ইহার সহিত বৌদ্ধমতের সম্বন্ধ অতি অল্প। রামায়ণের ভায় একখানি হিন্দুর ত্রেষ্ঠ ইতিহাসে বেদবিষেবী বৌদ্ধধর্মের ৭ বুদ্ধের নিন্দা প্রচার প্রয়োজন চণ্ডয়ার বৌদ্ধ-ব্রহ্মবের অবসানে বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় কোন হিন্দু কবিকর্তৃক এই নত রামায়ণে সংযোজিত হইয়াছে। ইহা সহজেই অস্বাভাবিক করা যায়। *

(৬) রামায়ণী যুগে ভারতে বৃষ্টিপূজা প্রবর্তিত হয় নাই। রামায়ণের প্রথম ৬ কাণ্ডের কোন স্থানেই বৃষ্টিপূজার উল্লেখ নাই; কিন্তু উত্তরকাণ্ডে শিবপূজার উল্লেখ আছে। উৎসরকাণ্ডে কেবল শিবপূজা নহে বহু আধুনিক বিষয়েরও উল্লেখ

দৃষ্ট হয়। এই কাণ্ডটি যে বাস্তবিকর রানায়ণের অন্তর্গত নহে, যিনি বাস্তবিকর সঙ্গীতভাগ সংগ্রহ করিয়া রানায়ণ সর্গপ্রথন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার উক্তি-তেই তাহার আভাস পাওয়া যায়।

(৪) রানায়ণে মনুষ্যের পরমায়ুর উল্লেখহুণে সর্বত্রই সহস্র সহস্র বৎসরের উল্লেখ দেখা যায়। আদিকাণ্ডের ১৮ বর্ণে : রানায়ণের অজ্ঞাতনামা সংগ্রাহক লিখিয়াছেন—

দশবর্ষ সহস্রানি দশবর্ষ শতানিচ।

রামোত্তরায় মুপাসিতা ব্রহ্মলোকম্ প্রযাতীঃ। ৯৮

প্রথম ৪টি সর্গ পাঠ করিলেই পাঠক দেখিবেন, এই সর্গ কয়টি কোন পত্রবর্তী কবিকর্তৃক লিপিত হইয়া রানায়ণের ভূমিকাস্বরূপ তাহাতে সংযোজিত হইয়াছে। রামের বয়সের সংখ্যা দেখিয়াই ইঁহাকে পৌরাণিক কবি বুদ্ধিতে পারিবেন। এই কবি যে স্থানে সুবিধা পাইয়াছেন সেই স্থানেই এইরূপ সহস্র সহস্র সংখ্যার উল্লেখ-দ্বারা প্রকৃতবিষয়কে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। পৌরাণিক যুগের কবিদিগের রচনার ইহাও একটি পরিচয়। এইরূপ কবিদিগের প্রসাদে আমরা বঙ্গীয় পত্রিকা-র ত্রৈত্যযুগের মনুষ্যপরমায়ুর পরিমাণ “দশসহস্র বর্ষ” ও মানবদেহের পরিমাণ “চতুর্দশ হস্ত” পরিমিত জানিয়া অতিক্রান্ততা সক্ষম করি।

বাস্তবিক পক্ষে রানায়ণের আদিত্তরের রচনা হইতেও বৈদিককালের ছাত্র মনুষ্যপরমায়ুর পরিমাণ শতবর্ষই অবগত হওয়া যায়।* এতদ্ব্যতীত আদিকবির

* প্রত্যেক দশবর্ষ রাজ্যান্তিবিজ্ঞ করিবেন, এই সংবাদ মনুষ্য নিত্যজ্ঞ ভয়রূপে কৈকেয়ীকে প্রদান করিলে কৈকেয়ী বলিলেন—

সমুপাসে কথং কুন্তে ক্রতা রাষ্যতিবেচনম্। ১০

ভরতকপি রামস্ত ব্রহ্মম্ বর্ষ শতাঃ পরম্।

শিতু-পিতামহঃ রাজ্যমধ্যাপতি নগর্যঃ। ১১

স্য ত্বমুভয়ে প্রাপ্তে ভর্যমানেনং যত্নে।

ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কি দিনঃ পরিতপাসে। ১২ (অযোধ্যা ৮)।

“কুন্তে তুমি হুস্তিত কেন? ভরতও যে রামের শতবর্ষ পরে শিতু-পিতামহপদের রাজ্যপ্রাপ্ত হইবেন। তুমি কল্যাণের বিধানবরণ এই হুস্তর ব্যাপার উপস্থিত; তুমি পরিতাপ করিতেছ কেন?”

কক দেখে। বহু ব্রহ্মে এইরূপ শতবর্ষ মানবপরমায়ুর আভাস দেখিয়াছে “সেই চক্ৰবর্তন দেবপুত্রের হিতকর নির্গুন (দুর্বারওল) উদিত হইতেছেন। আমরা যেন শত শত বৎসর দেখিতে পাই। শত শত বৎসর বাঁচিয়া থাকি।”

(দশবর্ষ হস্ত—১৭ মণ্ডল—৩৬ পৃষ্ঠ—১০ কক্)

অন্ততঃ—“তবে প্রবৃত্ত হল শতবৎসরযোগী জীবনের মন্ত আমাকে রক্ষা করুন।”

(ঐ—১০২ হস্ত—শেখার্দ)

অন্ততঃ—“এইরূপ পুত্র ও পৌত্রকে আমরা শত বৎসর গোপিত করি।” ঐ

ভোকম্ পুত্রোহননঃ শতং দিব্যঃ।

(১ অষ্ট—৩০ পৃষ্ঠ—১০ কক্)

রচনার সময় ও বয়সজ্ঞাপক যে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যতাব অতিক্রম করিয়া যায় নাই। ইহা আমরা রানের বিবাহ, বনবাস, প্রাচ্যলাভ প্রভৃতির আলোচনার দেখাটয়া আসিয়াছি।

স্বামীরূপের আদি রচনা যে প্রাক্তিপুররচনার নিষ্পন্নপে স্বায় অতিক্রম হারাইতে বসিয়াছে তাহা আমরা সংক্ষেপে এইস্থানে উল্লেখ করিলাম। এই প্রাক্তিপুর আলোচনা করিতে বাইরা আমরা মূল বিবরণ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন মূল বিবরণের অবতারণা করা বাউক।

(ক্রমঃ)

শ্রীকেশরিনাথ বহুদার ।

সংক্ষম ।

(সংস্কৃত হইতে)

কি কাষ সম্পদে যেরা দান নাহি করে ?

কি কাষ সামর্থ্যে যেরা শত্রু দেখি' ডরে ?

কি কাষ বিজ্ঞার যেরা ধান্মিক না হয় ?

কি কাষ জীবনে যেরা ভিত্তিহীন নয় ?

শ্রীঅঘোরনাথ বহু কর্ণেশ্বর ।

আয়ুর্বেদের ইতিহাস।

ব্রাহ্মণযুগ।

বৈদিক যুগের কিছু পরেই ব্রাহ্মণ যুগ। অপকর্ষবেদের অধিকাংশই তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পর লিখিত হয়—প্রত্নতত্ত্ববিদগণ উচাই স্থির করিয়াছেন। আমরাও অপকর্ষবেদকে ব্রাহ্মণযুগের মধ্যে ধরিয়া লইলাম। ব্রাহ্মণযুগে বিলাসের যুগ। তখন আর্ষাগণ ঐশ্বর্যাশালী; যুদ্ধবিগ্রহ শাস্ত্র; আর্ষাগণ নিশ্চিন্ত। ঐশ্বৰ্য্যের অঙ্কে বসিয়া, অবসর হুখে—ঐভদ্রা-ভক্তের অবেষণে, তাঁহারা বহু দূর অগসর হইতে পারিরাছিলেন।

প্রজাম্পদ কৃষ্ণশাস্ত্রীর মতে—তখন অপকর্ষবেদ সংলিখিত হয়, তখন কৃত্তিক নক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে ভিল অগ্নেয়ার খেদে বা নখাল প্রদেশে জননি পড়িয়াছিল। পৃ: পু: ১৫১৬ অব্দে অপকর্ষবেদ সংগৃহীত হইয়াছিল। অনেকের মতে অপকর্ষবেদ প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের সময়ে আয়ুর্বেদের বৈশিষ্ট্য, অপকর্ষবেদের সময় আয়ুর্বেদ সুপ্রাচীন। অপকর্ষবেদ পড়িলে আয়ুর্বেদের ক্রম-বিকাশ ল্পষ্ট বৃত্তিতে পায়। আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ আয়ুর্বেদকে অপকর্ষবেদের উপাঙ্গ বলিয়াছেন। চরক, সুশ্রুত এবং ভাঃমিঃপ্রঃ একবার সমর্থন করিয়াছেন। এই জন্ত আয়ুর্বেদের আর একটি নাম ‘অপকর্ষ-সর্গর্ষ’।

আমরা এই ব্রাহ্মণযুগকে বিলাসের যুগ বলিয়াছি। ঐশ্বর্যাশালী আর্ষাগণ ব্রাহ্মণযুগে বিলাসী ও আলস্যপরায়ণ হইয়া পড়িলেন। আলস্য চিরকাগই যমের প্রধান সম্ভ। ব্রাহ্মণযুগে আমরা বাসনজাত মেহ, অকালবার্দ্ধক্য, পাণ্ডু, রাজবন্দ্য, দকোদর, দ্রীহোদর, শিথ, কুষ্ঠ, কাস, পামা, বলাস, রক্তদ্রাব, পক্ষাঘাত, কৃমি, নষ্টবীৰ্য্য, ক্ষত, চক্ষুরোগ, কেশপাত, শোথ, গণ্ডমালা, শূল, উদ্ভান, জায়ন্ত (Tumor), অপচৌ, বক্ষণীগ্র, আশ্রাব (আমাশয়) তক্ষণ (জ্বর) প্রভৃতি বহু রোগের নাম দেখিতে পাই।* বৈদিকযুগে এত রোগ ছিল না।

এই সময় দেবর্ষি নারদ, সাধারণকে বাসনের অপকর্ষিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।† কিন্তু তাঁহার উপদেশ কেহই ভুলিগ না, রোগও কমিল না। তখন পরদ্রব্য-কাতর ভরদ্বাজ ঋগর্ষ, বৃদ্ধিল, কাণ্ডপ, বৈতথ্যপ, গোতিল প্রভৃতি

* অপকর্ষবেদ, কৈশিকসূত্র, দারিদ্র ও ভেদবের টীকা দেখুন।

† ঐতরেয় ব্রাহ্মণ: ১৩।

মহর্ষিগণকে সঙ্গে লইয়া পীঠভূতের চিকিৎসা আনন্ত করিলেন । দশমূল, শণ, তিল, পুষ্টিপী, পাঠা, অপামার্গ, অৰখ, শুগুণ্ডু, যতকুমারা, কুড়, হরিদ্রা, যুগ্মহৃৎ, শলাখ, কপিথ, লাক্ষা, শলৌক, পিপ্পলী, ভরগীৰুক, অজগুন্দী, চৌপুন্ড, যুগপুন্ড, গোমূত্র, মধু, স্বর্ণ, মুক্তা, মৌসক প্রভৃতি বহুবিধ ঔষধ উপাদানস্বরূপ গৃহীত হইল ।

আর্য্যাক্ষা তখন পল্লাব হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ । ধনী তখন যান-আরোহণ শিখিয়াছেন ; গো, বৃষ, হস্তী অথ প্রভৃতি পশুরও আদর বাড়িয়াছে । প্রয়োজন বৃত্তিরা একদল “শল্য বৈত্ত” পণ্ড চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন ; আর এক দল যানারোহণে কাহারও কোন চর্চনা ঘটিলে—তাহার চিকিৎসার ক্ষমতা নিযুক্ত হইলেন । ব্রাহ্মণযুগেই কগতে প্রথম পণ্ডচিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছিল । মহর্ষি ভূপর্ণ প্রণীত ‘পশ্যাময়ালোকঃ’ নামক পণ্ডচিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থই তাহার প্রমাণ । এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় এখনও পাওয়া যায় । ইহাতে কেবলমাত্র অপরোগের চিকিৎসা আছে । অশ্বের অস্ত্র, মুখরোগ, কাস, বাত, বমন, অতিসার, তন্দ্রা, দাঁহ, চক্ষুরোগ ও কর্ণরোগের কয়েকটি সুটিষাৎ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় ।

ব্রাহ্মণযুগে আর এক শ্রেণীর অস্থচিকিৎসক ছিলেন, তাঁহারা প্রসবকালে ধনী মহিলাগণের সাহায্য করিতেন । এই যুগে অস্থচিকিৎসা ‘প্রণীত’ বসেই উন্নতি হইয়াছিল । শারীর বিস্তারও উন্নতি হইয়াছিল । ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে যজ্ঞক্ষেত্রে নিহত পশুর শারীরদেহের বিশেষ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাতে শল্য-তন্ত্র-শিক্ষার্থিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল । এই সময় ত্রণ (ক্ষত) চিকিৎসারও প্রকৃত উন্নতি হইয়াছিল ।^১ একদল “শল্যবৈত্ত” গ্রামে গ্রামে বৃত্তিরা ওষু ত্রণ চিকিৎসা করিয়া বেড়াইতেন, ক্ষতস্থানের রক্তপ্রাব নিবারণের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রয়োগ করিতেন ।^২

ব্রাহ্মণযুগেও “দৈব ব্যাপ্যস্তর” চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব ছিল । ঔষধ বাহ্যিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হইত । কোনও ঔষধ রোগীকে ধারণ করান হইত, কোনও ঔষধের ঘ্রাণ লইতে হইত, কোন কোন ঔষধ শরীরের স্থান বিশেষ দাওয়া ভাঙ্গা বা কবচের মত বাঁধিয়া দেওয়া হইত । কোন ঔষধ প্রলেপ ও সীলিতরূপে ব্যবহৃত হইত ।

১ : পতঞ্জলি ব্রাহ্মণ, ৪র্থ, ১৮৮ ।

২ : কৌশিক সূত্র ২৪, ৩ ।

রোগে শোকে নিরাশার নাশের দ্রব্য ভাদিয়া বায়ু। এই সকল মানসিক ব্যাধিরও তাঁহারা প্রত্যেক করিতে পারিতেন। অপর্যবেদন “উপচার” দেখিলে নৃষিদিগের লোকহিতৈষণা বুঝা যায়। কোথাও কোন্ গন্ধিতা কামিনী, পতির পবিত্র প্রেমকে দোষনের নর্পে উপহাস করিয়া হতভাগ্যের জীবনের এক হিরণ্ময় অধ্যায় হৃৎকের মত মনোমলিন করিয়া দিয়াছে; কোথাও ঈশ্বরের অনাদরে উপেক্ষিতা তরুণী অনভ্যাসক সুকলম প্রতি নুর্ভেদ মরণের প্রতীক্ষা করিতেছে; সেই কৃত্তবংশ-প্রমুখ উপাসকগণ, শান্তিবস্ত্রারনের সাহায্যে তাহাদের দ্বন্দ্ব দূর করিতে সচেষ্ট হইতেন। তখন একটী মাত্র প্রেমচূষনে মম্পতির বুগ-বুগাঙ্কের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যাইত; দুইটি পরস্পর বিরোধী ব্যক্তি জনের এক চিরস্থায়ী শান্তির সন্ধি স্থাপিত হইত।*

ব্রাহ্মণবৃণের বৈজ্ঞানিক রোগের লক্ষণ নিরূপণ করিতে পারিতেন। বৈদিক-যুগে ইহা ছিল না। অপর্যবেদে “তক্ষণ” নামক রোগের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোগ অত্যন্ত সাংঘাতিক। “তক্ষণের” লক্ষণের সহিত ন্যাৎলেব্রিয়া জরের লক্ষণ মিলিয়া যায়। “তক্ষণ” একপ্রকার জ্বর, এ জ্বরের লক্ষণ—পর্দায়কমে উত্তাপ ও নৈত্যবহা, জ্বর ছাড়িয়া আবার আইসে, কখন দুই দিবস, কখন তিন দিবস কখনও বা চারি দিবস অল্প অল্প প্রকাশ পায়। রোগীর মস্তকে যন্ত্রণা, ও কাস প্রভৃতি আত্মসঙ্গিক অদ্ভুত উপসর্গ থাকে। এ জ্বরের কারণ “অগ্নি” বা বিজ্ঞান, জ্বরসাং রোগীর দেহের উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যদি এ জ্বর নীচ বদ্ধ না হয়, তাহা হইলে পাণ্ডু (যক্‌ৎ বা পিত্তবিকার জনিত রক্তহীনতা) পমন (চুলকণা) এবং বলান (ক্ষয়) প্রভৃতি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে।

ব্রাহ্মণবৃণের বৈজ্ঞানিক কুষ্ঠরোগে হরিড্রা, ভূদ্রাজ, ইজ্র, বাকুণী, (রাখাল শল্য) এবং নিলীকা ব্যবহার করিতেন; উদরাময়ে মুক্ত ত্বণ, ক্ষতরোগে অরুন্ধতী লতা, তক্ষণরোগে কুড়, নেত্ররোগে সর্বপের প্রলেপ, কেশ-পাতে নিতম্বী লতা, গণ্ডমালায় গৌমূত্র, নষ্টবার্ণ্যে কপিত্ব এবং সর্পরোগে অপ্যামার্গ ব্যবহার করিতেন। পরমাণু ও বলবৃদ্ধির স্তম্ভ—মুক্তা ও বর্ণ ব্যবহৃত হইত। কৃত্তবোনিজ রোগে জড়িড বৃক্ষের ব্যবহা ছিল। অরুন্ধতী লতা, নিতম্বী লতা ও ভদ্রিড বৃক্ষ যে কি ছিল এখন তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা অসাধ্য, অপর্যবেদ ব্যতীত আর কোনও প্রায়ে এই তিনটি ঔষধের নাম পাওয়া যায় না।*

৩। ইমাম—সপত্নী বাধতে, বহা সববিস্তি পতিম্।

৪। অপর্যবেদ “কৈবল্যানি” ও “দাদুদ্যানি” বস্ত্রসমূহ দেখুন।

তখন, কেরিয় স্ট্রেপে [Hereditary diseases. Pulmonary. Consumption] মৃগশূন্য ব্যবহৃত হইত । পুরাণে লিখে—প্রথমে চক্ষের ক্ষয়রোগ হয় ; চক্ষের কলককে অনেকই “হরিণ” বলেন । চক্ষু হরিণ কোণে করিয়া বসিয়া থাকেন । ক্ষয়রোগনাশক বলিয়াই কি চক্ষু মৃগকে এত ভালবাসেন ? এই জন্তই কি চক্ষুর নাম মৃগাক ? পরবর্তী যুগেও চক্ষুর নানাত্বসারে যক্ষ্মারোগের অনেকগুলি ঔষধের “নামকরণ” হইয়াছিল । যথা—“মৃগাক বটী” “রাজ-মৃগাক” “লক্ষ্মপ্রভা ওড়িকা” “চক্ষামৃত রস” “চক্ষুকলা বটী” ইত্যাদি । মৃগ যে ক্ষয়-নাশক তাহাতে যার সন্দেহ কি ? জীবনশক্তির স্রোত হইলে—মৃগনাভির প্রসাদে কোটি কোটি নানব পুনর্জীবিত হইয়াছে ।

ব্রাহ্মণযুগে সর্পবিশেষ চিকিৎসা ছিল । অগ্ন্যবসে নানাবিধ সর্পের উল্লেখ আছে । সর্পবষ্ট ব্যক্তিকে মধুপান করান হইত । জলমিশ্রিত যব (Barley) সর্পরোগে পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইত । এই যুগে জলচিকিৎসা বা হাইড্রোপ্যাথি প্রচলিত ছিল । ঔষধরূপে “করণার জল” ও “শ্রোতের জল” ব্যবহৃত হইত ।

আজকাল যুরোপে যে Psychopathy চিকিৎসা প্রচলিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ-যুগেই এ চিকিৎসার মূত্রপাত হয় ।

ব্রাহ্মণযুগের বৈজ্ঞান, রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বস্ত্রিঘস (পিচ্কারী) এবং মূত্রবদ্ধ হইলে শলাকা প্রয়োগ করিতেন । তাহার্য বহুবোধ্যের কাপ দ্বারা রোগীকে দান করাইতেন ।

পিতৃস্নেহের সাহায্যে অম্মাদির পরিপাক হয়, এই বৈজ্ঞানিক সত্য—ব্রাহ্মণ-যুগেই আবিষ্কৃত হয় । সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্ত সম্রাটসারভেদে কর্ণের বিভাগ—এই যুগেই প্রথম ঘটে হইয়াছিল । ব্রাহ্মণযুগে “ভূত প্রেতের” প্রবল প্রতাপ, ভূতবোমির ভয়নিবারণের জন্ত কাশ্মপ ঋষি একখানি তন্ত্র লিখিয়াছিলেন । ভূতবিজ্ঞানবিদ্যক বহুগ্রন্থই এই সময় রচিত হইয়াছিল । সে সকল গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না, ডরনচাচার্যের টীকার কোন কোন গ্রন্থের তাই চারিটি নোংরা উদ্ধৃত হইয়াছে । কাশ্মপতর এখনও পাওয়া যায় ।

শ্রীব্রহ্মবল্লভ দ্বার কাব্যকণ্ঠ বিশারদ ।

“পিক্‌নিক্‌”।

ভক্তকবি কুণসীদান গাহিয়া গিয়াছেন “তখনে সব কোই হরি তত্তে স্বথমে না ভবে কোই।” স্তব্ধতা: আত্মনিক হিন্দুধর্মে অনাস্তাবান প্রোফেসর স—বাবু যে “অবিয়ান অয়ের” পক্ষপাতবাপী প্রবাস্তাফনার ভক্তিহন্যপ্রতিভে উৎকণ্ঠিতা পত্নীর স্থানীয় লাগ্নত দেবতা “চণ্ডীমাই”এর নিকট ছাগশিঙের “মানভ” সমর্থন করিবেন ইহাতে বিশ্বহের কোনই কারণ নাই। এবং ভগবদ্ভক্তি হইতে মানব-ঈশ্বরের উৎপত্তিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। স্তব্ধতা: রোগমুক্তির পর স—বাবু পরহিত-ব্রত ছাগশিঙের আয়ত্যাগের হৃদয় কেবল দেবীকেই সমর্পণ না করি। অসুগত বন্ধুজনকেও তাহার অংশ দিতে ইচ্ছুক হইলেন। হির হইল, কোন আসন্ন শুভ-দিনে স—বাবু দেবদগ্ন হইতে মুক্ত হইয়া বন্ধুবর্গকে কৃতজ্ঞতার স্বপ্নে আবদ্ধ করিবেন। কিন্তু হার “ন চ বৈবাং পরং বসং।” সে শুভদিন আর আসিল না। স—বাবুর বীথ রোগমুক্তির পর পর্যায়ক্রমে তাহার পুত্র, কন্যা, পত্নী, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, ভাগিনেরী সকলেই পীড়িত হইতে লাগিলেন। বিপন্ন স—বাবু চিকিৎসকের পরামর্শে সকলকে বায়ুপরিবর্তনের জন্ত দেওঘরে পাঠাইয়া “মেলের” বাসায় “পরবাসী” হইয়া পড়িলেন। পূর্ণাঙ্গ ভক্ত আদর্শ ছাগশিঙ অবাধে বঙ্ধিত হইতে লাগিল।

এমন সময়ে সহসা একদিন রক্তনীপ্রভাতে ছাগশিঙের অবস্থা পরিদর্শন করিতে গিয়া স—বাবু তাহার অশ্রুশ্রবণ এবং শরীরে “সুহৃতি”-সন্ধ্যার সম্ভাবনা দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি তখনই দ্রুতপদে বন্ধুবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া সকলকে এই বিপদের বার্তা জানানইলেন।

বন্ধুবৎসল চ—বাবু বন্ধুবর্গের বিপন্ন দেখিয়া প্রতাপ করিলেন যে, স—বাবুর প্রীতিভোজ “পিক্‌নিক্‌” পরিণত হউক, এবং চাপা করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা হউক। সকলেই সাগ্নাহে চ—বাবু প্রতাপ সমর্থন করিলেন। অকুল সমুদ্রে কুণ পাইয়া ছাগশিঙিত স—বাবু পরম পুলকিত হইলেন। সেই দিনই সন্ধ্যায় চা পান করিতে করিতে আহার্যের তালিকা, বন্ধুবর্গের নান, চান্দ্র পরিমাণ প্রভৃতির রীতিমত বিবরণ আবেগপূর্ণ আলোচনা এবং অগভীর গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইল। যতঃ অকণাক্রান্ত প্র—বাবু কন্ধ্যার ন—বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ আরম্ভের হস্ততন হিসাব করিয়া ফেলিলেন। কেবল বাহ্য সন্ধ্যাপেক্ষা সন্ধ্যা, অর্থাৎ দিনহির করাটি থাকি রহিল।

কিন্তু সকলেই জানেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্বীকায় প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রথম দৃষ্টিতে যে অঙ্কটিকে সর্বাঙ্গপেক্ষা সহজ ও ভদ্র বলিয়া মনে হয়, কার্য্যতঃ সেইটির সমাধানই অত্যন্ত কঠিন ও সমস্যাপেক্ষ হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল।

প্র—বাবু নরঃবল চলিয়া গেলেন, হ—বাবু “সেমন” আরক হইল, ক—বাবু কঃ-
 হুত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, জাভার বাবুর অর্জাণ অত্যন্ত চুপি পাইল, এবং ক—
 বাবু একটি দানীর আশোষণের সমাধান লইয়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন। শেষে
 এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, ৩৬৫ দিনের মধ্যে কোন দিনেই সকলের সুবিধা হওয়া
 অসম্ভব।

এমনই করিয়া দুই মাস কাটিয়া গেল। ছাত্রাণ্ডের বিপদজনক অবাধ পরিণতি
 দ্রুত করিয়া ন—বাবু নাথায় হাত দিয়া বসিলেন। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায়
 হইয়া এক দিন তিনি প্রত্যাব করিলেন যে, আর “পিক্নিকে” প্রয়োজন নাই ;
 বলিযানান্তে দেবীর প্রেরাদ তিনি বন্ধুবর্গের মধ্যে মনস্তাবে বণ্টন করিয়া দিবে।
 কথাতা কর্ম্মবীর ন—বাবুর প্রাণে লাগিল। ন—বাবু হঁকাহুতে আফাণন করিয়া
 বলিলেন, “আগামী রবিবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। রবিবার দিন যেমন করিয়া
 হউক ‘পিক্নিক’ আনি করিবই।”

শনিবার রাতিতে ন—বাবুর উৎসাহে এবং ক—বাবুর সমর্থনে পরদিন নথ্যাকে
 “পিক্নিক” দ্বির হইয়া গেল। যাহাদের সে দিন অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা
 তালিকা হইতে নির্মমভাবে তাহাদের নাম কাটিয়া বেওয়া হইল।

সন্দের ক—বাবু এই শুভকার্য্যের ক্ষত আপনার উত্থান বাটীটা বন্ধুবর্গের
 কর্ত্ত্বাধীনে সমর্পণ করিলেন। উজ্জোগপর্য্য আরক হইল। দ্বির হইল ন—বাবু
 পরদিন প্রভাতে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া কেবলেন ; এবং ভোজনবিলাসী
 বি—বাবু এ সম্বন্ধে তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন। উরাসে রপীক্স বাটী
 কিরিলেন। ছাত্রাণ্ডের চুচিহা হইতে নিরুতি পাইয়া ন—বাবু বহুদিনের পর
 প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। প্রত্যাবেই ন—বাবু এবং বি—বাবু সম্মিলিত
 হইয়া আহাৰ্য্য্য ত্রবানির সংগহ করবার কথা। কিন্তু বৈবের উপর মাস্ত্রবের হাত
 নাই। স্ততঃ্য সে দিন শব্যাত্যাগ করিতে বি—বাবুর কিছু বিলম্ব হইল। অগত্যা
 প্রাতর্জন্য শেষ করিয়া তাহার বাড়ী কিরিতে যঃষ্ট বেগা হইয়া গেল। কিরিতেই
 দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট “পর্য্যায়িক” নামের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাবের
 পারম্পর্য্য অহুসারে তাহাকে দেখিয়াই বি—বাবুর চুল ছাটিনার প্রকৃতি বলবতী
 হইয়া উঠিল। চুল ছাটিলেই স্থানের প্রয়োজন। এবং দ্বান্দ করিলেই কুণায়

উদ্রেক অবশ্যবাহী। সন্ধ্যার সময় আহার না করিলে “পিত্তপতনের” সুস্থ সম্ভাবনা। স্নাতগাং দ্রাব্যাদি হৃদয়স্থানি “পরেতা” এবং হৃৎ ছিলিন তানাক্ সেবন করিয়া বাহির হইতে বি—বাবু ১১টা বাজিয়া গেল। সহকারীহীন ন—বাবু চক্রহীন বিমানের ন্ত কাগেই অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

বেলা ১টার সময় আরোহণ সনাপ্ত হইল। মধ্যাহ্ন-আহার মধ্যাহ্ন-বিহারে পরিণত হইল। কিন্তু নির্লিকারভাবে ধূমপান করিতে করিতে করিতে বি—বাবু সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আহাশ্নেবিহারে প্রেভেন অতি অচৈ; কেবল উপসর্গের বিভিন্নতা মাত্র। আম্রকানন ভেদ করিয়া, অরহর ক্ষেত্র কম্পিত করিয়া, কটকিত গর্জর শাখার সুস্পর্শ হইতে কষ্টে অগ্রসর করিয়া “পকৌর্য্য” নহিত “এক” উদ্ভুক্ত প্রোত্তরে সবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। অপরাহ্ন দুইটার সময় ক—বাবুর উদ্ভান দৃষ্টিগোচর হইল। উল্লাসে বহুবর্গ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

রক্তনের আরোহণ আরম্ভ হইল। নানাপ্রকারের স্তম্ভোচ্চর ব্যবস্থা হইয়াছিল। মধ্যাহ্নভোজনের আশায় লুপ্তচিত শূন্তগঠর বহুগন ভবিষ্যৎ স্তম্ভের অগোচনার দ্বারাই বর্তমান অভাবের কথা জুলিয়া যাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

পাচক প্রথমেই “তরকারী” চড়াইয়া দিয়াছিল। তরকারী সিদ্ধ হইয়া আসিলে মশ্‌লার অহুসন্ধান করিতে গিয়া বেচারা সন্নিহরে দেখিল যে, মশ্‌লার কোন প্রকার ব্যবস্থাই নাই। অবগত হইয়া ধূমপান বিভোর বি—বাবু গভীর ভাবে বলিলেন “হী হী মশ্‌লাটা আনতে ভুল হ’রে গেছে বটে।” বলিয়া তিনি পুনরায় তারতুট সেবনে প্রগাঢ় নবোনিবেশ করিলেন।

বি—বাবুর আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ন—বাবু বলিলেন, “মশাই, আপনাকে দিই কি কোন কাব হবার যো নেই?” বি—বাবু অবিচলিতভাবে বলিলেন, “To err is human”। ন—বাবু আর আত্মসম্মরণ করিতে পারিলেন না। বাক্যবিতণ্ডা ক্রমশঃ বাহুবুদ্ধে পরিণত হইবার আশঙ্কা দেখিয়া ধীরবুদ্ধি ডাক্তারবাবু পাচককে বলিলেন, “আহা ততক্ষণ মাংসটা সিদ্ধ করে ফেল না। ওতে ও ত সময় লাগবে।” পাচক নীরুত হইয়া মাংসের সন্ধানে গেল। চ—বাবু “মালি”কে মশলা আনিতে পাঠাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মাংসও আনা হয় নাই! বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল। স—বাবু হতাশ হইয়া মাথার হাত দিয়া বসিলেন।

খিওসফিষ্ট ক—বাবু বলিলেন, “আহা এত ভাবচেন কেন ? প্র—বাবু ত এখনও আসেন নি, আমি ‘টেলিগ্ৰাফি’ করে দিচ্ছি, মাংস ও মণলা তাঁর সঙ্গে চলে আসবে।” কিন্তু এ কথাই কেহই কর্পাস করিলেন না। ঘোরতর বিতর্ক আরম্ভ হইল, পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, “আহা অজ্ঞান না ততক্ষণ পাক্তরাণ্ডার সমাবহার করা যাক্, তাঁর পর বিয় ৩’রে একটা বাবুয়া করে কেল্লেই হবে।” ডাক্তারবাবু স্বয়ং পপপ্রদর্শন করিলেন, তর্ক করিতে করিতে অজ্ঞাতে অপর সকলেও তাঁহার অহুসরণ করিলেন। দৃষ্টান্তের শক্তি এমনই।

কিন্তু পাক্তরা সেবেস্তর পরেও সমস্তার কোনই মনোংসা হইল না। ন—বাবু ক্রোধে মুহূর্হ ধ্বংস করিতে লাগিলেন; বি—বাবু চ—বাবুর সঙ্গে “বিত্তি” খেলিতে বসিলেন এবং ডাক্তারবাবু অগ্র সকলকে নিকটে ডাকিয়া কোন খাত্ত কিরূপে রন্ধন করিলে স্থপাচ্য ও স্ববাহ হইতে পারে গম্ভীর ভাবে তাহারই আলোচনার প্রবৃত্ত হইলেন।

পাচক হত্যার হইয়া কেবল জন সিদ্ধ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে সত্যই প্র—বাবু উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মাংস ও মণলা। উন্নাসে সফণে চোৎকার করিয়া উঠিলেন। বিব্রয়োংসাহে ক—বাবু বলিলেন, “কেমন ? ‘টেলিগ্ৰাফি’ মানেন কি না ?” বলিয়াই ঘড়ি ধরিয়া তাঁহার চিত্তার সময় এবং প্র—বাবুর গৃহপরিভ্রাণের সময়ের হুস্ত ভুলনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

প্র—বাবু সকলের বুদ্ধিবৃত্তিকে যথাসাধ্য বিকার দিয়া মাংসাদি পাচককে দিয়া আদিলেন। অচিরে স্বখাত্তের জরজ্বিতে সমস্ত উত্তান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স—বাবু ও ন—বাবু ক্ষুধারক্তির উদ্বেগে নিকটবর্ত্তী অরণ্যক্ষেত্রে স্থবিল বাবুর অশ্বেষণে ধাবমান হইলেন।

এ দিকে অলক্ষিতে আকাশ ধীরে ধীরে নেবাজ্জর হইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যার পূর্বে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। নেবাজ্জর দ্বিতরঙ্গনীর সন্ধ্যা অতি সহর উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে চারি দিক ঘনাক্ষারে আবৃত হইয়া গেল। মধ্যাহ্নভোজনের আরোহনে আলোকের ব্যবস্থা ছিল ন।। শীতার্ঠ বহুবর্গ অন্ধকারে অলস্ত চুলীকে বেটন করিয়া বসিলেন। কেবল খিওসফিষ্ট ক—বাবু দূরে সন্ধ্যা-ধানে নিমগ্ন হইলেন।

ধানাও উদ্বিগ্ন-চিত্তে সকলকে একান্তে ডাকিয়া তিনি দীর্ঘ দীর্ঘে বলিলেন,

“বেথ, আরেকের গতিক ভাল নয়। এখানে কোন প্রেতবোনির বাস আছে। রাত্রিতে এখানে আহারের আয়োজন করা ভাল হয় নি।”

নিবারণের প্রেতকে অবাধে উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে, বিশেষতঃ মেঘ ও বর্ষার দিনে কথাটা কিছু গুরুতর হইয়া উঠে। হুতরাং মুখে পরিহাস করিলেও সকলেরই জনস্বভাবী অজ্ঞাতে যেন একটু কঁপিয়া উঠিল। যখন স্বপ্নন সন্ধ্যা হল তখন চারিদিক “হুতিভেদ” অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত; টিপিটিপি গুটি পড়িতেছে; থাকিয়া থাকিয়া মৃত গৃহ মেঘগর্জনের সঙ্গে ভূবার শীতল আর্দ্র-বাণু ছফা করিয়া উঠিতেছে।

অন্ধকারেই “পাতা” হইল। অনেক চেষ্টার একখণ্ড কাঠকে মশালে পরিণত করিয়া মধ্যস্থলে রাখা হইল। ভোজন আরম্ভ হইল।

প্রথমেই তরকারী ও পণ্য পড়িল। পোলাও মুখে দিয়া ন—বাবু বলিলেন, “আরে ছায়া চানগুলো অর্ধেক কাটা রংয়ে গেছে! নূন হোকগে নাংসটা বের কর।”

পাচক আসিয়া পাত্রে মাংস দিয়া গেল। মাংস মুখে নিয়াই ক—বাবু মুপ-মগল ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। ভীতিকাম্পিত কর্তে ক—বাবু বলিলেন, “ভাট বা ভর ক’রেছিলুম তাই! একবারে tasteless, কে যেন টিপিয়ে সব রসটুকু ভবে নিয়েছে!” ওনিয়া সকলেরই বক্ষ হৃদয় উত্ত করিয়া কঁপিয়া উঠিল।

ন—বাবু পাচকে বলিলেন, “ঠাকুর একবার আলোটা দেখাও ত।” কি আশ্চর্য! আলোকের সাহায্যে সকলেই হুস্পষ্ট দেখিলেন, সমস্ত মাংসই যেন চর্কিতাবশেষ! কপিভবকে সকলেই নীরবে পরস্পরের দৃষ্টাবলোকন করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সহসা বিহ্বলের হীক দীপ্ত মৈশ অন্ধকার ছিদ্র ভিন্ন করিয়া কাদবিনীতকে ঝলদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ বাবু আসিয়া ফৌজ আলোকটিকেও নির্দোষিত করিয়া দিল। সেই নিবিড় অন্ধকারে অহুমানসিক হুত্রে কে বলিল, “সেলান বাবু লোগ।”

বাকুদের স্তূপে যেন অগ্নিস্থলির পড়িল। “ওরে বাবারে” বলিয়া যে যে দিকে পারিল আশ্রয়ণে ছুটিয়া পলাইল! হতবৃত্তি পাচকও মাংসের কটাহ মাটিতে ফেলিয়া বাবুদের অহসরণ করিল। কেবল বীরবৃত্তি ডাক্তার বাবু এই দারুণ ভূর্যোগেও মস্তক স্থির রাখিয়া উৎপ “চপে” পকেট দুইটি পূর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে নিকটবর্তী দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইতিপূর্বেই তিনি একবার ভ্রমণে বাহির হইয়া দোকানদারের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন।

প্র—বাবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, “আহা এমন টুপিও দেখি নি” বলিতে বলিতে অজ্ঞাতে অগ্রগামীদেরই অহুসরণ করিলেন ।

অন্ধকারে পথ হারাইয়া, সমস্ত রাত্রি গুটীতে ভিড়িয়া, দিক্‌বান্ত্র, কর্দনাক্ত-দেহে সকলে গৃহে ফিরিলেন ।

ডাক্তারবাবু রাত্রিতে দোকানেই রহিয়া গিয়াছিলেন । প্রাতঃকালে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার বাহার অহুসাসিক শব্দে ধাবমান হইয়াছিলেন, সে ব্যক্তি সেই গ্রামের চৌকিদার ; সংবাদ পাঠিয়া সে বাবুদের “সন্ধান দিতে” আসিয়াছিল । তাঁহারের পন্থায়নে চতুর্কি হইয়া সে গিয়া গ্রামে সংবাদ দিলে গ্রামের সমুদায় ভট্ট ছেলে সমবেত হইয়া আচাৰ্য্য সানিয়া সবুই বাগীতে লইয়া গিয়াছে !

তিনিয়া সকলেই লজ্জার অধোবন হইলেন এবং সকলে মিলিয়া ক—বাবুকে আক্রমণ করিলেন । ক—বাবু বলিলেন, “কিন্তু নাংসের ব্যাপারটা ?” সকলে বলিলেন “নাংস ত আমরা মুখেই দিই নি ।” ক—বাবু বলিলেন “পেটা কি আমার বোধ ?” সংবাদ লইয়া জানা গেল, আহাণ্ডের সঙ্গে রক্তন্যাস্ত্রগুলিও অশুভত চটরাছে ! পাত্রগুলি অপরের, স্তত্রাং চাচার টাকা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল । ন—বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ; বি—বাবু “পাওরাটা নাঠে মাগা গেল” বলিয়া কোডে ব্রিগমান হইলেন এবং ভ্যোতিব শাস্ত্রজ্ঞ স—বাবু ভ্যোতিবমতে তাঁহার সে সমস্তটা কিরূপ বাইতেছে তাহারই গবেষণায় মনোনিবেশ করিলেন ।

ঐযতীজ্ঞানোহন গুপ্ত ।

কালী পোদ্দার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কেবলরান পোদ্দার নামক একজন সুবর্ণবিগ্গ ব্যবসায়বাণিজ্যের সুবিধার আশায় নৈপট্যিক ব্যবস্থান বন্ধনান পরিত্যাগ করিয়া বশোহরের নিকটবর্তী বগড়রে আটলেন। কেবলরানের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কিন্তু ব্যবসায়শুধি যথেষ্ট ছিল। হুতরাং অতি অন্নদিনের মধ্যেই তিনি ব্যবসায়ের উন্নতিলাভ করিয়া ধনশালী হইয়া উঠিলেন। কেবলরান অর্থলাভ করিয়া কলীদারী ক্রয় করিতে বাগ্য হইলেন।

এই সময় মনশালা বনোবস্তের কালে অনেক প্রাচীন কলীদারের কলীদারী বিক্রয় হইতে থাকে। কেবলরান এই সুযোগে চাঁচড়ার রানাদিগের সম্পত্তি হইতে ইলকপুর ও ইগাবপুর প্রভৃতি কয়েকটি পরগনার কতকাংশ ক্রয় করিলেন। কালীপ্রসাদ এই কেবলরানেরই পুত্র।

গুরুপ্রসন্ন নামে কালীপ্রসাদের এক সহোদর ছিলেন। হুতরাং কেবলরানের মৃত্যুর পর কালীপ্রসাদ অর্দ্ধাংশে সানাত্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সানাত্ত সম্পত্তির আয় হইতে যে বহুব্যয়সাধ্য সাধারণ-হিতকর কার্য করিয়াছিলেন, প্রকৃত সম্পত্তিশালীর পক্ষেও তাহা করিতে পারিলে স্নাত্তার বিষয় হইত।

কালীপ্রসাদের সর্বপ্রধান কীর্তি উহার নিম্নিত বগড়র হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সুপ্রশস্ত গ্রামবন্দ। ইহা “কালীপোদ্দারের রাস্তা” নামেই পরিচিত। তদা যার, এক সময়ে কালীপ্রসাদের বৃদ্ধা মাতা গঙ্গাবানে গাইতে অভিনাবিণী হইয়া পুত্র কালীপ্রসাদকে সে অভিনায় জ্ঞাপন করেন। পুত্র মাতার জন্ত পাল্কী বেহারা ও লোকজনের বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে সে সংবাদ দিলেন। পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা একটু হাসিয়া বলিলেন—“কালী, আমার বাইবার জন্ত ত পাল্কীর বন্দোবস্ত করিলে, কিন্তু আমার পাড়াপ্রতিবেশী গরীব-জম্বীর বাইবার কি বন্দোবস্ত করিয়াছে? তাহারা যে আমার সঙ্গে গঙ্গাবানে বাইবে বলিয়া আশা করিয়া আছে। তাহাণিগকে সঙ্গে করিয়া না লইয়া যাইতে পারিলে আমার ত মানের কঁস হইবে না!” পুত্র লোকজন বন্দোবস্ত করিয়া রাস্তার কার্য আরম্ভ করাইয়া দিলেন। কালীপ্রসাদের অহুষ্ঠিত স্নাত্তা নির্দ্বাণ শেষ হইলে পুত্রগোরবে গোরবাষিতা জননী সেই রাস্তা দিয়া পাড়াপ্রতিবেশী গরীবজম্বীদিগকে সঙ্গে লইয়া মহানন্দে গঙ্গাবান করিয়া আসিলেন।

-এই গ্রন্থা ব্যতীত 'কালীপ্রসাদ আরও বহু সাধারণহিতকর কার্য করিয়াছিলেন । এ স্থলে আমরা তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি--১। চন্দ্রনাথ পর্বতে উত্তীয়ার সোপান ২। অষ্ঠারনালা বাটের মন্দিরসম্মুখস্থ ইষ্টকনির্মিত নাটমন্দির ৩। মণেশ্বরী দেবীর মন্দিরসম্মুখস্থ ইষ্টকনির্মিত নাটমন্দির ৪। দাইতলা খালের উপরিস্থিত ইষ্টকসেতু ৫। নীলগঞ্জের নিম্নস্থ দৈত্যন নদের উপরিস্থিত ইষ্টকসেতু ৬। নীলগঞ্জের ধর্মশালা ৭। চুড়ামণি-কাটি ইষ্টক প্রাচীর পর্যাপ্ত বিস্তৃত দিশ মাইলবাণী রাসবন্ধ ৮। বিকার-গাছার নিকট কংপাংক নদের উপরিস্থিত লৌহসেতু ৯। বাদবপুত্রের নিকট বেতনা নদীর ইষ্টকসেতু ১০। কাশ্যপুরের ইষ্টকসেতু ১১। নার-ডাঙ্গা হরিদাসপুরের ইষ্টকসেতু ।

ইহার মধ্যে কয়েকটি কার্যের সাময়িক সংস্থারব্যয়নির্বাহক কালীপ্রসাদ বার্ষিক তিন শতাধিক হুদ্রা আয়ের হুদ্রীসম্পত্তি গভর্নমেন্টের হস্তে প্রদান করেন ।

তখন উদায়দয় নিষ্ঠার ওয়ালটাং এন্স, সিটন-কার একাধারে বশোহরের জজ ও কালেক্টর । তিনি গভর্নমেন্টকে কালীপ্রসাদের এই সদহুতানগুলির কথা লিখিয়া জানাইলে গভর্নমেন্ট একজোড়া শাল-একটি ছোকা এবং সোণার জরি ও মুদ্রাখচিত একটি নিরপেক্ষ খিলাতসহ কালীপ্রসাদকে 'রায়' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত ও অভিনন্দিত করিবার জন্ত মিটার সিটন-কারকে অনুমতি করেন । কালীপ্রসাদকে এই খিলাত ও উপাধি প্রদান উপলক্ষে মিটার সিটন-কার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ বশোহরে এক দরবারের অনুষ্ঠান করেন । এই দরবারে সিটন-কারের পর তত্ত্বলোকদিগের প্রতিনিধিরা রায় লোকনাথ বহু ও নীলমাধব ঘোষ কালীপ্রসাদের শুণকীর্তন করিয়াছিলেন ।

কালীপ্রসাদ সেই স্থগেই বশোহর গভর্নমেন্ট স্থলে ৪০০ টাকা, দাতব্য হাস-পাতালে ১০০ ও দরবার উপলক্ষে সমবেত দরিদ্রদিগকে ৩০০ টাকা বিতরণ করিয়া খীর স্বভাবসিদ্ধ বদ্যাক্তার পরিচর দিয়াছিলেন ।

কালীপ্রসাদ চলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তাহার জনহিতকর পুণ্যকার্যাবলী আজিও তাহার কীর্তিকাহিনী ঘোষিত করিতেছে ।

ঐঅখিনীকুমার সৈন ।

সমালোচনা।

সঙ্গীত-চন্দ্রিকা। ৫৫

অধুনা শিক্ষিত সঙ্গীতজ্ঞদিগের মধ্যে সঙ্গীতসম্বন্ধে স্বরলিপিগ্রন্থপ্রচারের চেষ্টা হইয়াছে, ইহা স্পষ্টের বিষয় সংকল্প নাই। স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও মহারাজা সার সৌদামিনীমোহন ঠাকুর এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক। ইহারা ‘সঙ্গীত-সার’ ‘কণ্ঠকৌমুদী’ ও ‘বঙ্গকেন্দ্রদীপিকা’ এই তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সঙ্গীত শিক্ষার্থিগণের এক বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন। এই সঙ্গে অপর একখানি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেখানি স্বর্গীয় কলকণন মুখোপাধ্যায়ের ‘সঙ্গীত-সার’। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্রকণ উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর হইল নাড়াডোলাধিপতির সঙ্গীতচর্চায় শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সঙ্গীতমঞ্জরী’ নামক কণ্ঠসঙ্গীতের এক স্বরলিপিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সঙ্গীত-জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্দ্ধমানাধিপতির সঙ্গীতচর্চায় শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচ্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাও কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরলিপিগ্রন্থ।

এতদ্ব্যতীত নিরক্ষর ‘বাগোয়াং’দিগের মধ্যে একটা অল্প বিবাস আছে যে, সঙ্গীত জিনিষটা লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য নহে। সুতরাং কোন স্বরলিপি পুস্তকের প্রচার দেখিলে তাহার্য্য অগ্রেই নাসিকাকুঞ্জন করিয়া থাকেন। তাহারদের মতে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইলে ওস্তাদের মুখাপেক্ষী হইতেই হইবে। শুক্লময় ঘোষা নিষিদ্ধা শিখিতে নাই, সেইরূপ সঙ্গীতও লিপিবদ্ধ করিয়া শিখিলে চলিবে না; লিপিবদ্ধ করিলে সঙ্গীতের গৌরব নষ্ট হইবে। এই বিশ্বাস একান্ত ভ্রান্ত।

মোটামুটি সঙ্গীত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা কণ্ঠসঙ্গীত ও বঙ্গ-সঙ্গীত। এতদ্ব্যতীত মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতই প্রাধান্য। ইহার কারণ এই যে, কণ্ঠোদ্ধৃত ধ্বনির মধ্যে ততটা বৈচিত্র্য পরিগম্য নহে, যথোদ্ধৃত ধ্বনির মধ্যে ততটা হয় না। যথেষ্ট স্বাধীনভাবে সঙ্গীত হইলেও উহার প্রধান উদ্দেশ্য কণ্ঠসঙ্গীতের সহায়তা করা। সুতরাং কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরলিপিসম্বন্ধে আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

ধ্বনির বৈচিত্র্যই সঙ্গীতের প্রাণ। সঙ্গীত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনিকে সমন্বয়িত করিয়া কৌশলে সাজান হইয়াছে। ধ্বনির

* শ্রীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ৩১ ও ৩২ নং সোব, তার ট্রাফিক কলোন লেনে প্রিন্টেড শ্যাম ধার প্রিন্ট ও প্রকাশিত। মূল ২/৩ টাকা।

প্রকারভেদ ও সময়ের বিভাগ এই দুইটিকে সঙ্গীতের অস্থিগর্ভ বলা যায়তে পারে। সঙ্গীতের কার্যকার ঐ উপাদান হইতে সঙ্গীতের মূর্তি খাড়া করেন। সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিতে হইলে উহার উপাদান দুইটিকে অগ্রে লিপিবদ্ধ করিতে পারা আবশ্যক।

গানের মধ্যে যে প্রকার সময়বিভাগ থাকে তাহা লিপিবদ্ধ করা ততদূর কঠিন নহে। ইহার কারণ, গানে একটা ছন্দ থাকে, সঙ্গীতের ভাবায় তাহাকে ভাল করে। এই ছন্দ গানের মধ্যস্থিত ধ্বনিগুলির স্থিতিকাল একরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে, কোন একটা স্থিতিকালকে নির্দিষ্ট করিলে অপরগুলিকে তাহার অংশ বা গুণিতক হিসাবে প্রকাশ করিতে পারা যায়।

ধ্বনির প্রকারভেদ কিরূপে লিপিবদ্ধ হইতে পারে এক্ষণে তাহাটী দেখা যাক। কণ্ঠোদৃত ধ্বনির তিনটি বিশেষ্য আছে। উহা স্বর হইতে পারে কিম্বা ব্যঞ্জন হইতে পারে। যদি স্বর হয়, তবে ‘অ’, ‘ই’ ‘উ’ প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরের কোন একটা হইবে। যদি ব্যঞ্জন হয় তবে ‘ক’ ‘চ’ ‘ত’ ‘প’ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যঞ্জনের কোন একটা হইবে। এই গেল প্রথম বিশেষ্য। এই বিশেষ্য অবলম্বন করিয়া আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির নৈমিত্ত্য ব্যক্ত করিয়া থাকি। ধ্বনির দ্বিতীয় বিশেষ্য এই যে, উহা প্রবল ভাবে কিম্বা মৃদু ভাবে উচ্চারিত হইতে পারে। দূরে অবস্থিত কোন ব্যক্তিকে ডাকিবার সময় আনুষ্ঠানিক প্রবল ভাবে ধ্বনি উচ্চারণ করি; কিন্তু নিকটবর্ত্ত কোন ব্যক্তির সহিত কথোপকথনের সময় ধ্বনি অপেক্ষাকৃত মৃদু করিয়া লই। ধ্বনির তৃতীয় বিশেষ্য এই যে, উহার গুণন (pitch) উচ্চ হইতে পারে কিম্বা নিম্ন হইতে পারে। উচ্চ বলিতে চড়া স্বর এবং নিম্ন বলিতে খাদ স্বর। এই চড়া খাদের আবার নানাবিধ স্বর হইতে পারে। ধ্বনির এই বিশেষ্যের প্রধান ব্যবহার সঙ্গীতে।

ধ্বনির স্বরব্যঞ্জন হিসাবে প্রকারভেদের সাক্ষাতিক চিত্র বহনিত হইতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং সঙ্গীতের সহলিপিকরণে উহার কত আর নূতন চিত্রের প্রয়োজন নাই।

মৃদুপ্রবল হিসাবে ধ্বনির যে প্রকারভেদ হইতে পারে হিন্দুসঙ্গীতে তাহার জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। সেটা হিন্দুসঙ্গীতের পক্ষে মর্যাদাপূর্ণক নহে। গীতের মধ্যে উপযুক্ত স্থানে ধ্বনি মৃদু বা প্রবল করিতে পারিলে উহার যে সৌন্দর্য বাড়ি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে দুই শারি কথা পরে বলিব।

ধ্বনির গুণন হিসাবে যে প্রকারভেদ তাহার স্তম্ভ সাক্ষাতিক চিত্রের উদ্ভাবন করা যাইতে পারে কি না দেখা যাক।

পৃথক্ পৃথক্ ওজনের ধ্বনিকে পৃথক্ পৃথক্ হ্রস্ব বলা যায়। সঙ্গীতে যে, হ্রস্ব-
গুলি লাগে তাহাদের ওজনের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকে। সে সম্বন্ধ তত জটিল
নহে। সঙ্গীতের প্রাতিমধুরত অনেকাংশে এই সঙ্গের উপর নির্ভর করে।
হিন্দুসঙ্গীতে ব্যবহৃত হ্রস্বসকলকে ওজনের নিম্নোক্ততা অনুসারে সাজাইয়া বরগ্রাম
রচিত হইয়াছে। ঐ বরগ্রাম এরূপ সম্পূর্ণ যে, উহার মধ্যস্থিত হ্রস্ব ভিন্ন অল্প হ্রস্ব
সঙ্গীতে লাগাইলে ক্রতিকটুদোষ ঘটে। সঙ্গীতশাস্ত্রে বরগ্রামের হ্রস্বগুলিকে 'বড়্জ',
'শবড', 'গাকার' প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।* এখন ইহাদের জ্ঞাত সাংকেতিক
চিহ্নের উদ্ভাবন করিলেই সঙ্গীতের বরলিপির ব্যবহার উপকরণ সংগ্রহ করা হইল।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাক্যের দ্বারা সঙ্গীতও লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য।
পার্থক্য এই যে, সঙ্গীতের বরলিপিতে হ্রস্বের বিভিন্নতা প্রকাশ করিতে হয়,
বাক্যের বরলিপিতে তাহার প্রয়োজন হয় না।

কোন বিভা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিলে তাহা হইতে দুইটি ফলের আশা
করা যায়। প্রথমতঃ, সেই বিভা অবিকৃত অবস্থায় বজায় থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ,
জ্ঞাতের উহার শিক্ষাবিত্তার হইবে। সমালোচনা গ্রন্থপানির দ্বারা এই দ্বিবিধ ফল-
লাভেরই আশা করা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থে যে সকল ওস্তাদী গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিই
ঐকদাঙ্গ, অধিকাংশ মিঞা তানসেন ও বৈজুবাওয়া এই দুই গ্রেট্ গায়কের
রচিত। তাহারা যে ভাবে গাহিয়াছিলেন গীতগুলি ঠিক সেই ভাবে বজায় আছে
কি না তাহা এক্ষণে জানিবার কোন উপায় নাই। বরলিপি প্রচলিত না থাকায়
তাহারা বিভিন্ন ওস্তাদের মুখে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকিতে পারে।
আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা দ্বীর ওস্তাদের নিকট সেগুলি যে ভাবে শিখিয়াছেন,
অবশ্য সেই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আকবর বাদশাহের সময় হইতে ওস্তাদের
মুখে ফিরিয়া গীতগুলির যে কিছুই রূপান্তর ঘটে নাই, এরূপ বলা কঠিন।
তবে এ কথা ঠিক যে, এখনও তাহাদের যে রূপ আছে, লিপিবদ্ধ না হইলে তাহাও
ক্রমশঃ লোপ পাইত; এবং কালে ঐ সকল গীতের কি দূর্গতি হইত তাহা তাবি-
বার বিবরণ। গ্রন্থকর্তা তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দুসঙ্গীতের কত
উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমের।

পক্ষান্তরে গ্রন্থখানিকে প্রথম শিক্ষার্থিগণের সম্পূর্ণ উপযোগী করা হইয়াছে।

নিবাসবস্ত্রস্বাক্ষরঃ বড়জমদানীধরভট্টাঃ।

পক্ষান্তরেও সঙ্গীত শাস্ত্রী কণ্ঠধ্বনিঃ শব্দঃ।

টহা হইতে কেহ না মনে করেন যে, সঙ্গীতে একেবারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বিনা সাহায্যে ইহা আরম্ভ করিতে পারিবেন। বাহার অক্ষর-পরিচয় হয় নাই এমন বাণকণ্ঠ নিকট যদি একখানা বর্ষপরিচয় পুস্তক ফেলিয়া দেওয়া যায়, সে যেমন শুধু 'অ' 'আ' 'ই' প্রভৃতি চিহ্ন দেখিয়া কিছুই করিবার উঠিতে পারে না, তেমনই যে ব্যক্তির স্বরগ্রামসাধনা হয় নাই, সে যে শুধু 'সা' 'গা' 'পা' প্রভৃতি চিহ্ন দেখিয়া গান শিক্ষা করিতে পারিবে তাগ আশা করা যায় না। প্রথম প্রণালীগুলি গুরুর সাহায্যে স্নোতিমত অভ্যাস করিয়া যদি কেহ এই পুস্তক হইতে গান শিক্ষা করিবার প্রেরণা পাবেন তিন সফল হইবেন বনি ; আমাদেয় বিশ্বাস। স্বরলিপি দেখিয়া গান শিক্ষা প্রথম প্রথম কিছু কঠিন বলিয়া বোধ হইতে পারে। সেটা সফল ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। স্নোতিমত অক্ষর পরিচয় হইবার পরেও একটানা পড়িয়া যাওয়া প্রথম প্রথম কঠিন বোধ হয়। কিন্তু পড়িতে পড়িতে এমন অভ্যাস হইয়া যায় যে, অক্ষর দেখিয়া ভাবিবার আবশ্যক হয় না ; দৃষ্টি ও আনুভূতির মধ্যে যে সন্ধিভেদ একটা ক্রিয়া হইয়া যায় সেটা ধরিতেই পারা যায় না। সেই-রূপ স্বরলিপি অভ্যাস হইয়া গেলে তদুপরি গান-সাধনা অতি সহজ ব্যাপার হইবার পড়ে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রথমে বিস্তারিত স্বরসাধনপ্রণালী, পরে কয়েকটি রাগিনীর 'সংগম', তদনন্তর কতকগুলি সহজ গানের স্বরলিপি এইরূপে সিঁড়ী-প্রস্তুত করিয়া প্রথম শিক্ষার্থীর শিক্ষার পথ যথেষ্ট সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে বিশেষ পাতিথোরও পরিচয় পাওয়া যায়। যে স্থানে কাব্যশাস্ত্রের ছন্দের সহিত সঙ্গীতের তালের ঐক্য সমাধান করা হইয়াছে সে স্থানটি অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। তত্ত্বমধ্যা ছন্দের সহিত স্বর কাক্ষ্য তালের তুলনা করা হইয়াছে। ছন্দোমঞ্জরী তত্ত্বমধ্যার এই প্রকার লক্ষণ দিয়াছেন—

মৃতিমূর্ত্তশব্দো রত্নভূতরূপা ।

অন্তাং মম চিত্তে নিত্যং তত্ত্বমধ্যা ।

যেওচিহ্নের দ্বারা স্থিতিকাল জ্ঞাপন করিলে উক্ত ছন্দের ইঙ্গ-দীর্ঘর এইরূপে ঘোষণা যায় :—

মৃ ॥ ঠি ॥ মৃ ॥ র ॥ শ ॥ জো ॥ ॥ র ॥ ভা ॥ কু ॥ ত ॥ ক ॥ পা ॥

তল্লম্ব স্বরকাক্ষ্য তালের বোল এইরূপ :—

বেনে ॥ গ ॥ দি ॥ বেনে ॥ নাব্ ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে তদ্রূপ। ছন্দের প্রত্যেক চরণে ত্রয়ফল। তাহার দুই কেবলতা আছে।

স্বরলিপিকরণ স্বর্গীর ক্ষেত্রনোহন গোদ্বাদীর প্রাবর্তিত সাক্ষতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। নিজের খেয়ালমত নূতন সাক্ষতিক চিহ্ন প্রবর্তন করা অপেক্ষা প্রচলিত চিহ্ন ব্যবহার করা যে সর্বতোভাবে সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকের হয় ত বলিবেন, প্রচলিত সাক্ষতিক চিহ্ন নানাপ্রকার ক্রটি আছে। তাহা স্বীকার করিলেও প্রচলিত চিহ্ন ছাড়িয়া নূতন চিহ্ন ব্যবহার করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালা অক্ষরের অনেক ক্রটি আছে এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ বর্ধমান অবস্থার বাঙ্গালা অক্ষরকে তাদ্রিগা চূরিয়া নূতন করিয়া গড়িবার পরামর্শ দেন, তবে তাহার পরামর্শ সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।

কেহ কেহ বলেন, ইংরাজী নোটেশন ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলে স্বরলিপি সকল জাতিরই পক্ষে সহজবোধ্য হইবে। এ দেশে একলিপি-বিশ্বাসের যে চেঁচা হইয়াছে তাহার ফলাফল না দেখিয়া এ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা যায় না। বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশের প্রচলিত সঙ্কেত ব্যবহার করাই ভাল।

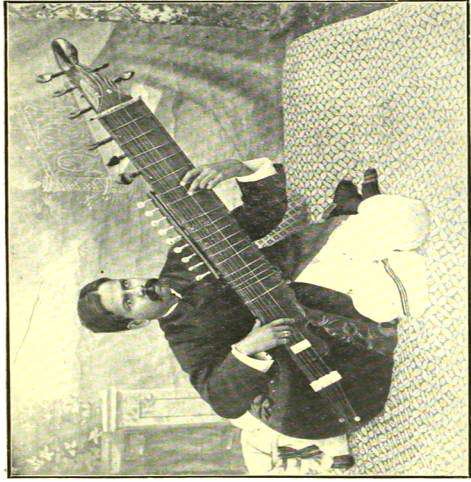
একটা কথা বলিয়া এই সমালোচনা শেষ করিব। পুঙ্কেই বলিয়াছি, একদেকীর সঙ্গীতে ধ্বনির উত্থানপতনের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয় না। কলে বাঁড়ায় এই যে, সঙ্গীতের রসস্বষ্টিকমতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। এইজন্য বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অপরে উহা সমাক উপভোগ করিতে পারেন না। বিশেষজ্ঞেরও যে উপভোগ সে কতকটা বোধাত্মক : সম্পূর্ণ অহুতবাত্মক নহে। কিন্তু সঙ্গীতের দ্বারা পূর্ণমাত্রার রসস্বষ্টি হইলে তাহা সকলেরই উপভোগের বিষয় হইবার কথা। সঙ্গীতবিৎসগ যদি এ বিষয়ে ঐদগীক পরিহার করেন, তাহা হইলে বোধ হয় সাধারণো সঙ্গীতের আদর অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। বর্তমান সময়ে গুস্তাভী গানের নাম শুনিলেই সঙ্গীতানিভিজ লোকের নিম্নাবেষ হয়। তাহার কতকটা কারণ যে, উহার রস-স্বষ্টিকমতার অভাব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধ্বনি উপযুক্ত স্থানে প্রবল বা নূত না হইলে শুধু রাগিণী ও ছন্দের গুণে প্রোত্ক্ষন্যে আঘাত করিতে পারে না। একটানা বহুতা শুনিতে যেমন শ্রোতার ভাল লাগে না ; একটানা গান শুনিতেও তেমনই বিরক্তি জন্মে। ধ্বনির উত্থান ও পতনে সঙ্গীতের যে মৌলিকতা বদ্ধি হয়, তাহা উৎসাহনীয় নহে।

স্বরলিপিকারগণ যদি ধ্বনির উত্থানপতনের সম্বন্ধে কিছু উদ্ভাবিত করিয়া
স্বরলিপি-গ্রন্থে উহা সন্নিবিষ্ট করেন তবে তদ্বারা শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকার হয় ।
শিক্ষার্থী শিক্ষা করা গান গাহিয়া যদি না রমাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার
উন্নতভঙ্গ হয় । শিক্ষানবীসের অদৃষ্টে সঙ্গীতানুভূতি শ্রোতাটিকে অধিক ছুটিয়া
থাকে । অপর তাহাদের মনোরঞ্জন করাই সকাপেক্ষা করিল । শিক্ষার্থীর গান
সুসঙ্গতভাষনশব্দে হয় ত নির্দোষ, কিন্তু তথাপি তাঁহার গানে রসসৃষ্টি না হওয়ার
সাধারণ শ্রোতার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না । শিক্ষার ঈদৃশ ফল দেখিয়া শিক্ষার্থীর
আগ্রহ কমিয়া যায় । হয় ত তাঁহার শিক্ষা এই স্থানেই সাফ হয় । ধ্বনির উত্থান-
পতনের দ্বারা ইহার আংশিক প্রতিবিধান চটিলেও তাহাট বঞ্চেই বলিয়া গণ্য করা
যাইতে পারে ।

'সঙ্গীতচম্পিকার' গ্রন্থকর্তা ভবিষ্যতে যদি এট বিবরণটি লক্ষ্য করিয়া স্বরলিপি
গ্রন্থত করেন তাহা হইলে তাঁহার স্বরলিপি সর্বদাঙ্গসুন্দর হইবে । আমরা তাহার
গ্রন্থের প্রথম ভাগ দেখিয়া সম্পূর্ণ প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং তাঁহাকে অগ্ররের
সহিত মন্তব্য প্রদান করিতেছি । আশা করি, গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধে প্রকাশিত
হইতে দেখিব ।

শ্রীমানকীনাথ গুপ্ত ।

আয়্যাবত্ত,—



শ্রীগোপেশ্বর বন্দে।।পাথায়।

যুরোপ-ভ্রমণ ।

ব্রসেল্‌স্ ।

নগর হইতে অনেক পথে ব্রসেল্‌সে যাওয়া যায় । তবে ডোভার পর্যন্ত ট্রেনে যাইয়া তাহার পর Royal Belgian Mail Packetএ অষ্টেও পর্যন্ত এবং অষ্টেও চটতে ব্রসেল্‌স্‌ রেলের ষাটবার পপট সন্নিপেক্ষা অল্প দূর । মেল বোটগুলি খুব ছোট চোট ; ডোভার-ক্যানের মধ্যে যেরূপ জাহাজ চলে সেই প্রকার । সমুদ্র শাখা থাকিলে ২০ ঘণ্টা, ৩ ঘণ্টার ডোভার হইতে অষ্টেও পৌঁছান যায় । আমি যে দিন যাই সে দিন সমুদ্র বড় সুবিধামত ছিলেন না । আকাশ মেঘাবৃত, সমুদ্র কিঞ্চিৎ তরঙ্গারিত, কাষেই ছোট জাহাজ বেশ বৃত্তা আরম্ভ করিলেন । প্রথমে বেশ আনন্দ বোধ চটতেছিল ; অর্ধঘণ্টা পরে যখন আহাভ্যাসবশে নিম্নে যাইলাম, তখনও বেশ । কিন্তু কিছু আহারের পরেই একটা মাংসের ডিসে অতি ভয়ানক দুর্গন্ধ পাইলাম । প্রথমে নম্র হটল বুঝি মাংস পচা ; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলাম, রোগ পাতে নহে, পানকে : আনাকে সূত্র পীড়ার পরিণামে । মনটা বড় খারাপ হইল । দ্রুতর আরও সাগর প্রভৃতি অবলীলাক্রমে কাটাটয়া শেষে কিনা ক্ষুদ্র North Seaতে বিপাকে পড়িলাম ! বাহা হউক, কিঞ্চিৎ উপদীপন করিয়া দেহ অনেকটা সুস্থ হইল । অষ্টেও পৌঁছিতে ৮টি ঘণ্টা লাগিল । কপালের ভাগ, কে খণ্ডাইবে ? সমুদ্রের ধারেই রেল ষ্টেশন । প্রথমে নানমাত্র কাঠক পয়সা করিয়া রেল উঠিতে দিল । দুই ঘণ্টা পরে সন্ধ্যার পর ৬টার সময় ব্রসেল্‌স্‌ সেন্ট্রাল ষ্টেশনে পৌঁছিলাম । অক্টোবরের শেষ, প্রায় ৩০টার সূর্যাস্ত হয় ; কাছেই ৬টা বেশ রাত্রি, তরুণর অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল । হোটেলে পৌঁছিয়া হাত মুখ ধুইয়া আহার-কক্ষে যাইলাম । গিয়া দেখি, হোটেলে বাজীর সংখ্যা অনেক । ব্রসেল্‌সে তখন প্রদর্শনী চলিতেছে । যদিও প্রদর্শনীর প্রায় শেষ তথাপি অনেক লোক তখনও আসিতেছেন । টেবলে যুরোপের অনেকদেশবাসী লোকই দেখিলাম । এদিয়ার প্রতিভা আমি ও একজন জাপানী যুবক । জাপানী-টির সহিত সামান্য পরিচয় হটল । তিনি বলিলেন, আগামী বর্ষে তাঁহার ভারতবর্ষ দেখিবার অভিলাষ আছে ।

আহারের পর, হোটেল আঁপিব হইতে একজন “সোপো” সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম । রাত্রিতে ঘণ্টা দুই ঘোরা গেল, বিশেষ ভাল লাগিল না । তখন অনেক জারগাই বন্ধ এবং বৃষ্টি তখনও চলিতেছে । যে স্থান অধিগম্যে

ডাক্তার হইয়াছিল দেখিলাম, সে স্থলে লজাপাতা দিয়া সব ঢাকিয়া দিয়াছে । প্রদর্শনীর স্থান পূর্ব প্রকাণ্ড বলিয়াই বোধ হইল । ট্রামে হোটেল ফ্রিলাম । সহরের যেটুকু দেখিলাম, অনেকটা প্যারিসের ভায় তুলোভন এবং প্যারিসেরই ভায় পাল্পদিল মনে হইল ।

সকালে কত কোম্পানির প্রেরিত গাড়ি ও পরিদর্শক আসিল । তাহার সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিলাম, ব্রসেল্‌সের রাস্তা অতি চমৎকার । অনেকগুলি রাস্তা পূর্ব চওড়া । প্রথম দুই ধারে কুটপাথ, তাহার পর দুই ধারে গাড়ির রাস্তা, তাহার পর দুই ধারে দুই গালি করিয়া চম্পশোভিত প্রকাণ্ড avenue সমুজ্জ্বল কুটপাথ এবং সর্বমধ্যে পুনরায় চওড়া গাড়ির রাস্তা । এত প্রশস্ত রাস্তা ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে দেখি নাই । এতপ রাস্তা ব্রসেল্‌সে ও এটওয়ার্পে অনেকগুলি আছে । ব্রসেল্‌সের এইরূপ একটি রাস্তা ২৫০ মাইল লম্বা, তাহারই শেষ সীমায় প্রদর্শনী ছিল ।

বলা উচিত, বেলজিয়ম পূর্ব সমতল দেশ । তবে ব্রসেল্‌স্ (দেশীয় ভাষায় ব্রুজেল) পার্শ্বতা বটে । সহরের সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে রাজবাটীর নিকটে বিচারালয় (Palais du Justice) । যুরোপে এত বড় বিচারগৃহ আর নাই । দেশটি পূর্ব ছোট, তাই হাইকোর্টটি যুরোপে বৃহত্তম ! প্রবেশ-পথের নিকটে সিঁড়ির দুই ধারে দুইটি প্রকাণ্ড মূর্তি, একটি ডিনস্‌পিনিসের, আর একটি কাহার মনে নাই । সন্মুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মূর্তি কি মন্দের ?” তিনি বলিলেন, “সে আমাদের পত্নী দেশ, প্রভুর মূর্তি কোথায় পাইব ?” বিচারালয় দেখিয়া ত দেশ কি চমৎকার বলিয়া বোধ হইল না । যে স্থানে (কক্ষ বলিতে ভয় হয়) ব্যবহারতীর্থিগণ মোরাকেলের সহিত দেখা সাফল্য করেন সেটি ত আর আমাদের কলিকাতা হাইকোর্টের Quadrangle এর ভায় প্রশস্ত বলিয়া মনে হইল । অনেক ব্যারিষ্টার দেখিলাম, গাউনে ফার্ (ur) লাগান । বোধ হয় তাহারা অপেক্ষাকৃত বড়দের—King’s Counsel ভাটীর । দুই একজন বিচারপতি দেখিলাম, মাথায় ছোট ছোট টুপি পরিয়া বিচারাসনে বসিয়া আছেন । ভাষা অজ্ঞাত পাকাতো অবগত নোকর্দমা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ।

আনার বাসস্থানের নিকটেই ব্রসেল্‌সের টাউনহল বা Hotel de Ville অবস্থিত । চকবিলান প্রকাণ্ড বাড়ী ; ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত । সমুখে বাগান উঠান ; তথায় শাক সব্জি প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে । এই বাটীতে স্থানিসিপাল আধিপসি অবস্থিত ।

ব্রসেল্‌সের জাণনাগ গ্যালারিতে অনেক ভাল ভাল চিত্র আছে। তবে ভান-ডাইক (Van Dyck) চিত্রিত ছবিটাই কিছু অদ্বিতীয়। তার এক ভয়ংকর চিত্রশালা আছে, Weirtz নামক একজন চিত্রকর নিজের অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র মৃত্যুর পর সাধারণকে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই বাড়িতে সেগুলি রক্ষিত। চিত্রগুলি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। পাপের, রোগের ও মানসিক বিকারের চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি নাকি কাহাকেও এ সব চিত্র দেখান নাই। শোকটির নিকম ও শিরবক্ষতা অন্তর্ধারণ, কিন্তু কি জন্য যে তিনি এ সব ভয়ানক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বলা কঠিন। এক কোণে একটি কুকুর বন্ধ রাখিয়াছে; প্রথম দৃষ্টিতে ননে হয় এমনই কংড়াইবে, ভাগ করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, জীবন্ত নহে, অঙ্কিত। একটা প্রকাণ্ড চিত্র আছে, মৃত্যুর পর প্যাপীর শাতি। সে চিত্র দেখিলে অনেক দিন হুনিয়া হওয়া কঠিন।

বৈকালে পুনরায় প্রদর্শনী দেখিতে গেলান। অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার। ভিন্ন ভিন্ন দেশের দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত। প্রত্যেক গৃহ বা কোর্ট দেখিতে একাধিক সপ্তাহ লাগে। বহুবিভাগে দাঁড়িয়া ভাবিলাম, একটা কোনরূপ যন্ত্র বিশেষ করিয়া বেশি। কিন্তু সম্ভব হইল না;—প্রত্যেক প্রকারের অনেকগুলি যন্ত্র বর্ণনান। বিশেষতঃ লোকের সাহায্য ব্যতীত কিছুই দূর করা যায় না।

প্রদর্শনীস্থান হইতে সেতুপারার পাঠকের সুপরিচিত আর্ডেন কানন (Forest of Ardennes) নয়নখোচের হয়।

অতি সঙ্গর্পণে বলিতে হয়, ব্রসেল্‌সবাদিনাদিগের সুখ কননারতা ও কৌনগতা বড় কম দেখিলাম।

র্যান্টওয়ার্প।

র্যান্টওয়ার্প (বেশীর ভাষায় র্যান্ডার্স) ইউরোপের বিতীর্ষ বৃহৎ বন্দর। শুনিলাম যে, ক্রমশঃ একটি বন্দর ইহার অপেক্ষা বড়। নানাদেশীয় বৃহৎ বৃহৎ জাহাজে বন্দর পরিপূর্ণ। ইউরোপের প্রায় সকল দেশের ও আমেরিকার পোত তথায় রাখিয়াছে। এই স্থানেও ব্রসেল্‌সের মত অনেকগুলি অতি প্রশস্ত রাস্তা বেধা যায়। একটি খুব বড় পার্ক আছে; তাহার মধ্যে একটি হ্রদে একটি ভাসমান উদ্যান। এই পার্ক র্যান্টওয়ার্পবাসীর স্বাম্য স্থান। ইহার নিকটস্থ রাস্তায় একটি ভদ্রশোক কয়েকটি বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন, প্রত্যেকটি ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্থাপত্যাদর্শে নির্মিত, মোটের উপর দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে।

রান্টওয়ার্পে কুবেনস্ (Rubens) এর অভ্যন্তর প্রভাব। কুবেন্সের মর্ম্মর মূর্তি ও বিখ্যাত কণ্ঠকার চিত্রকর কুইন্টিন ম্যাট্‌সিস্ (Kuintin Matsys) এর মর্ম্মর মূর্তি আছে। ক্লাসনান গ্যালারিতে অতি সুন্দর চিত্র ও মর্ম্মর মূর্তির সমাবেশ, অধিকাংশই কুবেনস্ ও তাহার ছাত্রের তান ডাইক্ ও জর্ডানের (Jordannes) অঙ্কিত।

এ হানের কেপিড্রাল বা গির্জা অতি প্রসিদ্ধ। তথায় টিটিয়ানের (Titian) অঙ্কিত কয়েকটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে, কুবেন্সের চিত্রের ত কপাই নাই। তন্মধ্যে তথায় একটি আশ্চর্য্য বস্তু আছে। অলটারের (Altar) ঠিক পশ্চাতে তিনটি চিত্র আছে। দেরিগে মনে হয় যেন মর্ম্মর মূর্তি (Sculpture in relief) কিন্তু হাতে দিলে বুঝা যায়, Black and white painting মাত্র। আবার সরিষা দাড়াইলে মনে করা যায় না যে, মর্ম্মরগঠিত নহে। কেপিড্রালের Stained glass windowsগুলিও বড় চমৎকার; অতি সুন্দর চিত্রে পরিণোভিত।

কেপিড্রাল ভিন্ন সেণ্টপলের গির্জা নামধের একটি ভগ্ননাগরের সরিষাকটে Calvary বা শ্রমণ চিত্রিত আছে। তথায় মর্ম্মরে একটি পরিত্যক্ত শ্রমণ গঠিত ও নরকের দুঃখ প্রদর্শিত। স্থানটি বিভীষিকাময়।

এম্‌স্টারডাম ।

রান্টওয়ার্প হইতে হগাণ্ডের রাজধানী এম্‌স্টারডামে আসিতে পথের শোভা অতি মনোহর। বেগজিরনে রেলের দুই ধারে জল ও ঘন বন। রোসেনডাল নামক ষ্টেশনে Customs পরীক্ষা হয় ও ঘড়ি কুড়ি মিনিট বাড়াইয়া লইতে হয়। ইহাই হগাণ্ডের প্রথম ষ্টেশন। তাহার পর দুই ধারে কেবল জল ও জলাভূমি। জলের মধ্যে কাঠের বড় বড় ভাঁড়ি কেলিয়া মাটি চাপা দিয়া তাহার উপর রেল বসান। আনি যে গাড়িতে ছিলাম, তাহাতে দুইটি ইংরাজ ছিলেন। ইংরাজ পিতাপুত্র—পিতার বয়ঃক্রম ৯০, পুত্রের ৪০। পিতা বোধ হয় ইংলণ্ডের বাহিরে গুব কনই আসিয়াছেন। তিনি বিদেশে সবই অপছন্দ করিতেছিলেন। পথে কোনও ষ্টেশনে চা পাওয়া গেল না; বৃদ্ধ বড়ই বিরক্ত হইলেন। পুত্রের পিতৃ-ভক্তি অনন্তস্থগত; তিনি পিতার সুখস্বাস্থ্যের জন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিলাম।

এম্‌স্টারডাম সনত্ত সহরটাই জলের উপর অবস্থিত। বড় বড় গাছের ডাল সোজা জলের মধ্যে প্রোথিত করিয়া পার্শ্বস্থ স্থান ইট চূণ দিয়া ভরাট করিয়া দেই স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৌধ নিশ্চিত। এমন কি রাজবাড়ীও এইরূপ। রাণী

এ স্থানে খুব কমই বাস করেন। কিন্তু আবাসভবনটি খুব কমকালে; মন্দিরের অত্যন্ত ছড়াছড়ি। প্রায় সকল কক্ষেই মন্দিরের উপর স্থানীয় কারুকার্য (frieze) ১৬৪২ খ্রষ্টাব্দে এই প্রাঙ্গণ নির্মিত হয়। তলহৃৎকারগুণি এককাল পড়ে নাই কেন, বুঝিতে পারিলাম না। রাস্তাটির একপাশে একটি Square এর মত। সেই দিকে একটি Balcony বা বারান্দা। সেই স্থান হইতে রানী (বা রাণী) প্রভাদের দর্শন দেন।

এম্‌ষ্টারডামে অনেক খাল; তবে রাস্তাও আছে, কিন্তু অপ্রশস্ত, আবাদের দেশের গ্রাম্য রাস্তার মত। কায়েই ছই খার দিয়া গাড়ি চলিতে দেয় না; কোনও রাস্তায় হয় ত উত্তর হইতে দক্ষিণে গাড়ি যাইতে পার না, সব শকটই উত্তরগামী। এইজন্য অতি নিকটস্থ স্থানেও যানারোহণে যাটতে হইলে অনেক সময় লাগে। ট্রেন হইতে আমি' বে হোটেলে উঠিয়াছিলাম তথায় বাইতে বস মিনিট লাগিয়াছিল, কিন্তু আসিবার দিন হোটেলে হইতে ট্রেনে আসিতে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা লাগিল। তবে বলা উচিত যে, সহরের এক অংশ বেশ প্রশস্ত রাস্তায় সুশোভিত। যুরোপের মধ্যে এক হলাণ্ডে তামাকের গুহ নাই, কায়েই চুকট অত্যন্ত সস্তা ও ভাল। Halland Havannas এর নাম সকল ধূমপায়ীর জাগেন।

এম্‌ষ্টারডাম যুরোপের সর্কাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন সহর বলিয়া খ্যাত। বাস্তবিকই সহরটি অতি পরিষ্কার। অত্যন্ত দরিদ্র পরীতেও ময়লা বা আবর্জনা দেখা যায় না। অনেক ভাষাগার জনের মধ্যে pinelogs পুঁতিয়া reclaim করা হইতেছে দেখিলাম। দৃষ্ট বড়ই কৌতুকাবহ।

এম্‌ষ্টারডামে আমার যে প্রদর্শক জুটিয়াছিলেন তিনি অনেকদিন ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সাধারণ লোক বিমল করে না যে, ভারতবর্ষে ব্যাঘ্র সর্প ভিন্ন সভ্য মনুষ্যের বসবাস আছে। বেচারি রাত্রিতে জানালা বন্ধ করিয়া শুইতে পারেন না ও ঘরে আগ্নেয় সহ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার বদেববাসীরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করে।

এম্‌ষ্টারডামে একটি প্রকাণ্ড ম্যাজিরম আছে। তথায় হলাণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদিগের পরিচ্ছন্ন সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীর মুক্তি গতি করিয়া পরাইয়া রাখিয়াছে। দেখিতে বড় চমৎকার। ভিত্তির চিত্র, মন্দির মূর্তি, অস্ত্রশস্ত্র, বস্ত্র প্রভৃতি অনেক রকম। চিত্র অধিকাংশই রেমব্রান্ট বা তাঁহার উপাসকগণের অঙ্কিত। Holland seems to be as much under the spell of Rembrandt as Antwerp is of Rubens and Brussels of Van Dyck.

‘এম্‌ট্যারডান যদিও নামে রাষ্ট্রদূত, রাজকীয় সমস্ত অফিস ও জাতীয় সভার অধিবেশনস্থান হাগে (La Haeg বা Hague)। রাণীও অধিকাংশ সময় এম্‌ট্যারডানে বাস করেন না ।

কলোন ।

ওডিকলোনের (Eau-de-Cologne) কুপার আশ্রয় দেশস্থ কলোনের নাম আমাদের দেশে সুপরিচিত ।

এম্‌ট্যারডান হইতে কলোন আসিতে পথে ক্রানেনবুর্গ নামক স্থানে জম্মাদির অরিন্দ্র । এই স্থানেই Customs পরীক্ষা হয় ও যদি ৪০ মিনিট বাড়িয়াই লইতে হয় ।

তিনিরাছি, কলোন অতি সুন্দর নগর । কিন্তু বিধি বান ; আমি বতকণ তথায় ছিলাম, ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়ার আমার নিকট কলোন মোটেই ভাল লাগে নাই, তন্ত্রির ভারতবর্ষ ভ্যাগের পর প্রথমে কলোনে মণার উপস্থানে রাষ্ট্রিতে নিব্বার ব্যাঘাত হইয়াছিল ।

কলোনের ক্যাথিড্রাল খুব প্রসিদ্ধ । ইহা আরম্ভতনে অতি বৃহৎ ; এতন্ত্রির আর বড় কিছু দেখিলাম না । অবশ্য অন্ধিত গবাক (illuminated windows) অনেকগুলি আছে ; কিন্তু তাহাও পুথ ভাগ বোধ হইল না ।

ওগানহফ ও রিকার্ট নামীয় দুইটি তন্ত্রলোকের প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ ম্যাজিয়ন আছে । বাহিরে তাঁহাদের মর্ধরম্ভি সন্নিবেশিত, ভিতরে অবশ্য অনেক চিত্র । কিন্তু আমার নিকট প্রায় ছবিই অতি সাধারণ বলিয়া মনে হইল । কেবল জম্মাদির রাণী লুইস্ এবং ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথ মেত্রী কুইন অব-ফর্টসের বখাভা দন্তথত করিতেছেন এই দুইটি চিত্র বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, বিশেষতঃ দ্বিতীয়টি । এলিজাবেথের মুখে একাধারে হর্ষ, সাক্ষ্য ও লোকদেখান বিবাদের ভাব অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত । চিত্রকরের নাম মনে নাই । কিন্তু তিনি যে কৃতী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

কলোনের Town Hallএর যে ঘরে চারি শত বর্ষ পূর্বে Hansa League সম্পাদিত হইয়াছিল, সেই কক্ষে এখন ম্যানিসিপ্যালিটির অধিবেশন হয় । দেওরালে শুণ্ড niches আছে । তাহার ভিতর স্বর্ণরোপা নিশ্চিত casket প্রকৃতি বহিয়াছে । রক্ষী বাহির করিয়া দেখাইল ।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু ।

সংগ্রহ।

তাজমহল।

আশ্রয় তাজমহল কে প্রস্তুত করিবার, তাহা গঠন অনেক আলোচনা ও ব্যবস্থা চলিতেছে। কেহ বলেন, অনেক কঠোর কর্তৃক তাজ নির্মিত হইয়াছিল; কেহ বলেন ইটালী দেশীয় একজন কারিকর উহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। সংগ্রহি নিতাই নেটল্ কলেক্টর নামক এক ব্যক্তি এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিয়াছেন। আশ্রয় নিজে তাহার মৰ্মাহ্বায় প্রদান করিয়ায়।

উক্ত লেখক লিখিয়াছেন, বাল্যকালে আমি শুনিয়াছিলাম, অষ্ট্রিয় অক বোর্দি নামক জনৈক কঠোর তাজমহল নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাজমহলের গঠন তাহারই কল্পনাপ্রসূত। তাজমহলের বিভিন্ন মত।

নির্ণায়কঃ শেখ হুসৈন, পাচে ইনি অষ্ট্রিয় কোথাও এইরূপ স্থান স্থাপত্য কার্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেন, সেইরূপ বাংলা ইঁহার কল্পনাপ্রসূত কাটয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাতে ইনি যথেষ্ট সজ্জার কাহ্ন হুসৈন বজ্জনে বাস করিতে পারেন, তাহার অষ্ট্রিয় ইঁহারে প্রস্তুত বনয়ন করিয়াছিলেন। ইনি সেই অষ্ট্রিয় ইঁহারে বজ্জনে হুসৈন বজ্জনে জীবন যাত্রা নির্মাণ করেন,—তাঁহার পায় আমি পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম এবং লোক হুসৈন তামিা ছিলাম যে, তাজমহলের গঠন, কল্পনা, দ্বিগুণেবিনো ভেদেবিনো নামক জনৈক ইটালী বালীর অষ্ট্রিয় প্রসূত; কিন্তু সংগ্রহি আমি লিখিয়াছি যে, এ কথা সত্য নহে, আমার জ্ঞান অনেকই ইঁহার লিখিয়াছেন। উল্লিখিত কঠোর সাজাহানের দ্বিগুণ সজ্জাহানের নির্মাণার্থ নিম্নুক্ত হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি তাজমহলে গঠন কল্পনা করিয়াছিলেন, অথবা তাহাতে মৰ্ম্ম প্রস্তুতবিনো কার্য সম্বন্ধে করিয়াছিলেন, ইঁহার কোন প্রমাণই নাই। তাঁহার গঠন সম্পূর্ণ পারদিক স্থপতি শিল্পের অনুরূপ। তিনি যদি উহার নির্মাণকার্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবস্থাব্যবস্থা বর্ণিবার, উল্লেখ এবং টাকারনিয়ম তাঁহারিগের লিপিত প্রস্তুত তাহার উল্লেখ করিতেন বিনোবতঃ টাকারনিয়ম অনুরূপ বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লিপিত বিবরণে ঐ কথার উল্লেখ থাকিত। আনন্দিক বিকটো প্রসূত পুস্তকীয় পুরোহিতপণের কথার উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করিতে হয় যে, তেরোনিয়ো নামক জনৈক ইটালী বালী তাঁহার গঠন কল্পনা করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি যোগল সম্রাটের কর্মচারী ছিলেন, ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে ইঁহার বৃত্তাঃ হয়; আসরার প্রাচীন সোভাননে ইঁহার সমাধি এখনও বিস্তারিত আছে। প্রসূত পণ্ডে বহুস্থ ইঁহার একেও নামক জনৈক ব্যক্তি তাজমহলের গঠন কল্পনা করিয়াছিলেন। একেও তুর্ক বা পাশ্চাত্য জাতীয়। ইঁহার ব্যবস্থাব্যবস্থা এখনও আশ্রয় হইয়াছেন। তাজমহল ভিত্তি হইতে নির্মাণ পৰ্যন্ত সাজাহানের শিল্পের স্থপতি শিল্পের সম্পূর্ণ অনুরূপ, ইঁহারে ভিত্তিদিয়া স্থপতি শিল্পের প্রত্যয়ে কিছুই নাই।

ইঁহার পর উক্ত লেখক লিখিয়াছেন যে, এংরেজি ভিত্তিগণপদার্থগতঃ দুইজন এবং সত্যাহ মহল নামে দুইজন সম্রাটবিনো একই ব্যক্তি মনে করিয়া বিবরণ দান করিয়া দেন। দুইজন

পারিলেনে জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমে সর্দারদের লাসক সের আকপানের সহিত বিবাহিত।

মুরমহল।

হয়েন। এই সের আকপান সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে জাহাঙ্গীর মুরমহলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং যে কোন উপায়ে ইঁহাকে বিবাহ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। সের আকপানের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে মুরমহল জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লাহোরে সাদ্রিগো সাহাবার নামক ছান্দে মুরমহলের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

মৃত্যুমহল সম্পূর্ণ বহর খাতি। তাম্রমহল ইঁহাঃই সমাধিস্থল। তিনি মুরমহলের স্ত্রী আকপান কস্তা। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বয়স যখন ১৯ বৎসর, সেই সময় দুবরান খানের

মৃত্যুমহল

সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। দুবরান খান সাজাহান নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাজাহান মৃত্যুমহলকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মৃত্যুমহল মৃত্যুর পর সাজাহান ১৭ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষ দশায় আশ্রয় চুগে, তিনি তাহার কস্তা জাহানারার সহিত ৮ বৎসর কাল বন্দী অবস্থায় অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ দুইবৎসর কাল পাঠ করিলে কনক কবীরসে সিক্ত হইয়া উঠে। মৃত্যুর ছাত্রা যখন তাঁহার সেহে বন্দীভূত হইয়া পড়িতেছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আদর্শ একবার উঠাইয়া যাও। শব্দের উপর যখন তাঁহাকে উঠাইয়া বসান হইল, তখন তিনি কারাগারের দ্বারক দিয়া খীরসাহিবী য়ুনায় প্রশান্ত জনগণের পরপারে তাম্রমহলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। ঐ তাম্রমহল তাঁহার প্রাণেক্ষোভিপি গীরনী মহিষীর সমাধিস্থল। তাম্রমহলের উপর যেমন তাঁহার সত্যক দৃষ্টি পড়িল, এমনই তাঁহার শব্দেই মধ্যাহ্ন উপরে পুটাইয়া পড়িল।

কেহ কেহ বলেন, বেরির বেরন নামক জনৈক পণ্ডিতীয় ব্রাহ্মী আকবরের অন্ততম মহিষী

বেরির বেরন

ছিলেন। লোক বলেন, এই উক্তি সত্য নহে। এই উক্তি সত্য হইলে আকবরের চরিত্রলেখক বখাউনি বা আবুলকলম তাঁহার উল্লেখ করিতেন। বেরির বেরন নামী আকবরের জনৈক হিন্দু মহিষী ছিলেন, ইনি জাহাঙ্গীরের স্ত্রী। সেকেন্দার ইঁহার সহঃরাজ্ঞী বর্তমান। সেই সমাধিস্থলের নিশানটিকিণের অর্থাৎ আগ্রের দাপাখান্দা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ,—



କାବ୍ୟର ଉପାଦାନ ।

শৈল-স্মৃতি ।

শিলিগুড়ি হইতে উষার আলোকে হ্রস্ব মেঘের মত নগাবিরাজ বিম্বা-
লয়কে প্রথম দেখিলাম । প্রভাত-বায়ু তখন রেলপথের উত্তরদিকে তৃণ-
চ্ছন্ন ধরণীর স্তূপ দেখে কোমল করপন্ন বুলাইয়া ফিরিতেছিল । প্রকৃতির
শান্তিরসাম্পদ তপোবনের বধ্যা যেন একটি ধ্যানমগ্ন ঋষির প্রশান্ত মুষ্টি-
খানি নিঃশব্দে নয়নের সম্মুখে কুটিয়া উঠিল ।

পূর্বতের বড়টুকু দেখিতে পাইলাম, দার্জিলিং সহরটি তাহার উপরে
হইলেই বগেটে বিশ্বরের বিষয় মনে করিতাম ; কিন্তু তুনিলাম, গিরিশ্রেণীর
প্রকাশমান অংশ উচ্চতার কিছুই নহে—সূর্যের পর সূর্য অতিক্রম করিয়া
বেষলোকের বহু উর্দ্ধে আমাদিগকে উঠিতে হইবে । ক্ষুদ্র, ট্রেনখানি
সম্মুখে বাষ্পোৎসর্গ করিতে করিতে ছুটিল । অনতিবিলম্বেই ভয়াইএর
নিবিড় জঙ্গল চারিদিক হইতে আমাদিগকে চাপিয়া ধরিল । ক্রমোন্নত
পাহাড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতার বড় বড় গাছ একেবারে ঠেলিয়া আকাশে
উঠিয়াছে । কিন্তু যহতের সহিত বলপরাঙ্কার ক্ষুদ্রের বীৰ্য্য কতকগুলি ক্রিকেটে
পারে ?—ট্রেন খানিকটা উঠিয়া একটা খোলা জায়গার আসিলে দেখিলাম,
সেই পগনম্পর্শী বিটপিশ্রেণী লজ্জার স্তম্ভল দেহ সজ্জিত করিয়া পাহাড়ের
পায়ে বিশিয়া গিয়াছে । কোথাও কোথাও পান্ডী পশুচাত্তে হটিতে হটিতে
উপরে উঠিতে থাকে । এ স্থানগুলির নাম “রিভার্স” (reverse) । পর
তুনিলাম, যে স্থানে প্রথম “রিভার্স” সেই অবধি রেল আনিয়া এন্ডিনিয়ার
দেখিলেন, পাহাড়ের অবস্থা বেক্রপ তাহাতে আর অগ্রসর হইবার উপায়
নাই । এ সমস্যার কোন সমাধান করিতে না পারিয়া তিনি বিম্বভাবে
গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় পত্নী তাঁহাকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা
করিলেন । ব্যাপার তুনিয়া হুঃখিত হইয়া পত্নী বলিলেন, “then better
retreat,” “আর যখন আশা নাই, ফিরিয়া চল ।” এই retreat হইতে
reverse এর কৌশল বিজ্ঞাতের মত পতির মতকৈ বেশিরা গেল ।

আমরা বিমানচারী বিহগের স্তায় উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম ।
চারিদিকে প্রতি বৃহত্তে যে দৃশ্য দেখিতেছিলাম, তাহার প্রত্যেক লংগের

যা সৌন্দর্য্য বোধ করি খুব অধিক হইবে না, কিন্তু ঘোড়ের উপর একটি বস্ত্রবাহ্যের সৃষ্টি হইতেছিল। সুপুটে মেঘের লোমের মত পাহাড়ের স্থানে স্থানে চাদের স্বপ্নান ; চা-গাছগুলি ভরে ভরে বহু নিম্নে নামিয়া পিরাছে, শরৎকালে হৃৎকল কারখানার বাঁড়ীটি অতি ছোট দেখাটতেছে। কোথাও নিম্ন দ্বিধীর কুলুকুছু ধ্বনি, কোথাও জলপ্রপাতের চৈতরব নিনাদ। শৈলদেহে কত অপরিচিত তরুলতার শব্দাবেশ, কত বিচিত্র কুসুমের শোভা, কত সুচিকণ “ফার্ণে”র প্রকুম কাঙ্ক্ষি, কত বিশাল বনস্পতির পতীর গাভীর্য্য। সুদূর উপত্যকা হইতে গুল লঘু মেঘ উঠিতেছে, তাহাদের নিম্নে নিবিড় ছায়া, উপরে উজ্জল রোত্র।

ট্রেণ কাশ্মিরাংএর নিকটে আসিল। প্রয়াসগামী বহুর বিদায় অভি-
নন্দনের অল্প সমতলভূমি শেষবার গিরিশূলে আসিয়া দাঁড়াইল। বনপল্লবিত
তরুশ্রেণী দুর্লভবনতঃ বৃক্ষশিখর মত দেখাটতেছে, তাহাদের অন্তরালে রঞ্জ-
যেধাবৎ বজ্রস্রতি নদী ; তটভূমি বালুকাবর।

ক্রম বেগে উপরে উঠিতেছি। পদন্তলে মেঘ, মাথার উপর মেঘ,—
চারিদিকে সমস্ত বর্ষার জলধোংসব চলিতেছে। পথের ধারে কাঠের রেলিং
দৈল দিয়া পাহাড়ী রমনী রেলগাড়ী দেখিতেছে। তাহার পৃষ্ঠের উপর
ত্রিভুজের মত বাঁশের টুকুরি বেতের রজ্জ্ব অবলম্বন করিয়া স্বাধা হইতে
ঝুলিতেছে। টুং টেশনে একটি বৃদ্ধ পাহাড়ী দম্পতি তিকা করিতেছিল।
তাহাদের কাপড়ের বুট হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ট্রেনের সমুখে আসিয়া
তাহারা “বেলুয়া” বাজাইয়া গান ধরিল এবং তালে তালে পা ফেলিয়া
নাচিতে লাগিল। গানের ভাষা কিছুই বুঝিলাম না, কিন্তু সুর বড় করুণ।
অদূরে টিনের ছাতগুলা কাঠের ছোট ঘরে পাহাড়ী দোকান ; ভদ্রার শুক
বিঠাই, কাঁচা পেয়ারা, সবরতি লেবু, ছোলাভাঙ্গা এবং মকাইপোড়া
সজ্জিত। দোকানদার সিগারেট টানিতে টানিতে আগু বিক্রয়ের আশায়
মাকে মাকে ট্রেনের দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।

ক্রমে দূর হইতে দার্জিলিং সহর দৃষ্টিগোচর হইল। একটির ক্ষেত্র
উপর আর একটি—এই ভাবে শাখা শাখা বাড়ীগুলি আকাশে উঠিয়া
পিরাছে। মাকে মাকে প্রকৃতির কলিকুলের মত বিচিত্র বনসজ্জি গৃহ-
শ্রেণীর বিশ্লেষণ নির্দেশ করিতেছে। পাহাড়ের গায়ে পথগুলি বৃহৎ অলপ
শাপের মত, হেলিয়া ছলিয়া উঠিতেছে নাহিতেছে। রাস্তার উপর রেলিং

দেওয়া কাঠের পুল ; নিরে করণার জল শিলা হইতে শিলাত্তরে লাফাইতে লাফাইতে উপত্যকার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। চারিদিকেই ঘূমাকার মেঘ ; তাহার। বনের উপর, ঘরের ছাতে এবং টেলিফোনের তারে আসন পাতিয়া লহয়াছে। এ স্থানে দিনের প্রবল আলোক বৃষ্টি কখনও পৌঁছা দেয় না,—অসীম সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিচিত্র সৃষ্টি ত্রাতিদিন ছাত্রদের পক্ষপূট বিস্তার করিয়া বাঁসিয়া থাকে।

২১শে শ্রাবণ। গৃহস্থলী পাতাইয়া লহয়াছি। আজ হাটবার ; প্রাতে রবিবারে যাত্রা এ স্থানে হাট বসে, সেই দিন সমস্ত রাসদিকনিয়া রাধিতে হয় দোকানীরা প্রায় সকলেই খ্রীলোক। তাহাদের কর্ণাভরণ স্বর্ণের, পলায় বাংলায় আকারে বহু সোণার চাক্টি। পহন। পড়াইবার পর বাংলায় গৃহস্থীদের সোণার যে অবস্থা হয়, পাড়াড়াদের সোণা সেরূপ নহে,—একে-বারে নিষাদ,—কাঁচা হলুদের বত রং। বর্ণভারাক্রান্ত অঙ্গে ঘুর ঘুরাতর হইতে ঘোট বহিয়া ইহার। বাংলায় আইসে। কেহ কেহ আখ্যায় সুগৌর-বর্ণ, বাসেল পশুদেশ প্রক্টিমাত। বোধ করি এই শ্রেণীর পলায়নীদের অন্তর্গত কবি আক্ষেপ করিয়াছেন—“এত ভার মরি মরি, কেমনে গরুছ বরি, কোমল—করুণ—ক্রান্ত কাধ।” ঘাটে শাক-সবজী বধেই। পেয়ারা বলিয়া যে কল কিনিতেছিলাম তুলিলাম, সেটা তরকারি, কল নহে, নাম “কোরাল”। “কটহর” এ স্থানে কাঁচাল নহে—আনারস। ‘সানো’ ‘সানো’ অর্থাৎ ছোট ছোট “কটহর” পরসার দুই তিনটাও মিলে। কাঁচকলা বলিয়া যে সামগ্রী আনিয়াছিলাম, আহারের সময় দেখি, তাহা ছুণের বাটিতে বিস্তার করিতেছে ; নাম নাকি ‘চিনি-চন্দা’, অতি সুমিষ্ট কলা দেখিতে কাঁচা কলা যাত্রেকেই বাহাতে কাঁচকলা ঠাণ্ডাইয়া না বসি, তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যতে সাবধান হইয়াছিলাম।

৩০শে শ্রাবণ,। সুরহরি বাবু শান্তিরাম আশ্রমে উঠিয়াছেন। তিনি পর করিতেছিলেন, বনবিভাগের একটি ছোটপুট কর্ণচাষী হাওয়া বদলাইতে আশ্রমে আনিয়াছেন ; নাম রামদাস। পূর্বদিন সন্ধ্যায় পর উভয়ে একত্র আহারে বসিয়াছিলেন। রামদাসের পাঁচ চকুর নিষেধে বায়বায় খালি হইতেছিল। সুরহরি বাবু বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার অনুষ্ঠান কি ? প্রেরে তাঁহার ক্ষুধার প্রতি অপরাধজনক কটাক্ষ আছে যেন করিয়া রামদাস স্তম্ভোন্মিত সিম্বেৎ গর্জিয়া উঠিলেন, “কি, আমার অনুষ্ঠান নাই, কিচ্ছান্—

বেন, বশাই—আজ বাবু বৎসর 'ডায়ারিটিপে' আমি কত ভুগছি।" সুরহরি মনে মনে জবাবটির অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া লইলেন—“স্বপ্ন শরীরে আমি যুক্তকৃত নহি, আমার স্ত্রী বহুব্রজের লতা।” তিনি অসুস্থ্যমান করেণ, রানদাসের 'চেন' খুব ভাল হইতেছে। আসল কথাটা এই যে, এ স্থানের এক একটি পথ এক একটি হস্তিগণি। ঘরের বাহির হইলেই চড়াই,—একেবারে কোমর বাধিয়া রাস্তার সঙ্গে লড়াই! রানদাসের অপরাধ কি?

এই তাত্র। কয়েকদিন খুব বাতুলার পর আজ রোজ উঠিয়াছে। কাকনজন্মার রক্তমণ্ডিত বৃত্তি নীল আকাশের গাত্রে উজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইতেছে। নিমেষ আকাশের এমন সুন্দর নীলিমা সমতলভূমিতে স্বপ্নের অন্তীত। 'লরেটো কন্ডেক্টের' মেচেরা দল বাধিয়া শিকরিজীদিগের সঙ্গে রাস্তার বাহির হইয়াছে। সেকালে আমাদের দেশে বর্ষার দিনে অনব্যায় হইত, এ স্থানে রোজের সুখ দেখিতে পাইলেই স্থলের ছেলেমেয়েদের ছুটি। আজ এই বৃষ্টি আকাশের নিম্নে সবুজ পাহাড়ের গাত্রে তইয়া করণার পান তনিতে তনিতে জ্বারমণ্ডিত কাকনজন্মার দিকে চাধিয়া থাকিলে যে আনন্দ ও জ্ঞানলাভ হইবে, পড়িবার কোন পুস্তকে তাহা পাওয়া বাইবে না, নিশ্চয়।

আমরা সুরহরি বাবুর সঙ্গে 'বাট হিলের' দিকে চলিলাম। বাট হিলের সাত্ত্বদেশে পথগুলি বড় নির্জন, চারিদিকে অবিভ্রাম কি'কি ডাকিতেছে। এই বিরিক্তত বনপথে মধ্যাহ্নকালেও সন্ধ্যার পাতীর্ষ্য। ঘুরিতে ঘুরিতে পাহাড়ের মাথার উঠিলাম। এই স্থান হইতে জ্বারপ্রণী বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একপার্শ্বে সমুদ্রপক্কৃত চা এবং বিস্মৃটের নিদর্শন রহিয়াছে। না আমি কোন্ ভাবুক এ স্থানে চা-পান করিয়া গিয়াছেন। সুরহরি বাবু এ সম্বন্ধে বথেষ্ট গবেষণা করিলেন। কাকনজন্মার সমুদ্রে চা-পানে যে অধিক সুখাত্তব হয়, এ তত্ত্ব দর্শনবিজ্ঞানে লিখে না। স্মৃতরাং এ ক্ষেত্রে দুইটি মাত্র সিদ্ধান্তের অবকাশ আছে। প্রথম—চা-খোর চিরন্তন জ্বারকে সাক্ষী রাখিয়া চির-মৌত্যতের সংকল্প হৃৎ করিয়াছেন। দ্বিতীয়—জ্বার মৎসবটা এই যে, বহিও গিরিরাণ ঠাণ্ডা বরফের তক্ত তথাপি লগতে পরম পদার্থ সরম চা। “ধন মান চাহি না, শুধু, বিধি। বহি প্রাতে উঠে পাই একটি পেরালা চা।”

— ১৫ই আশ্বিন। আমাদের বাড়ীটির অধিকারী লিভিংয়ের একজন

সম্মান ব্যক্তি। 'এক দিন তাঁহার পুত্রের জন্মতিথি উপলক্ষে নেপালী নাচ দেখিবার নিয়ন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। কার্য্যানুরোধে বাওরা হর নাই; তবে তদ্বিগ্রাহি, নার্নারকমের যুগল পরিয়া পাহাড়ীরা খুব লক্ষ্যকর করিয়াছিল। আল হানীর পাহাড়ীদের যে থিয়েটার দেখিলাম তাহা সোনার পাতরের বাটি, তাবতলিতে বিশেষ বড় কম। লিথাইয়াছেন বাঙ্গালী বাবুরা, স্মরণ্য কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের একটা পাহাড়ী সংকরণ হইয়াছে। নৃত্যগীত বড় বেশি বেশি; এমন কি প্রথম দৃষ্টেই রাজা হরিন্দ্র সিংহাসন হইতে উঠিয়া একটি পান পানিয়া পুনরায় সিংহাসনে বসিলেন। তার হইতেছিল, একটু নাচিবেনও বুকি। স্মৃতির বিবরণ, ততদূর গড়াইল না। অভিনয়ের শেষে একটা বাঙ্গালা গান হইল; পাহাড়ী ছেলেনের যুগে সেটি তনাইল যেন।

২১শে আশ্বিন। সন্ধ্যার সময় 'কাটরোডে' পাড়াইয়া দার্জিলিংএর আলোকমালা দেখিতেছিলাম। মনে হইল, ভরল নতামগল গাঢ় হইয়া পৃথিবীর উপর ব্রুকিয়া পড়িয়াছে,—আর সেই ঘননীল আকাশে নত নত ভাস্বর তারা জলিতেছে। এতিনের দীর্ঘ আলোকছটা বিকীর্ণ করিয়া কুস্মটিকার মধ্যে দূরে ট্রেন আসিতেছিল। পাহাড়ের ধাক্কা ধাক্কা আলোটি কণে জলিয়া কণে নিবিয়া অতিরাং সচল তারকার ভায় শোভা পাইতে লাগিল, অবশেষে সেই সাত নীলিমার নক্ষত্রমণ্ডলে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

১৬ই কাশিক। আট বাইল দুঃবর্তী 'টাইগার হিল' এ অঞ্চলের সর্কোড শুল। এই টাইগার হিলে উঠিয়া সূর্যোদয় এবং 'বাউন্ট এভারেস্ট' দেখিবার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু সুরহরি বাবু একটু গোল বাধাইয়াছেন। তিনি এ বাজা সিঙ্গাপুরে মিউনিসিপ্যালিটির 'বিজুলি-বাতি'র কারখানা, দেখিতে চাহেন। সিঙ্গাপুরের পথ প্রায় পাঁচ বাইল; ভীষণ উৎসাহ। কিন্তু সুরহরি বাবুর নাকি অসুবিধা হইবে না। একবার হাঙ্গারিয়ার জিলায় তিনি ষোড়শ চড়িয়াছিলেন। সহিল অশ্বের বল্লভার তার পাইয়াছিল এবং কৃত্তি পুঙ্খ ধারণ করিয়াছিল। সাকোপাল সুরহরি এই ভাঙ্গিতে মিনিট পাঁচেক ষোড়শোড় করিয়া আইলেন। পূর্বস্মৃতি জাগরক হওয়ার তিনি পুনরায় অধারোহণের লজ্জা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। একজন সওয়ার সলীভ জুটিয়াছে। বাইবার সময় উৎসাহের সাথে ষোড়া চলিবে না,

তজ্জু হুরহরি একটি ত্রিণুল সংগ্রহ করিয়াছেন ; এই ত্রিণুলে ভর দিয়া পাছাড়ে নাঝিতে বড় আশ্রয় । ত্রিণুলহস্তে ভৈরববেশে তিনি গিজাপং বাজা করিবেন । পথের বহর বেত্রপ তাহাতে ক্ষুধাও ভৈরবী রকমের হইবে সন্দেহ নাই ; অতএব সহিস শুধু অশ্বটি নহে, কিছু লুটিকচুরিও সঙ্গে লইবে । আমরা তর্কজাল বিস্তার করিয়া হুরহরির গিজাপং অভিযান আপাততঃ বন্ধ করিয়া দিলাম ; হির হইল, সকলের একসঙ্গে টাইগার হিলেই বাওয়া উচিত ।

রাত্রি তখন চতুর্থ প্রহরে পড়িয়াছে,—আমরা কাপড় চোপড়ে কাহুলী আকুয় সাজিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম । বাজারের দোকানগুলিতে আলো জলিতেছে, পণ্যগ্রন্থ সমস্তই আচ্ছাদিত, একজন পুলিশ প্রহরী ওভার-কোটের পকেটে দুই হাত পুঁথিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । কাপকোরা ছাড়াইরা সহরের প্রায় বাহিরে আসিলাম । নিরে পাছাড়ীদের কুটীরগুলি সতীর নিত্যের আচ্ছন্ন । গুল তুলারানির মত বেথের আড়াল হইতে ‘একাদশীর বক্তব্য’ বারংবার উঁকি দিতেছেন, পথের উপর তরুছাটার রঙে রঙে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে । প্রকৃতির পাবাপ দুর্গের বিশাল প্রাচীরের ভার বামের উচ্চ পাছাড়ের মাথার সেনানিবাসের চমককোজল বাজী-গুলি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত দাঁড়াইয়া হাসিতেছে । ঘুম টেননের তাপমান বয়ে বেধিলাম, তাপ ৪২ ডিগ্রি ; আর মশ ডিগ্রি নাহিলেই জল জমিবার কথা । কোড়বাংলা হইতে চড়াই আরম্ভ করা গেল । আমরা বখন শিকলের নিধরে তখন অরুণরাগ পূর্বাঙ্কণে হুর মেঘে সোণালী পাড় বুনিয়া দিয়াছে । দুই দিকে গাছে গাছে কত না অর্কিত ; খেন অটোদারী তপস্বীদের নৈমিষারণ্য । অবশেষে টাইগার হিলের চূড়ার উঠিলাম । অমনই সুহৃৎসবধো তপন দেব সলিলময় গোলকের মত বেথের-রাশি তেজ করিয়া বেধা দিলেন । প্রণয়ীর প্রথম করম্পর্শে প্রেমিকার অঙ্গে হুঁকি রোমাক হইতেছিল ; তাই বামদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কৃকনজআর বোজনব্যাপী জুবারদেহে রামধনুর বিচিত্র বর্ণগুলি একে একে খেলিতেছে । সমুখে মত দুই দৃষ্টি চলে, হিবানীমতিত অনন্ত গিরি-শ্রেণী দ্বিপক্ষে বিলীন হইয়াছে ; তাহার নিরে অভলম্পর্শ ধবল বেব-সমুদ্রে তরলভঙ্গময় বেবমণ্ডলীর অনন্তব্য । হৃষ্টির প্রথম প্রভাতে বিখনিষ্ঠা যে সুহিবাহিত সৌন্দর্য্যভাঙারের আবরণ অপসারিত করিয়াছিলেন,

মাহুদের চকলতা ভাষার বিকৃতি ঘটাইতে পারে নাই, কল্পিত পর্য্যন্ত এ শোভারানি নব নব উবার এমনই অনাহতভাবে দেখা দিবে।

এভারেই-দর্শন লইয়া টাইগার হিলের চৌকিদারের সঙ্গে আশাবের বতন্তে বটিল। কটোগ্রাকের ছবির সহিত গুলিলাইয়া যে শৃঙ্খলিকে আশ্রয় এভারেই ধরিয়া লইলাম, চৌকিদার বলিল, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি এভারেই নহে। সুরহরি বাবুর বতে, লোকটি যদিও চৌকিদার তথ্যনি এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বটে; সুরহরি আমরা যে জগন্নাথের বদলে ভাতের হাঁড়ি দেখিয়া গেলাম না, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না।

২য় অগ্রহারণ। চৌরাত্তার নিয়ে জুটিয়া-বস্তির পথে দালাই লামার কয়েকজন অহুচরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। একজনের ভিক্তী পোষাকের উপর মাথার হাট ইনি বেশ ইংরাজি বলিতে পারেন। বেবিলাম, চীনের অতঃপূর্বের সময় ধবরই ইংরাজি রাখেন। দালাই লামার বাড়ীটি সে-ব-ডের দিকে; সিপাহী সঙ্গী-চড়ানে বন্দুক ঝাড়ে করিয়া পাহারা দিতেছে। লামা তখন বোধকরি উপাসনার নিবৃত্ত, ভিতর হইতে স্ব-স্ব কহ-স্ব-বাক্যধ্বনি উঠিতেছিল। ‘গুলি সাহেবের’ অল্পমতি পাইলে তবে লামার দর্শন-লাভ ঘটে। জপে তপে তাঁহার দিন কাটিতেছে বন্দ নহে।

ডেপুটি কমিশনার আফিসের একজন ভিক্তীয় কর্মচারী একবার ভিক্তিতে চাকরী করিতে গিয়াছিলেন; রাজনীতিক ছাড়া লামার সময় পলাইয়া আই-সেন। বৎসরে তিন চারি দিন কি বড় জোর সাত একদিন কায করিতেন, অবশিষ্ট সময় লামাদের আশীর্বাদ লইতে কাটিত। অত্র আশীর্বাদের প্রয়োজন কি? এই চাকরীই যে অসাধারণ আশীর্বাদের ফল।

৩য় অগ্রহারণ। দার্জিলিং প্রায় জনশূন্য। বসন্তের কোকিলরা অধিকাংশই নাথিয়া গিয়াছেন। শীতের মাত্র। কবেই চড়িতেছে, পট্ট, লেপ ও কবল মাত্র এখন সম্বল; বত্রে বত্রে আশ্রয় আলা সুর হইয়াছে, চারিদিকে গৃহের চিম্নি হইতে কুতলীকৃত ধূম উঠিতেছে। আশাবের বাড়ীর সম্মুখে টেলু ও সম্বন্ধে লিখরে পূর্বে বরফ দেখি নাই; আজকাল সেগুলি পান্না হইয়া গিয়াছে।

সুরহরি বাবু ‘বিজ্ঞান-বাতির’ কারখানা দেখিবার কল্পনা কার্যে পরিণত করিলেন। আশ্রয় অপরাহ্নে সিঙ্গাপুর পৌঁছিয়া। একটা দোঙ্গার-মান সেতুর উপর দিয়া অরণ্যের জল সবেগে আসিয়া ছইটি তালুও

বা জলাশয়ে সঞ্চিত হইতেছে, পুনরায় তালাও হইতে কারখানা-ঘরে
 প্রবেশ করিয়া ভীমবলে কলের ঢাকা ঘুরাইতেছে। কারখানার অমাব্যায়
 আমাদিগকে সমস্তই আশ্বাস করিয়া কলঘরে লইয়া গেল এবং চক্রযুগ্মের
 দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সংক্ষেপে তিন কথার সমগ্র বৈজ্ঞানিক
 ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিল—“পানী ইথিরূপে আস্তা, উথিরূপে ঝাড়া, ইথিরূপে
 নিকালুতা।” কলের রহস্ত একেবারে জল! আমাদের ঘরের পার্শ্বে
 একটি নূতন বৃত্ত ঘেঁষিতে পাওয়া গেল,—পাহাড়ের উপর আম কাঁটাল
 ও লিচুর গাছ। একটা কমলা লেবুর গাছে সুপক লেবুও ঝুলিতেছিল।

কিরিবার সময় সুরঘরি বাবু কয়েকবার চিংপাত হইয়া পথের উপর
 গুইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উদ্ধৃষ্টিতে বোধ-
 হয় পাহাড়ের শোভা দেখিতেছিলেন। রাজি আটটার দার্জিলিংএ
 পদার্পন করিতেই তিনি বলিলেন, মহীরাবণ বধের পর পাতালপুরী
 হইতে উঠিবার সময় রামচন্দ্রের অশ্রুচরকে নিশ্চয় এতটা চড়াই করিতে
 হয় নাই, অথচ সিদ্ধাপৎএ তিনি ধ্বংস করিয়াছেন মাত্র স্মৃতি ও কবলালেবু।

১০ শে অগ্রহায়ণ। সুরঘরি বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রবিন্ ও কালিন্-
 পৎএ পদতলে বাইবার কল্পমাটা কেমন? রবিন্ দার্জিলিং হইতে তের
 মাইল এবং কালিম্পং একত্রিশ মাইল। তিস্তের কথা এখনও জ্বলেন
 নাই।

ঐত্থপেজনারায়ণ চৌধুরী।

কবি ও কাব্য ।

নানা সুল হ'তে যথা মধুপনিকর
 মধুমাশি করি' আহরণ,
 নির্দ্বাইয়া মধুচক্র রুড়ে, রুড়ে, তা'র
 সম্বন্ধনে করে তা' বন্ধন ;
 বিবিধ সৌন্দর্য্য হ'তে কবি সেইরূপ
 ভাবসুধা করিয়া চরন
 বিরচিয়া কাব্যগ্রন্থ ছজে ছজে তা'র
 রাধি' দেন হৃদয়রঞ্জন ।

ঐবতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

মানদহের পল্লী-কথা।

রামাবতীর মহলা

পিছলী গঙ্গারামপুর

লক্ষণাবতী বর্ণনাকালে রামাভিটা, ধর্মপুর, চতীপুর ও কল্যাণাবতীর কথা বলা হইবে ; সুতরাং উক্ত চারিটি স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ না করিয়া রামাবতীর অপরাপর মহলাগুলির বিবরণ লিখিত হইল।

রামাবতী নগরের অন্তর্গত মহলাগুলির পরিচয়প্রসঙ্গে বে সন্ধ্যায় বনানীর প্রাচীন স্থানের পরিচয় প্রদত্ত হইবে স্বয়ং প্রাচীনকালে সেগুলিও রামাবতীর অন্তর্গত পল্লী বা তাহার উপনগর গ্রাম ও পল্লী মধ্যে ধরা হইত।

পিছলী।

বর্তমান অমরাবতীর সন্নিকটে পিছলীর কাঠাল বিস্তারিত রহিয়াছে। সন্ধ্যায় প্রাচীন পুঁজু বর্ডচন্দ্রাকারে ইহার পশ্চিমপ্রান্তের সীমা নির্দেশ করিতেছে। কানাইপুর নামক গ্রামটি পিছলীর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

মানদহের লোক বনভূমিকে 'কাঠাল' বলিয়া থাকে। আমাদের বর্তমান পিছলী।

বর্তমান আলোচ্য পিছলী কাঠালে পরিণত হইয়াছে। তথায় বিবিধ বস্তুরূপ তাল, ধর্মপুর জমিয়াছে ; বাগেই বেতবনও আছে। দেশের লোক সেই বেত সংগ্রহ করিয়া কুড়ি, পেতে, করলা, ঝালুই ইত্যাদি বুনিয়া সংসারের কার্যে লাগাইয়া থাকে। ভিতরে বহু পুরাতন পুষ্করিণী, কিল, পরিখা, গড়, সমতলক্ষেত্রমধ্যে উন্নত গৃহচিহ্নিত জুপ আর ইতস্ততঃ ইষ্টক-প্রস্তর বিকিণ্ড রহিয়াছে দেখা যায়। প্রাচীন সেতু (সোঁকো), বাধান ঘাট, আর দুই একটি প্রস্তরের তর দেবমূর্তিরও সন্ধান পাওয়া যায়। তর মসজিদও বিস্তারিত রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে পুরাতন বাধান পথের চিহ্নও লক্ষণকারীর নেত্রগোচর হইয়া থাকে। এই স্থানে লবণ কনিত্তে করিতে এবং বর্তমান দ্রুত মেঘিতে মেঘিতে প্রতীত হয়, স্থানটি একদিন বহুজনগণে ও হর্ম্যাম্বলার শোভিত ছিল।

আমি যে সবয়ে এই সকল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতাম তখন কানাই-পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রুহুল্লাহ সাহ ও শ্রীযুক্ত হারাদন সাহ বহুবর আমায়

সাহায্য করিতেন। পিছলী, গজারামপুর প্রভৃতি স্থানগুলির অধিকাংশ ভূভাগই তাঁহাদের সম্পত্তির মধ্যবর্তী এবং তাঁহারা এ সকল স্থান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে উক্ত স্থানসমূহের বিবরণ সংগৃহীত হইত না। তাঁহারা সবিশেষ যত্নসহকারে আমাকে প্রত্যেক দ্রষ্টব্য স্থানে একাধিকবার লইয়া বাইরা আবার অনুসন্ধানের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

পিছলী কাঠালের উত্তর পশ্চিমে বর্তমান কালিন্দী নামে এক নদী প্রবাহিত। কালিন্দী অত্য়াপি পিছলীকে গ্রাস করিতেছে। কালিন্দীর দক্ষিণ তীর উন্নত। নদীর গর্ভে পিছলী বতই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, ততই কূপভের মধ্যগত মানবচক্ষুর অগোচর হইতেছে। অনেক প্রাচীন কীর্তি লোকলোচনসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোড়ীর ইষ্টকে গঠিত বৃহত্তিস্তি-কূলদি দেখা বাইতেছে; বহুসংখ্যক ‘খেজুরে পাটের’ কূপ বাহির হইয়া পড়িতেছে; সেকালের মৃত্তিকা-নির্মিত বিবিধ প্রকার খেলনা, হাড়ী ইত্যাদি সুপ্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। দশ বার হাত মাটির নিরেও অনেক মৃৎপাত্রের অবশেষ মিলিতেছে। কাষেট পিছলী যে কত পুরাতন নগর তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

পিছলীর উত্তরস্থ কালিন্দীর পরগারে ‘নাগরাই’ নামক কাঠাল। পিছলী যখন সমুদ্র ছিল ‘নাগরাই’ তখন বনজনশোভার পরিস্ত ছিল। পিছলী হইতে নাগরাই গমনাগমনের ক্ষত্র একটি কাঠের সেতু ছিল। এ কথা উক্ত স্থানের প্রাচীন ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন। এই কাঠের সেতুর কথা রুমুকলাল সাহ ও হারাধন সাহ বহুবছরের নিকট হইতে শুনিয়াছি। তাঁহারা বলিয়াছেন, একবার কালিন্দীর উক্ত অংশের জল গ্রীষ্মকালে খুব কমিয়া গিয়াছিল; সেট সময়ে তাঁহারা ও উক্ত অঞ্চলের অনেক লোক

কালিন্দীর
উপর কাঠের
স্রাব্যে।

দেখিতে পারেন, বড় বড় বাহাদুরী শালের গোটা গোটা পান্ন সারি সারি স্তম্ভের স্তায় ছই শ্রেণীতে প্রোথিত রহিয়াছে। এবং তাহার সহিত অস্ত্র কাঠবণ্ড যে আবদ্ধ ছিল তাহারও চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। আমিও সেই স্থানটি দেখিয়াছি। কিন্তু তখন জল ছিল

বলিয়া কাঠের খামগুলি দেখিতে পাই নাই। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, নদীস্রোতে পিছলী বাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় তাহার ক্ষত্র সেকালে কাঠ পুতিয়া জলস্রোত কিরাইবার চেষ্টা হয় ত হইয়াছিল। কিন্তু নাগরাই কাঠালের

দিকেও ঠিক ঐ প্রকার কাঠজন্তুশ্রেনী দৃশ্যমান ছিল-অবগত হইয়া বুকিয়ায়, কালিন্দীর উপর কাঠের সেতু ছিল।

আবার শুনিতে পাই, বড় গঙ্গা বাহিয়া বড় বড় শওদাগরী নৌকা পিছলীর ঘাট হইতে রামাবতী পর্য্যন্ত শ্রেনীবদ্ধভাবে বহু থাকিত। এই

হানের ঠিক পরপারেই রাজমহল। যখন রাজমহল হইতে গয়ের হই পিছলী পর্য্যন্ত নদী বিস্তারিত ছিল তখন এই স্থান হইতে অন্ত-পার্শ্বে দোকান।

স্থান দেখা যাইত। পিছলীর পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত নদী-বিধৌত বলিয়া বানিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। বণিকগণ বানিজ্য বাপদেশে পিছলীতে বাস করিত। দক্ষিণ দিক হইতে অর্থাৎ তরতীপুর, গৌড়, লক্ষ্মৌড়ী, টাঁড়া হইতে যে রাজ্য গঙ্গার কূলে সোনাভলী, কাঞ্চন সহ-রের মধ্য দিয়া, পিছলীর মধ্য দিয়া বিস্তৃত থাকিত, গঙ্গারামপুর, ভগী-রথপুর, দৈবকৌপুর, কোতোয়ালী, তারাপুর হইয়া নিমোসরাই পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, তাহার উত্তর পার্শ্ব কেবল বণিকগণের বিবিধ বিপণিতে শোভিত ছিল। আশিও লোক বলিয়া থাকে যে, সত্যার পর রাজ্যের উত্তর পার্শ্বের দোকানের আলোকেই এই সুদীর্ঘ পথটি আলোকিত হইয়া থাকিত। এ কথা আশিও বহু স্থানে বৃদ্ধগণের নিকট শুনিতে পাই।

কালুপাহালমানের দরগা

মালদহবকে প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ বিস্তারিত রহিয়াছে বলিয়া অনেকেই প্রত্নতত্ত্বের অঙ্গসজ্জানে বা কোডুল-চরিতার্থ করিবার অস্ত্র মালদহে গিয়া গৌড়-পাতুরা দেখিয়া আইসেন। কিন্তু তাঁহাদের ভ্রমণসীমা অতীত সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। যে প্রাচীন স্থানগুলি বহু বার বহু লোক দেখিয়া বাপিয়া গিয়াছেন—নবাবগত ভ্রমণকারীর দল সেই স্থানগুলির উপর ভ্রমণ করিয়া প্রাচীন গৌড়-পাতুরার একটা চিত্র লইয়া ফিরিয়া আইসেন—তাঁহাদের মননে ও চিত্তক্ষেত্রে সেই সসীম স্থানটির করুণাই প্রাচীন গৌড়ের নিখুঁত চিত্র বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক ইহা ছাড়া যে আরও গৌড়-পাতুরার সুকারিত অশৌকিক চিত্র আশিও বিস্তারিত তাহা তাঁহাদের চিত্তক্ষেত্রে কখন উদ্ভিত হয় কি না তাহা বলিতে পারি না। বনের মধ্যে যে স্থানে বাপদের ভয়, যে স্থানে রাশালদল গুরু চরায়, যে স্থানে জলে অসংখ্য কুম্ভার ভাসে, যে স্থানের বনের মধ্যে শরীর

বাস, যে স্থানে ম্যালেরিয়া নিরাকার বেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই বনের মধ্যে ময়ূরের নৃত্য, হরিণের ভরচকিত নেত্র দেখিতে দেখিতে কত শত প্রাচীন চিত্র পুঞ্জীকৃতভাবে নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হয় তাহা ওঁহারা বুঝেন না। বলিতে কি, পৌড়ের কাহিনী সেই বনভূমিতে অনাদরে সৃষ্টিত আছে। কে কখন তাহাদের প্রাচীনকথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবে সেই আশায় বেন তাহারা আজিও অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে।

পিছলীর মধ্যে যদিও এখন আর বড় বন জঙ্গল নাই, তথাপি কোথায় নাহাও একটু নিদর্শন পাইব বলিয়া কেহ পিছলী ভ্রমণে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। পিছলীর বনটি বেশ করিয়া খুরিয়া দেখিলে পিছলীর অতীত গৌরবের নিদর্শন পাইতে পারি। পৌড়ের ইতিহাসের এক অব্যাহত পিছলীর কাঠালে অবলম্বিতভাবে আজিও রহিয়াছে।

পিছলীর প্রাচীন কাহিনী মুছিয়া বাইতে বাইতে আর লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। আজিও দুই চারিজন বুকের নিকট ওঁহাদিগের দেশের অতীত গৌরবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আজিও ওঁহারা দেশের প্রাচীন কাহিনী বলিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। দেশের বনদৌলত ও মহিমার কথা বলিতে বসিতে ওঁহারা উত্তেজিত হইয়া পড়েন; গল্পের লেবে মুগ্ধমানি মলিন করিয়া বিধবৃত্তাবে কাহিনীর উপসংহার করেন। আবাদিগকেও বালদেহের পরীকথা শেষকালে ঐ প্রকার বিবাদের গীত গাহিয়া উপসংহার করিতে হইবে।

পিছলীর এক বীরের কথা এই স্থানে বলিব। পিছলী বধন বনজঙ্গল-পূর্ণ ছিল তখন তথায় কালু পাহালমান (কালু পালোয়ান) নামে এক কাদুর কাহিনী। ময়র বাস করিতেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, ইহা ব্যতীত ওঁহারা

জাতির কথা আর কিছু কেহ জানে না। কানাইপুরের উত্তর-পশ্চিমে, গঙ্গারামপুরের পশ্চিমে মহানন্দার তীরে কালুর বাড়ী ছিল। আজিও ওঁহারা বাড়ীর ভিটা ও তথায় ইষ্টক প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে। লোক দেখাইয়া দেয়, ঐ স্থানেই কালু পাহালমানের বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বেই কালুর একটা বসুন্ধের আজিও রহিয়াছে। সেই বসুন্ধেটি গঙ্গারামপুর নীবার মধ্যে পড়িলেও পিছলীর কাঠালমধ্যগত বলিয়া প্রকাশ। সে বসুন্ধেটি কালুর কি না তাহা পরে বলিব। কালু কোন অনিবার্য কারণে বোঙ্গলমান হইয়া পড়েন। কেন তিনি বোঙ্গলমান - কথাবলসী হইয়াছিলেন তাহার কথা কেহ বলিতে পারে না।

কালুর সময় গৌড় নগরে তাঁহার সবকক বয়স আর কেহ ছিল না। তাঁহার নিকট অনেকে কুস্তিগীর্ণ করিত বলিয়া তাঁহার অনেক চেনা ছিল। কালু সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার 'আখড়াবাড়ী' বহু বয়সের জীড়াভূমি ছিল। আখড়াবাড়ীর দক্ষিণে একটি ঘাটবাধান পুকুর ছিল—আজিও আছে, তবে বাধান ঘাটটির আর বড় অবশেষ নাই। আখড়ার পার্শ্বেই 'বসুন্ধেদবাড়ী'। এই বসুন্ধেদকেই দেশের লোক 'কালু পাহালমানের দরগা' বলে। এই দরগার সীমামধ্যে এক বড় বৃহৎ প্রস্তর পড়িয়া আছে। তাহার এক পার্শ্ব চিত্রিত; দেখিলেই বোধ হয় ইহা কোন প্রস্তর গঠিত প্রাণীদের অংশবিশেষ ছিল। লোক ঐ প্রস্তরবস্ত্র দেখাইয়া বলে, কালু ঐ পাতরে বসিয়া থাকিতেন, নামাঙ্কের সময় পদ ধোত করিতেন, কুস্তির সময় ঐ পাতরখানিই তুলিয়া নানানরূপ জীড়া-কৌশল দেখাইতেন। যদি কোন বয়স তাঁহার সহিত বলপরীক্ষার জন্য আসিত তবে তিনি তাহাকে ঐ পাতরখানিই অগ্রে তুলিতে বলিতেন। যে ঐ পাতরখানি তুলিতে পারিত তাহার সহিত তিনি বলপরীক্ষা করিতেন, যে ব্যক্তি উহা তুলিতে না পারিত, তাহাকে কালুর শিষ্য হইয়া বয়সজীড়া শিক্ষা করিতে হইত।

কালু এক সুন্দরী যোগলমান যুবতীকে বিবাহ করেন। তিনি বিবাহের পর গৌড়ের বাদশাহের একজন সেনাপতি হইলেন। পিছলী নগরে বাস করিবার পূর্বে তিনি পিছলীর এক কোশ উত্তর-পশ্চিমে কালিন্দীর পরপারে অখণ্ডরাক্তি এক কিলের সন্নিকটে বাস করিতেন। সেই কিলের নাম 'কালাপাহাড়ের কিল'। 'নাগরাই' বর্ণনাকালে ইহার বিষয় বর্ণিত হইবে। এই কালু যখন হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন তখন তাঁহার শৈবধর্মে আস্থাবান থাকিবার পরিচয় দেশের লোক দেখাইয়া দেয়। একপাহাড়ীর দক্ষিণে লোহাগড়ের দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে এক সুবৃহৎ গৌড়ীপট্টমন্ডেত শিবলিঙ্গ পতিত আছে। দেশের লোক ঐ শিবকে 'কালাপাহাড়ের শিব' বলে। কালু ঐ শিবের পূজা করিতেন।

এই* সুন্দর বিবরণদ্বারা বনে হয় 'কালু পাহালমান' নয়নটানের পুত্র কালচাঁদ বা রাজু হইবেন।

কালুর জীবনী বাহা এ প্রদেশের লোক বলিয়া থাকে তাহা কতকটা কালাপাহাড়ের জীবনীর বত। কালুর পূর্ণ ইতিহাস 'ভাতা' বর্ণনাকালে বর্ণিত হইবে।

কালুর নামে যে মস্কেদটি খ্যাত তাহার কিয়দংশমাত্র বিজ্ঞান রহিত। ইহাতে প্রস্তর অপেক্ষা ইষ্টকের প্রাচুর্যই অত্যধিক দৃষ্ট হয়। আজিও বহু বিদেশী বোমলমান তত্ত্বপূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া কালুর দরগা ও কুলাঙ্গ করিয়া থাকেন। মস্কেদের একটি ক্ষুদ্র কুটুরিতে

বহুসংখ্যক প্রাচীনকালের 'কুলা' ভগ্ন অস্তর অবস্থার পড়িয়া আছে। সেই কুলাগুলি কি কারণে এই ভাবে রহিয়াছে তাহা জানিবার বিষয় প্রবাদ, বাহারা মক্কাসন্নিক বাইত ও তথা হইতে আসিত তাঁহারা এই তথা হইতে 'কম্ব কম্ব' কুপের জল আনিয়া এই মস্কেদে প্রদান করিত। সেই কুলাগুলি বিদেশীয়। বাস্তবিক ইহা সত্য কি না তাহা বলা যায় না। তবে ঐ প্রকার কুলা মালদহের কোথাও প্রাপ্ত হইতে দেখি না বা আর কোথাও বিজ্ঞান নাই।

এই দরগার অক্ষরমালাকোদিত একখানি দীর্ঘ শিলা-কলক বিজ্ঞান আছে। ইহাতে কোরাণের বায়েত কোদিত। ইহা অস্ত্রাপি বিজ্ঞান। ইহা অক্ষরমালা দৈর্ঘ্যে ৭ ফিট প্রস্থে ১ ফিট ২ ১/২ ইঞ্চি। প্রস্তরে কোদিত তারিখ কোদিত শিলা- ৬৪৭ হিজিরি বা ১২৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। মস্কেদের বিশেষ বিবরণ এ কলক। স্থলে প্রদান করিলাম না। গৌড়পাণ্ডুপ্রবন্ধক (Guide to Gour and Pundua) নামক পুস্তকে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। মালদহ জাতীয় শিলা সমিতি হইতে উহা দীর্ঘ প্রকাশিত হইবে।

কালু পাহালমানের দরগার নিকটেই 'হজরৎ সাহ জালালউদ্দিনের তাকিয়া' নামক স্থান বিজ্ঞান। এই প্রকারের কয়েকটি তাকিয়া মালদহের হজরৎ সাহ বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞান রহিয়াছে। 'তাকিয়া' আন্তানার এক জালালউদ্দিনের প্রকার সংস্করণ মাত্র। সাহ জালাল উদ্দিন সম্বন্ধে এ প্রদেশের তাকিয়া। হিন্দু বোমলমান যে প্রাচীন কাহিনী বলিয়া থাকেন তাহাতে সাহ জালাল উদ্দিনের অপার সহকার্য কথাই ব্যক্ত হইয়া থাকে। সাহ জালাল উদ্দিন একজন সিদ্ধ ফকির। তিনি এই স্থানে জনহারা আন্তানা করিয়া বিপ্রায় করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি এই আন্তানার অনেক সময় থাকিতেন।

যখন গৌড় নগরে রাজা লক্ষণ সেন রাজত্ব করিতেন তখন সেখ সাহ

জালাল উদ্দিন এ দেশে আসিয়াছিলেন। দেশের লোক এই কথাই সেখ কাহিনী। বলিয়া থাকে। কিন্তু ইতিহাস তাহা বলিতে চাহে না। আশ্রয় এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের গতি ছাড়িয়া ভ্রমণের অধিকার লইয়াছি। কারণ বর্তমান গ্রন্থ ‘মালদহের পল্লী-কথা’ অংশবিশেষ; ইতিহাস নহে—ইতিহাসের উপাধান। লক্ষণাবতী হইতে পিছলী পর্যন্ত সে সময় লোকে লোকারণ্য ছিল, সহস্র সহস্র হর্ষ্য ভাগীরথীতীরে শোভিত ছিল। তখন সেখ একাকী এই হিন্দু দেশে আগমন করেন। তিনি কোন প্রকারে পিছলীতে আটসেন, এবং তথা হইতে কালিন্দী নদী পার হইয়া পাণ্ডুয়ায় বাইবার অস্ত্র কালিন্দীর ঘেরাঘাটের পাটনীর নিকট গমন করেন। পাটনী জাহার বেশত্বা অপূর্ণ-দর্শন দেখিয়া কোন প্রকার ছদ্মবেশী ও বৈদেশীক বলিয়া অবদারণ করে এবং পার করিতে চাহে না। সেখ বারবার পাটনীকে পার করিয়া দিবার অস্ত্র অহু-নয় বিনয় করিণেও পাটনী রাজাদেশলজ্ঞানের ভয়ে পার করিতে চাহে না। তখন পাটনী অজ্ঞাত, অপরিচিত, অদূতবেশধারী, কাহাকেও সন্দেহবশতঃ পার করিত না। সেবে সেখ আলবেয়ার ‘জিব’ হইতে ক্রমাল ক্রমালের নৌকা। বাহির করিয়া জলে কেলিয়া দিলেন ও বলিলেন—‘কৌত্তি হো’ দেখিতে দেখিতে ক্রমালখানি নৌকা হইয়া গেল। সেখ তাহাতে চড়িয়া নদী পার হইয়া গেলেন। পাটনী বিন্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিল; তবে আর কোন কথা বলিল না।

বে স্থানে এই ব্যাপার ঘটয়াছিল তাহার সন্নিগটেই কালু পাণ্ডালমানের দরপা ভবিষ্যতে নির্মিত হইয়াছিল। বে স্থানে সেখ ঠাড়াইয়া ছিলেন সেই স্থানেই ‘তাকিয়া’ নির্মিত হইয়াছিল।

সেখের এই অলৌকিক কার্যের কথা স্থানান্তরে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইবে। কারণ সেখের সহিত পিছলীর সম্বন্ধ অধিক নহে।

“চতুর্জ্ঞানেশ্বরে থাকে সহস্রেক শতাব্দিকে।

বেহার পাটনাৎ পূর্বে তুর্কক সমুপাগতঃ ॥”

(সেখ শুভোদয়া)

ইহার মতে ১১২৪ শকে বিহারভূমি পাটনায় তুর্কক আগমন করিয়াছিল। সেই কালের কোন একদিন লক্ষণ সেন গৌড়পার্ব্ব গঙ্গাতীরে

গাড়াইরা দেবীঃ গঙ্গা পক্ষেতি" শব্দ কীৰ্ত্তন করিতেছিলেন ।
সেখ আবির্ভাব ।
সেই সময়ে জলের উপর দিয়া এক অলৌকিক বেনধারী পুরুষ
ঠাট্টা আসিলেন ।

"কৃষ্ণাবরঃ পূরঃ শিরোবেষ্টনতৎপরঃ ।

শ্রীমাদ্ভীষতরং বীক্ষণ্ণ আগ্রাতি নৃপসন্নিবো ৷"

(সেখ শুভোদয়া)

কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রপরিহিত মাথায় পাগড়োবিশিষ্ট পশ্চিমাভ্যুদয়বানী সেখ সৰ্ব্বপ্রথম গোড়ে আসিয়াছিলেন কি না বলা যায় না । কিন্তু এই সময় হইতেই বোমলমানগণের এ দেশে পভারাত আরম্ভ হইয়াছিল । তিনি বাণিজ্য-ভরগীতে গোড়ে আসিয়াছিলেন । পাণ্ডুরা বর্ণনকালে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইবে । পিছলীর বন্দরে সেখাবির্ভাব ঘটিয়াছিল ।

পিছলীর কাঠালের অন্তর্গত দর্শনযোগ্য বিশেষ কোন স্থান আর নাই ।
যে দিকে দেখিবেন সেই দিকেই প্রাচীন নগরক্ষণ্ডের চিহ্ন সুস্পষ্ট বিস্তারন
রহিয়াছে । মধ্যে মধ্যে পীরের দরবার চিহ্ন দেখা যায় ।

তম বৃদ্ধ-
বৃদ্ধি ।

বৃদ্ধক সাহেব বাগানে একটি কাঠাল গাছের তলদেশে কটিদেশ
হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মানবপ্রমানে তর বৃদ্ধবৃদ্ধি পতিত থাকিতে

দেখিয়াছিলাম । মধ্যে মধ্যে তাত্র, পিত্তল ও প্রস্তরের বৃদ্ধি ভূগর্ভ
খননকালে বাহির হইতেও শুনা যায় ।

ভগীরথপুর ।

পিছলীর দক্ষিণে ভগীরথপুরের কাঠাল । পূর্বে ভাগীরথাতীরেই
ভগীরথপুর প্রতিষ্ঠিত ছিল । গঙ্গার দয়া হারাঈরা ভগীরথপুর জনহীন বনে
পরিণত হইয়া গিয়াছে । এই ভগীরথপুর একদিন কেবল দেব-
চাঁদনীবাড়ী ও দেবীর মন্দির ও গোলাঘাটে পূর্ণ ছিল । আজিও 'গোলাঘাট'
গোলাঘাট । 'চাঁদনীবাড়ী' নামক স্থানগুলি অতীতের স্মৃতি আগাইয়া
দিতেছে । অতি অল্প দিন হইল এই স্থানের জনপ্রোত বদ্ধ হইয়া গিয়াছে ।
বোধ হয় ৫০৩০ বৎসর পূর্বে সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়া এই স্থানেষড় বড়
নৌকা দ্বারা চাউল ইত্যাদি বোঝাই লইয়া গভারাত করিত । উক্ত
অকালের বৃদ্ধগণ গঙ্গা করিয়া থাকেন যে, নিকটবর্তী স্থানের দুর্গা প্রতিমা-
গুলি সশব্দে দিন ভগীরথপুরের চাঁদনীবাড়ী নামক ঘাটেবু ধারে নৌকা-

বোম্বে স্থানান্তরিত হইত। তখন উক্ত স্থানে মেলা বসিত। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। গোলাঘাটের নিকটেই চাঁদনীবাড়ী। গঙ্গার বাধাবাটের উপর চাঁদনীবাড়ী ছিল সেই ক্ষুদ্র আখিও দেশের লোক ইহাকে চাঁদনীবাড়ী বলিয়া থাকে। যোগ উপলক্ষে যখন গঙ্গানানের সময় আসিত তখন বরেন্দ্র হইতে ও নগরের বিভিন্ন পক্ষ হইতে ভগীরথপুরের চাঁদনীবাড়ী বাটে গঙ্গানানের মেলা হইত। বোম্বেঃ দিন ব্যতীত প্রত্যহ বিভিন্ন স্থান হইতে আগত নরনারীর দানের এইটি প্রসিদ্ধ বাট ছিল।

সেকালের সম্ভ্রান্ত জনগণ গঙ্গাবাস উপলক্ষে এই ভগীরথপুরে বাস করিতেন। সন্ধ্যার সময় ভাগীরথীতীরস্থ ভগীরথপুর দেবতাপূজার আনন্দিক-বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া উঠিত। গঙ্গাবক্ষে শত শত দীপালোক তরঙ্গে তরঙ্গে ঘূর্ণিত হইত।

ভগীরথপুরের কালীবাড়ী ও ঠাকুরবাড়ী প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় সন্ধ্যার পর আনন্দিক দেবতার ক্ষুদ্র যথেষ্ট লোকসংঘটি হইত। ভগীরথপুর প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল গোলা গঙ্গা বন্দর ও দেবালয়ে পূর্ণ ছিল।

শ্রীহরিন্দাস পালিত।

দারিদ্র্য।

(সংস্কৃত হইতে অনূদিত ।)

দারিদ্র্য হইতে হয় লক্ষ্যের উদ্বার,
লক্ষ্য-পরিগত জন শক্তিহীন হয়।
শক্তিহীন হ'লে তা'র ঘটে পরাজয়,
পরাজয় হ'তে জন্মে নিকের নিশ্চয়
নিকের হইতে শোক, শোকে বৃদ্ধি কর,
বুদ্ধিকরে মানবের মৃত্যু নিঃসংশয়।
যে হুটে দারিদ্র্য এত আপদের মূল,
কি পাপ সংসারে আর তা'র সমতুল।

সনাতনী ।

পত ভাত্র মাসের ‘একাদশী’তে ঐযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ‘সনাতনী’র যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে—তাঁহা পড়িয়া মনে হয়, গ্রন্থখানি ‘একাদশী’ কার্য্যক্ষেত্রে বোমার বস্তু পড়িয়াছে । কিন্তু যিনি বস্তুর সহিত গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন, তিনি ইহাতে শিক্তিক এমিডের সম্ভবতঃ প্রাপ্ত হইবেন না । বিখ্যাত গ্রন্থকার তাঁহার আভ্যন্তরক অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যর ফল সমাজকে দান করিয়াছিলেন—গ্রন্থকার সহিত দান করিয়াছেন—অগ্রদূতের সহিত দান করেন হাই ।

আত্মকাল রাজনীতি ও অর্থনীতির আদর্শধারা সামাজিক ব্যবস্থার প্রকার বোধগ্ণ বিচারিত হইতেছে । বলাবিবাহে সমাজের মর্য্যদা দুটি হয়, সূত্রগত বলাবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত, জাতিভেদ থাকায় ভারতবর্ষে দেশের পৃষ্ঠমের অতিবন্ধকতা হইতেছে—সূত্রগত জাতিভেদ এবং বর্জনীয়; বিবাহের ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করার হিন্দু জাতির বংশবৃদ্ধি হইতেছে না, সূত্রগত বিবাহবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত এবং বৈদ্যুতিক দ্বারা সমস্ত সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক হইতেছে । সমাজসংস্কারের প্রয়োজন হাই, এ কথা বলিয়া আসল আশা করেন হাই; কিন্তু সংস্কারপ্রসারীমণ্ডলের এতাবশ্য দুটি দাত-সহিষ্ণু বলিয়া আসা করেন মনে হয় না । প্রত্যেক সামাজিক প্রকার বোধগ্ণ সর্বাধিক আদর্শধারা বিচারিত হওয়া উচিত । রাজনীতিক ও অর্থনীতিক আদর্শ কিছু সর্বাধিক আদর্শ হবে । কিন্তু বর্তমান অবস্থানের দৃষ্টে অনেকই ভগ্নগণা উচ্চতর আদর্শে বিশ্বাস করেন না । বিভিন্ন আদর্শ অবলম্বন করি বলিয়া আসিয়া কোথাও বিবরে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না ।

উদার ও ব্রহ্মণশীল ব্যবস্থার হিন্দুই হিন্দু জাতির সহস্রের পক্ষ করিয়া থাকেন । অগ্রতের অন্যান্য জাতি হইতে আসা যের বিশেষত্ব আছে বলিয়া আসিয়া সকলেই বিশ্বাস করি । এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া আসিয়া হিন্দু, এই বিশেষত্ব আছে বলিয়া আসিয়া জাতি পর্য্যন্ত স্বকীয় বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছি । ভারতের উচ্চল রত্ন, ব্রাহ্ম সমাজের শিরোমণি ঐযুক্ত ব্রহ্মসেবাব শীল পত সার্বজনীন মহাসভার বলিয়াছিলেন,

“What does India represent ? Not universal Empire like the Eternal City. Not universal spiritual domination, like the mother of all the churches. India in the shadow of the glacierclad Himalayas and the roar of the Southern Ocean, has ever dreamt of other than a historic eternity. India dreamt of building up the foundations of the life spiritual preaching Ahimsa, the sacredness and inviolableness of all life and sentience not for their own sake merely, but as progressive manifestation of the Life Eternal. India sought to organize the successive stages of life as in

social amphitheatre, so as to lead up to the high tableland, the Sinai peak, the rare and pure air, in which the universal self, the self of all that lives and moves, reveals itself to the searching gaze of Man. That fair fabric of a nationality on the basis of universal Peace, peace between man and man, and between man and every sentient creature was cruelly shattered by the shock and collision of Historic force. For it was necessary that the world should painfully learn the cult of a painful historic development from the brute to the man.

ভারতবর্ষ কিসের ঐতিহিবি?—বিষয়্যাপ্তি সাম্রাজ্যের মধ্যে; বর্ষজসতে সকলের উপর একত্বেরও মধ্যে। জুমারাজ্যের হিন্দুদের দ্বারা এবং দক্ষিণ মহাদেশের দক্ষিণের মধ্যে ভারতবর্ষ চিরকালই এক সনাতনবর্ষের স্বপ্ন দেখিয়েছে। যে সনাতনবর্ষ ঐতিহাসিক মধ্যে। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি সংস্থাপনের কল্পনা করিয়াছিল, ভারতবর্ষ অহিংসা—স্বাভাবিক জীব ও বৈদ্যনাথবোধী পদার্থের অধিকাংশ প্রচার করিয়াছিল। স্বাভাবিক জীব ও বৈদ্যনাথবোধী পদার্থ সেই সনাতন পুরুষের ক্রমবিকাশশীল একাদশ বলিয়া অহিংসা প্রচারিত হইয়াছিল,—কেবল এই সনাতন জীব ও পদার্থের প্রতি দৃষ্টি-বশতঃ মধ্যে। জীবনের বিভিন্ন কালকে ভারতবর্ষ এমনভাবে ব্যবহৃত করিয়াছিল, যে তদ্বারা মানুষ উন্নত হইতে উন্নততর গুণে আয়োজন করিয়া পরিশেষে এমন গুণে পৌঁছিতে পারে যে দ্বারা সেই বিদ্যমান মানবের দুইতে প্রকাশিত হইবে। বিদ্যমান শান্তি, মানব মানবে শান্তি, মানব ও প্রতি বৈদ্যনাথবোধী পদার্থের মধ্যে শান্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই সনাতন জাতীয়তার নৌবা ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের সংঘাতে ভূপতিত হইয়াছিল। পণ্ডিত হইতে মানবের কঠোর উন্নতির উপর সনাতন মানব-সাম্রাজ্যের আদ্য আয়োজন হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থার সমালোচনা করিবার সময় শীল মহাপুরুষ ভারতবর্ষের যে মহত্বের নির্দেশ করিয়াছেন—তাঁহা আদ্য জুলিয়া বাই। আদ্য জুলিয়া বাই, ভারতবর্ষের কবিগণ সমাজব্যবস্থার সময় টাকাকড়ির হিসাব একবারেই করেন নাই, পরন্তু বর্ষসাবন মানবজীবনের উদ্দেশ্য ধরিয়া লইয়া ভারতীয় সমাজ পটভূমি হইয়াছিল।—এ কথা ভারতসমাজ সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। জীবন সংগ্রাম মধ্যে—যক্তি—এ কথাটি জুলিলে কিছু সমাজের কিছুই বুঝা বাইবে না। পণ্ডিত জীবন সংগ্রাম-মাত্র। পণ্ডিত সুখের গ্রাস কাড়িয়া না বাইলে তাহার চলিবে না। অসত্য ব্যবস্থার বাস্তবও এই সংগ্রামের দ্বারা হইতে নিষ্কৃতি পায় না। পান্ডিত্য সমাজে এই সংগ্রাম অতি জীবন-ভাবে চলিতেছে। বিদ্যমান এই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারেন জনতার ভোগ্য পদার্থ ভীষণই করায়ত্ত হয়। কিন্তু যে দ্বারা একজন করিয়া করেন সে দ্বারা একজন জন পরামর্শিত হইয়া দ্বারের বোকা বহিয়া জীবন পণ্ডিত করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বেগ ভীষণবেগে বর্ধিত হইয়া বাইতেছে—সামাজিকতা পরিবর্তিত না হইলে মানবজীবন সংগ্রামকেই

রহিয়া যাইবে । আমাদের সমাজের ভিত্তি ছিল—শাস্তি, মানুষে মানুষে শাস্তি, মানুষে ও ইতর জীবে শাস্তি । শাস্ত্যাত্য দেশের বিঘট্ট বাক্যসম্মানের দেশে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে—এমন হইতে সতর্ক না হইলে সমাজের অধিকাংশের জীবন বিঘর হইয়া উঠিবে ।

‘সনাতনী’ গ্রন্থে স্রব্দের সরকার মহাপুর আটান ভারতের আদর্শ সমাজে বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিয়াছেন । “ভারতবর্ষ কৰ্মভূমি—অন্যত্র দেশ ভোগভূমি”—সরকার মহাপুর বলিয়াছেন ভারতসমাজকে এ কথা সৰ্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে । অন্যত্র দেশের সমাজব্যবস্থা ভোগসাধনের সহায় ; সে সমস্ত দেশে সংস্কারকণের লক্ষ্যই ভোগ । বাহ্যতে সমাজের অধিকাংশ লোকের ভোগলালসা চরিতার্থ হইবার সুবিধা হয়, সমাজকে উন্নতরা দেই ভাবে পুৰণিত করিতে চাহেন । ভারতসমাজের ভোগ করিতে বিশেষ নাই—কিন্তু তাহাকে এমন ভাবে ভোগ করিতে হইবে বাহ্যতে বর্ণসাধনের সুবিধা হয় । “এই কথাটি যদি আমরা বেশ স্মরণ করিতে পারি, এবং শাস্ত্রের উপদেশ মত কাৰ্য্য করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলেই আমরা এই পুণ্য ভূমিতে বাস করিবার অধিকাৰী, নতুবা ভিক্ষু, গোষেয় বা রাউন, শিখ—চট্টগ্রাম চুঙ্গালি প্রভৃতি স্থানে যে অধিকাৰে বাস করিতেছেন আমাদের অধিকার উাহাদেরই মত ।” “যদি তুমি গৃহস্থ হও এবং অতিথি, যোজতা, পিতৃপুত্র প্রভৃতির নিৰ্ভরিতরূপে অন্নদান দান না কর, তবে তুমি নিরাশ্রম হবিব্যাহাই ভোজন কর, আর পিষ্টক পলায়েই গ্রহণ কর, সে কেবল শূকর-পেটপূরণ ।” এই বে ভোগকে বর্ণের আনুসঙ্গিক করিবার চেষ্টা, ভারতের সমাজব্যবস্থার পক্ষে পদেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায় । চেষ্টা যে কলবতী হইয়াছিল—সকাল ৭ বৎসর পূর্বের সামাজিক জীবনের আলোচনা করিলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । আমাদের দেশে বড়লোক ও ব্রাহ্মণের জীবনযাপনপ্রণালীর বিশেষ ভারতম্ভা ছিল না । মিছের ভোগের অল্প সমস্ত অর্থ নিয়োগ করা পূর্বে বিভাগই নিশ্চয়ী ছিল । অর্থ হইলেই দশজনকে খাওয়াইয়া ও প্রতিপালন করিয়া তাহা ব্যয় করিতেই সকলের আগ্রহ ছিল । আজ মিছের ভোগটি ঠিক রাখিয়া আমরা বর্ণকৰ্ম করি । গৈতুক আর একই আছে—কিন্তু গৈতুক ক্রিয়াকৰ্মগুলি আমরা ছাড়িয়া দিতেছি । কেন না যে টাকা পূর্বে এই সমস্ত ক্রিয়াকৰ্মে ব্যয়িত হইত অধুনা তাহা না হইলে আমরা ফিটন স্রব্ধ মোটরকার রাখিতে পারি না ।

ভোগপ্রবৃত্তিকে যে কত ভাবে সংযত করিবার চেষ্টা আমাদের দেশে হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত আছে তিনিই তাহা বেধিতে পারেন । একটি উদাহরণ এ স্থানে দেওয়া অসম্ভব হইবে না । ‘তুখা বাসে’ ভোজন নামে বিবিধ । জীবহিংসা অকর্তব্য, কিন্তু বাসে ভোজনের অল্প বাহার বলবতী পুখু—সে পুখু চরিতার্থ করিতে না দিলে, তাহার অনেক প্রকার কতি হইতে পারে । তাই নাম ব্যবস্থা দিলেন, “দেবতার পূজার্থে পণ বলি দিয়া সেই পণ্ডর বাসে দশ জনকে দিয়া তুমি ভোজন করিতে পার ।” মিছের ভোগ-প্রবৃত্তিকে সেমপুখা ও অপর দশজনকে ভুক্তির অধীন করিয়া দিয়া শাস্ত্রকার ভোগকে কথোই সংযত করিয়া দিয়াছেন ।

সরকার বহান্নর এটীন হইলেও ভবিষ্যতের দিকে আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিবার শক্তি হারাণ নাই। তিনি বলিয়াছেন,—“ভারতবর্ষ কর্তৃত্বমি, এ কর্তৃত্বমিকে তুমি কিছুতেই ভোগত্বমিতে পরিণত করিতে পারিবে না।” কিন্তু তাঁহার মত ভবিষ্যতের দিকে চাহিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাই আমরা বেধিতে পাইতেছি—চারি দিকে সংবেদ্য বন্ধনঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে; পাক্ষাত্য ভোগবিলাসের আদর্শ ক্রমশঃই আপনায় স্থানচ্যুতিঃ করিয়া লইতেছে আধ্যাত্মিকতা অর্থহীন ও মনুষ্যত্বনাশক বন্ধন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে—নেবদানবের বুদ্ধে দানব ক্রমশঃ জরী হইতেছে এবং কনিদ্বিপের সমাজব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে বলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু অবলম্বন হইতে বঙ্গলের উদ্ভব হয়। ভগবান কতন—সরকার বহান্নরের আশা সকল হউক। হয় ত ভোগানন্দের পরিণাম দেখিয়া বিগুণ আশ্রয়ের সহিত ভাগ্যসন্তান পুনরায় সেই এটীন আদর্শকে আঁকড়াইয়া বহিবে। তাহাই যদি ভগবানের উদ্দেশ্য হয়—সরকার বহান্নরের গ্রন্থখানি সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করিবে এ কথা নিঃসন্দোহে বলা যায়।

বর্ধমানকেই বুঝা উদ্দেশ্য বলিয়া বাহায়া স্বীকার করেন, সরকার বহান্নরের সহিত তাঁহাদের বিশেষ বিরোধের কোন কারণ নাই। কিন্তু আভিতালি অনেক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, practical না হইলে বর্ধ পালনীয় নহে। ‘সমান্তরাল’ এই আপত্তির বেশ বড়ন আছে। “বর্ধ আদর্শ। আদর্শ বলিয়া বর্ণের সম্পূর্ণ বাজনা অন্ততঃ practical বর্ধও অপ্রতিবন্দ্যমান। তাই বলিণা বর্ধ যে পালনীয় নহে, তাহা নহে। বর্ধ মনী-তিকার মত বিখ্যা মোহজন্মের পূর্বার্ধ নহে ও বুঝা আশায় আধাসিত করিয়া হঠাৎ নিরাশার কঠোরভাৱ আচ্ছন্ন করে না। বর্ধ সত্য পদার্থ, মিথ্যা পদার্থ, উচ্ছল, শান্ত, বীর, স্থির, আভা-ময়, বর্ণের িকে মত অগ্রসর হইবে ততই তুমি আশ্রিত হইবে, শীতল হইবে, অথচ চির-জীবন, অস্ত্রে অস্ত্রে সাধু ব্যক্তি ক্রমেই বর্ণের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, কখনই স্পর্শ করিতে পারেন না। সারীণ। ক্রমেই পাচতর হয়, অথচ সাধুজা অনন্তকালসাধ্য।” আমাদের সমাজব্যবস্থাপক্ষণ এই দুঃসাধ্য বর্ধ এতোয়কের অন্তই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতোয়কেই এই impractical বর্ণের বাজনা করিতে হইবে। আদর্শ সকলের পক্ষেই সমান—তবে সাধনার প্রকারভেদ আছে।

বর্ধ আদর্শ হইলেও তাহা জানিবার উপায় কি? গ্রন্থারম্ভেই সরকার বহান্নর তাঁহার পাঠকগণকে বলিয়াছেন “অচ্ছন্দতা (individuality) কটি পাথর নহে; শুধাকথিত বিবেক কষ্টপাথর হইতে পারে না।” পাক্ষাত্য চরিত্রনীতিশাস্ত্রে বর্ধাবর্ণের কষ্টপাথর লইয়া বিভিন্ন আদ্যোচনা হইয়াছে। সে সমস্ত আদ্যোচনা সবেও সরকার বহান্নর দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন।

• “বেমোহখিলো বর্ধমূলং স্মৃতিশীলো চ ভবিষ্যৎ।

আচার্যশ্চৈব সাধুসামান্যনন্তস্তু রেখত।” বহু ২৬।

অবিল বেধ, বেদবিদগণের স্মৃতি ও শীল, সাধুগণের আচার ও আন্তর্যুপী এই সমুদায় বর্ণের মূল।

এই বিশেষ শতাব্দিতে বেদ ও শিষ্টাচারের দোহাই দেওয়া ব্যতিক্রমই অসম সাহিত্যের পরিচায়ক ; কিন্তু সত্য কথা বলিবার সাহস থাকে এয়োজম। সত্য বটে 'বেদাঃ বিত্তিয়াঃ শ্বতরো বিত্তিয়াঃ'। এবং মহাজনও অনেক, কিন্তু তবুও মহাজনের পন্থা ভিন্ন পন্থান্তর নাই। বিবেক সকলের একত্রণ নহে ; অজ্ঞিত জ্ঞানদ্বারা বর্ধাবধের দীবালা সকল সময় সম্ভবপর নহে। সুতরাং মহাজনের পন্থাসুসরণ ভিন্ন উপায় আর কি আছে ? মহাজন অনেক বলিয়া আত্মতুষ্টির কথা বলা হইয়াছে। সন্দেহজনক স্থানে যে মহাজনের পন্থাসুসরণ করিলে তোমার আত্মতুষ্টি ১২ তাহার অনুসরণ করিলেই তোমার ধর্ম হইবে। ভ্রাতৃত্বাত্মক কষ্টপাতর বাহাই হউক তাহার প্রয়োগ বশম হুসাধ্য নহে এবং প্রয়োগদ্বারা সকলে যখন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না—তখন আত্মতুষ্টি ভিন্ন পন্থান্তর নাই। কিন্তু এই আত্মতুষ্টি বৈদগ্ধ্যশিষ্টাচারসম্মত বিধে হওয়া চাহি। তদ্বিপরীত বিধে আত্মতুষ্টি হইলে যুক্তিতে হইবে, তোমার অর্ধেকটী তুষ্টি, বর্ধে নহে। 'সমাত্মনী'তে এতখানি বিনয়রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বর্ধাবধের কষ্টপাতর নির্ধার করিয়া গ্রন্থকার বর্ধাবধের অনেকগুলি উপায়ের নির্দেশ করিয়াছেন। বহু সহস্র বৎসরের সাধনার ফলে ভারতবর্ষ যুক্তিগত—অহিংসা বিভাবর্ধ। আরহা আনুসিক বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহি—পরীরক্ষার্থে অহিংসা ধর্ম। সরকার মহাপর বলেন, "ব্রহ্মচর্য্য। সকলের পক্ষেই সকল সময়েই পালনীয়" "আর ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ গোপসাধন হইতে বিরতি।" ব্রহ্মচর্য্য সকলের পালনীয় এই জ্ঞান যে এই অমিত্য পরিবর্তনশীল সংসারে কেবল ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা ই নিত্য নিবিকার সত্তার উপলব্ধি করা যায়। সমাজের দে যে ব্যবস্থার এই ব্রহ্মচর্য্যের পরিপোষণ করে, সরকার মহাপর বিনতি করিয়া বলিয়াছেন, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না। এই ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শেই লক্ষ্য হিঁর রাখিয়া গ্রন্থকার গৃহস্থের ধর্ম, নারীর ধর্ম, শাস্ত্রা ধর্ম, প্রভৃতির নির্দেশ করিয়াছেন। সবস্তরের আলোচনা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অসম্ভব। গাছের ধর্মের তিনটি মূল কথা ;—অকণ্ট্র হওয়া, অপ্রবাসী হওয়া ও নিজের অবস্থার সঙ্কট থাকে। অপ্রবাসী হওয়া কেবল উচিত তাহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"প্রবাসে ভক্তি ও শাস্তি দুইটি, প্রবাসে বৎসবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য দুই হয় না এবং বহুব্যাধের সম্যক স্মরণ হয় না।" প্রবাসে এক পক্ষের পেটের পূরণ আর বিত্ত বা অবিত্ত ভোগে বাসীচর্মির ধানের দানবোধের সম্মুখ হাড়া ক্লিষ্টকালপাণি কিছুই নাই। প্রবাসীর পৈতৃক গৃহবৈষম্যের সেবা হয় না, প্রবাসীর পৈতৃক গৃহে অতিথি স্থান পায় না। প্রবাসীর পিতৃপুত্রবন্দের সঙ্গে সম্পর্ক নাই—ব্রাহ্ম নাই, শাস্তি নাই, দেশের লোকের ঐক্যবন্ধ নাই। প্রবাসে হিন্দুর বহুব্যাধ থাকে না। সন্তোষ হইতে আলস্য আসিয়া পড়িতে পারে। এ কথার উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—যদি অতিথি বৈষম্যের পূজা, অবস্ত্রপোষ্যের পালন, পেট-পূজার যত এয়োজনীয় মনে করি তাহা হইলে আরহা অলস হইবার অবসর পাইব না। আভের পর আরহা পিতৃলোকের নিকট বস চাহি—

"যাতারো মোহতিবর্ধন্ত্যং বেদাঃ সন্ততির্যত।

ব্রহ্ম চ নো বাধ্যমং বহুধেরক মেহতিতি ।" যত্ন ১০২০২।

“আমাদের হুলে দাঁটার সংখ্যা তুচ্ছ পাউক—বের বস্ত্র সংখ্যা তুচ্ছ হউক।” যে ঐকান্তিকতা সহকারে ঐকগণ আর্থনা আপনায় পিতৃপুরুষদের কাছে করিতে পারে, সে কি কখন আর অলস হইতে পারে? দারীদর্প লব্ধে গ্রহকার বহুর বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীলোক বলে; পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে ও স্বামী বহিরা গেলে পুত্রের বশে থাকিবে। কিন্তু কখনও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবে না। শ্রীলোকের স্বামীর সঙ্গে ভিন্ন বস্ত্র নাই, স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত ও উপবাস নাই, কেবল পতি-সেবা ঘরাই শ্রীলোক অর্পণ সমন করেন! গ্রহকার শ্রীপুরুষের সাধ্যাব্যবহার বিরোধী।

এ সমস্তই সনাতনী কথা কিন্তু যে রকম দিন কাল পড়িয়াছে তাহাতে এ সমস্ত কথার পুনরুজ্জীবন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ সমস্ত ভিন্ন আর একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা ‘সনাতনী’তে আছে। সেটি আতিথেয়। গ্রহকার বলিয়াছেন “অন্যভেদেই আতিথ্য সূত্র: ‘সংসারের নিয়মেই ইচ্ছার স্থিতি এবং শত্রুরবীজেই জাতকের ভাতি নই। গুণ-ভেদে আতিথেয় অনন্তর কথা। আপনায় গুণে নিমিলিত্য হওয়া যায়, উলবটবিলের গুণে সহায় অধিকার পাওয়া যায় কিন্তু কোনও বিধি বাবহার বাহালী ইংরেজ হইতে পারে না।” বিধাধিহীন বহা তপতা করিয়া ব্রাহ্মণের অধিকার পাইয়া ছিলেন রাজ, ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। বীজগুণের অন্ত বিধাংগুণের আবশ্যক। বীজগুণের অন্ত অঙ্গগুণ আবশ্যক বটে: কিন্তু ভিন্ন বর্ণের আর অঙ্গগুণ হয় না, এ বড়টী সর্ববাদি-সম্মত নহে। বহাভারতের সময়ে পুত্র সূপকারের অন্ত ব্রাহ্মণ কত্রির সকলেই গ্রহণ করিতেন।

গ্রহবাসির একটু পরিচয় মিলাই। এখন ‘এবাসী’র সমালোচনার একটু পরিচয় দিয়া উপসংহার করিব। গ্রহের পূর্বসূত্রিকার গ্রহকার বলিয়াছেন “আজকাল অনেক শিক্ষিত লোকেই পরিবর্তনপ্রণালী। বলে করেন বর্ষে, সমাজে, শিক্ষায়, শীকার সকল বিষয়েই নিরন্ত পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। সংসারের পতিই যেন কেবল নিরন্ত পরি-বর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। পরিবর্তনদ্বারাই সকল পদার্থের যেন পরিষ্কৃত হইতেছে। এটা ভীষণের বিশ্বাস, কিন্তু এটা একটা বিঘন জ্ঞাপনিকা ব্যরণ।” ‘এবাসী’র সমালোচক এই বক্তব্যের উপর ভীষণ রেখাণ বর্ণন করিয়াছেন। স্রষ্টার বহাশ্রয়ের বক্তব্যটি যৌব হয় উপরোক্ত করেক পংক্তিতে সম্যক পরিষ্কৃত হয় নাই। এই সংসারের পতি যে কেবল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা ভীষণ উদ্বেগ হইতেই পারে না। ভীষণ বক্তব্য—অনন্ত পরিবর্তনের মধ্যেও এক বিভা নির্জিকার সম্ভাৱিয়াছে। পরিবর্তন সং নহে। স্রষ্টার চতুর্দিকে অব্যবহৃত পরিবর্তন সং-চিত হইতেছে বলিয়াই যে ভোর করিয়া পরিবর্তনকে টানিয়া আনিতে হইবে এখন কোনও কথা নাই। পরিবর্তন যে বিভা পদার্থকে প্রকাশিত করিতে চাহে কিন্তু প্রকাশিত করিতে পারে না তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পরিবর্তনের অন্তই পরিবর্তনকে আচ্ছাদন করা সম্ভব নহে। এই পরিবর্তনশীল বাহু অগতে অপরিবর্তনীয় কিছু না পাইয়া অগতের প্রত্যেক মুগেই সাধক ও দার্শনিকগণ পরিবর্তনের নিয়মেণে এক

নির্মিতকার পদার্থের অনুসন্ধান করিয়াছেন। পরিবর্তন যেমন জগতের শিবন, এই পরিবর্তনের সন্ধানও তেমনই মানবমনের সহস্রাত অভিযান। যেমন জড়জগতে তেমনই মানব-সমাজে পরিবর্তনবিপ্লবের নিয়মেণে সেই নিত্য পুঙ্খ বিয়ান করিতেছেন। এই এককাশ ও অগ্রকাশের মধ্যে কোমল সেতু আশাদের সাধারণ চক্ষুর গোচর নহে। কিন্তু অগ্রকাশ বহন আশ্রয় তখন ঊহাতে পৌছিবার পথও নিশ্চরই আছে। সূর্যর আলি হইতে এই পথ আধিক্যের অস্ত্র মাতুল অবিরাম চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টার সফল হইয়াছেন বলিয়া অনেকে দাবী করিয়াছেন। ঊহারা বলেন, ঊহাদের নিশ্চিই পথে সেই নির্মিতকার সত্য লাভ অবশ্যতাবী। শুধু পথের নির্দেশ করিয়াই ঊহারা বিস্তৃত করেন নাই; ঊহারা সমাজকে এমন ভাবে গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন—বাহ্যতে উক্ত পথ অবলম্বন করা সহজসাধ্য হয়। সরকার মহাশয় বিশ্বাস করেন, এই পথে সেই নির্মিতকার সত্য লাভ সাধ্য। গায়। সুতরাং জগৎ সত্য পরিবর্তিত হইতেছে বলিয়া এই পথ পরিত্যাগ করতঃ পরিবর্তন আনয়ন করা ঊহার মতে সম্ভব নহে। যে সমাজব্যবস্থা এই পথকে সুগম করিয়া দেয় তাহার পরিবর্তনেরও তিনি সমর্থন করেন না। সুবিধি সমাজে বঞ্চেই আছে; তাহার পরিবর্তন করা, কিন্তু যে বিধিগুলি সেই নিত্য পদার্থের দিকে আমাদিগকে লইয়া যায়—তাহারও যদি পরিবর্তন করিতে চাহ, তাহা হইলে বলিব “বানো, আর নয়।” জগৎ পরিবর্তনশীল, — অতি সত্য। না হইলে ত বাঁচিয়া বাইতাম। উপরোক্ত সমাজ পথের উপকারিতার ক্রমেই লোকের বিশ্বাস লোপ হইবে তাহাও সত্য, সমাজের বিধি সবই পরিবর্তিত হইবে। কিন্তু তাহাই পরিবর্তনের শেষ বহে তাহার পরেও পরিবর্তন আছে, সে অতি ভীষণ; সে মহাশয়দের পরিবর্তন। সব জগৎ হইবে, কিন্তু পরবর্তী বস্তুতে সেই সমাজের পথ আবার অতি কষ্টে আবিষ্কৃত হইবে, আবার লক্ষ লক্ষ লোক সেই পথে চলিবে; পুনরায় ত্যাগ করিবে, আবার সব এলায়-সাগরে লীন হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমি বাহ্যকে সত্য বলি তাহা হুঁকি তাহাকে ছাড়িব কেন?

সরকার মহাশয় বলিয়াছেন “গুণভেদে জাতিভেদ অসম্ভব কথা।” ‘এবাণীর’ সমাজ-গোচক স্রীতা হইতে “গাতুর্জগৎ হয়। সূর্য গুণকর্মবিভাগঃ” উদ্ধৃত করিয়া সরকার মহাশয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখানেও সমালোচকের অবধানতা। বিভিন্ন জাতির মধ্যে গুণভেদ অস্বীকার করা যে সরকার মহাশয়ের উদ্দেশ্য নহে, সে কথাও বলিয়া দিতে হইতেছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। গুণভেদ ত আছেই; কিন্তু সেই গুণভেদ হইতে জাতিভেদের উৎপত্তি হয় নাই। আজিকালি অনেকে বলিয়া থাকেন—ব্রাহ্মণ সেম বেমন গুণবিভাগ দ্বারা কোলিত্র এবা হাগন করিয়াছিলেন, তেমনই পূর্বকালে জাতি-বিভাগও সংঘটিত হইয়াছিল। সরকার মহাশয় এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ঊহার মত পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এক আর্যজাতি কালক্রমে ব্রাহ্মণ ক্রমি বৈশ্য এই তিন জাতিতে বিভক্ত হইয়, পড়িয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের অনার্য্যগণ পূরাজাতিতে পরিণত হইয়াছিল—একথা ত

বেশী দিন উল্লেখ্য। এ কথা উল্লিখ্য পূর্বে ব্রাহ্মণ কত্রি বৈশ্ব ঐতিহ্য জাতি যে বীজতঃ জিহ্ন
এ কথা সকলেই বিবাক করিত। সেই প্রাচীন বতকেই সরকার মহাশয় বক্তা বলিয়াছেন।
এই বক্তার একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও তাঁহার পুস্তকে না আছে এমন নহে। 'সনাতনী'
১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠায় আছে "অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন গ্রন্থে ব্রাহ্মণের ভাষাতে
আগমন ও অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন পরে কত্রি ও বৈশ্ব রূপে রূপে পরে পরে আসেন।"
বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া যদি ব্রাহ্মণ কত্রি বৈশ্ব ঐতিহ্য নামে
পরিচিত হইয়া থাকেন—তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই।
বীজশক্তি সম্বন্ধে 'প্রবাসী'র সমালোচক অনেক কথা বলিয়াছেন। তাগতে তাঁহার
Darwin, Weismann, Spencer ঐতিহ্য পণ্ডিতের সন্নিহিত বংশে পরিচয়ের প্রমাণ থাকিলেও
আদম কথটির কোনও সীমাবদ্ধতা নাই। সরকার মহাশয় বীজসংশ্লিষ্টতার বিরোধী।
তাঁহার বক্তার বক্তন করিতে হইলে বীজসংশ্লিষ্টতা জাতির উন্নতি হয়, দেখাইতে হইবে :—
সমালোচক তাহা দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। পক্ষান বংশের শিকার নিগ্রোজাতি যদি
যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়া থাকে—সে উন্নতির কারণ শিক্ষা, অস্ত্র জাতির সন্নিহিত ব্রহ্ম-
সংশ্লিষ্ট নহে। বহুকাল পূত হইলে কি হয়, বলা যায় না, কিন্তু কয়েক পুরুষ
ব্যবহৃত ব্রহ্মসংশ্লিষ্টতার ফল যে নিগ্রোই লাভান হয়, তাহার প্রমাণ সর্বদেখেই
পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়াই আমাদের দেশের কতিপয় পণ্ডিতকে বড় ভয় করিতেন।
সমালোচক বলিয়াছেন, "বর্তমান ভারতীয় হিন্দুজাতি যে বহু বিভিন্ন জাতির 'সংশ্লিষ্ট'
উৎপন্ন, ইহা একটা ঐতিহাসিক সত্য, এবং উপজাতি সকলের যে কত সংশ্লিষ্ট
হইয়াছে—তাঁহার তো ইয়তাই নাই।" বক্তার সংশ্লিষ্টতা যে ভারতে হয় নাই—এ কথা
বলিবার সাহস আমাদের নাই। কিন্তু নিগ্রোজাতিও জাতি কখনও শুদ্ধবীজ
জাতির সন্নিহিত হিঙ্গা বাইতে পারে নাই। আজ পর্য্যন্ত তাহার বক্তা হইয়া আছে।
ব্রাহ্মণ পুস্তকত্রাকে বিবাক করিলে উক্ত বিবাহোৎসব কত্রার বংশধরের (বিবাহপণ্ডিত অব-
লম্বন করিলে) কয়েক পুরুষ পরে ব্রাহ্মণ হইবার বিধি বক্ততে আছে বটে, কিন্তু তাৎপাৎ:
যে তাহা হয় নাই—অসংখ্য মিল জাতিঃ অস্তিত্ব দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মণ কত্রি
বৈশ্ব এই তিন জাতির মধ্যে মিল রক্ত যে গুণ কবই আছে—নিগ্রোর মিলনী ও তাঁহার
বক্তাবলী কয়েকজন ভিন্ন আর কেহই তাহা অস্বীকার করিবেন না।

শিকাগারঃ যে প্রত্যেক জাতিই উন্নতিলাভে সমর্থ সে কথা সরকার মহাশয়ও অস্বীকার
করেন না। তিনি সর্বজাতির শিকারও বিরোধী নহেন। 'সনাতনী'র ১৬৩ পৃষ্ঠায়
থাকে "শিক্ষিত অশিক্ষিত পার্থক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতে কি সমাজের
শৃঙ্খলা থাকে না বজল হয়? বনের ভায়ে বিভ্রাণ্ড কেবল লানে সার্থক হয়। কিন্তু ঘনমানে
ও বিভ্রাদানে 'পার্থক্য' বিস্তার। x x x x x x এ হেন বিভ্রাণ্ড স্বয়ং উপার্জন করিয়া যদি
পাঁচ জনকে না দিলে, অথবা দুলা লইয়া যদি তাহার বিক্রয় করিতে থাকিলে, তাহা হইলে
তুনি বিভ্রাণ্ড সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে দিলে না, তা বজল হইবে কিরূপে? + + + + বেরণ
শরীরের অস্ত্র বল, বাহু, আতপ, বনের অস্ত্র, আত্মার অস্ত্র সেইরূপ সংদিকা প্রয়োজনীয়।

যে সমাজে সাধারণ লোভুক তাহা সহজে হুলস্থল না পায়, সে সমাজে আর সভ্য কিসে? সেই সমাজকে সত্তা অথবা সভ্যসাম্রাজ্য বলিতে হয় বল, কিন্তু তাহা সম্ভাব্য-হীন।” সরসার মহাপর বলেন, এতোক আভিই নীর বীজ শুদ্ধ হাবিরা যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে, কিন্তু অশুদ্ধ বীজে উন্নতি সম্ভব নহে! উন্নতি বলিতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ বুলিলে হইবে না, মনের একুত উন্নতি বুলিতে হইবে। আর শুধু বীজ শুদ্ধ থাকিলেই যে উন্নতি হইবে তাহাও নহে। ব্রাহ্মণের বীজ শুদ্ধ হইলেও মিল্লি, আক্কা, রাক্ষসুতামা প্রভৃতি এসেলে যে ব্রাহ্মণের অবস্থা অত্যন্ত হীন সরকার মহাপরই তাহা বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বড় ছিলেন—তিনি ব্রাহ্মণ্য করিতে পারিতেন বলিয়া। তাঁহার “উত্তমাকোত্তম” ও “জ্যোতি” এই ব্রাহ্মণ্যপার সহায়তা করিয়াছিল মাত্র। উত্তমাকোত্তম ও জ্যোতি হইয়াও ব্রাহ্মণ্যে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণের একুত কখনই হইত না। এই ব্রাহ্মণ্যপার সক্ষম ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ বড় হইয়াছিলেন। যে সময়ে সমাজ ব্যবস্থিত হইয়াছিল—তখন ব্রাহ্মণ্যপাই ব্রাহ্মণ্যপার সক্ষম হইয়াছিলেন। শিকার শুধে যাবতীর আভিই যদি ব্রাহ্মণ্যপার সক্ষম হয়—তাহা হইলে ব্রাহ্মণের প্রভুত থাকিবে না। আর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্যপার অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের একুতও বাইতে বলিয়াছে। কিন্তু এত নির্ধ্যাতন সহ করিয়াও যে ব্রাহ্মণ এত দিন টিকিয়া আছে—তাহার বীজবিশুদ্ধিই ইহার কারণ। এই বীজ বিশুদ্ধির অন্তই ব্রাহ্মণ এখনও ইচ্ছা করিলে বড় হইয়া উঠিতে পারিবে, পুনরায় পৈতৃক ভূমির অধিকারী হইবেন। সমালোচক মহাপর Darwin, Weismann, Spencer এর কথা না ভুলিলেই ভুল করিতেন। কেন না যোগাৎজিত গুণ সন্তানে সংক্রমিত হয় কি না সে সম্বন্ধে প্রতিভগণ এখনও নিঃসন্দেহরূপে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। সমালোচক যে accidental variation এর কথা বলিয়াছেন—তাঁহার অর্থ variation কেন তাহার কারণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু variation এর কারণও আছেই ওসবও ভুল্যে বিনা কারণে কেহ গ্রহণ হয় না। সুতরাং এই “accidental variation” বা ওসবও ভুল্যে কেন হয়—যত দিন তাহার কারণ আবিষ্কৃত না হয় তত দিন জৌহুরী বংশের অতটা গোবৎসকাল না করিলেই ভুল হয়।

“সর্গদ্বারবর্ণের মধ্যে শিকার বিভাগ হওয়ার বাহাদিগকে খুশ বলা হয়, তাহাদিগের মধ্যে এমন লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—বাহাদিগের চরণভলে বলিয়া ব্রাহ্মণ্যপণ বহুবৎসর শিক্ষালাভ করিতে পারেন ও উন্নত হইতে পারেন”—সমালোচকের এই উক্তি প্রতিবাদের আবোধ্য। আভিভেদ ও আভিবিবেচ এক কথা নহে। আভিভেদ আবাদের দেশে ছিল, আভি-বিবেচ ছিল না।

পশ্চিমে যে বক্তব্য, সরকার মহাপর জীবনের সত্য্যে অবশ্যবাসীর উপকারার্থ প্রচাৰণা দিখিয়া এতোক অবশ্যবাসিত্বীয় বক্তব্যবতাজন হইয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যিকগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র অবশিষ্ট আছেন। আশা করি, তাঁহার লেখনি আরও বহুদিন পর্য্যন্ত সৰল থাকিয়া জ্ঞান, বিশ্বাসদীর্ঘ, হতাপ বাঙ্গালীর পূর্বে বাহ্য বিশ্বাস ও আশা বিতরণ করিবে।

• জিতারকল্পে যার ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য ।

"Soil of Ancient India, Cradle of humanity hail ! hail !!
Venerable and efficient whom centuries of brutal
invasions have not yet buried under the dust of oblivion,
hail ! Fatherland of love, of poetry, and of science, may we
hail a revival of thy past ..."

—M. Louis Jacolliot's, 'Bible in India.'

আম আশাধের—অভাবের অভাব নাই—আর সকলে সেই অভাবগুলি
পূর্ণ করিয়া দিতেছে।—ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। কিন্তু বর্তমান, উন্নত
জাতি সকল যখন যৌর অজ্ঞানতাবিরুদ্ধ ছিল, ভারত তখন উন্নতির উচ্চ
শোণানে অবস্থিত ছিল।

পৃথিবীর অধুনাতন বাবতীয় উন্নত জাতির পূর্বে এই ভারতবর্ষেই প্রথম
উন্নতির বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তাহা হইতেই তদানীন্তন গ্রীক, ইতালীয় ও
মিশরীয় জাতিরা উন্নত হইতে পারিয়াছিল।*

অতি পুরাকালে হিন্দুদিগের সর্বতোমুখিনী প্রতিভা যে অর্বনোতিতেও
বিকশিত হইয়াছিল তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বর্ণবিভাগ।
মহাসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারত প্রকৃতি গ্রন্থপাঠে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে,

* The natives of India were not only more early civilised, but had
made greater progress in civilization than any other people.

—Robertson's Hist. Disq. Con. Anc. India.

Modern researches by western scholars and savants distinctly point
out that the mythologies, philosophies, creeds and customs of ancient
Greece, Italy and Egypt were of Asiatic, especially of Indian origin.

—Bose's Hindoo Civilization in Anc. America

Some of the most ancient of the Greek philosophers travelled into
India, that by conversing with the sages of that country they might
acquire some portion of the knowledge for which they were distinguished.

—Robertson's Hist. Disq. Con. Anc. India.

ବ୍ରାହ୍ମଣ କଞ୍ଚିର ବୈଷ୍ଣୁ ମୁଦ୍ରାଦିର ସେ ବର୍ଣ୍ଣବିଭାଗ ଇହା ଓହ୍ଲୁ ଏକ ଏକଟି ବିଷୟର ଉତ୍ପତ୍ତିକରେ ଏକ ଏକଟି ଶ୍ରେଣୀ; କ୍ରମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଳକ୍ୟନୀର ଅହୁମାନେର କଲେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ସମାକଳେତ୍ରେ ଏକ ଏକଟି ପ୍ରାଚୀରବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ଇହାର ନିରାକରଣ ସେ ସମୟ ବ୍ରାହ୍ମଣେତର ଜାତିର ଅସାଧ୍ୟ ଥିଲ ।

ତତ୍ତ୍ୱାନୁଜ୍ଞାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରା ବେତ୍ତମ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାବଳେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ-ବିଭାଗ କରିହାନ୍ତିଲେନ, ତାହା ଓହାହା ଶେଷେ ଆପନାରାହି ଗ୍ରାସିତେ ପାରିଲେନ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବିତା ବର୍ଣ୍ଣବିଚାର କରା ହେଲ ନା, ସେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲ ଏବଂ ଏହି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉ ନା ପେଲ ।*

ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବିଭାଗ ପୂର୍ବେ କର୍ମୀରୂପ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ: କର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ହେଉ ଉଠିଲ । କେନ ସେ ଏତ୍ତମ ହେଲ ତାହା ବଳା କଠିନ । ଶ୍ରବଣତ: ଚାରିଟି ବିଭାଗ ହେଲ, ତାହାଦେର ଯଥା କେହ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିବେ, କେହ ଗ୍ରାସ୍ତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ, କେହ ବନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ଓ ଦେଶେ ବାହାଡେ ଅର୍ଥାଗମ ହର ତାହାହି କରିବେ, ଆଉ ଶେଷୋକ୍ତ ଜାତି ଉକ୍ତ ଜାତିକ୍ରେର ଦାମସ କରିବେ । ପରେ ଇହାଦେର ଯଥା ଦୃତୀଯୋକ୍ତ ଜାତି ନାନା ଡାପେ ବିଭକ୍ତ ହେଉ ଉଠିଲ । ବଡ଼ ଉପାରେ ବନାର୍ଜନ ହର ଡତଡ଼ଲି ଶାଖା ଜାତିଓ ହେଲ । ଇହାଡେ ଶିଳ୍ପ ବାସିଜ୍ୟ କ୍ରବିର ଜଡ଼ ସତର ସତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ ହେଉ ନେଲ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ୟ-ବିଭାଗ (Division of labour) କ୍ରମେ ଅନ୍ୟସବେ ପରିଣତ (Birthright) ହେଲ । କିନ୍ତୁ ଆବାର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବିଭାଗେର ପରଓ ଦେଖା ବାର ସେ, କେହ କେହ କର୍ମଜେଦେ ବର୍ଣ୍ଣବିତ୍ର ଓହା ହେଉଛାଲେନ । x

- * ଅଧ୍ୟାପନସଂସାଦନଂ ସଞ୍ଜନଂ ବାଜନଂ ଡଣା ।
- ସାନ: ପ୍ରତିଗ୍ରହକୈବ ବ୍ରାହ୍ମଣା ନାମକଜଗତଂ ।
- ଓଜାନାଂ ଡକ୍ଷଣଂ ସାନବିଜ୍ୟାସାରସବେତ ।
- ବିଷୟେବଂସଜିକ୍ତ କଞ୍ଚିରତ ସମାସତ: ।
- ମନ୍ତ୍ରାଂ ଡକ୍ଷଣଂ ସାନବିଜ୍ୟାସାରସବେତ ।
- ବନିକ୍ଷପଂ: କୃତ୍ତ୍ୱୀୟକ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ରବିବେତ ।
- ଏକସେବ ତୁ ମୁକ୍ତ ଓହ୍ଲୁ: କର୍ମ ସମାସିନଂ ।
- ଏତେବାସେବ ବର୍ଣ୍ଣାଂ ଓହ୍ଲୁବା ସବହରା"—ସହ, ୧୩ ଅଧ୍ୟାୟ,

୮୯-୧୧ ଗୋକ ।

x ନ ବିଶେଷ୍ଟା ହିତି ବର୍ଣ୍ଣାଂ ସର୍ବଂ ଗ୍ରହଣିତଂ ଜଗତଂ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣା ପୂର୍ବ କଠିନ ହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବର୍ଣ୍ଣାତଂ ମତଂ ।—ସହାତାରତ ।

মানুষ যখন উন্নতিচক্রে উঠিতে থাকে তখন ক্রমশঃ তাহাকে কতকগুলি অভাব বোধ করিতে হয়। অভাব হইলে তাহার মোচনের পণ্ড আবিষ্কৃত হয়। এই অভাব মোচনের তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষা হইতেই মানুষের উদ্ধাবনী শক্তি বিকশিত হয়। যে জাতি যত অধিক উন্নত ও সম্ভ্য হইবে তাহার অভাবও ঠিক সেই মত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অভাব নানা প্রকারের, তাহার মোচনও নানা উপায়ে করিতে হয়। অর্থই তাহার মধ্যে প্রধানতম। কাবেই অর্থগণের লব্ধ শিল্প বাণিজ্য কৃষির আশ্রয় লইতে হয়। অভাবই উন্নতির মূল। মানুষের জাতীয় অবস্থা এই অভাবের মধ্য দিয়াই পূর্ণ ক্ষুণ্ণি পাইয়া থাকে।

এই হিন্দু জাতির পূর্বপুরুষগণ যখন এইরূপে অর্থোপার্জননের লব্ধ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তাহারা বৃদ্ধিতে পারিয়াছিলেন “বাণিজ্যে বসতে লম্বী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ষণি।” এখন, আমরা এই বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য ও বণিক্ জাতির সংশ্লিষ্ট পরিচয় দিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বোধ হয় লগতে আর নাই। সেই গ্রন্থেই প্রাচীন কালে ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের বাণিজ্য ব্যবসার ও এই বাণিজ্যক্ষেত্রেই সমুদ্র যাত্রার অনেক উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। (ঋগ্বেদ ; ১ম মণ্ডল, ২৫ হুক্ত ; ৭ শ্লক ; ১ম মণ্ডল, ৪৮ হুক্ত, ৩ শ্লক)।

ইহা ব্যতীত মহাভারত, রামায়ণ, মহাসংহিতা গ্রন্থেও ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। মহাভারতের সভা পর্বে ও মহারাণ ধৃতিশিরের রাজত্বের যজ্ঞোপলক্ষে নানা দেশাগত রাজস্ববর্ণের প্রদত্ত উপঢৌকনের তালিকা দৃষ্টে অনেক প্রকার বস্তুর নাম দেখা যায়। সে সকল ভারতবর্ষে উৎপন্নই হয় না—বিশেষ হইতে আনীত। এবং আরও দেখা যায় যে, হিন্দুদিগের সহিত অন্তঃদেশীয়দিগের সম্বন্ধিতি ছিল। রামায়ণেও অযোধ্যার সমৃদ্ধি বর্ণনার আদি কালে ও সূন্দর কালে, শিল্প বাণিজ্যের চরম উৎকর্ষ দেখা যায়। মহাসংহিতায় বাণিজ্যসংক্রান্ত সকল প্রকার বিধিই আছে, যেমন সমুদ্র যাত্রা (যখন বিলাস-বাসনা অথবা অধ্যয়ন-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে হুয়োপে যাওয়ার প্রথা ছিল না, তখন বাণিজ্যই তাহার একমাত্র কারণ গণ্য করা যাইতে

যমু বৈবস্বতের সম্ভাবনের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ বা শূদ্রও হইয়াছিলেন। দাতাপারিষ্টের দুই পুত্র একবার বৈশ্য হইয়াছিলেন পুনরায় তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বিবাহিত স্ত্রী ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন।

পারে), পণ্য বিক্রয়ে লাভ ও ক্ষতি, যৌথ ব্যবসায়, শুক, বণিকের প্রভাবাদি
শাস্তি, চুক্তির সময় পণ্যগণের নিষেধ, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট পণ্য জন্মের
সংক্রিয়ণে শাস্তি, ঋণ, কৃষি প্রভৃতি বাণিজ্যসংক্রান্ত নানা বিষয়ের উপদেশ
ও কর্তব্য নির্দেশিত আছে। বাণিজ্যের ক্ষয় বধন দত্ত বিধিও প্রচলিত,
তখন বাণিজ্য যে বহুল পরিমাণে ছিল, এবং সমুদ্র-যাত্রার কথায় ভারতের
বাহিরেও যে ভারতের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল—এ সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত
হওয়া যায় ।

দ্বিতীয় কথা, তখন বাহ্যিক বাণিজ্যকেই জীবনরুত্তি করিয়াছিলেন সেই
বণিক জাতির অধিকার ও সম্মান শুনিলে বাস্তবিক স্তম্ভিত হইতে হয় এবং
বুঝিতে পারা যায় যে, সেকালের লোকের বাণিজ্যের প্রতি কি গভীর
প্রভা ছিল ।

মহারাজ হুবিষ্টির রাজত্বের যজ্ঞোপলক্ষে নিমন্ত্রণের তালিকার বলিতেছেন
“মাননীয় বৈশ্বগণকে আমন্ত্রণ করিবে” । * সে কালে বেদে অধিকার বড়
একটি সোজা কথা ছিল না, কিন্তু বৈশ্ব জাতির বেদাধিকারও ছিল । শুধু
অধিকার নহে, বেদাধ্যয়ন তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য ছিল । †

বহুসংহিতার হিন্দুদিগের সামাজিক, রাজ্যিক, নৈতিক বিধি ব্যবস্থা বাস্তব
বাণিজ্যসংক্রান্ত নিয়মাবলী লিখিত, তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি । রামায়ণে
ও মহাভারতে যে প্রাচীন হিন্দুদিগের আর্থিক অবস্থার বর্ণনা আছে তাহাতে
বেশ নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে ভারতবর্ষ শিল্পবাণিজ্যের
মহামেলা ছিল । কারণ, যাহুবেগ উন্নত অবস্থার যে সমস্ত বিলাসোপযোগী
সামগ্রীর প্রয়োজন সেগুলি শিল্প বাণিজ্য বিনা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব-
পর নহে । এ সব কি তবে কবির তত্ত্বনা বলিয়া উপেক্ষার কথা ? বাহা
আছে কবি তাহারই বর্ণনা করেন । কবির কাব্যই তবিল ইতিহাসের
প্রধান অবলম্বন । মহাস্ব চন্ড সত্যই বলিয়াছেন “Bards may be regarded
as the primitive historians of mankind.”—(Tod's Introduc-
tion to Rajasthan).

* “আমন্ত্রণ ধন রাজ্যে ব্রাহ্মণ ভূমিপালক ।

বিশ্বত সাক্ষ্য সূত্রাং স্ত সর্কানানরতে তিচ”—মহাভারত, সভাপর্ক ।

† “জননীত) ধিমে বেদানহুংপাত্ত তথা হৃতান ।

অনিষ্ট,। চৈব বৈজ্ঞান্য মোকবিজ্ঞান ব্রহ্মত্যাগ: ।—বহু, বর্ষ-অঃ, ৩৭৫০:

বিদ্য, ব্রাহ্মণ কর্ত্তির ও বৈশ্ব ।

পণ্ডিত প্রবর রবার্টসন তাই বলেন —“Whoever examines the whole work cannot entertain doubt of its containing the jurisprudence of an enlightened and *civilized* people.”—Robertson's Hist. Disq. Con. Anc. India.

অন্ত হইতে প্রায় সার্ব্ব তিন সহস্র বৎসরেরও পূর্বেও, প্রত্নতত্ত্ব হইতে প্রথম যশা, নীল, ও অন্যান্য অনেক বস্তু মিশরে প্রেরিত হইত। মিশর ও ইতালী দেশ হইতে বহু সংখ্যক পণ্যবাহী পোত আসিয়া মালাবার উপকূলে উপস্থিত হইত এবং এই ভারতবর্ষ হইতে অনেক প্রকার পণ্যদ্রব্য লইয়া বদেশে প্রত্যাপন করিত। এইরূপ সার্ব্ব তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ভারত বর্ষ প্রভীচা দেশের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিল।

চীন দেশ কোমের বস্ত্রের অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিখ্যাত। এই চীনদেশীয় বস্ত্র ভারতবর্ষেও আমদানি হইত। চীনের সেই বস্ত্র এ দেশে তখন অত্যন্ত সমাদৃতও হইত। চীন বস্ত্রের উল্লেখ কালিদাসের গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

“গচ্ছতি পুরঃ শরীরং দাবতি পশ্চাদনঃস্থিতং চেতঃ

চীনাংগক মিবকেতোঃ প্রতিবাতঃনীরমানস্ত।”

—শকুন্তলা, প্রথম অঙ্ক।

হিন্দুরা এই প্রাচীন বাণিজ্যকালে যে সমুদ্র-বাত্ম্যও করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এ বিষয় পরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। হিন্দুরা তৎকালে অতি প্রবল বণিকজাতি ছিল, তাহার বাণিজ্যের অস্ত্র জীবন পণ করিয়াছিলেন—কিসে দেশে বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতি হয়। পরবর্তী পুরাণোক্ত নিবেদনবিধিই প্রমাণ করিতেছে যে, পূর্বে হিন্দুদিগকে সমুদ্র-বাত্ম্য করিলে জাতিভেদ হইতে হইত না।

এ দেশে জায়ফল, দারুচিনি উৎপন্ন হয় না, ভারতীয় বীপপুঞ্জই এগুলি প্রকৃত পরিমানে আছে; কিন্তু তাৎকালিক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঔষধের উপাদান-স্বরূপ এগুলির যে নাম দৃষ্ট হয় ইহাতেই বুঝা যায় যে, এগুলিও এ দেশে আমদানি হইত।

সামান্যে আছে, ভরত যখন অবোধ্যার আইলেন তখন তাহার বাত্ম্যই তাহাকে কথঞ্চিৎ, হরিণচর্ম, উত্তম বস্ত্র ও অনেকগুলি কুকুর দিয়াছিলেন।

অবোধ্য। কান্তের অষ্ট বহিঃস্থ অধাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, দূতগণ পঞ্চনদের নতর ও বিপাশা নদী পার হইয়া বহুদূর পূর্বতমর কেকয় নগরে পৌছেন। তবেই কেকয় নগর যে বর্তমান কান্দীর দেশ ইহা বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কান্দীর এবং তদ্ব্যবস্থিত তিব্বত দেশ অন্তাপিও শাল ও পশবী বস্ত্রের জন্ম বিখ্যাত। সুতরাং কেকয়রাজপ্রদত্ত কবল ও উত্তম বস্ত্র বে, কান্দীরীর অথবা তিব্বতীর বস্ত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবেই দেখা গেল, প্রাচীন হিন্দুরা বানিজ্যের জন্ম জল, স্থল, পূর্বত, মন্ত্রভূমি কোথাও যাইতে ভীত হইতেন না। এই জন্মই বলিয়াহি প্রাচীন হিন্দুগণ বানিজ্যের জন্ম প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াছিলেন।

মহাবীর আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ কালে ভারতীয় অনেক দ্রব্য গ্রীস দেশে লইয়া যানেন। তন্মধ্যে কার্পাস, পিঙ্গলী, মস্ত, শুগন্ধি ভক্ষ্য দ্রব্য (বধা মশলা ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য। গ্রীকরাই সর্বপ্রথম যুরোপে শর্করা আমদানি করেন; তাহার পূর্বে এ দ্রব্য যুরোপে ছিল বলিয়া কোনই প্রমাণ নাই। নিম্নে ঐতিহাসিক দ্রব্যের নামোল্লেখ করিতেছি; তাহাতেই স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, আমাদের দেশে এই শব্দ গুলি বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু যুরোপে তদপেক্ষা অপ্রাচীন গ্রন্থেই ইহাদের নাম পাওয়া যায়; আর বিদেশীয় নামগুলিও সংস্কৃতেরই অমূর্তপ। তবেই এ গুলি যে এই দেশ হইতেই নীত তাহা বুঝা যাইবে—

সংস্কৃত	গ্রীক	ইংরাজী
কার্পাস	Karpas	Cotton
শর্করা	Sakhur	Sugar
চন্দন	Santanon	Sandal
পিঙ্গলী	Peperi	Pepper

ল্যাটিন Barus বা Baritus ও বোধ হয় সংস্কৃত “বারণ” শব্দ হইতেই গৃহীত। নীল ভারতের জিনিষ বলিয়া উহার নামও Indicum, Indigo ই রাখিয়া গিয়াছে।

পূর্বকালে যুরোপবর্তে যে সকল গন্ধ দ্রব্য বণ্টানি হইত অনেক অমুখান করেন, সে সকল গন্ধ দ্রব্য আরব দেশে উৎপন্ন হইত। কিন্তু রবার্টসন বলেন যে, আরবীয় বণিকরা ভারতবর্ষ হইতে গন্ধ দ্রব্য লইয়া গিয়া ঐ গন্ধ দ্রব্যই অধিক মূল্যে বিক্রয় করিত।

রোমের জনবিখ্যাত অভুল সমৃদ্ধির দিনেও রোমে ভারতীয় মুক্তার ঘণ্টে আদর ছিল। এমন কি রোমে বত প্রকার মুক্তা ও হীরক প্রেরিত হইত, তাহার অবিকাশেই ভারতজাত বা ভারতীয় বোপজাত। শুধন মুক্তার বিশেষ আদর ছিল। রোমীর পণ্ডিত প্লিনি (Pliny) বলেন, জ্লিয়ান্ সিলর ক্রটসের জননোকে একটি মুক্তা দিয়াছিলেন, তাহার মূল্য ৪৮৪৫৭ পাউণ্ড। মিশরের সম্রাটী সুল্লারীকুলোক্তমা ক্লিগোপেটোর দুইটি কুণ্ডলের মূল্য ১৬১৪৫৮ পাউণ্ড।

এই সময় রোমে রেশমের খুব আদর হইয়া উঠে। এই রেশম যে কি ও কি হইতে উৎপন্ন বর্ষ শতাব্দী পর্যন্ত যুরোপে কেহই তাহা অবগত ছিল না। যুরোপীয়রা ভাবিত, ইহাও বোধ হয় এক প্রকার হস্ততর তুলার কাপড়। এই রেশমের একমাত্র উৎপত্তিস্থান চীনদেশ। চীনদেশে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় এই রেশম ক্রয় করিয়া পরে যুরোপীয়দিগকে বিক্রয় করিত। এইরূপে, রেশমের উৎপত্তিস্থান চীন অপেক্ষা রেশম ব্যবসায়ের জন্য ভারতবর্ষই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এ প্রসিদ্ধির ঘণ্টে কারণও ছিল। ভারতবর্ষই নানাপ্রকার বস্ত্র, দ্রব্য সামগ্রী, পদ্মদ্রব্য, বিলাস দ্রব্য ইত্যাদীর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তৎকালের সকল উন্নত জাতিই এই ভারতবর্ষে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করিতে আসিত। ভারত হইতে পারন্ত দেশীয় বণিকরা এই রেশম ব্যবসারে অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। অবশেষে খৃষ্টীয় বর্ষ শতাব্দীর শেষভাগে দুইজন মিশনারী দেশত্রমণে বহির্গত হইয়া চীন হইতে কতকগুলি কোবকোট লুকাইয়া লইয়া আনিয়াছিলেন; ও রেশম প্রস্তুত করিবার প্রণালীও শিখিয়া আনিয়াছিলেন। রেশমের প্রস্তুত ভণ্য যুরোপে এই সর্ব প্রথম বিলাপিত হইল।

রোমের সহিত ভারতবর্ষের এই বিশাল বাণিজ্য বাপারে একশত কুড়িখানি বাণিজ্যপোত পণ্য বহন জন্য ভারতবর্ষে শুধন বাতারাভ করিত।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

রাজা মটুক রায় ।

কেতাবের বে স্থানে আরব্য উপক্ৰাসের কুমার লক্ষ্মন ও চীমারাজ-
কুমারী বেদৌরার উপাখ্যানের যত পরীক্ষণ গাঙ্গী ও চম্পাকে একত্র করিল
সেই স্থান হইতে জনপ্রবাদের সহিত কেতাবের আদৌ মিল নাট। জন-
প্রবাদ এইরূপ—গোরা গাঙ্গী নামে এক ফকির বাবা বনে বৃক্ষকৃৎ দেখাইয়া
বেড়াইত। যখন মটুক রাজার স্ত্রী কত্ৰা চম্পাবতী ওরফে সূতহার
বিবাহের কথা দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল তখন নানা স্থান হইতে
নানা রাজ্য উপলোকন সহ কত্ৰার তত্ত্ব করিতে আসিতে লাগিলেন। গোরা-
গাঙ্গীও কত্ৰার রূপে মুক্ত হইয়া বিবাহ করিবার মানসে তাঁহার ঢেলা কালু-
সাহের নিকট এক হাঁড়ি গহনা মুখবন্ধ করিয়া উপলোকন বস্ত্রপ পাঠাইয়া
দিয়াছিলেন। হাঁড়ি রাজবাটীতে পৌছিলে কেহ তাহার মুখ খুলিতে পারিল
না, চম্পাবতী যেমন হাঁড়ি স্পর্শ করিলেন অমনট হাঁড়ির মুখ খুলিয়া গেল ;
রাজকত্ৰা আগ্রহ সহকারে তাহার ভিতর যে সমস্ত স্ত্রবর্ণের অলঙ্কার ছিল
তাহা আগে পরিধান করিলেন। সেই গহনা আর কেহ রাজকত্ৰার অঙ্গ হইতে
থলাইতে পারিল না। কালু বলিলেন, গহনা যখন কত্ৰার গায় হইতে থনি-
তেছে না তখন গাঙ্গী সাহেবের রাজকত্ৰাকে বিবাহ করিবার অধিকার
অস্বিগাছে। রাজা কালুর কথার ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন এবং
নগরে আদেশ প্রচার করিলেন যে, ফকির দেখিলেই তাহাকে বন্দী করিবে।
গাঙ্গী সাহেব এই সংবাদ অবগত হইয়া স্ত্রীর বন হইতে বহু সংখ্যক বাঘ
সংগ্রহ করিয়া মটুক রাজার রাজ্য ধ্বংস করিতে আগমন করিলেন।

যেহায পাটনিগণ বাঘ দেখিয়া নৌকা ফেলিয়া পলায়ন করিল, গাঙ্গী
সাহেব ব্যাবসিককে মস্তবলে ভেড়া করিয়া রাখিলেন ও নদীর উপর কড়ে
জাল দিয়া নদী পার হইয়া মটুক রাজার জীবৎ কুণ্ড গোরস্তে অপবিষ্ট
করিয়া দিলেন। মটুক রাজা কালী-সাবক ছিলেন, কুণ্ডের জল কল্মষিত
হওয়ার রাজার সাধনার ব্যাঘাত হইল, মটুক রাজা গাঙ্গীর দৃঢ় ঐশ্বৰ্য্যাগ
করিলেন। গাঙ্গী সাহেব মটুক রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুর দাস ও কত্ৰা
চম্পাবতীকে মূলমামন প্রার্থে দীক্ষিত করিয়া তথায় একটি মূলমামনের দরগা
স্থাপিত করিলেন। ঠাকুর দাস মূলমামন হইয়া ঠাকুর বয় নাম ধারণ করি-

লেন আর চম্পাবতী—মাই চাম্পা নামে অভিহিতা হইলেন চম্পাবতীকে পাঞ্জী সাহেব মুসলমান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহ করিতে না পারিয়া কিছুদিন সবে রাবিয়া অবশেষে পনিমধ্যে পরিত্যাপ করিয়া গিয়াছিলেন। সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত বেত্রাবতী নদীর সন্নিকটে জিলা বোর্ডের সদর রাস্তার ধারে মাই চাম্পার দরগা অত্যাশি বিস্তারিত রহিয়াছে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সেই দরগার ছাপ ও কুতুহল দিয়া এখনও পূজা ও মানত করিয়া থাকেন। কান্তন মাসে তথায় একটা মেলা বসে। আর ২৪ পরগনা জিলার মধ্যে গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে চার প্রাণে ঠাকুর বর সাহেবের দরগা বর্তমান আছে। এ স্থানেও কান্তন মাসে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পীর সাহেবকে ভক্তি ও প্রজ্ঞা করিয়া থাকেন। এই দরগার পীর ঠাকুর বর সাহেবের আগে পৈতাম্বর চিহ্ন বর্তমান আছে, সেবাইৎ ফকিরগণ সেই ব্রাহ্মণ পীরের যজ্ঞোপবীতের চিহ্নটি আঁজিও রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। চার ঘাটের ব্রাহ্মণ পীর ঠাকুর বর সাহেবের ইতিহাসে একটি প্রাচীন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু বণিকের জীবনী নিহিত আছে। এক্ষণে দেবা বাড়িক, মুসলমান কেতাবের বয়ান অনুসারে স্মরণ বনে কোন সময়ে সেকন্দর নামে কোন মুসলমান রাজার নাম পাওয়া যায় কিনা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমরা পাঠান রাজা সাম-সুদ্দিন ইলিয়াস সাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকন্দর বাদশাহের নাম পাই। তিনিই পাণ্ডুর বিখ্যাত আফিনা মসজিদ নির্মাণ করান। তাঁহার পুত্র গিয়াসুদ্দিন হুছে পিতাকে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। আবারও সন্নিহিত ইতি-হাসের এই সেকন্দর বাদশাহের কোন সন্ধান নাই।

আবাদিগকে দেখিতে হইবে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্মরণ বনের নিকটবর্তী স্থানে সেকন্দর নামে কোন বাদশাহের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা?

গ্রন্থাত ঐতিহাসিক হাটীর লিখিয়াছেন - One Tajkhan Mansad Ali, accompanied by his younger brother Sikondar Pahalwanir the Wustter, conquered Hijili and founded a Muhāmadan settlement at the mouth of the Rasulpur river, Tajkhan's tomb still exists there but the inscriptions attached to the vault have not yet been published. Mansad Ali was

a holy man, Mansad Ali village south of Contaic still exists. After the death of Sikondar Pahalwan Tajkhan governed the country alone till in 1515 he buried himself alive.

সেকন্দর পলোয়ান নামে একজন মুসলমান বোদ্ধা হিজিলিতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ; আর তাঁহার রাজত্ব তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সত্ত্ব সত্ত্বই ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দীর্ঘের সম্রাটের হস্তগত হইয়াছিল ; ইহা আনন্ডা জানিতে পারিয়া । সেকন্দরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন সাধু পুরুষ ছিলেন । রাজ্যের ছেলের ককিরি শব্দে বড় আশ্চর্যের বিষয় মনে ; সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত ইহা সচরাচর চলিয়া আসিতেছে । অতএব সেকন্দর পলোয়ানের পুত্র পাঞ্জী সাহেব যে ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়া ককির হইবেন তাহা অসম্ভব মনে । মনসদ আলি বোদ্ধা ভ্রাতা সেকন্দর পলোয়ানের সাহায্যে রাজ্যস্থাপন করিলেন আবার ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে মনসদের অকাল মৃত্যুর সনে সত্ত্বই সে রাজ্যেরও লোপ হইয়া গেল । তাজ খাঁ ধার্মিক লোক ছিলেন, রাজ্য শাসন করা তাঁহার পক্ষে বড়ই দুঃস্বপ্ন কাব্য ছিল নতুবা তিনি শত্রুর ভয়ে জীবন্ত কবর পাইবেন কেন ? এতদ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সেকন্দরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাজ খাঁরও অস্তিত্ব শেষ হইয়াছিল । সেকন্দরের মৃত্যু যদি ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি হয় তাহা হইলে পাঞ্জী সাহেবের জন্মও ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে হইবার সম্ভাবনা । পাঞ্জী সাহেব যখন সাবালক হইয়াছেন, পিতা তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার তত্ত্ব অস্বরোধ করিতেছেন, সেই সময় তিনি ও কালু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলারান করেন । গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা “সাগর সমান” নদী পার হইয়া সুন্দর বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন । এক্ষণে দেখা দাঁউক সেকন্দর বাদসাহার বিরাট নগর—ইতিহাসের হিজিলি, কোন্ স্থানে অবস্থিত । আর সেই হিজিলি হইতে সুন্দর বন অকলে আসিতে হইলে, . পরে “সাগর সমান” কোন নদী পার হইতে হয় কি না ?

Hunter বলেন Hijili is the name of the coastland extending from the mouth of the Rupnorayan along the right bank of the Hugli river near Jaleshwar. Mr. Grant includes it in the Sundarbans.

এক্ষণে আমরা দৈর্ঘ্যেতেছি, বর্তমান বংশোদ্ভূত জিলার অন্তর্গত বিকার-

গাহার সন্নিকটে লাউজিনি গ্রাম—মটুক রাজার সেই রাজ্যনা নগর—হইতে সেকন্দের বাদসাহের হিজিলি ঠিক পশ্চিম না হইলেও একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করিতেছে। হিজিলি তমলুক অঞ্চল এক্ষণে বেদিনীপুরের মধ্যে পড়িলেও তখন সুলতর বনের অন্তর্গত ছিল। হিজিলি হইতে বহির্গত হইয়া প্রকৃত সুলতর বনে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমে “সাগর সমান” ভাগীরথী নদী পার হইতে হয়। গাজী সাহেবও সর্ক প্রথমে আশার সাহায্যে এই নদী পার হইয়া সুলতর বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাত বৎসর বনভ্রমণ করিয়া ককিরঘর শ্রীরাম রাজার ছাপাই নগরে আগমন করেন। কেতাবের এই বয়ানে কোন ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া অনুমান হয় না, তবে মটুক রাজার বাড়ীর উত্তর-পূর্ব কোণে বার বাজারে শ্রীরাম রাজার বাসভিটা ও প্রাচীন কীর্তির অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। হিজিলি হইতে বাহির হইয়া অগ্রে মটুক রাজার রাজ্য পার না হইয়া শ্রীরাম রাজার বার বাজারে (ছাপাই নগর) প্রবেশ করা যায় না। গাজী সাহেব যে অগ্রে মটুক রাজার রাজ্য ধ্বংস করিয়া পরে শ্রীরাম রাজার রাজ্য নষ্ট করিয়াছিলেন তাহা আমরা পরে দেখাইব। হিজিলি হইতে সোনাপুর ব্রাহ্মনা নগর যাইবার পথে শ্রীরাম রাজার সহিত কালু গাজীর সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভবপর নহে কেতাবে আছে, গাজী ও কালু শ্রীরাম রাজার ছাপাই নগর পরিত্যাগ করিয়া সুলতর বনে সোনাপুর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। মাতলা লাইনে বাকুইপুর নবভিবিলনের উত্তরে সোনাপুর গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। হিজলী হইতে সোনাপুর অধিক দূর নহে। সুলতর বনে প্রবেশ করিয়া বরাবর উত্তর দিকে অগ্রসর হইলে সমুখে সোনাপুর গ্রাম পড়ে। কালু ও গাজী অসংখ্য নদীবালপরিবৃত্ত দুর্গম বন ভ্রমণ করিতে করিতে যে দীর্ঘ সাত বৎসর পরে সোনাপুরে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা অসম্ভব নহে। এই সোনাপুরেই পরীপণ চম্পাবতীর সংবাদ গাজীকে দিয়াছিল ও দক্ষিণ দেশে মটুক রাজার বাড়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল। কিন্তু সোনাপুর হইতে মটুক রাজার বাড়ী উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থান করিতেছে। মটুক রাজার বাটী সম্বন্ধে পরীপণের ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু মটুক রাজার সেনাপতি যাহুব ছিলেন, তিনি দিক্ নির্ণয়ে কোন ভুল করেন নাই। দক্ষিণ দ্বার গঙ্গাধেবীর স্তুতি করিবার সময় বলিয়াছিলেন—

“পশ্চিম দেশেতে আছে বিরাট নগর,
পিতা ভাত্তর বাদসা জান নাম সেকন্দর ।”

ব্রাহ্মণ নগর হইতে হিজলি বিরাট নগর পশ্চিম দিকে বলিলে অস্ত্রায় বলা হয় না। অস্ত্রাপিও মধ্যবঙ্গে প্রবাহ আছে ‘জলে কুমীর ডাকায় বাব ।’ সুন্দর বনে গভীর জঙ্গলে ব্যাত্র ও কুমীরেরই একরূপ রাজত্ব ছিল। এই বাব কুমীর যে বশ করিতে পারিত তাহার পসার বাড়িয়া যািত : সেই কারণে আমরা মুসলমান ফকিরগণের বৃদ্ধকৃত্ত বধো সর্বাগ্রে ব্যাত্র বশ করিবার ক্রমতা দেখিতে পাই। যে স্থানে ফকির ও পীরের দরগা আছে সেই স্থানেই ব্যাত্রের কাহিনীও শুনিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, সুন্দর বন তখনও reclaimed হয় নাই, ব্যাত্র জঙ্গলের বধায় তথায় বুরিহা বেড়াইত, ব্যাত্র চর্ম সংগ্রহ করা সে সময় বড় কঠিন কাৰ ছিল না। মটুক রাজার সৈন্তদিগকে ভয় দেখাইবার জন্ত যে গাজী সাহেব সৈন্তদিগকে ব্যাত্রচর্ম পরাইয়া ব্রাহ্মণ নগরে উপস্থিত করেন না? তাহাই বা কে বলিতে পারে? •

উত্তর-পশ্চিম হইতে কোন শত্রু আসিয়া মটুক রাজার নগর আক্রমণ করিতে হইলে তাহাকে হরিহর নদী পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইত। এই কারণে আমরা মটুক রাজার রাজধানীর দক্ষিণে ‘কড়ি জাঙ্গলের’ নাম শুনিতে পাই। এই ‘কড়ি জাঙ্গলই’ যে হরিহর নদীর বাঁধ তাহাও পূর্বে বলিয়াছি। কড়ি জাঙ্গল শত্রুগণের দ্বারাও প্রস্তুত হইতে পারে কিম্বা ইহা হয় ত মটুক রাজা অথবা তাহার পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক পারা-পারের সুবিধার জন্ত নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। গাজী সাহেবের ব্যাত্র আছে আর মটুক রাজার যদি কুমীর না থাকিলে তবে বৃদ্ধ প্রবল হয় না। দক্ষিণ দিক এমন বীর যে, ব্যাত্রদলকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু গাজীর সহিত যুদ্ধে তিনি বাধা পড়িলেন, তাহা না হইলে গাজী সাহেবকে বড় করা যায় না। গাজী সাহেবের মাগী গঙ্গা দেবী, অম্বুপা সুন্দরী তাহার ভগিনী ; মটুক রাজাও গঙ্গাদেবীর বরপুত্র, গাজীও গঙ্গাদেবীর ভগিনীপুত্র। গাজী সাহেব মুসলমান হইয়াও হিন্দু ; তাই তাহার সহিত চম্পার দিবাহটা বড় বিসম্মত হয় না। রাজার পুত্র সৎজান লাভ করিয়া ফকিরী লইয়া বাগপ্রহ অবলম্বন করিলেন, পীর পরগছর হইয়া পড়িলেন, আবার তিনিই যদি এক হিন্দু রমণীর রূপ দেখিয়া পাগল হইয়া পড়েন, তাহা হইলে

তাহা সিদ্ধ ককিরের পক্ষে বড়ই লক্ষ্যের কথা হয়। সেই কারণেই বোধ করি মুসলমান পুঁথিকার এইরূপ একটা সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাহা হউক পাকী সাহেব যে মটুক রাজার রাজ্য ধ্বংস করিয়াও তৎকর্তা চম্পাবতীর পানিগ্রহণে সমর্থ হইবেন নাই, তাহা আমরা চম্পাবতীর কথায় দেখাইব। সেকেন্দর সাহের প্রথম হিজিলির settlement যদি ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে হয়, তাহা হইলে পাকী সাহেবের ১৪৮- খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি জন্ম হয়। পাকী সাহেবকে সাবালক হইয়া গৃহ ত্যাগ করিতেও অন্ততঃ ১৮১২ বৎসরের কম লাগে নাই। পাকী সাহেব প্রথমে সুন্দর বনেই ৭৮ বৎসর ঘুরিয়াছেন; পরে সোনাপুর নগর নির্মাণ করিয়া কিছু দিন বাস করিয়াছেন; তাহার পর চম্পাবতীকে বিবাহ করিবার লালসায় সুন্দর বনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সৈন্ত সামন্ত সংগ্রহ করিয়া এই দুর্গম বনভূমি পার হইয়া তবে মটুক রাজার বেশে গিয়া উঠিয়াছিলেন। তথায় তিনি নগর অবগোধ করিয়াছেন, বুদ্ধ চলিয়াছে, তবে মটুকরাজা ধ্বংস হইয়াছেন। বাহা হউক যদি ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের সমকালে পাকীসাহেব জন্ম হইয়া থাকে তাহা হইলে ১৫৩০—১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই মধ্যবয়সের প্রবল প্রভাবান্বিত, প্রতিভাশালী সাধক হিন্দু ব্রাহ্মণ রাজা মটুকরায়ের রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঐজগৎপ্রসন্ন বার।

বর্ষ-চক্র।

নিদাঘ আসিল যবে প্রখর পিপাসালয়ে—
 আনুল উদাস,
 তপ্ত বায়ু সনে তা'র এল মোর ব্যক্তিতার
 বিরহ-নিবাস।

সঘন বরষা যবে নামিল গগনপথে
 ঘিরি' চারিধার,
 করে বারি অবিরল ;— এবে শুধু অশ্রুজল
 ব্যথিতা প্রিয়ার ।

৩

শরতে নির্ঝল দিপি, উজ্জল ধরণীতল,
 প্রসন্ন আকাশ ;
 শেকলি-কমল-বাসে জলে স্থলে ভেসে আসে
 প্রিয়াদেহবাস ।

৪

আসিল হেমন্ত রাণী— হিলোলিত শস্তক্ষেত্রে
 অঞ্চল সোনার,
 কুণ্ঠিত সোনার রবি ;— সরস-সঙ্কোচ ছবি
 প্রিয়ার আমার ।

৫

হুহেলি-আবৃত মুখ, নির্ঝাকু শিশির অসি'
 হানে হিম-বাণ,
 আনে অবসাদ ঘোর ;— এবে দয়িতার মোর
 নিরদয় মান ।

৬

বসন্ত আসিল সয়ে নব পত্রপুষ্পরাশি—
 সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস,
 বহিছে মলয় ধীর ;— এ যে মোর প্রেমসীর
 অঞ্চল-বাতাস ।

৭

প্রতি ঋতু দিয়া গেল প্রিয়ার আভাস মোর,
 বর্ষ ঘুরে যায় ;
 তবু আনিল না প্রিয়া,— পূর্ণ রূপরশি নিয়া
 আজি সে কোথায় !

ঐরমণীমোহন ঘোষ ।

উন্মাদিনী ।

কেরে অই ধাড়াইয়া বকুল-তলায় ?
 ভস্ম, ধূলা, মাটি মেখে,
 শরীর গিয়েছে ঢেকে,
 কস্ম কেশে ষটীভার ধরেছে মাথায় ।
 কেরে অই অভাগিনী বকুল-তলায় ?

শত গ্রন্থিযুক্ত বাস ছিল পরিধান ।
 সে চীর বসনখানি,
 বলিয়া ফেলেছে টানি' ;
 নাহি লক্ষ্য, ভয় মনে, মান, অভিমান ।
 সকলি হৃদ্রে 'ওর করেছে প্রস্থান ।

এত করি' হুধাইল না দেয় উত্তর ।
 কা'র অভাগিনী মেখে,
 বৃষ্টি মনে ছুঃখ পেয়ে,
 গৃহ ছাড়ি' আসিয়াছ অরণ্যভিতর,
 কি গভীর মনোহুঃখে আছ নিরুত্তর ?

৪

আয় আয় অভাগিনি ! আয় মোর কাছে ।
 ধূলা, মাটি ধোয়াইব,
 নব বাস পরাইব,
 অন্তরের স্নেহ দিব, বাহা মোর আছে,
 আয় অভাগিনী নারী, আয় মোর কাছে ।

শ্রীমতী হেমাদিনী ঘোষ ।

৳রমায়ণী সভ্যতা ।

সাহিত্য ।

অধর্মের উল্লেখ রামায়ণে আছে ; কিন্তু তাহা বেদবাচ্যে অতিহিত নহে । ইহাতে মনে হয়, রামায়ণে অধর্ম স্ববির নামীয় যন্ত্রেরই উল্লেখ করা হইয়াছে । [সামায়ণ প্রবাদও] অধর্ম বেদের বিভাগকাল রামায়ণী যুগের পরে বলিয়া নির্দেশ করে ।

বেদের পর ব্রাহ্মণের স্থান, বেদ মন্ত্রে যে জ্ঞানরাশি নিহিত আছে ব্রাহ্মণে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সমাজে বৈদিক ভাষা লোপ হইয়া ক্রমে সংকুচিত ভাষার আলোচনা প্রচলিত হইয়া গেলে বেদমন্ত্র সাধারণের নিকট অত্যন্ত দুর্বোধ্য হইয়া উঠে । এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডলোপ আশঙ্কা করিয়া সমাজের নেতৃগণ বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন ও তদ্বারা বেদপ্রচলিত ক্রিয়াকলাপ রীতি নীতি জনসমাজকে সাধারণ ভাষার বুঝাইয়া দেন । বেদমন্ত্রের এই ব্যাখ্যা ও সমাজের নেতৃগণ কর্তৃক যুগেযুগেই প্রচারিত হইয়াছিল । বেদের ব্যাখ্যা বা ব্রাহ্মণ-ভাগ চাতুর্ধর্মপ্রতিষ্ঠার পূর্বে রচিত হইয়াছিল । এই ব্রাহ্মণ হইতেই পরবর্তী বেদব্যাখ্যাকারী বা সমাজের নেতৃগণ ব্রাহ্মণ উপাধি লাভ করেন ।* অতঃপর চাতুর্ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণ প্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া অভিহিত হইলেন । বেদের ব্যাখ্যা বা ব্রাহ্মণ ঠিক এক সময়ে এক স্থানে এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নাই । বেদব্যাখ্যাকালে ব্রাহ্মণ এমন অনেক গল্প বর্ণিত হইয়াছে বাহা বেদে নাই । বেদের ব্রাহ্মণ গড়ে রচিত হইয়াছিল এবং তাহা রামায়ণের অনেক পূর্বে রচিত হইতে আরম্ভ

* ব্রাহ্মণই বেদের একমাত্র প্রকাশক এই ভাব হইতেই বোধ হয় "ব্রাহ্মণ ব্যতীত বেদে অন্তের অবিকার নাই" এই ভাবটি প্রবর্তিত হইয়াছে । এই ভাব রামায়ণ যুগের যত্ন পরে প্রচলিত হইয়াছে ।

হইরাছে। রামায়ণ মহাকাব্যের পরেও অনেক ব্রাহ্মণ রচিত হইরাছে। রামায়ণে ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। (অ-১৪)

রামায়ণী যুগের পর লিপিপ্রণালী প্রচলিত হইলে ব্রাহ্মণগুলি লিখিত হইরা ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত হইরাছে। রামায়ণের সময় কতগুলি ব্রাহ্মণ রচিত হইরাছিল ও তাহা কি কি তাহার কোন উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া যায় না।

বৃহৎ ব্রাহ্ম দশরথের উক্তি “জীর্ণস্তত্ত্ব পরীক্ষ্য বিপ্রাশ্ৰিত্যতিব্রোচয়ে।” অ-২৮ হইতে আরণ্যকের আভাস উপলব্ধি হয়। কিন্তু তখন কোন আরণ্যক ব্রাহ্মণ রচিত হইরাছিল কি না অবগত হওয়া যায় না। এই সকল লৌকিক ভাব হইতেই ক্রমে ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ রচিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রথম ভাগ কথ্যকাণ্ড শেষভাগ জ্ঞানকাণ্ড। কথ্যকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ড আধুনিক। আরণ্যক উপনিষদ প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। এইগুলি বেদের অন্তর্ভাগে সংযুক্ত বলিয়া ইহাদিগকে বেদান্তও বলে। বেদান্তের দ্বারা বেদান্তের উল্লেখ রামায়ণে থাকিলেও এখন যে সকল গ্রন্থ বেদান্ত বেদান্ত বলিয়া কথিত রামায়ণী যুগে সে সকল বিষয়ের পৃথক আভিধ ছিল না।

রামায়ণে পুরাণের উল্লেখ আছে। আদি কাণ্ডের নবম সর্গে দ্বন্দ্ব দশরথকে বলিতেছেন “প্রভুত্যা তৎ পুরাণস্তৎ পুরাণেচ বধ্যা ক্রতম্। ১ বর্তমান সময় যে সকল পুরাণ গ্রন্থ প্রচলিত আছে সেই পুরাণ গ্রন্থগুলি (মৎস পুরাণ, কুর্খ পুরাণ প্রভৃতি) সকলই রামায়ণের পরবর্তী কালে রচিত হইরাছে। রামায়ণে যে পুরাণের কথা বর্ণিত হইরাছে তাহা বেদের ব্রাহ্মণভাগকে নির্দেশ করিতেছে। বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য যুগে ব্রাহ্মণই পুরাণ বলিয়া অভিহিত হইত।

তৈত্তিরীয় কঠ প্রভৃতি বেদের শাখাগুলি রামায়ণের পরবর্তী কালে রচিত হইরাছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের প্রাচীন অংশ কৈশলায়ন ঋষি তাহার শিষ্য যজুকে শিক্ষা প্রদান করেন। যজু যীর শিষ্য তৈত্তিরীকে শিক্ষা দেন; তৈত্তিরী কৃষ্ণ যজুর্বেদকে নিজ নামে প্রচার করেন। এই অল্প প্রাচীন কৃষ্ণ যজুর্বেদ তৈত্তিরীয় সংহিতা নামেও পরিচিত। বেদের শাখাগুলি লিপিপ্রণালী প্রবর্তনের পরবর্তী কালের হইলেও এই দুইটি শাখার উল্লেখ রামায়ণে (অ-৩২) কোন স্থানেও প্রবেশ লাভ করিতে

পারিয়াছে। রামায়ণের বে স্থলে এই শাখাঘরের উল্লেখ দুই হইয়া তাহা পাঠ করিলেই পাঠক দেখিবেন, ইহা নিতান্ত অনাবশ্যক প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বেদের বে বে শাখার উল্লেখ রামায়ণে প্রবর্ত্তি হইয়াছে ঐ ঐ শাখা-
ঘারী ব্যক্তিগণ দ্বারাই তাহা পরবর্ত্তী কালে রামায়ণে প্রবেশ লাভ করিতে
সমর্থ হইয়াছে। রামায়ণে সহস্র বেদ ও বড়ক বেদের উল্লেখ আছে।
হতুমান লকার প্রবেশ করিয়াই বড়ক বেদবিদ ব্রহ্মত ব্রাহ্মণদিগের বেদক্ষনি
প্রবণ করিলেন;

বড়কবেদ বিজ্ঞাং ক্রতু প্রবরবাজিনাম্ ।

ওশ্রাব ব্রহ্মবোবান্ স বিয়াত্রে ব্রহ্ম রক্ষসাম্ ॥ হু ১৮২

রামায়ণে উল্লিখিত বেদের এই বড়ক কি কি তাহা স বিশেষ অবগত হওয়া
যায় না।

শিক্ষা কল্পে ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষঃ তথা।

ছন্দশ্চেতি বড়কানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ ॥

বড়কের এই হুত্র রামায়ণের অনেক পরবর্ত্তী রচনা। নিরুক্ত ও কল্প
প্রবাদি রচিত হইবার পরে বেদের এই বৃষ্টকল নির্জারিত হইয়া হুত্র
নির্নীত হইয়াছে।

বেদের “শিক্ষা” অঙ্গটি অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় ঐতিহ্যের
আরম্ভ ছিল। শিক্ষা সংজ্ঞার সারনাচার্য্য লিখিয়াছেন যে জ্ঞানদ্বারা বেদের
বর্ণ (Letters), স্বর (Accents), মাত্রা (Quantity), বল (Organs of
Pronunciation), সাধ (Delivery), সঙ্গান (Euphonic laws) বুঝা যায়
তাহাকেই শিক্ষা বলে।

বৈদিক ঐতিহ্য পিতৃদিগকে বেদপাঠের এই নিয়মটি সুখে সুখেই
শিক্ষা দিতেন।

কল্প প্রথমে বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কল্প প্রথমে শুনি
কল্প হুত্র নামেও পরিচিত। বর্ণীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, দক্ষিণ
ভারতে আর্য্য বসতি বিস্তৃত হইবার পর হুত্র প্রথমে রচিত হইয়াছিল।

কল্প হুত্র রচিত হইবার পূর্বে ‘ব্রাহ্মণ’ দ্বারাই বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতি
ব্যাখ্যাত হইত। কল্প হুত্রগুলি ব্রাহ্মণের বিশেষণ। আশ্বলায়ন, আপ-

তৎ, বোধায়ণ প্রভৃতি ঋষিগণই কল্প হুত্রগুলির প্রণেতা । ইহারা সকলেই বায়ীকির পরবর্তী ঋষি । কল্প হুত্র রামায়ণের পরে রচিত হইলেও রামায়ণের এক স্থলে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আদিকাণ্ডের ১৪শ সর্গে লিখিত হইয়াছে—

অ্যাহোহুত্মেধঃ সংখ্যাতঃ কল্পহুত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ । ৪০

বাকরণের উল্লেখ রামায়ণের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় । এক স্থানে রাম বলিতেছেন—

“নুনং ব্যাকরণং কৃৎসন্যনেন সহসা শ্রুতম্ ।

বহ ব্যাহরতানেন ন বিপকিদপশকিতম্ ॥

কি । ৩২২

বোধ হইতেছে নিশ্চয়ই তিনি বহবার ব্যাকরণ শ্রবণ করিয়াছেন ইত্যাদি ।

ঐ সময় কাহার প্রণীত ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল, তাহা রামায়ণে অবগত হওয়া যায় না । কেহ কেহ রামায়ণকে পাণিনির পরবর্তী রচনা বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন । তাঁহাদের যুক্তি পাণিনির হুত্রে বৃষ্টাঙ্কস্থলে রামায়ণের বিষ্ণু হুত্রেও উল্লেখ নাই । এ দিকে রামায়ণেও পাণিনির উল্লেখ নাই । সুতরাং এইরূপ যুক্তি ভল সন্মতীকন নহে । পাণিনির ব্যাকরণ বৈদিক ব্যাকরণ এবং অতি প্রাচীন । ইহা লিপিশ্রমাদী প্রবর্তনের পরে লিখিত । পাণিনিতে পূর্ববর্তী অনেক বৈয়াকরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় । তাঁহাদের নাম—আপিশনি, কান্তপ, গার্গ, গালব, চক্রবর্ত্তন, ভরষাঙ্ক, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক, ক্ষোটায়ন প্রভৃতি । পাণিনিতে ইহাদিগের নামের উল্লেখ থাকায় ইহারা যে পাণিনির পূর্ববর্তী তাহা স্বীকার্য্য । কিন্তু ইহাদিগের সকলেই যে রামায়ণরচনার সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী তাহা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে না । ‘বাহেশ ব্যাকরণ’ নামে আরও একখানি বৈদিক ব্যাকরণ লিপিশ্রমচলনের পূর্বে প্রচলিত ছিল । কিন্তু তাহা কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় না । রামায়ণের সময় পাণিনির উল্লেখিত কোন ব্যাকরণ অবশ্যই প্রচলিত ছিল ইহা অস্বহমান করা যায় ।

নিরুক্ত ।—বৈদিক শব্দসমূহের বাতু অর্থ প্রভৃতি বাহার দ্বারা প্রকাশ পায় তাহাই নিরুক্ত । অর্থাৎ বৈদিক শব্দের নিরপেক্ষ তাবপ্রকাশক

• রামায়ণের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ঋষিগণের লস ও হুত্র প্রচারিত আছে ।

সেগুলি বর্ধাৰ্থই তাঁহাদের প্রণীত কি না সন্দেহ ।

অর্থে নিরুক্ত শব্দ বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল। লিপিমালা প্রবর্তনের পর বাক্যের নির্ধট্ট রচিত হইলে লোক সেই নির্ধট্টকেই নিরুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে। বাক্যের নিরুক্ত (৭) বৈদিক অভিধান গ্রন্থ। রাধারণের সময় নিরুক্ত নামক কোনও অভিধানের প্রচার ছিল না। শুক্ল যুগে যুগেই নিরুক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থ প্রকৃতি শিক্ষা দিতেন। শিক্ষার ভার নিরুক্ত ভবন গুরুর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ছিল না।

হুম্ব: ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কোন রচনাও রাধারণের সময় প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। রাধারণে জ্যোতিষসম্বন্ধীয় যে সকল কথা উল্লেখ আছে তাহা আমরা বিজ্ঞান-প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

নাট্যশাস্ত্র ভারতের অতি প্রাচীন সম্পদ। রাধারণীযুগে নাট্যকলাতিরের বিশেষ ব্যবহা ছিল। অযোধ্যায় বিচিত্র বধু ৫ নাট্যশালা স্থাপিত ছিল; রাজধানীর বর্ণনায় আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। রাম বিশ্র তাহার রচিত নাট্যাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। অযোধ্যা কাণ্ডের ৬২ সর্গে লিখিত হইয়াছে, তরত নাট্যলাগয়ে অত্তত বপ দেবীরা বিমর্ষভাবে অবহান করিলে তাঁহার বস্ত্রগণ তাঁহার মানসিক শান্তিবিধান-মানসে হৃত্য সীত বাস্ত ও নাটক অভিনয় করিতে লাগিলেন।

“বাদরস্তি তদা শান্তিং লাসংস্ত্যপি চাপরে ।

নাট্যকান্তপরে সাহসীতানি বিবিধানিচ ॥” ৪

ওরেবারগ্রন্থে যুগোপীর্ষ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র ঐক নাট্যশাস্ত্রের অনুরূপে উৎপন্ন। ওরেবার বলেন, ব্যাকট্টীয় ঐক রাজাদের দরবারে ঐক নাটকের অভিনয় হইত, সেই

যাহারা বাক্যকে নিরুক্তের প্রণেতা বলিয়া অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহারা যথেষ্টদূরে দৃষ্ট মহাশয়ের নিম্নলিখিত রচনা পাঠ করুন,

Professor Max Muller has pointed out a common mistake made in calling Yaska's work as the Nirukta. Nirukta is a work as Sayana says where only a number of words is given. Yaska takes up such an old existing Nirukta and on this text (which is usually known as the Nighantu) he writes a commentary which is his work.”

History of Civilization in Ancient India

সকল অভিনয় দেখিয়া পরাব ও ওমরাটের হিন্দুদের অশ্রুকরণশক্তি উল্লেখিত হয়; এইরূপে হিন্দু নাট্যের উৎপত্তি হইয়াছে । এই সকল মত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ তাহা ফরাসি পণ্ডিত দিলডেন লিখি প্রদর্শিত করিয়াছেন । বাস্তবিক গ্রীক সংক্রমের পূর্বেও যে ভারতে নাট্যশাস্ত্রের প্রচলন ছিল বুঝের উপদেশ তাহার স্থলপট প্রমাণ । বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে যে দশটি উপদেশ প্রদান করেন তাহার মধ্যে একটি উপদেশ—“নাট্য ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকিবে ।” এই উপদেশে স্থলপট প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেও ভারতে নাট্যশাস্ত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল । রামায়ণের পূর্বে কোনও গ্রন্থে নাট্যসাহিত্যের উল্লেখ নাই । পাণিনিতেও নট শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় । ইহার পর রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে ।

গ্রন্থ ব্যতীত কিরূপে নাট্যকালিনয় হইতে পারে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

রামায়ণ প্রথমেই গ্রন্থকারে লিখিত হইয়া প্রচলিত হয় নাই । কবিতা আছে তাহা বাস্তবিক কর্তৃক সঙ্গীতাকারে রচিত হইয়া এবং স্মৃতিসাহায্যে কুলীলব (১) কর্তৃক গীত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল । স্মৃতিসাহায্যে সঙ্গীত ভাবপ্রকাশক অদভঙ্গী দ্বারা গীত হইলেই তাহাতে নাট্যীয় ভাব প্রকাশ পায় । এইরূপ ভাবপ্রকাশ হইতেই নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে । ইহার পর গ্রন্থরূপে ভরত মুনি নাট্যশাস্ত্র প্রচার করিয়া নাট্যশাস্ত্রের উন্নতি বিধান করেন । ইহার পর বৈদেহিক ভাবের আদানপ্রদানে গ্রীক প্রভাণ সংক্রমিত হওয়া অসম্ভব নহে ।

স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা রামায়ণী সমাজ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি । তখন হিন্দু সমাজের স্মৃতিতে অহুশাসন বিব্রাজ করিত ও যে অহুশাসনের বলে সমাজ পরিচালিত হইত গ্রন্থরূপে তাহাই সংগৃহীত ও কালভেদে পরিবর্তিত হইয়া আধুনিক বহুসংহিতার মূল কলেবর গঠিত হইয়াছে ।

শ্রীকেশবনাথ মহাশয় ।

‘মুরোপ-ভ্রমণ ।

হাইডলবার্গ ।

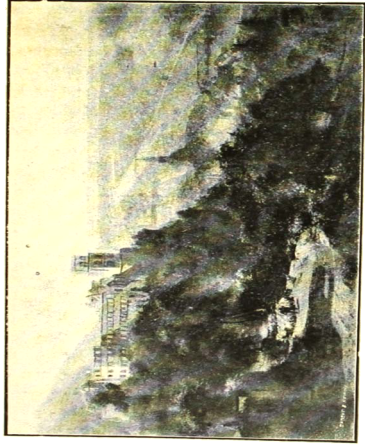
লভাপাদপরিপূর্ণ পর্কতপরিবেষ্টিত খরশ্রোতা নেকারের (Neckaar) উভয় কূলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ালঙ্কৃত হাইডলবার্গ বাস্তবিকই অতি মনোরম স্থান । পরিশ্রান্ত জীবনের শেষভাগে পৃথিবীর কোলাহল হইতে অপস্থত হইয়া ভগবক্তিতায় মনোনিবেশ করিয়া অবশিষ্ট জীবন কেপন করিবার পক্ষে এমন উপযোগী স্থান অধিক দেখা যায় না ।

কলোন হইতে হাইডলবার্গ যাইতে রেল প্রায় ৪১০ ঘণ্টা সময় লাগে । এই পথটি অতি সুদৃশ্য । প্রায় সমস্ত কণই রাইন নদীর তীর দিয়া ট্রেন চলে । নদীর তীরেই পাহাড়, কোথাও বা দুই ধারেই পাহাড়, কোথাও জল, পাহাড়ের গাত্র ব্রাক্সাক্ষেত্রময়—হৃদয় হৃদয় গাছ বড় চমৎকার দেখায় । আমি যখন গিয়াছিলাম তখন নভেম্বর মাস, গ্রীষ্মকালে যখন উভয় কূল ফলপুষ্পে মণ্ডিত থাকে তখন এই নদীর উপর দিয়া ছোট্ট টীমারে (pleasure steamer) বেড়াইতে কি আনন্দ হয় তাহা সহজেই অল্পমান করা যায় । নদীর মধ্যে এক স্থানে এক পাহাড়ের উপর একটা সেকলে Castle দেখিলাম, অতঃই Grimm's Fairy Talesএর নৈত্যদের Castleএর কথা মনে হইল ।

জার্মানিতে আমাদের দেশের স্তায় রেল চারি শ্রেণী, তবে মধ্যম শ্রেণী নাই, একেবারে খোলাখুলি ভাবে ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ । আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—রেলের কর্মচারীরা সন্ধ্যার পর স্ব স্ব বকে লঠন হুলাম । রেলওয়ে স্টেশনগুলিও অতি বৃহৎ ও প্রকাণ্ড ব্যাপার । ওয়েটিংরুমগুলি প্রায়ই সুবন্দরভিত্তিক ও অতি হৃদয় কাকর্ষ্যময় । এ শুধু জার্মানিতে নহে, হরোপের প্রায় সর্বত্রই—বিশেষ এন্টওয়ার্পে ও এমসটারডামে রেলওয়ে স্টেশন দুইটিতে ।

সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে আমি যখন হাইডলবার্গে পৌছিলাম তখন এক পশলা বৃষ্টি হইয়া ধরিয়া দিও হইয়াছে । হোটলে জিনিসপত্র কেনিয়াই একাকী বেড়াইতে বাহির হইলাম । সहरটি ক্ষুদ্র । ইটিতে ইটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছিলাম । তথায় একজন অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ হইল ; তিনি অতি

ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ,—



ହାଇଡନବାର୍ଗ

সদাশয়; বলিলেন, “এখন রাত্রি হইয়াছে আপনি কলর দশটার পর আগিলে আপনাকে সমস্ত দেখাইয়া দিবে; আমি বলিয়া রাখি।”

পরদিন প্রথমে সহরের পার্শ্বস্থ দুইটি পাহাড়ের উপর বেড়াইতে হাইলাম। নদীর ধারেই পাহাড়। অল্প দূর পর্যন্ত কয়েকটি বাড়ী আছে, উভে কেবল গাছপালা। প্রায় শিখর পর্যন্ত গাড়িতে যাওয়া যায়। ঘোড়াগুলি কি ভাবে উপর পর্যন্ত উঠে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সর্বোচ্চ শিখরে বিসমার্কের স্মৃতিস্তম্ভ অবস্থিত। এই স্থানে বৎসরে এক দিন খুব উৎসব হয়। পাহাড়ের গায়ে এক পার্শ্বে একটি ছোট গৃহ, তথায় ছাত্ররা বৈরথ যুদ্ধ (Duel) করেন। এ স্থানে ছাত্রদিগের অনেকেরই মুখে ও মাথায় তরবারির আঘাতচিহ্ন! কাহারও বা আঘাত অতি অল্পদিনের,—মাথায় ও মুখে sticking plaster লাগান। ইহা একত্বপ সম্মানের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত। কোন কোন ছাত্র কলেজে পাঠাভ্যাস কালেও plaster লাগাইয়া রহিয়াছেন দেখা যায়। পাহাড়ের উপর ও নদীর কূলে অতি হৃদয় বন অনেক দূর পর্যন্ত গিয়াছে।* বাস্তবিক হাইডেলবার্গে পাহাড়, নদী ও বনের অতি আশ্চর্য সমাবেশ।

নদীর ধারে সহরের দিকে একটি পুরাতন দুর্গ দেখা যায়। তথায় দুইটি মদের পিপা আছে। একটিতে ৬০,০০০ বোতল ও অন্নটিতে ৩,০০,০০০ বোতল মদ ধরে। সিঁড়ি দিয়া বড় পিপাটির উপর উঠিলাম; একটি প্রকাণ্ড ঘরের স্তায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে এই দুর্গ হইতে funicular railway আছে। ইংলন্ড টাওয়ারের প্রসঙ্গে যেক্টপ রেলের কথা বলিয়াছি ইহা তদ্রূপই। এই রেলো বালিনবাসী মধুমাংসখাপনকারী এক দম্পতির সহিত আলাপ হইল। তাঁহারা ভাষা ভাষা ইংরাজি জানেন। শুনিয়াছি, এখন জর্মানির কূলে ইংরাজি ভাষা অবস্তপাঠা। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ দেখিবার জিনিষ ছাত্রদিগের কারাগৃহ। ছাত্ররা কোনও অপরাধ করিলে বা সহরের মধ্যে পোলমালা করিলে তাহাদিগকে এই কারাগারে বদ্ধ রাখে। দুইটি ঘর নির্জন কারাবাসের জন্য নির্দিষ্ট! দরজায় অনেক ছাত্র অপরাধীর কটোপ্রাক রক্ষিত। তাঁহারা হয় ত এখন খুব গণ্য মাত্র ব্যক্তি। আবার ঘরের ভিতর অনেকে কবিতা প্রভৃতি* লিখিয়া রাখিয়াছেন। একটির অল্পবাদ এই:—“এ স্থানে আমি বেশ আছি। কারাগারের বাহিরে আমি অতি নগ্ন ছিলাম কারাগারে আমাকে অনেক হুমকী ও মার্কিণ ভ্রমণকারী দেখিতে আসিতেছেন।” অনেকে আবার পেন্সিল বা কয়লা দিয়া দেওয়ালে অনেক ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছেন।

হাইডলবার্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি গির্জা আছে। তাহার নাম Churuch of the Holy Ghost একই ভাষায় এক পার্শ্বে প্রোটেষ্টান্টরা এবং অপর পার্শ্বে রোমান ক্যাথলিকরা ভজন্য করেন। যাহা একটা সামান্য সড় দেওয়াল ব্যবধান। এ উদারতা হুরোপে আর কোথাও দেখি নাই।

ম্যুনিক ।

আর্থাগির অভ্যর্গত ব্যাভেরিয়া রাজ্যের রাজধানী ম্যুনিক খুব বড় সহর। ইহা ইকার নদীর তীরে অবস্থিত। কবি ক্যাম্বলের Hohenlinden নামক কবিতায় পড়িয়াছিলাম Isar, rolling rapidly দেখিলাম ও তাহাই। নদীটি খুব ক্ষুদ্র; আবার ম্যুনিকের নিকট দুই অংশে বিভক্ত, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুতগতি; বহু উপলে শীর্ষা নদীর বন্ধ আবৃত—কিন্তু কি ধরবেগে প্রোত চলিয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য মনে হয়।

ম্যুনিকে জটিল স্থান অনেক, বিশেষ এ স্থানে চিত্রশালার বাহলা। সহস্র সহস্র বহুমূল্য তৈলচিত্রে ম্যুনিক বিচুর্ষিত। এক ফ্রেসেল ভিন্ন আর কোথাও এত চিত্র আছে বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিকই ম্যুনিকের চিত্র-সম্পদ অতি মহার্ঘ্য ও অনন্তসাধারণ। এত চিত্রের মধ্যে কোন্টা ছাড়িয়া কোন্টা দেখি অল্প সময় ক্ষেপণকারী রাজীর পক্ষে তাহা স্থির করা দুষ্কর; ঠিক “ধানবনে ডোম কাণ।” এই জন্তই বোধ হয় আমার নিকট ম্যাক্সিমিলিনিউম (Maximilianeum) নামক মাত্র জিন্থানি ছবিবৃত্ত একটি গ্যালারি সন্নিবেশিত উৎকৃষ্ট মনে হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব।

ম্যুনিকে আসিলে প্রথমেই এই স্থানের লোকের পোষাক দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। অনেক রকম পোষাক এ দেশে দেখা যায়। ব্যাভেরিয়া কৃষক, পুঙ্খ ও রমণী, উভয়েরই পরিচ্ছদ বড় সুদৃশ্য—picturesque প্রায় লোকেরই হুঁশিতে হয় হস্তিণের লেজ না হয় পাখীর পালক প্রভৃতি বসান। আর কত রকম বৈরকমের আচ্ছাদনবাস (cloak) ! ত্রীলোকদিগের মুখ লাল লাল ফুলা ফুলা; কিন্তু সৌন্দর্য্য বিশেষ আছে বলিয়া বোধ হইল না। বাস্তবিক সমস্ত হুরোপের মধ্যে এক প্যারিসের মহিলাদের মুখে কমনীয়তা ও লাবণ্য কিয়ৎপরিমাণে বর্তমান, আর কোথাও তাহা চক্ষুতে পড়িল না। নিশ্চয়ই আমার নয়নের দোষ।

ম্যুনিকে রাজারাজ্যের অত্যন্ত ছড়াছড়ি। অনেক বাড়ীর সম্মুখে সাজি

দণ্ডায়মান। প্রের করিলে জানা যায়, অমুক প্রিন্সের বাড়ী। অনেক রাজাই আমাদের দেশের রাজাদের দ্বারা কুমিল্প্র। দেশের প্রকৃত অধিপতি উন্নয়ন, তাহার পিতৃব্য Regent বা রাজপ্রতিনিধি, তিনিই কাঙ্ক্ষিত রাজা।

ম্যানিক আলস পরীক্ষার অতি নিকটে অবস্থিত। বৈকালে বেড়াইতে যাইয়া তুষারমণ্ডিত পাহাড়ের স্থাপিত দৃষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল। প্রদর্শক বলিল, পাহাড় যখন এত শীত দেখা বাইতেছে, কল্যা নিম্নের বৃষ্টি হইবে। ঘটিলও তাহাই।

ম্যানিকের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে (১) ও (২) পিনাকোথেক (৩) ম্যান্সি মিলিনিউম (৪) ম্যান্সিয়ম (৫) ব্যাভেরিয়ায় মূর্তি ও Hall of Fame এবং (৬) বিয়র গৃহ। এই কয়টির মাত্র সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। এতদ্বির বিশেষ উল্লেখ-বোধ্য আর একটি জিনিষ আছে; Rathans বা ম্যান্সিপাল আপিবের ঘড়ি। বেলা ১১টার সময় এই ঘড়িতে প্রথমে কতকগুলি পূর্ণাবয়ব স্ত্রীপুরুষ অবসাদি প্রকৃতি নৃত্য ও বৃক্ষ প্রদর্শন করে, তাহার পর অতি স্বল্পর ভাবে Chimes বাজে, সর্বশেষে একটি কুকুট বহির্গত হইয়া তিনবার শব্দ করে। সর্ব সময়ে প্রায় ১৫ মিনিট এই সব চলে। প্রত্যহ ইহার দ্রষ্টা লোকের ভিড় হয়। খুব অল্পত।

(১) পুরাতন পিনাকোথেক :—পিনাকোথেক শব্দের অর্থ চিত্রভাণ্ডার। এই পুরাতন ভাণ্ডার ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। মর্ম্মর মূর্তি ব্যতীত এ স্থানে প্রায় দুই সহস্র স্বল্পর স্বল্পর চিত্র আছে। র্যাফেল, বট্টিচেলি, কোরেজিও, ফবেন্স, ভ্যানভাইক, রেমব্রান্ট, ডুরে, হোলবাইন, টিসিয়ান প্রকৃতি প্রসিদ্ধ সমস্ত চিত্র-করেরই অঙ্কিত চিত্র এ স্থানে দেখা যায়। এতদ্বির সর্বনিম্নতলে বহু পুরাতন বৃৎপাণ্ড (Old Vases) রক্ষিত আছে। বর্ণনা করিয়া সে চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।

(২) নূতন পিনাকোথেক—এ স্থানে আধুনিক চিত্রকরদিগের চিত্র সং-রক্ষিত, চিত্রে লিখিত বিবরণগুলি অধিকাংশই আধুনিক মুরোপীয় ইতিহাস-বর্ণিত। এতদ্বির কার্ণাণির প্রধান প্রধান ব্যক্তির তৈল চিত্র এবং ম্যানিকের ও পার্শ্ববর্তী স্থানের অনেক চিত্র আছে।

(৩) ম্যান্সিমিলিনিউম—সহরের ঠিক বহির্ভাগে এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর এই গৃহ দণ্ডায়মান। দুই পার্শ্বে অর্ধচন্দ্রাকার গণ্ডে উঠিয়া আসিতে হয়। দুইটি প্রকাণ্ড হল ও দুইটি বারাতা। হল দুইটিতে মাত্র ত্রিশ খানি তৈল-

চিত্র । আদম ইভের স্বর্গচ্যুতি হইতে আরম্ভ করিয়া জর্জ ওয়াশিংটনের জীবন ও লাইপজিগের যুদ্ধ পর্য্যন্ত মানবেতিহাসের ত্রিশটি প্রধান প্রধান ঘটনা এই চিত্র কয়টিতে লিখিত । অবশ্য ইতিহাস বলাতে যুরোপের ইতিহাসই বুঝিতে হইবে । এগিষ্টার ইতিহাসবিষয়ক চিত্রের মধ্যে কেবল মহাম্মদের মক্কাভি-গমন এবং হারুণ অল রসিদের চিত্র দেখা যায় । বারাগা দুইটিতে অগতের প্রধান প্রধান প্রায় দুই শত লোকের চিত্র ও মর্ম্মরচিত আবক্ষ মূর্ত্তি আছে । বাস্তবিক যুরোপের চিত্রশালার মধ্যে এই গ্যালারিটিই আমার সর্কোপেক্ষ। হুম্মর বোধ হইয়াছিল । নভেম্বর মাসে ইহা বন্ধ থাকে, তাই রক্ষকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া দেখিতে হইয়াছিল ।

(৪) স্তাশনাল মুন্ডিয়ম—এই স্থানে আমাদের কলিকাতা মুন্ডিয়মেরই মত প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের অনেক অস্ত্রশস্ত্র, বাসন, পুস্তক, মর্ম্মরমূর্ত্তি, প্রভৃতি রক্ষিত ; অবশ্য অনেক চিত্রও আছে । তত্ত্বিৎ ব্যাভেরিয়াবাসীদের পুরাতন ও আধুনিক বসন প্রভৃতি ও Ceramic শিল্পের অনেক নিদর্শন রক্ষিত আছে ।

(৫) ব্যাভেরিয়ায় মূর্ত্তি এবং যশোমন্দির—একটি প্রাস্তরের এক পার্শ্বে ৬২ ছুট উচ্চ প্রকাণ্ড এক রোঙ্ক-নির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি ফুলের মালা হাতে লইয়া দণ্ডায়-মান । ইহাই ব্যাভেরিয়ায় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মূর্ত্তি । নিকটে একটি দরদালান (Colonnade) ; তথায় ব্যাভেরিয়ায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের আবক্ষ মূর্ত্তি—ইহাই ব্যাভেরিয়ায় যশোমন্দির । আমি ত অনেকেরই নাম স্মৃত ছিলাম না, কেবল শেলিঙ (Schelling) এবং রিকটার (Ican Paul Richter) এই দুইটি পরিচিত নাম দেখিলাম ।

(৬) বিয়র গৃহ (Hoibranhans) :—আমরা বেতুপ জল খাই, জার্মানির লোকতাহা অপেক্ষাও অবধে ও ঘন ঘন বিয়র পান করে । বিয়রই জার্মানির National drink । বিয়র সর্কজই প্রস্তুত হয়, তবে মূনিকের বিয়র খুব প্রসিদ্ধ । এই দ্বিভল গৃহটি গডর্গমেন্টের প্রস্তুত । নিম্নে দুইটি লম্বা হল ; কতকগুলি টেবুল ও তাহার চতুঃপার্শ্বে বেঞ্চ । তাহাতে নানা পরিচ্ছদ পরিহিত শত শত স্ত্রীপুরুষ বিয়র পান ও ধূম পান করিতেছে । উপরেও ঠিক ঐরূপ, তবে তথায় টেবুলগুলি ছোট ছোট ও বেঞ্চের পরিবর্তে চেয়ার রক্ষিত । তথায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর লোক আইসেন । নিম্নে যে বিয়রের দাম এক বোতল ডিম্ম আনা তাহাই উপরে হয় আনা মূল্যে বিক্রীত হয় । এ স্থানটি সহরের

ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ,—



ଗାନ୍ଧି ଶ୍ରୀମତୀ ।



প্রাথমিকস্থলে অবস্থিত ও সজ্জাই ঘূষ সরগরম। ম্যানিকে একটি প্রকাণ্ড পার্ক আছে। তাহার নাম English Gardens. কেন এ নাম হইল বুঝিতে পারিলাম না। প্রদর্শক বলিলেন—একজন ইংরাজ এই উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন তাই এই নাম; কিন্তু ঘুরিতে ঘুরিতে হপতির স্মৃতিও শুধে দেখিলাম, তিনি মার্কিনবাসী। তবে এ নাম কেন?

নয়হাউসেন্।

বেলা দশটার সময় যখন ম্যানিক হইতে যাত্রা করি, তখন আকাশ প্রায় পরিষ্কার, রৌদ্র হাসিতেছে। মাত্র মিনিট দশেক পরেই আকাশ মেঘাবৃত হইল। রেলের কাচমণ্ডিত জানালার ভিতর দিয়া পথে দেখিলাম তুলা পড়িয়া রহিয়াছে। চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কোথাও শিমূল গাছ দেখিতে পাইলাম না। সহযাত্রী কেহই ইংরাজিনবিশ ছিলেন না, জিজ্ঞাসাও করিতে পারি না। পরে জানালাতেও সেইরূপ দেখিয়া আমার চমক ভাঙিল, এ তুলা নহে তুবার-পাত। দেখিতে দেখিতে সব ধবলাকার, অতি চমৎকার দৃশ্য। তুবারধবল কথাটি পূর্বে অনেক স্থানে পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু ভাবগ্রহণ করিতে পারি নাই। আজ বুঝিলাম, তুবারধবল এবং যেত এ দুইটিতে কত পার্থক্য। খোলার বাড়ীর উপরে বরফ পড়িয়া ঢালু জায়গায় জমা হইতেছে, দেখিলে মনে হয় যেন গোলা চূণ ঢালিয়া চূণকাম করিতেছে। বেলা প্রায় দুইটার সময় Lake of Constance নামক হ্রদের ধারে উপনীত হইলাম। চতুর্দিকে পাহাড়, মধ্যে প্রকাণ্ড দ্বীপ। পাহাড়ের অঙ্গে স্থানে স্থানে ছোট ছোট গ্রাম, সে আর এক স্বন্দর দৃশ্য। ক্ষুদ্র দীঘল বোটের হ্রদের অপর পারে আসিলাম। এখন আমি হুইটবারল্যাণ্ড দেশে। এক রাস্তার ধারে বোট হইতে নামাইয়া দিল। সেই-স্থানেই ট্রেন আসিবে। কিছুক্ষণ পরে ট্রেন আসিয়া থাড়াইল। প্রায় ট্রামের মত, তবে অনেকগুলি গাড়ি। প্রত্যেক গাড়ির মধ্যস্থল দিয়া যাত্রাঘাতের রাস্তা, দুই পার্শ্বে বেতমোড়া বেঞ্চ, জিনিষ পত্র গাড়িতে লইবার নিয়ম নাই। প্রত্যেক বৈকে মাত্র দুইজনের বসিবার স্থান। কেবল প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে বেঞ্চগুলি গদি-আঁটা। দুইটি মাত্র স্টেশন পরে আমাকে গাড়ি বদল করিতে হইল। নতুন গাড়িতে উঠিয়া দেখি, অত্যন্ত স্থানান্তর। হ্রদের বিষয় আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল, সে শ্রেণী পূর্বে হইতেই পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আমার সঙ্গে দুইতিনটি ব্যাগ, সে দেশের ভাষা জানি না—সময়ের অন্তত-

নিম্নেন ত্রেকে দিতে পারিলাম না, কাবেই মোট লইয়া একখানা পাড়িতে কণ্ঠকটায়ের নিবেদ অগ্রাহ করিয়া গিয়া উঠিলাম । মধ্যে যে সামান্য সন্ধ্যা তাহাই অবরোধ করিয়া অবোধে পাড়াইয়া রহিলাম ; যাজীরা কলরব করিতে লাগিল, গার্ড বকাবকি করিতে আরম্ভ করিল ; আমি ভাষা বুঝি না, ক্রক্ষেপ না করিয়া পাড়াইয়া রহিলাম । বেগতিক দেখিয়া কণ্ঠকটায় আমাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে ডাকিয়া তাহার সহিত যাইতে বলিল । তখন পাড়ি চলিতেছে ; খুব জোরে বরফ পড়িতে হুক করিয়াছে । গার্ড আমাকে এক প্রথম প্রেক্ষীর কক্ষে লইয়া গেল । তথায় দেখি, একজন ইংরাজ । তাঁহাকে পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল । তবু কিছুক্ষণ কথা বলা যাইবে । তিনিও আমাকে পাইয়া আশ্বাসিত । সেই বিদেশে আমরা যেন এক-দেশবাসী । গার্ড তাঁহাকে বলিয়া গেল, আমি যেন কিছুক্ষণ পরে স্থান হইলে দ্বিতীয় প্রেক্ষিতে যাই । তথায় বলিয়া দুইজন গল্প আরম্ভ করিলাম । প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সহযাত্রী নামিয়া গেলেন, এ সময়টা বড় স্বখে কাটিল । দুই ধারে কাল ও নীল পাহাড়, তাহার উপরে বরফ জমিয়া রহিয়াছে, কোথাও কোথাও স্ত্রামল তরলতা, কোথাও বা হ্রদ দেখা যাইতেছে, চারিপার্শ্বে ধবল হিমালী—বড় স্বন্দর দৃশ্য । অল্পক্ষণ পরে যখন সন্ধ্যা হইল, পাহাড়ের গাত্রে বাড়ীতে বাড়ীতে আলো জালিয়া দিল তখন নয়নসমক্ষে অতি অপূর্ণ দৃশ্য প্রতিভাত হইল । সন্ধ্যার পরে হুইট্‌জারল্যান্ডের রাজধানী জিওরিক্ (Zurich) এ পৌছিলাম । এ স্থানে অর্ধ ঘণ্টা অবস্থানের পর পুনরায় অল্প ট্রেনে যাত্রা করিলাম । তখন তুষারপাত বহু হইয়াছে । কিন্তু বেশ বৃষ্টি পড়িতেছে । রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার, পথে কিছুই দেখা গেল না । তবে টেনে আমাদের দেশে পরিচিত রেলের ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম । ঘুরোপে আর কোথাও রেলে ঘণ্টা বাজান শুনি নাই । প্রায় এক ঘণ্টা পরে নয়হাউসেনে পৌছিলাম । এটি হুইট্‌জারল্যান্ডের উত্তর সীমায় একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম । বিলাতে আসার পূর্বে ইহার নাম শুনি নাই । আমি যখন লওনে বসিয়া ঘুরোপ ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতেছিলাম, তখন আমাদের হাইকোর্টের জজ বন্ধুবর মিটার সরফুচিন পরামর্শ দেন, নয়হাউসেন না দেখিয়া যাইও না । এ স্থানে রাইন নদীর একটি প্রপাত আছে । নদী এ স্থানে মাত্র ১২৫ গজ চওড়া, কিন্তু খুব ধরম্বোতা । কতকগুলি পাতরের গাত্রে আহত হইয়া জল প্রায় একশত ফুট উপর হইতে লাকাইয়া পড়িতেছে । অতি গভীর দৃশ্য । চতুর্দিকে জল আঘাতে চূর্ণ হইয়া শত ধারায় উঠিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে । প্রপাতের শব্দও খুব শুক গভীর ।

টিক মধ্যস্থলে একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ চওড়া পাতর আছে। ক্ষুদ্র প্রৌঢ় প্রাণ হাতে করিয়া সেই প্রপাতের ভিতর দিয়া তাহার উপর উঠিয়া তথায় চাপান করা একটা অবশ্যকর্তব্য কার্য। বাতাসে জলের কণা রেছুর দ্বারা অধিক পড়ে, কায়েই তথায় ঘাটতে হইলে ওয়াটারপ্রুফ গায়ে দিয়া যাইতে হয়। গ্রীষ্মকালে চতুর্দিক আলোকমালায় সজ্জিত করে, তখন নিশ্চয়ই বড় হিম্বর দেখিতে হয়। আমি শীতকালে গিয়াছিলাম, সে সব কিছু দেখি নাই।

এই নয়গাউসেনে বড় কোতুক হইয়াছিল। বলা উচিত যে, হুইটবারল্যাও সর্বত্রই হোটেল, অস্ত্র বেনবাসীয়া বলেন হুইটবারল্যাও না বলিয়া হোটেলল্যাও বলা উচিত এবং ইহার জাতীয় বীরের নাম William Tell (উইলিয়ম টেল) না হইয়া উইলিয়ম হোটেল হওয়া উচিত। সে ঘাঘা হউক বড় বড় কয়েকটি স্থান ভিন্ন অস্ত্র নিদিষ্ট সময় (Season) আছে। বৎসরের মধ্যে সেই কয় মাস এই সব স্থান আমোদস্বাস্থ্যে ও যাত্রীদের কলহাস্তে সুপরিত, অস্ত্র সময়ে প্রায় সমস্ত হোটেলই বন্ধ থাকে, এক আধটা বাহাও বা খোলা থাকে, সে সকলে দাসদাসীর একান্ত অভাব। আমি যখন নয়-গাউসেনে গিয়াছিলাম তখন সে স্থানের Season শেষ হইয়া গিয়াছে। যে হোটেল ঘাইলাম তথায় অস্ত্র অতিথি কেহই ছিলেন না, কর্তৃপক্ষের মধ্যে দুইজন রমণী ও একটি দাসী; তাহারা কেহই ইংরাজি জানিতেন না, আমারও ইংরাজি ভিন্ন অস্ত্র যুরোপীয় ভাষা জানা নাই। কায়েই কথাবার্তা আকার ইন্ধিতেই চলিল, যখন ভাষার নিভাস্ত দরকার তখন বাঙ্গালা ব্যবহার করিতে লাগিলাম, কারণ তাহাদের পক্ষে ইংরাজি ও বাঙ্গালা দুইই সমান। প্রোজীবর্গ হাসিয়া হুট পাট। আমার জানিবার প্রয়োজন হইল যে, ভারতবর্ষের ডাক কবে যায়। ইহা ত আর ইন্ধিতে বুঝান যায় না! কাগজে লিখিয়া অনেক কটে একজনকে বুঝাইলাম যে, কাগজখানা ডাক ঘরে পাঠান প্রয়োজন। দেড় ঘণ্টা পরে অনেক চেষ্টার পর পোষ্ট-মাষ্টার একজন ইংরাজিবিদকে বাহির করিয়া আমার চিঠি পড়াইয়া দাবাব লিখাইয়া দিলেন। এ ভোগ আর কোথায়ও ভুগিতে হয় নাই। অস্ত্র সব স্থানেই ইংরাজিজন্য লোক হোটেল পাওয়াইছিল।

পরদিন বৈকালে লুনার্ণ যাত্রা করিলাম। হুইটবারল্যাও কোনও মাল বিনা মাঙ্গলে রেল লইতে দেখে না। ছোট ছাণ্ডব্যাগেরও মাঙ্গল দিতে হয়। অস্ত্র দেশের তুলনায় মাঙ্গলও খুব বেশী।

১. রেল জিওরিক পর্য্যন্ত প্রায় পাহাড়ের উপর দিয়া গিয়াছে। পথে প্রায় তিন মাইল একটি আঁকা বাঁকা নদীর ধারে ধারে সর্পাকৃতি লাইন। দেখিলাম, নদীর একেবারে কিনারা পর্য্যন্ত কবিত, কেবল দুই পাহাড় মাত্র পাইনাদি বৃক্ষে শোভিত। রেলের দুইপার্শ্বে পর্ব্বতগাত্র তৃণমণ্ডিত; উচ্চ শিখরগুলি পাদপহীন ও তৃণমণ্ডিত। পাইন গাছগুলিতে হৃন্ময় গন্ধ পাওয়া যায়। পথে সমস্ত দিন হৃন্ময়ব বৃষ্টির সহিত লুকোচুরি খেলিতেছিলেন, তাই দুই ধারের দৃশ্য আরও হৃন্ময় দেখাইতেছিল।

পথে চ্যাম (Cham) নামক গ্রাম দেখা গেল। তথায় “গোয়ালিনী মার্ক। গাউ দুড” (Milkmaid brand Condensed Milk) এর কারখানা, গ্রাম-টিতে ঐ কারখানার অধিবাসী বাতীত আর বিশেষ কোন অধিবাসী আছে বলিয়া মনে হইল না। তবে একটি গির্জা দেখিলাম, তাহার চূড়া ব্রোহ্মমণ্ডিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ৪৪০টার সময় লুনার্ণ পৌছিলাম।

ঐনরেঅহুমার বহু ।

নর ও নারী ।

নর বলে, “নারী তোরা বড় ভয়ঙ্করী,
তোদের রূপের দাহে মোরা পুড়ে মরি।”
নারী বলে, “ওহে নর, মিছা ভব রোষ,
পতঙ্গ পুড়িলে নিজে বহির কি মোষ ?”

ঐজীবানন্দ মল্লিক ।

সংগ্রহ।

বিবিধ।

—*—

পরিবর্তনশীল পৃথী

—:~:—

বিলাতের 'রেফারী' নামক পত্রিকার জৈষ্টক লেখক বর্তমান যুগের মানব জাতির অশান্তি ও তাহার ভবিষ্যৎ কল সম্বন্ধে একটি সম্বর্ড একাধিত করিয়াছেন। লেখক খাঁর নাম প্রকাশ করেন নাই। লেখক বর্তমান সময়ের দুয়োশ্রীর সমাজের চাকল্যের সহিত সম্যক পরিচিত। সেই পরিচয় বা অতিজ্ঞতা হইতে তিনি সমস্ত মানব সমাজের চাকল্যের কারণ নির্ণয় ও তাহার ভাবী কল নির্দেশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার রচনার চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাহার বক্তের সহিত অনেকের ঐকমত্য বা অগ্রিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। যাহা হউক, আশা নীরে সংক্ষেপে সেই সম্বর্ডের আভাস ও তৎপদ আশাদের সম্বন্ধে প্রকাশ করিলাম।

লেখক লিখিয়াছেন, বর্তমান সময়ে মানবজাতির মধ্যে যের চাকল্য দেখা য়িয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। চাকল্যের লক্ষণ দিকে দিকে দেখীপামান। পৃথিবীর ইহার কোলাহল শ্রুত হইতেছে। মানবজাতি এখনও বস্ত্র ভাবাপন্ন রহিয়াছে,—

অশান্তি।

আশল বিধি ব্যবস্থা এখনও মানব সমাজকে অশুশাসিত করিতেছে, এই সত্য ঐতিহাস নহে। কিন্তু বস্ত্র বিধি তিরদিনই মানব সমাজকে অশুশাসিত করিয়া আসিতেছে। আশা অবিজ্ঞান যে চাকল্যের কথা শুনিতেছি—সেই চাকল্য মানব সমাজকে পার্শ্ব শান্তির দিকে অধিকতর অগ্রসর করিবে,—এইরূপ অশুশাসন অস্তিত্ত সত্তব বলিয়া মনে করা বাইতে পারে।

অন্তঃপর লেখক এই সার্বজনীন অশান্তির কারণ বিদ্রিষ্ট করিয়াছেন। তাহার বক্তে প্রদানতঃ তিনটি কারণ হইতে এই চাকল্য উদ্ভূত হইয়াছে। প্রথম কারণ,—যে সমস্ত মানব পান্ডাত্য লিঙ্কার প্রভাবিত হইতেছে তাহাদের মনে

কারণ নির্দেশ।

অধিকতর সুখ বৃদ্ধান্ততার সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহের আকাঙ্ক্ষার অভাব। দ্বিতীয় কারণ,—মানবজাতির বর্ধবিষাদের ক্ষর ও পার্শ্ব সুখ বৃদ্ধান্ততার অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্তির ক্ষর ঐকান্তিক আগ্রহের উদ্ভব। তৃতীয় কারণ,—প্রীজাতির অভাব।

পান্ডাত্য রীতি অনুসারে লেখক মহিলাদিগের কথা প্রথম আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মহিলাগণ পুরুষদিগের সহিত সমান অধিকার প্রাপ্তির ক্ষর যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন,—তাহা আন্তিমূলক। বাঁহারা এই আন্দোলনশীল অধিকার।

লন উপস্থিত করিয়াছেন তাহারা যে, অপরিবর্তনীয় কর্তব্য

নির্যে পৃথিবী শাসিত হইতেছে,—ভাংরা কিছুই বুঝেন বলিয়া বনে হও না । জ্বি, কল, বায়ু, পৃথিবীর স্থানসংস্থাপন ও পরিপূরণের দীর্ঘ পদ্ধতি ও ভ্রাম্য বারাই সেই নিয়ম বিলিঙ্গো-
জিত বা অব্যক্তি হইয়া থাকে । সমুদ্রের পক্ষি যে পৃথিবীর ইতিহাসে এবং ক্রমে বুঝাণের
সহিত এগিরার সম্বন্ধসংস্থাপন ব্যাপারে ক্রিয়ণ প্রভাব বিদ্যুত করিয়াছে তাহা এই
মথোভ্যখিত 'রাসনিক' বল উপলব্ধি করিয়া থাকেন বলিয়া বোধ হয় না । কাল'মজ্ঞ'ও
নির্যেটসির অব্যক্তি মন্তের প্রভাবে পদ অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এই সম্বন্ধে মানবজাতির মত
পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু ইহার উত্তরেই সমুদ্র হইতে দ্রবতরী হানের অবিবাসী ।
সমুদ্র হইতে দূরে থাকিয়াই উত্তরে গ্রহ মিথিয়াছেন । রাজ্যাবিকার ও শাস্ত মানবীর
উৎপত্তি মার্মনিক সমবেগার দ্বারাও সম্ভবে না :—উদ্যতে পক্ষির প্রয়োজন । সাগর হইতে
বাহারা দূরে বাগ করে সেই সকল মরমারীর উপর সাগর ক্রিয়ণ প্রভাব
বিদ্যুত করিয়া থাকে তাহা বাহারা বুঝিতে পারেন না :—ভাংরা পৃথিবীর ব্যাপার সম্পর্কিত
একটা গুরুতর বিষয় উপেক্ষা করিয়া থাকেন । আর এক কথা, বাহারা 'রাসনিক
ভুল্যাবিকার' লইয়া এত ভোলপাক করিতেছেন, ভাংরা এই কথাটিই ভুলিয়া যানেন যে,
পৃথিবীর অনেক অত্যাশঙ্কক কার্য অবিজ্ঞান অতি কঠোর পরিভ্রম দ্বারা নির্বাহ করিতে
হয় । শ্রীজাতি স্বাভাবিক নির্যে অবিজ্ঞান পরিভ্রম করিতে অনর্থক । সমগ্র ভবময় জীবের
নারীজাতি প্রকৃতির নির্দেশে যে কার্যসম্পাদন করিতে বাধ্য হইয়াছে :—সেই কার্যই ভাং-
রাগকে অবিজ্ঞান কঠোরপরিভ্রমসাধ্য কার্য সাধনের অব্যোগ্য করিয়াছে । মানবী সেই
প্রাকৃতিক নির্যের বহির্ভূতা নহেন । সুতরাং বাহারা মানবীকে মানবের ভুল্য অবিকার
দান করিবার অন্ত আশ্বোপনের সৃষ্টি করিয়াছেন,—ভাংরাগিকে বাধ্য হইয়া ঐ আশ্বো-
পনের উদ্দিষ্ট বিষয়টি পরিবর্তিত করিতে হইবে । তবে এই আশ্বোপন মানবী সমাজের
পক্ষি ও ভাব মৃতদ ব্যতে প্রবাহিত করিবার আকাঙ্ক্ষা সূচনা করিতেছে । ইহার পরিণাম
শ্রীপুরুষের সম্বন্ধ-বিপর্যয় :—উত্তরের ভুল্যাবিকার-প্রাপ্তি নহে । ইহাতে শ্রীজাতি
পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে ভোটাধিকার পাইবে অথবা প্রমদাধ্য কার্য নির্বাহ করিবে
ইহা বুঝার না ।

লেখক এই বিষয়টির বিদ্যুত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন ; শ্রীজাতি স্বভাবতঃ কোন
কোন কার্য সাধনে অব্যোগ্য ভাংরাও করেকটি গুটীত দিয়াছেন । দৌত্যাক্রমে আশ্বোপনের
বেশে শ্রীবিদ্যনা সম্পর্কিত আশ্বোপন ভীতভাবে আশ্বোপন
আশ্বোপনের সম্বন্ধ করে নাই—উদ্যর অতি ক্ষীণ অতি বৃহত্তর মাত্র অসুভূত হই-
তেছে । কলে আশ্বোপনের সমাজেও শ্রীপুরুষের সম্বন্ধ বীরে বীরে বিপর্যয় হইয়া
বহিতেছে । ইহা কালেরই প্রভাব । জনসমাজে চিন্তাশক্তির পরিবর্তনের সূচিত এই
পরিবর্তন বহিতেছে । পাকাত্য মন্তের প্রভাবে এ বেশে কেহ কেহ শ্রী পুরুষের ভুল্যাবিকার
হওয়া আবশ্যক বলিয়া বনে করিতেছেন । এ দ্বারা ভ্রাম্য । শ্রী ও পুরুষ জাতির বেকপ
প্রাকৃতিক ও প্রকৃতিগত বৈরতা বিদ্যমান,—সেইজন্য তাহাদের কার্যক্ষেত্রেও পৃথক ।

অধিকারের দ্বয় এই অশান্তির প্রবান কারণ । পৃথিবীর সকল জাতিই মানবজাতির

বর্ধ-বিধান কুর হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই বিধানের কর মানবজাতির অভ্যুদয় পুষ্টিকর কি না তাহাই বিচার্য। মানবজাতির উন্নতির এতোক বর্ধ বিধানের কর। যুগান্তর-সময়ে পূর্বতন যুগের বিধান অধীন হইয়া যায় এবং অভিনব বিধানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অগতঃ উপর লইয়াই ক্রমবিকাশ। এক এক যুগান্তে ক্রমশঃ পুরাতন বিধানের কর হইয়া অকুমান আশ্রয়কাল-করিতাহে।—অনন্যই নূতন বর্ধবিধান আসিয়া মানব সমাজে আনিপতা বিস্তৃত করিতাহে। এশিষ্টেটাস, সেনেকা, ক্রমওয়েলীর পিউরিটান্স, ললার্ড ও হিউগোবট দল যুগাবসানে ও কালপ্রভাবে অভ্যুদিত অকুমান নষ্ট করিয়া নূতন বিধান লইয়া অভ্যুদিত হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম নূতন বর্ধবিধানের অস্ত্র বাহুলতা আশ্রয়কাল করিতেছে। লোক-চক্ৰ অন্তরালে মানবের বে পদম সবা আছেই তাঁহাকে পাইবার অস্ত্র জন্মদায়ক যন্ত্র হইয়াছে। অনেক উন্নত লোকের লেখার তাহা একাশ পাইতেছে। মিঃ হালডেন যাদুকল 'ইংলিশ রিভিউ' পত্রে লিখিয়াছেন, অর্থশিপাসা ভিন্ন আশ্রয়ভূতির অস্ত্র আরও কিছুই এখন আশ্রয়কাল সর্বপ্রথম একাশ পাইতেছে। এক সময়ে বর্ধই কলা বিজ্ঞান দ্বারা সুন্দর, চিত্তব্রাহ্মণ ও ভাবের উত্তেজক ছিল। তাহার পর লোক কলা বিজ্ঞানকেই উপেক্ষা করিয়া কেবল 'টাকা আনা পাই' বা লাভ' লোকসান লইয়াই যত্ন হইয়া উঠিল। অর্থই তখন সর্ব সুখের মূল্যায়ন বলিয়া গণ্য হইল। বিধানের কর হইতেছে—ইহা আশ্রয় এতাক করিতেছি। ইহা মানবজাতির উন্নতির নূতন যুগ আবির্ভাবের পূচনা করিতেছে। সাধারণ মানবসঙ্গীকে পাণপন হইতে ও পার্থিব কর্ম হইতে মুক্ত করিতে হইলে বর্ধের সহিত কলাবিজ্ঞান সঙ্গিলবসান, অপরিহার্য না হউক, অভ্য-বস্তক বটে। ক্রিকেট খেলায় পরাজিত হইলে বা অস্ত্র জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় হারিত খেলনা প্রভৃতি করিতে না পারিলেই জাতীয় অবনতি হুচিত হয় না। কলাবিজ্ঞান দ্বারা মানব ভাবপ্রকাশে সর্বা হইয়া থাকে। জন্মদায়ক বাহা সুন্দর, পূর্ণ বা নির্মূলত ভাষা-কেই ভালবাসিতে এবং বাহা বেতলা, বেহুতা ও লজ্জাজনক তাহাকেই শূণ্য করিতে শিখাইয়া কলা বিজ্ঞানকে প্রতিজনক করা আবস্তক। এই একারে বর্ধ মানব-সমাজে পুনরায় প্রত্যব বিজ্ঞানে সর্বা হইবে।

কলা বিজ্ঞানবিহীন জীবন রক্তভূলা নিফল ও বিরানব। কারণ উপভোগযোগ্য সৌন্দর্য না থাকিলে,—সৌন্দর্য উপভোগের কন্যা না থাকিলে—চিত্ত অন্তঃই অবনয় হইয়া পড়ে। প্রতিদিন নূতন নূতন সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারিলেই সৌন্দর্যের সাহচর্যে জীবন অতিবাহিত করা হয়। পুস্তক, প্রতিমূর্তি, ব্যক্তি, বর্ধবিধান ও বস্ত প্রভৃতিতে এইরূপ দিত্যই নূতন সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। উক্ত লেখক লিখিয়াছেন যে, রাজনীতি পিউরিটানধিগের দীরস ভাবা ও অন্তঃসারশূন্য ভাঙ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়া আশ্রয়কাল সময়ে বিজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে। রাজনীতি প্রকৃত পক্ষে বিবদমানগুরু, বাহুল ভূলা—কিন্তু উহা 'ভিজা বিজ্ঞানের' দ্বারা নির্মিত প্রতিবাদকারী বলিয়া আশ্রয়কাল প্রদান করিতে চাহে।

ঈশ্বর বিশ্বাসের পরিবর্তে আত্মোপভোগের ও আত্মোন্নতির নিষ্পাদক কিছু পাইবার জন্য বলবতী আত্মজ্ঞা কেবল প্রতিজ্ঞাধরে আত্মপ্রকাশ করে নাই, এটা বস্তুত পুরাতন বিশ্বাস নষ্ট হইয়া বাইতেছে,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার স্থানে নূতন বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নূতন বিশ্বাস গঠনের উপকরণসমূহ প্রস্তুতই রহিয়াছে। এখন কেবল বর্ত্তোপদেশদ্বারা অব-
সার্য্যবসারের প্রথম স্পর্শ করা সম্ভবে না। আগামী অর্ধ শতাব্দী কাল সম্ভবতঃ রক্ষক ও সাতীকনাই নামকরণের চরিত্র ও সত্যবত গঠনে সাম্প্রদায়িক উপদেশ অপেক্ষা অধিকতর প্রভাব বিস্তৃত করিবে। সত্যকে যদি সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া লোকের সমুদ্রে উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা সকলের তৃপ্তিসাধক হইবেই হইবে। সৌন্দর্য্যমণ্ডিত সত্যের প্রভাব প্রতিফলিত হইবার সম্ভে। কি করা কর্তব্য নহে, তাহা শুনিয়া শুনিয়া লোক বিমূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। অকর্তব্যের কথা শুনিয়াই মানব জাতি বিমূর্ত্ত ও নির্ভীক হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বাসের বন্ধন ভঙ হইয়া এখন ধূলার পুটাইতেছে, কর্তব্যের জিহ্বার উপর আবার নূতন করিয়া তাহার দাঁতন করিতে হইবে—অর্থাৎ এখন কি করা আবশ্যক লোককে তাহারই উপদেশ দিতে হইবে। এনিয়া যুরোপ ও আমেরিকা সর্বত্রই মানব সমাজে একই বিশ্ব-
শাসন অঙ্গভূত হইতেছে,—সে শাসন অগচ্ছ বা অনুচ্ছার পূর্ব্বসূচনা করিতেছে না,—উহা উপচরের—অবশ্যবসন সকারের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিতেছে।

বিশ্বাস সমাজে লেখক বাহা বলিয়াছেন,—তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। অন্তে পরে তা কথা এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই বর্ণবিশ্বাস অতিসার হুঃ হইয়া পড়াতে লোক অত্যন্ত নির্দোষপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। বাহ্যেই একেবারেই বর্ণবিশ্বাস আদ্যবসন বস্তু। নাই,—তাহাযের হৃদয়সম্মে কেমন একটা দৃষ্টতা, কেমন একটা

অজ্ঞান অঙ্গভূত হয়। বাহ্যেই লোকসমাজে কোমল দৃষ্টতা (vacuum) উদ্ভূত হইলে যেমন প্রথম সচিবের উদ্ভব হয়,—বিশ্বাসহীনতার বনে তেমনই তেমন একটা বিক্ষোভ জন্মিয়া থাকে। বিদ্রোহপ্রভ রোপীর দেহে সোপিত রস শুভ হইলে যেমন প্রাণহারিণী পিপাসা উপস্থিত হইয়া থাকে,—বিশ্বাসহীনতা ব্যক্তি ও সমাজে সেইরূপ বনপিপাসা, বানপিপাসা ক্রমতঃ পিপাসা অতি তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যে পিপাসা আত্মের পরিচায়ক ও কলমরূপ,—যাবার কল উপচর, সে পিপাসা হইতে এই অতিতীব্র পিপাসার পার্থক্য এই যে, উহা কখনই নিবৃত্তি পায় না। সুবেরের বন, বনের ক্রমতঃ, ইন্ডের সম্মান দিলেও সে পিপাসা লাভ হয় না,—“হরিষা কৃষ্ণবস্ত্রিণী ভূগো-
এয়াতি বহুতে”। এই পিপাসা বর্তমান যুগের অবসার করিয়া নূতন স্নেহ প্রদান করিয়া থাকে,—কিন্তু সেই নূতন স্নেহ পাইতে হইলে অশ্রুপানভূমির ভিতর দিয়া বাইতে হয়। সুতরাং বিশ্বাসহীনতাজনিত বর্তমান অশ্রুপান ভল যে, শুভ হইবেই—এ কথা বলা যায় না। উক্ত লেখক বলিয়াছেন, বিশ্বাসকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিতে হইবে, তবে সে বিশ্বাস প্রীতিবে। এ কথা সত্য। সাধনমার্গে ইহা বিশ্বাসের উদ্ভবের ভর। প্রাচ্যবস্তু, এনিয়াবস্তু, অশ্রুপানঃ পুণ্যভূমি ভারতে, বর্ণ অগতে সেই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত বিশ্বাসের সর্বন বিলিঙ্গা থাকে। তাহার দ্বারা বিশ্বাসের বিবর্ত্তিত্বকে যদি নূতন বলিয়া বসে যুগের, তাহা হইলে

তাহাতে 'এব' আছে না। তাই তাহার ভাব স্থলর, সাধকের দিব স্থলর। ^{বিশ্ব} বিশ্বাসকে নৌদ্ব্যর্থমিত্ত করিতে আসে। কেবল তাহাই নহে, তাহার সাধনার পথে এবের উপর আরও একটা ভর—আরও একটা অবস্থা আছে, তাহা তত্ত্ব। তত্ত্ব এবের পরাকর্ষা—উহা অগ্রেভূত। বর্তমান ক্ষেত্রে উহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। তবে এই বাস্তবতা আবশ্যক যে,—ভারতের সাধকগণ বিশ্বাস হইতে ক্রমে এব ও তত্ত্ব সাধনার পরা নির্ভূতি লাভ করিয়াছিলেন সেই ভারতের বধন এতীচা জড়বাদমূলক শিক্ষা বিশ্বাসের দল শিথিল করিয়া লোকের মনে অশান্তির পরল-বাহা ঢালিয়া দিতেছে, তখন জড়বাদপ্রাণিত হুতোপে এবের সম্বন্ধিকীর এবাহ বহিষ্কার সম্ভাবনা কোথায়? বিশ্বাস ব্যতীত এব থাকিতেই পারে না। কারণ এবই নৌদ্ব্যর্থমিত্ত বিশ্বাস। কিন্তু যদি চৈতন্যের আধার অগ্নিরা হুতোপে প্রেমদগ্ধা এবাবিত করিতে পারেন, তাহা হইলে জড়বাদের বক্ততে মন্বদের শোভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে,—অশান্তি পরমা শান্তিতে পর্যাবসিত হইবে,—বিশ্বাস মাসবের সূত্র স্থলর পূর্ণ করিয়া দিবে। লেখক যে জড়বাদের সাহায্য অগ্নিরাও প্রেমবারিবারার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন,—তাহাতে তাহার দুঃখবিশিষ্টাই বড়ি হইতেছে।

লেখকের বক্তে বর্তমান ঢাকল্যের আর একটি কারণ বাস্তবসম্পর্কিত। বাস্তব জীব্যের উৎপত্তিই প্রমথিতের এবান বিষয়। ইহা ভিন্ন সত্য ও স্মিত জুড়ীর কারণ। কোটীমধ্যে বহু, ইচ্ছন, ও গৃহের প্রয়োজন অপরিসীম। সকল সেনে গৃহের বা বাসস্থানের আবশ্যকতা অস্বুভূত হইয়া থাকে। এই সকল আবশ্যক জব্য উৎপন্ন করিলেই চলিবে না,—ইহা মানা স্থানে প্রেরণের জন্ত ক্রতবানী বাসাদি পরিচালনের ব্যবস্থাও আবশ্যক। এই বাসাদির পরিচালন সম্বন্ধে লেখক অনেক কথাই লিখিয়াছেন।

বাস্তব সাবগ্রীর অভাবমিত্ত ঢাকল্যের কথা আবারের দেশবাসীকে বিস্তৃতভাবে বলাই নিম্নপ্রয়োজন। ইহা অনেকই বর্ধে বর্ধে অস্বুভব করিতেছেন। বাস্তবে বাস্তব জীব্যের উৎপত্তি বুদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা না করিলে আবারের আর নিষ্কার নাই। সাধারণ ভ্রল্ললোকগণ তান দাবা গানার কালগ্রন না করিয়া যদি আপনাদের প্রাঙ্গণপ্রান্তে আবশ্যক ভরকারী প্রভৃতির উপাধানে সাস্ত্র চেষ্টা করেন, তাহাভেত স্থল কলিতে পারে।

প্রত্যাবর্ত্তন ।

বিবাহের পর দুই বৎসর সুখে কাটিয়া গেল ; বরং সুখের আত্মশ্রাব্য ব্যতীত অপ্রাচুর্য্য ছিল না । তাহার প্রধান কারণ, সে সুখ কেবল প্রকৃত নহে, তাহার অধিকাংশ কল্পনারাজিত হইয়া সুখময় হইয়াছিল । সংসারে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে মানুষ মানুষকে চিনিতে পারে, একের হৃদয়ে অপরের হৃদয় প্রতিভাত হয়, বাস্তবের আলোকে কল্পনাকুহেলিকা অপহৃত হইয়া যায়—এ দুই বৎসরে পত্নী কুমুদমালা সহিত যুগলকান্তির সে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই । কারণ, কুমুদমালা তখনও কখন বা পিত্রালয়ে কখন বা পতিগৃহে থাকিত । কুমুদমালা বোড়শ বৎসরেও সংসার বুঝিয়া সংসারে প্রবেশ করে নাই । তাহারও হৃদয়ে তখন প্রেমের প্রথম বস্তার আর সব ভাসিয়া গিয়াছিল । বসন্তে যেমন কুমুদে কুমুদে কঠিন শাখার অঙ্গ আবৃত হইয়া যায়—তেমনই প্রথম প্রণয়বিকাশে হৃদয়ের সহস্র দোষ পর্য্যন্ত আবৃত হইয়া যায়—কেবল কমনীয় কান্তিমাত্র প্রকাশ পায় ।

কিন্তু আঘাত না করিলে যেমন মৃত্যুর স্বরূপ প্রকাশ পায় না, আঘাত না পাইলে তেমনই হৃদয় চিনিতে পারা যায় না । বিবাহের দুই বৎসর পরে এইরূপ আঘাতের কারণ ঘটিল ;—সঙ্গে সঙ্গে যুগলকান্তির পক্ষে হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সম্বোধনের কারণ ঘটিল । যুগলকান্তি সাধারণ পাঠ শেষ করিয়া কিছু অধিক বয়সে বিবাহ করিয়াছিল । বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রপরীক্ষার তাহাকে প্রতিবার সকলচেটে দেখিয়া কুমুদমালায় বনী পিতা তাহাকে কত্কা সমর্পণ করিয়াছিলেন । যুগলকান্তি যথাবিত্ত অবস্থাপন্ন ; তাহার সংসারের জালা অল্প—কারণ এক জননী ব্যতীত তাহার সংসারে আর কেহ ছিলেন না । এ অবস্থায় সে যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে উত্তেজিত হইয়াছিল তাহাতে সামান্ত সাকল্যেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া বাইতে পারে । বিশেষ তাহার জননীর হস্তে কিছু টাকাও যে না ছিল—এমন হইবে । তাহার স্বত্তর এই সব বিবেচনা করিয়া কাষ করিয়াছিলেন । কিন্তু বোড়-দোড় অনেক সময় যে অথ সমস্ত পথ অগ্রে থাকে, শেষ সময় সে পিছাইয়া পড়ে । যুগলকান্তির ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল । অকুটে-দেবতা আমেরকে

অবহেলা করিয়া। সগৰ্ব্বতর সাধনার মৃণালকান্তিকেই সফলসাধন তহিয়া-
ছিলেন; এখন যেন সেই অকারণ আশুকুলো লঙ্ঘিত হইয়া যৌর কৃত
দুর্ভাগ্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বহুপরিকর হইলেন। ব্যবসায়ের প্রবেশপথে
পত্নীকার মৃণালকান্তি উপর্যুপরি দুইবার বার্ষিকনোরণ হইল।

মৃণালকান্তির স্বতর তাহার পূর্বসাক্ষ্য লক্ষ্য করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ
সাক্ষ্যের আশা করিয়াছিলেন এবং সেই আশার উপর নির্ভর করিয়াই
তাঁহাকে কল্যাণ করিয়াছিলেন। কাৰেই মৃণালকান্তির অসাক্ষ্যে তিনি
বিরক্ত হইলেন। কুমুদমালার সে কথা জানিতে যিনেব বিলম্ব হইল না।
কলে স্বামীর উপর তাহার অভিমান হইল; কিন্তু সে অভিমানের মূলে
অসাক্ষ্যদুঃখকাতর স্বামীর দুঃখে মহাহুতুরি বিশ্বমাত্র অতাব ছিল না,
বরং তাহা মহাহুতুরিহিত।

কিন্তু ইহার পর আর একটি ঘটনা ঘটিল। মৃণালকান্তি যখন দ্বিতীয়-
বার বার্ষ্যেই হইল তখন কেহ কেহ দোষটা কুমুদমালার ব্রহ্মেই চাপাইলেন।
যে এতদিন অসাক্ষ্য কাহাকে বলে তাহা জানে নাই, সে যে আপনার দোষে
বা পত্নীর দোষ ব্যতীত অন্য কারণে বার্ষ্যেই হইতে পারে, তাহা বুঝিতে
অস্বীকৃত্য হইয়া তাহার শাত্তির কোন কোন আশ্রয় এবং সবত
নিঃসম্পর্কীয় পরবাস্তব একবাক্যে কুমুদমালাকেই দোষী স্থির করিলেন।
তাঁহাদের চরম বিচার এক তরফ হটলেও তাহার বিরুদ্ধে 'আপিল' চলিতে
পারে না।

অন্যকথা হুড়ে পতিত হইলে যেমন তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া কেলে এই
কথায় তেমনই কুমুদমালার ক্রমের তাব বিরক্ত হইয়া গেল; মহাহুতুরি
বিরক্তিতে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না।

২

যখন বাহিরে লক্ষ্য পীড়িত ও ক্রমের হতাশার কাতর হইয়া মৃণালকান্তি
মহাহুতুরির অন্ত লোলুপ হইয়াছিল সেই সময় বাহার সামান্য মহাহুতুরি-
লাভের আশার সে আর সব সহ করিতে প্রস্তুত ছিল,—অন্যতর উৎকট
উপহাস ও নিবাক্রম মিছুরতার মধ্যে সে বাহার নিকট মহাহুতুরিলাভের
আশা করিয়াছিল, তাহার সেই পত্নী তাঁহাকে একান্ত দোষী মনে করিয়া
কথা করিতে অসম্মত হইল। যে আর সব আশা ছাড়িয়া বৃচ্ বিশ্বাসে
এক আশা নির্ভর করে সে সে আশার হতাশ হইলে কুমুদমালার

দেখে যে হানে আশ) যত অধিক সে হানে বেদনাও তত প্রবল। আপনার প্রেমগুণ হৃদয় দিহা সে পত্নীর হৃদয় বিচার করিয়াছিল—তাই সে একান্ত হতাশ হইল। তাহার কল্পনারচিত—পুশিত ক্রমলতাজ্জ্বলিত—বিহগকুঞ্জিত রমা উপবন মুহূর্ত্তে মরুভূমিতে পরিণত হইল। হতানাকাতর যুগলকান্তির হতানাবেদনা বেন বিগুণ হইয়া উঠিল।

কিছু প্রেম বাহির হইতে আপনার রক্তার উপায় না পাইলেও কিছু দিন আপনার সজ্জিত রসে আপনি জীবিত থাকে এবং সেই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পাইবার চেষ্টাও বে না করে—এমন নহে। যুগলকান্তির হৃদয়ে যৌবনের নিরুদয়, স্বাধিকমূল্যবোধীন প্রেম প্রবল প্রেমও এক দিনে জুগু হইবার নহে; তাহা এক দিনে বিলুপ্ত হইল না। সে আপনাকে আপনি বুকাইয়া কুসুমমালাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিতে বধেই প্রয়াস পাইল। প্রেম প্রেমিককে সহজে প্রোক্ষণের দোষ দেখিতে দেয় না। যুগলকান্তি আপনার নিরুদয় আপনাকে দোষী করিয়া পত্নীকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল। সে প্রথমে মনে করিল,—সে অতিরিক্ত অদম্যবের আশা করিয়াছিল—তাই হতাশ হইয়াছে। সে কেবল কল্পনায় সম্ভব আদর্শে পত্নীকে বিচার করিয়াছে—অত্যাধিক করিয়াছে। কিন্তু পত্নীর ব্যবহার লক্ষ্য করায় সে সত্যনা অলবিষের মত মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া গেল। তখন সে চিন্তাস্রয়ের আশ্রয় লইল।

ইহার পর সে মনে করিল, স্বামীর অভ্যাবিক প্রোক্ষণে পত্নীর হৃদয়ে বিরক্তির সঞ্চার হয়। হয় ত সে পত্নীর বালিকা-হৃদয়ে প্রেমবিকাশ বৃদ্ধিত হইবার পূর্বেই তাহার নিকট প্রেমভুক্তা জানাইয়া তাহাকে বিরক্ত করিয়াছে। তখনও তাহার মনোবৃত্তি উপযুক্তরূপে বিকশিত হইতে পার্য নাই। সে তখনও প্রেমের স্বরূপ বৃত্তিতে লিপ্ত নাই—বৃত্তিতে পারে নাই। অবি-চলিত নির্ভরশীলতা—অসাধারণ সহিষ্ণুতা বে প্রেমের ভিত্তি, তাহা সে তখনও বুকে নাই। কি মূল্য কি কিনিতে হয়, কি লাভের জন্য কি ত্যাগ করিতে হয়—তাহা সে তখনও জানে নাই। তাই সে বিরক্ত হইয়াছে। তখন লজ্জাধিক্যে সে সে কথা তাহার নিকটেও প্রকাশ করে নাই। হৃদয়ে প্রেম সুরিত হইবার পূর্বেই বিরক্তি সূচিয়া উঠিয়াছে। সে জন্য তাহাকে একান্ত দোষী করা সম্ভব নহে। এইরূপ চিন্তায় সে সত্যনালাভের চেষ্টা করিত।

কিছু পত্নীর ব্যবহারে পদে পদে তাহার প্রেম লাভিত, সৎসমুদ্ভূতিলাভ-

চেঁটা বাথ ও সমর্পিত প্রতাপিত হইতে লাগিল। ক্রমে সকলরূপ সামান্য লাভই অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল, সবে সবে বৈবাহ্যসীমার আতিক্রমও অবশ্যস্বায়ী হইতে লাগিল। অতি দরিদ্র তিস্রুকও চাহিয়া চাহিয়া শেষে পাইবার আশা ত্যাগ করে—চাহিতেও নিবৃত্ত হয়। বিলম্বিত হইতে হইতে শেষে আশাও বসলেন্দু ন্যায় মরুভূমিতে লভিকার মত শুকাইয়া যায়। মৃণাল-কান্তিরও ক্রমে তাহাই হইতে চলিল। এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল।

৩

পূর্বকথিত দারুণ দুষ্টিতার আশায় মৃণালকান্তি সমস্ত বৎসর পাঠে যথোচিত মনোযোগদান করিতে পারে নাই। বাহ্যকে নিশ্চেষ্ট সুপ্রোথিত হইয়া ব্যস্তা করিয়া প্রভাতেই পত্রব্য স্থানে উপনীত হইতে হইবে, সে যদি সহসা জাগিয়া দেখে, প্রভাতের আর অধিক বিলম্ব নাই—নিশাবসানের বজ্রাঙ্ককারে দোরেল প্রভাতী গাহিতেছে—তবে সে যেমন নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া অতি দ্রুত পথ চলিতে আরম্ভ করে, মৃণালকান্তিরও তেমনই ঘটিল। পত্রীক্ষার প্রায় দুই মাস পূর্বে সে দেখিল, দুই মাসে সব পাঠা পুস্তকের একবার আবৃত্তি করাও দুঃসাধ্য। সে চিন্তিত হইল, এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া নষ্ট সময়ের অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার বাহ্য প্রয়োজনমতে আপনাকে নিয়ন্তৃত করিতে অসম্মত হইয়া প্রথমে নানারূপ সামান্য সামান্য অনুরোধে সে অসম্মতি জানাইল। মৃণালকান্তি যখন তাহাতে ভ্রক্ষেপ করিল না তখন সে কিছু উৎকটরূপেই সে অসম্মতি জানাইতে প্রবৃত্ত হইল।

নিশ্চেষ্ট দেখে—প্রায় মস্তিকে, বাহ্যহীন দুর্বলতার ওরুতর মানসিক প্রমত্ত হই এক দিন চলে,—দুই একমাস চলে না। কিন্তু না চলাইলে নহে মনে করিয়া মৃণালকান্তি নিবৃত্ত হইল না এবং শেষে অনন্যোপায় হইয়া চিকিৎসকের স্বরণ লইল। চিকিৎসক সব তদ্বিধা আশঙ্ক্য প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, এ অবস্থায় মানসিক প্রম একেবারে নিষিদ্ধ—অস্ত্রাণা পীড়া বাড়িয়া দ্রুতই দুঃখরোগ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

মৃণালকান্তির মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। পত্রীক্ষার আর দুই মাস সময়ও নাই। এখন উপায় কি? সে চিকিৎসককে সে কথা বলিল;—এই দুই মাস কোনরূপে বাহ্যরক্ষার কোন উপায় কি নাই? নাই—তদ্বিধা সে বলিল, “আমার বাহ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায় সেও ভাল—এই দুই মাস বাহ্যতে

“যদি প্রব করিতে পারি তাহার উপায় করিয়া দিতেই হইবে।” চিকিৎসক তাহার কত সুখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কোন উপায়ই নাই। তিনি বলিলেন, “এখন অবহেলা করিলে চিররোগী হইয়া থাকিতে হইবে।”

মৃণালকান্তির চকুতে জল আসিল। হায় কেন সে পূর্বে এ কথা ভাবে নাই? সে এখন কি করিবে? এখন সে চিকিৎসকের কথা উপেক্ষা করিয়া পূর্ববৎ পরিশ্রম করিতে লাগিল। কিন্তু সে সহজেই বৃষ্টিতে পারিল, তাহা সম্ভব নহে। হতানার—বেদনার—যাতনার তাহার হৃদয় একান্ত চকল ও কাতর হইল।

তবুও এ কথা সে আর কাহাকেও—জননীকেও—বলিবার পূর্বে কুমুদমালাকে বলিতে আসিল। কুমুদমালা তখন হঠাৎকালে বসিয়া গেলাই করিতেছিল। হারপথে একজন প্রবেশ করিতেছে বুঝিয়া সে একবার মুখ তুলিয়া দেখিল। বামীর মুখ অন্ধকার বোধ হইল; কিন্তু সে তাহাতে বিশেষ মন দিল না।

মৃণালকান্তি বিপদে পড়িল; কেনন করিয়া কথাটা আরম্ভ করে? বিশেষ পরীর তাব দেখিয়া তাহার আগ্রহ কমিয়া গেল। শেবে কিছুকণ চুপ করিয়া থাকিয়া—মাথা তুলকাইয়া সে বলিল—“আবার বড় বিপদ উপস্থিত।”

কুমুদমালা কোন কথা কহিল না।

ওকতার প্রস্তরখণ্ড প্রথম নড়ানই কইসাধ্য; একবার নড়াইতে পারিলে তাহাকে গড়াইয়া লওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তখন কথাটা একবার আরম্ভ হইয়াছে—মৃণালকান্তি বলিল, “এবার পরীক্ষা দেখিয়া হইয়া উঠিতেছে না।”

কুমুদমালা দত্তে একটা হজ কাটিতেছিল; সেই অবস্থায় মুখ তুলিয়া বলিল, “কেন?”—তাহার বৃষ্টিতে তীব্র তিরস্কার।

মৃণালকান্তি বলিল, “পরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে।”

কুমুদমালায় ওষ্ঠাধরে অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল, “কেন, পরীক্ষার সময় আসিতেছে বলিয়া?”

হায় ইহারই নিকটে সে সহানুভূতিলাভের আশা করিয়াছিল? আর সম্ভব হইল না—মৃণালকান্তি বলিল, “ইহার পর যখন আমাকে নিগ্নাবাদী বলিবে, শষ্ট করি। বলিও, উপহাসের আশ্রয়ে অবিশ্বাস আবৃত্ত করিও না।”

কুমুদমালা কি উত্তর করিল মৃণালকান্তি তাহা তদিল না। সে ক্রতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

আশনার কণ্ঠে আসিয়া যুগলকান্তি কাহিতে চাহিল। কিন্তু অতি দারুণ বাতনার ক্রন্দন আসিল না। তখন বিবাহিত জীবনের সকল কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যা একবার ক্ষুদ্রে প্রবেশ করিলে বিপদের আর ভয় থাকে না। সে অতি তুচ্ছ ক্রটিকে অত্যধিক প্রমাণ করে, শুণ্ডে দোষ দেবার। আর যুগলকান্তির তাহাই হইল। আর বিবাহিত জীবনের ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনার পতীর ব্যবহারে সে পদে পদে অবহেলা, অবিবাস, উল্লেখ্য, যুগলকান্তি করিতে লাগিল। অতি তুচ্ছ ঘটনাও বিবম বাতনার কারণ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার প্রেমভুজা—তাহার প্রেম পতীর অবহেলা ও অবিবাস পরস্পরের সংস্পর্শে স্পষ্ট ও সন্মুখ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে প্রেম দিয়া উল্লেখ্য লাভ করিয়াছে, প্রেম চাহিয়া যুগল পাউয়াছে। প্রেমের উপযুক্ত প্রতিদান বটে! কিন্তু তবুও তাগো আর কি লাভ ঘটনা থাকে? হায়—প্রেম এখনই অবহেলার?

ক্রমে প্রেমের স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বি আসিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বি কাহার উপর? কে লইবে?

চিন্তার বাতনা ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। যুগলকান্তি চকল হইয়া কিছুকণ কক্ষমধ্যে পাথচারণ করিল, শেষে তাহাতে তাহাতে গৃহ ছাড়িয়া-রাজপথে বাহির হইল।

চিন্তা সবে গেল। রাজপথে অব্যাহত জনস্রোতঃ; নরনারী আপন আপন কার্যে বাইতেছে। স্বাৰ্ধসংঘাতসঙ্কুল মহানগরীর প্যাণপথে অবিস্ময় জনস্রোতে স্বাৰ্ধ ও পরাৰ্ধ দুই দ্বারা এক পথে বাইতেছে। ভাল মন্দ সবই আছে। সেই জনস্রোতে ভাসিতে ভাসিতেও কেবল সেই চিন্তা যুগলকান্তির মনে সন্মুদিত হইতে লাগিল—হায়, সে কি দ্রাব্য! সে কাহার নিকট সহায়ত্ব লাভের আশা করিয়াছিল। সে আশার সে সর্বপ্রথমে তাহারই নিকটে আপন দারুণ দুঃখ জানাইতে গিয়াছিল। সে তাহার উপযুক্ত কল্যাণ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখন সে কি করিবে?

নানা হুঁচিকার তাড়নে সে একটি কথা জুলিল—কর্তব্য বাহ্যিক তাহারই। অপরের ব্যবহারে তাহার ইতর বিশেষ সকল সম্বন্ধ হয় না। বিশেষ যে স্থানে

একই কর্তব্যো নানাবলন বুদ্ধ সে স্থানে সে কর্তব্য একের জন্ত তাগ কর।
জ্ঞানসম্বলত নহে—যে বুদ্ধের জ্ঞান ও মল দল জনের ভোগ্য একজননের দোষে
বা একজননের জন্ত তাহার হেদন করা যেমন অজ্ঞায়, তেমনই নিম্ননীয় ।

সে মনে করিল, সে বধন উপেক্ষিত হইয়াছে তখন সেই দারুণ অস্ত্র
ব্যবহার করা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ বা নিম্ননীয় নহে । শিকারী যেমন শিকারে
বাইবার পূর্বে আপনার বন্দুক নাড়িয়া চাড়িয়া আনন্দ লাভ করে সেও
তেমনই সেই অস্ত্রের কথা তাবিয়া আনন্দ লাভ করিল ।

সে মনে করিল, জ্ঞান ব্যবহারে জ্ঞান প্রতি তাহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে ।

সে দিন মৃণালকান্তির গৃহে কিরিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল । ইহা তাহার
পক্ষে কিছু নূতন । কার্য্য বাতীত—সব করিয়া সে কখনও সন্ধ্যার পর
বাহিরে থাকিত না । তাহার প্রধান কারণ, সে বালাকালেই পিতৃহীন,
সংসারে লোক অজ্ঞ । যা'র কায অল্পকণ্ঠেই সম্পন্ন হইয়া বাইত । সে
জানিত, যা তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন,—তাহার সামান্য বিলম্বে
তিনি ব্যস্ত হইবেন । ক্রমে অভ্যাস বশতাবে মুগ্ধিত হইয়াছিল,—বিনা কারণে
সন্ধ্যার পর বাহিরে থাকিলে সে আপনি চকল হইয়া উঠিত—আপনার নিকট
যেন আপনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল ।

পরদিনও এইরূপ হইল ।

এ দিকে কুমুদমালা স্বামীও বাতনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল না ।
সে, সে বাতনার তীব্রতা করুনাও করিতে পারিল না । কাবেই সে মৃণালকান্তির
ব্যবহার কমা করিবার কোনও কারণ দেখিল না—কমা করিল না । সে
আপনাকে অবধা অপমানিতা মনে করিল । সেও রাগ করিল ।

কলে স্বামীজীর মধ্যে মনোমালিন্য বাড়িয়াই চলিল ।

ক্রমে এমনই দাঁড়াইল—মৃণালকান্তি যেন গৃহ অপেক্ষা গৃহের বাহিরেই
ভাল থাকে । গৃহ তাহার দৈনন্দীন জীবনের কেন্দ্র ছিল, এখন দূর পরিধি-
প্রেমায় বিস্তৃত হইয়া পৰ্য্যবসিত হইল । কিন্তু যা'র কাছে একটা ওজর আবশ্যক ;
তাই মৃণালকান্তির বন্ধুগৃহে নিত্য নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল ।

পুত্রের অধিকাংশ বন্ধুর কথা—বিশেষ বনিষ্ঠ বন্ধুদিগের কথা যা স্তবগত
ছিলেন । সহসা তাহার বন্ধুবাহল্যে—বিশেষ বন্ধুদিগের বন্ধুনিমন্ত্রণে
অকারণ উৎসাহাতিশয্যে বা চিন্তিত হইলেন । পুত্রের প্রকৃতি তিনি জানি-
তেন—পুত্রের হৃদয় তিনি নখদর্পণে দেখিতেন ।

মা'র মনে সম্ভেদ উপস্থিত হইলে তাঁহার সে সম্ভেদ ভঞ্জন করিতে বিলম্ব হইল না। পুত্রের ও পুত্রবধূর ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তিনি সহজেই পুত্রের বহুবাহুল্যের কারণ বুঝিতে পারিলেন।

স্বপ্নালম্বিত ক্রমেই গৃহের সংশ্রবভাগের মাত্রে বাড়াইতে লাগিল গৃহের বাহিরে সহসা তাহার এত কাষ হুটিয়া গেল যে, গৃহে থাকিবার সময় অল্প হইয়া আসিল। মা ভিজ্ঞাসা করিলে হয় কার্য্য নহে ত নিষ্পত্তি এইরূপ উত্তর পাইতে লাগিলেন। পুত্রের বাহিরে এই কন্দবাহল্যও যে তাহার নিষ্পত্তিরই মত অস্তিত্বহীন মা'র তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মিথ্যার বস্ত্র আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার ভীকৃ দৃষ্টি সহজেই সত্য দেখিয়া গেল। পুত্রের কার্য্যের বিষয় তিনি যে না জানিতেন, এমন নহে; কারণ পূর্বে পুত্র আবৃত্তক অনাবৃত্তক অনেক কথাই তাঁহাকে জানাইত।

বাহিরে পুত্রের কাষ যে পরিমাণে বাড়িয়া চলিল মা'র হুঙ্কিতা তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়িতে লাগিল। কিন্তু তিনি সহসা কোন কাষ করিতে সাহস করিলেন না। তিনি কি করিবেন?

এই ভাবে মাসাদিক কাল কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে পতিপত্নী কেহই বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিল না; কেহই স্থায়ী সুখের উৎস-সন্ধানে বাইতে প্রস্তুত হইল না। উত্তরেরই বিশ্বাস, সে অবধা অপমানিত—সে অত্যাচারপীড়িত—সে কোনরূপে ঘোষী নহে। কাষেই উত্তরের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাহা কমিল না, বরং দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।

৭

ক্রমে যখন বাহিরে পুত্রের কাষ নিতান্তই বাড়িয়া উঠিল; “মা, আমার কিরিতে বিলম্ব হইবে; আমার লজ্জা অপেক্ষা করিও না”—এই কথা তাহার নিত্য বক্তব্য হইয়া গিয়াছিল, তখন মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

এক দিন অপরাহ্নে মা পুত্রবধূর নিকটে আসিয়া বসিলেন। পুত্রবধূ তখন পশম মিলাইয়া একটা গলাবন্ধ বুঝিতেছিলেন। মা নিকটে আসিয়া বলিলেন, “মা, তোমাদের কি হইয়াছে?”

কুসুমমালা উত্তর দিল না; মুখ নত করিয়া রহিল।

মা পুনরায় বলিলেন, “মা, আমি বড় দিন পারিয়াছি চুপ করিয়া ছিলাম কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিবার সময় নাই। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আর লজ্জা করিবার সময় নাই।”

কুমুদমালা মুখ ভুলিল না ।

মা বলিলেন, “কারণ বাহাই হউক, একই কারণে আমরা উভয়ে বিপন্ন ।”

কুমুদমালা বিন্মিতনেত্রে শাওড়ীর মুখের দিকে চাহিল ।

মা বলিলেন, “আমরা মৃণালকে হারাইতে বলিয়াছি ।”

কুমুদমালা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল ।

মা বলিলেন, “আমি মৃণালকে জানি । এই ছায়াবস্ত্র বৎসর তাহার কাষ, তাহার বহু সবট আমি জানি । আক সে আমাকে কি বুঝাইবে ? তাই আমি চিন্তিত হইয়াছি ।”

কুমুদমালার মুখে বিশ্বাসের পরিবর্তে আশঙ্কার ছায়াপাত লক্ষিত হইল ।

মা বলিলেন, “মা, আমরা তাহাকে হারাইতে বলিয়াছি । দুই জনে যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে রাখিতেই হইবে । যে সর্বস্ব, তাহাকে হারাইয়া কি লইয়া থাকিব ?”

অন্ধকার নিশার পর্কতপথে পথভ্রান্ত পথিক যদি সহসা বিদ্যুদালোকে সমুখে অতি গভীর সমুদ্র দেখিতে পায়, তবে যেমন মুহূর্তমধ্যে তাহার নিকট তাহার সমস্ত বিপন্ন সুশ্পষ্ট হইয়া উঠে, তেমনই শাওড়ীর এই কথায় আঞ্জ কুমুদমালার অন্তিমানে উদ্ভত হৃদয়ে তাহার প্রকৃত বিপদের বস্ত্রণ কুটিয়া উঠিল ।

সে ব্যস্ত হইয়া কি বলিতে বাইতেছিল এমন সময় কক্ষদ্বারে মৃণালকান্তির পদধ্বনি শ্রবিত হইল । মৃণালকান্তি বাহিরে বাইতেছিল । যাতাকে দেখিয়া সে ককে প্রবেশ করিতে বাইতেছিল, কক্ষমধ্যে পত্রাকে দেখিয়া সরিয়া আসিল, যেন সে সহসা সমুখে সর্প দেখিয়াছে । সে মা'কে বলিল, “মা, আমি বাহিরে বাইতেছি । আমার আসিতে বিলম্ব হইতে পারে । আমার জন্ত অপেক্ষা করিও না ।”

মা কাতর দৃষ্টিতে পুত্রবধূর মুখে চাহিলেন । পুত্রবধূর নয়নেও সেই কাতরতা । উত্তরে উত্তরের মনের তাব কুন্দিরাছেন । সেই দৃষ্টিতে উত্তরের হৃদয়ের তাব ব্যক্ত হইয়া গেল । বাক্য সকল সময় তাব-প্রকাশের জন্য একান্ত আবশ্যক নহে ।

“দুইটি রমণী হৃদয় হইতে অতি কাতর দীর্ঘশ্বাস উঠিল ।

“মা ডাকিলেন, “মৃণাল !” সে শব্দে কি কাতরতা !

কিন্তু মৃণালকান্তি ততক্ষণে দ্রুতপদে সোণামন্ড্রেরী অবতরণ করিয়া

গৃহ হইতে রাক্ষসে উপস্থিত হইয়াছে। সে মা'র সে আত্মা জ্বলিতে পাইল না।

সে রাজিতে যুগলকাণ্ডি গৃহে ফিরিল না। পূর্বে কখনও এমন হয় নাই। তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইলেও সে ফিরিত। সে না ফিরিলে মা দুমাইতে বাতেন না। আজও মা জাগিয়া বসিয়া রহিলেন। তবে আজ আর একজন তাহার সঙ্গে জাগিয়া বসিয়া রহিল। আজ কুমুদমালার নরনেও নিদ্রা নাই—আজ কেবল বেদনার ও আশঙ্কার তাহার হৃদয় ঢকল, এ ঢাকলা সে পূর্বে কখনও অনুভব করে নাই।

ক্রমে প্রভাত হইল। দিবালােকবিকাশের পূর্বেই পাখান মগরীর পাখান পথে জীবনের কোলাহল শ্রুত হইল। মা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বধূর দিকে চাহিলেন। তাহার নরন হইতে অশ্রু বরিয়া পড়িল। কুমুদমালার মনে হ'ল—সে একান্ত অপরাধী—শাতড়ীর এই বাতনার অন্ত বেন সে-ই দায়ী।

দীর্ঘ দিন কাটিয়া গেল। পুস্ত্রের আহার্য সজ্জিত করিয়া মা অনাহারে বসিয়া রহিলেন। পুস্ত্র ফিরিল না। কুমুদমালা শাতড়ীকে বল ল্পর্শ করাইতে পারিল না। মা বলিলেন, “আবার কুণ্ডা তুফা কিছুই নাই।” কুমুদমালার বুক ফাটিয়া বাইতে লাগিল।

পরদিন মা যুগলকাণ্ডির পত্র পাইলেন। সে লিখিয়াছে—তাহার শরীর অসুস্থ—সে কিছু দিনের অন্ত বেড়াইতে বাইতেছে।

সেই দিন অপরাহ্নে কুমুদমালার পিতা জামাতৃসঙ্গে আগিলেন। তাহার এক পুস্ত্রের বিবাহ—দুই দিন পরে “পাকা দেবা” ও এক পক্ষ পরে বিবাহ। বৈবাহিকাকে সে কবা জানাইয়া ও কতাকে পরদিবস স্বগৃহে লইয়া বাইবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুগল কোথায়?”

মা বলিলেন, “তাহার শরীর অসুস্থ। সে আজ ক: দিন হইল বেড়াইতে গিয়াছে।”

ওনিয়া কুমুদমালার পিতা বিরক্তি গোপন করিতে পারিলেন না; বলিলেন, “সম্মুখে পরীক্ষা—এখন বেড়াইতে বাইবার সময়ই বটে। আমি দেখিতেছি,—মেয়েটার কপালে দুঃখ আছে; নহিলে এত সম্বন্ধ ছাড়িয়া এই সম্বন্ধেই আশার মত হইবে কেন?”

মা'র মনে হইল বলেন, “তখন আপনিই বিশেষ চেষ্টা করিয়া এ কাষ

কহিয়াছিলেন।” তিনি আশ্বসংবরণ করিয়া বলিলেন,—“এখন আর আক্ষেপ করা বুঝা।”

বৈবাহিক প্রকান্তে বলিলেন, “তাঁহা সত্য।”—মনে মনে বলিলেন, “যেমন ছেলে—তেমনই মা।” তিনি আবার বলিলেন, “তাঁহার ঠিকানা কি? পত্র না লিখিলে আবার হয় ত রাগ করিবেন—বিষ না থাকিলেও যে কুলার বত চক্রে থাকে।”

মা’র পক্ষে আর আশ্বসংযম হুংসাব্য হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বহু কষ্টে স্থির ভাবে বলিলেন, “আপনাকে আর লিখিতে হইবে না।”

কতকালে পরদিন বাইতে বলিয়া পিতা বিদায় লইলেন।

কুমুদমালা আসিয়া দেখিল, শাওড়ীর ছুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু করিতেছে। সেও কাঁদিয়া ফেলিল। আজ শাওড়ীর বেদনা সে আপনার হৃদয়ে অনুভব করিল, শাওড়ীর অপমানে সে আপনাকে অপমানিত মনে করিল।

পরদিন পিত্রালয় হইতে তাহাকে লইবার লজ্জা গাড়ী আসিলে সে শাওড়ীকে বলিল, “মা, আমি বাইব না।”

শাওড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?”

“আবার বাইতে ইচ্ছা নাই।”

“তাঁহা ভাল হয় না।”—তিনি দীর্ঘকাল ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “মা, সংসারে ইহাই বড় আলা যে, লোকে বলিবে কি এই ভয়ে আপনার বাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাঁহা করা যায় না।”

৯

পিত্রালয়ে জননী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই কুমুদমালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মৃণালকান্তি কোথায়? থানী কোথায় গিয়াছেন তাঁহা সে জানে না—ইহাতে সকলেই বিষম প্রকাশ করিলেন। কেহ কেহ ইহা বিশ্বাসই করিতে চাহিলেন না। তাঁহার সমবয়সকারা ইহাতে তাহাকে বহুবিধ বিক্রম করিল—কেহ কেহ মৃণালকান্তিকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নার বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই বিষয়ে কুমুদমালা বুঝিল, সে একান্তই অত্যাশী। বাহা সকল পরীর অবশ্য প্রাপ্য সে তাঁহা পায় নাই। কিন্তু সে তাঁহার আপনার দোষেই তাঁহা পায় নাই। মৃণালকান্তির উদ্দেশে নিকিণ্ড নিদারুণ বাণ তাহাকেই আহত করিয়া অসীম যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাঁহার বুক কাড়িয়া বাইতে লাগিল।

ভাতার বিবাহ পর্যন্ত তাহার পিত্রালয়ে থাকিবার কথা। কিন্তু শাওড়ার কষ্ট হইতেছে বলিয়া সে “পাকা দেবার” পর দিন বাঁহীগৃহে চলিয়া আসিল। শাওড়ার প্রতি বধুর এই “অস্বাভাবিক” ভালবাসার মত তরুণীরা তাহাকে বিক্রপ করিলেন। সে কোন কথা শুনিла না—শাওড়ার নিকট চলিয়া আসিল; কারণ সমবেদনার সহানুভূতিমিত সাধনার তত্ত্ব ছদ্ম নীতল হয়।

তাহার পর যখন তাহাকে লইতে পুনরায় পিত্রালয় হইতে পাড়ী আসিল, তখন সে লম্বা লম্বা—কিছুতেই পিত্রালয়ে গেল না। লম্বাটে হুঁতায়ের টীকা লইয়া সে আনন্দোৎসবে যোগ দিতে অস্বীকার করিল।

পাড়ী ফিরিয়া বাইলে সে মৃণালকান্তির বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। তথায় প্রাচীরে বিলম্বিত স্বামীর আলোচনার নিম্নে হর্ষতলে লুটাইয়া সে দারুণ বেদনার কাঁদিয়া যনের ভারলাঘব করিল; স্বামীর উদ্দেশে বলিল—হে আমার ছদ্মস্বর্গ, আমার অপরাধের অস্ত্র নাই। কিন্তু তুমি কহা না করিলে আর কে আমার কহা করিবে?

যা বধুকে ঝুঁজিতে ঝুঁজিতে সেই কক্ষঘরে আসিলেন; বধুকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া বাইলেন।

দারুণ ছুঃখে পুত্রবিয়হব্যাপিতা জননীর ও পতিবিয়হবিধুরা পক্ষীর দিন কাটিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে প্রায় একমাস বটিল।

১০

ভাল লাগে না। বেদনার যে উত্তেজনার মৃণালকান্তি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহার তীব্রতার হাস হইল। অভিমানের স্থানে মনে কর্তব্যের কথা স্থায়ী হইল। গৃহ ত্যাগ করিয়া যাত্রাপথে আসিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, চিকিৎসক তাহাকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বাইতে বলিয়াছিলেন। সে তাহাই করিল। তথায় কর দিনে তাহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার কথা মনে পড়িল। সে পুস্তক আনাইয়া পড়িতে লাগিল। বিশেষে পাঠ ব্যতীত অস্ত্র কার্য নাই—আছে কেবল চিন্তা। চিন্তা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সে কখনও কহিছে ছাড়িয়া বিদেশে যায় নাই। মা জানি যা কি দুষ্টিতার—কি আনন্দের—কি বেদনার দিনরাপন করিতেছেন? তখন তাহার মনে হইল, সে অতি গহিত কায় করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল সে ভুলিয়াছে কর্তব্য পালনেই মনুষ্য। যদি পালনেই কুমুদমালা তাহার কর্তব্যচ্যুত হইয়াছে ভগ্নাঙ্গি সে কেন তাহার কর্তব্যচ্যুত হইবে? বিশেষ সে কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া ছইজন রমণীকে একান্ত অতিভাবকশত অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছে।

সে পুত্রগতপ্রাণা জননীর কথা বতই ভাবিতে লাগিল—তইই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে সে কর্তব্য স্থির করিল—প্রত্যাবর্তের আয়োজন করিল।

প্রভাতে ট্রেন আসিয়া হাওড়ার পাড়াইল। মৃণালকান্তি পাড়ী ভাড়া করিয়া গৃহে চলিল। পথে অল্প একখানি পাড়ীর উপর হইতে কে শকট-চালককে গাড়ী ধামাইতে বলিল। মৃণালকান্তি চাহিয়া দেখিল, পাড়ীর উপর তাহার পুরাতন কৃত্য।

যা পলায়ন করিয়া কিরিতেছিলেন।

মৃণালকান্তি পাড়ী হইতে নামিয়া আসিল; আসিয়া মা'কে প্রণাম করিল। পুত্রকে দেখিয়া মা'র নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। মা কোন কথা কহিতে পারিলেন না; কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। যে সর্ব্বথ—বাহাকে হারাইয়া জীবন বহুভূমি হইয়াছিল—সে কিরিয়া আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিবার আর কি আছে? আজ বেন মা'র আশঙ্কারও আর কিছু নাই।

১২

মাভাপুত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মৃণালকান্তি পরিত্রিত পথে আপনাব বসিবার ঘরে গেল। কুমুদমালা সবদেহে স্বাধীন সেই ঘরের জব্যাদি ঝাড়িয়া বধ্যস্থানে রাখিতেছিল। সে কৃত্যাদিপকে-সে ঘরের কাছ করিতে দিত না; থয়ং না করিলে তাহার ভূমি হইত না। আজ সে হোয়াটনটে পুস্তকগুলি ঝাড়িয়া উপরের থাকে কটোঙলি ঝাড়িতেছিল। তিনখানি ক্রেমে তিনখানি কটো।—কুমুদমালা ঘরের কটোখানি ঝাড়িয়া রাখিল—শাতড়ীর কটোখানিও ঝাড়িয়া রাখিল; তাহার পর মৃণালকান্তির কটোখানি তুলিল। কটোখানি অকলে মুছিয়া সে তুলিয়া ধরিল—তাহার পর অসীম আবেগে সেইখানি চুখন করিল।

কটোখানি বধ্যস্থানে রাখিয়া সে কিরিয়া দেখিল, কক্ষে মৃণালকান্তি। আনন্দে ও লজ্জায় তাহার মুখে রক্তভা ব্যাণ্ড হইয়া পড়িল।

রবিকরবিকাশে যেমন মুহূর্ত্তে অন্ধকার ঘুর হইয়া যায় তেমনই কুমুদমালায় কার্য্যে মৃণালকান্তির মনের সমস্ত তার ঘুর হইয়া গিয়াছিল। সে অগ্রসর হইয়া পরীকে বক্ষে টানিয়া লইল—পরীর লজ্জানন্ত আননে চুখন দান করিল। স্বামীজীর মধ্যে এত দিনের মনোমালিঞ্চ প্রেমের প্রবাহে তানিয়া গেল।

অল্প দিন পরেই পরীকার মৃণালকান্তির সাক্ষাৎসৌরবে তাহার প্রত্যা-বর্তনে মা'র ও কুমুদমালায় আনন্দ বেন আরও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।